দর্শন-জিজ্ঞাসা

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত
পাবলিকেশন্‌স্ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গপত্র

দার্শনিক সত্তম

শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মহারাজকে—

গ্রন্থকারের নিবেদন

দর্শনজিজ্ঞাসা কোন এক বিশেষ ধরণের জিজ্ঞাসা নয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই একমাত্র দর্শনজিজ্ঞাসা এ ধরণের কোন ভ্রান্তি থাকা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ভাঙ্গা পাঁচিলে ফোটা নাম না জানা ফুলের পরিচয়টুকু জানতে হ'লে বিশ্বপরিচয়ের প্রয়োজন হয় যথার্থ জিজ্ঞাসুর পক্ষে। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের Flower on a crannied wall বিশ্বজিজ্ঞাসার প্রতীক। দার্শনিক স্পিনোজা যে দর্শনের কথা বলেছেন তা হ'ল viewing things sub specie acternitatis ; এই দেখায় অভ্যস্ত হ'লে ছোট্ট ফুলটিকে চিনতে গিয়ে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করা অবশ্য কর্তব্য হ'য়ে পড়ে। বৌদ্ধদর্শনের সম্যক্ দর্শন এই ধরণের দর্শন বা বিচারের কথা বলে। আমরা এই বিস্তৃত অর্থে 'দর্শনকে গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি ও ব্যবহারগত জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অতিক্রম ক'রে এক সর্বব্যাপী সত্তারও সন্ধান করেছে। এরা সবাই দর্শনজিজ্ঞাসার অন্তর্ভূত।

প্রথম স্তবক থেকে সপ্তম স্তবক পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনার ধারা বেয়ে এসেছে দর্শন চারিত্র্যের, দর্শনের স্বভাব ও ধর্মের ওপর আলোচনা। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ষড়দর্শনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের নব্য হিন্দুবাদের আলোচনাও করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ইয়োরোপীয় মনুষ্যত্ববাদের কথা বলা হয়েছে ; বলা হয়েছে পশ্চিমী প্রত্যক্ষবাদের কথা, অগুস্ত কঁতের কথা। অধ্যায়ের শেষে রবীন্দ্রনাথের দর্শনে পাশ্চাত্যদর্শনের Alienation তত্ত্বের সন্ধান ও তদ্‌বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে নীতিদর্শনের আলোচনা। ভারতীয় নীতিদর্শনের আলোচনা ক'রে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের অবতারণা করা হয়েছে G E. Moore-এর নীতিদর্শনের আলোচনা ক'রে। মূর সাহেব এদিকে একজন দিকপাল।

তাঁর শ্রেয়োবাদ এই সেদিন ইয়োরোপীয় চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলেছিল। নীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কটা খুবই নিকট। তাই দ্বিতীয় স্তবকের প্রান্তে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কথা। প্রসঙ্গতঃ নৈতালিম নিয়ে একটি ছোট আলোচনা এই স্তবকের উপসংহারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

নৈতালিমের সূত্র ধ'রে আমরা তৃতীয় স্তবকে শিক্ষাদর্শন বিষয়ক আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাদর্শন, বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শন, গ্রীক শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গটিকে আধুনিক তাৎপর্য দানের জন্য আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনও পর্যালোচনা করেছি স্তবকটির শেষের দিকে।

শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনান্তে আমরা শিল্পদর্শনের আলোচনা করেছি। প্রাচীন কালে মধ্যযুগে এবং আধুনিক পূর্বযুগে এদেশে অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়ে সুগভীর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আজকাল সৌন্দর্যদর্শন নিয়ে এতদ্দেশে আলোচনার বড়ই অসদ্ভাব। পাশ্চাত্যদেশে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতজনা ভাবনাচিন্তা করছেন্। আমরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকাটুকু হারিয়ে ফেলেছি। তাই আবার নতুন ক'রে নন্দনতত্ত্বকে দর্শনের সাম্রাজ্যের মুখ্য সচেতকের ভূমিকাটুকু গ্রহণ করতে হ'বে। সেই প্রত্যাশায় আমরা চতুর্থ স্তবকটিকে দীর্ঘায়ত করেছি, আলোচনা করেছি নন্দনতত্ত্বের নানান সমস্যার। ইঙ্গিতও দিয়েছি এর ভবিষ্যত গতিপথের।

মানুষের প্রতিভা শিল্পসৃষ্টি করে আর সৃষ্টি করে সমাজ ও রাষ্ট্র। পঞ্চম স্তবকে আমরা রাষ্ট্রদর্শনের কথা বলেছি। এযুগে রাষ্ট্রদর্শনে যে নামটি প্রোজ্জ্বল, যা সকলকে আকৃষ্ট করে তা হ'ল কার্ল মার্ক্সের নাম। এই মানুষটির মৃত্যুর পরে সংবাদপত্রের পাতায় ওঁর ছাপা ছবি দেখে ব্রিটিশ মিউজিয়মের দ্বাররক্ষক বলেছিলেন: 'আরে এইত' সেই ভদ্রলোক যাঁকে আমি প্রায়ই রাত হয়েছে ব'লে রীডিং রুমের চেয়ার থেকে তুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলতাম। ভদ্রলোক এতো বড় ছিলেন, তাত আগে কখনো বুঝতে পারিনি। আমরা অনেকেই আজো বুঝিনি উনি কত বড় ছিলেন। সত্যিই কার্ল মার্ক্স চিন্তাজগতের এক যুগন্ধর পুরুষ। এশীয় এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনে এঁর প্রভাবের কথা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করেছি। পঞ্চম স্তবকের উপসংহারে এশীয় নবজাগরণের কথা বলেছি।

নীতি, ধর্ম, শিক্ষা—এরা সবাই মিলে ত' মানুষের জীবনদর্শনকে রূপায়িত করে। এই ষষ্ঠ স্তবকে জীবনদর্শনের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। জীবনধর্মকে আশ্রয় করে জীবনদর্শন। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী এই ত্রয়ী প্রতিভাধর পুরুষকে আশ্রয় ক'রে মানুষের সদ্ধর্ম, আদর্শবাদ ও তদ্‌উদ্বুদ্ধ জীবনবাদের আলোচনা করেছি।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা এযুগে এক নতুন শৈলীতে দেখা দিয়েছে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে। এঁদের নেতৃপদে রয়েছেন সদ্যোপ্রয়াত এরিক হফার। অবশ্য অস্তিবাদী ফরাসী দার্শনিক গ্যাব্রিয়েল মার্শেলের Metaphysicial Journal-এ এই ধরণের আলোচনা শৈলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইতিপূর্বেই ঘটেছিল। আমাদের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ সপ্তম স্তবকে আধুনিক মার্কিন দর্শনের আলোচনা প্রযুক্ত হয়েছে।

সুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমি নানানভাবে উৎসাহ পেয়েছি সন্ন্যাসী সত্তম স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের কাছ থেকে। বৈরাগ্য লাঞ্ছিত এই সন্ন্যাসীর জীবনদর্শন আমাকে আকৃষ্ট করে একান্তভাবে। তাই আমার এই গ্রন্থটি আমি তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে কৃতার্থবোধ করছি।

গ্রন্থটির প্রকাশনার ব্যাপারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের কর্ণধার শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত ও তাঁর সহকর্মীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা না পেলে এটির সুষ্ঠু প্রকাশ ত্বরান্বিত করার কোন আশাই ছিল না। নবজীবন প্রেস কর্তৃপক্ষও আশাতিরিক্ত সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুস্তকটির প্রকাশনে সহযোগিতার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সকল কর্মকর্তাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই; বিশেষ ক'রে স্মরণ করি প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম সৌজন্যের কথা।

'শৌচম্'
বালিগঞ্জ, কলকাতা

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ভূমিকা

দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল দেখা, দর্শন করা। সৎ বা অস্তিকে দেখাই হ'ল দর্শন শব্দটির মর্মার্থ। এই সাক্ষাৎকার, এই দর্শনটুকুর জন্যই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের নিত্য প্রয়াস। এই সাক্ষাৎকারের প্রান্তিক মর্মার্থ হ'ল আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ নিজেকে দেখা, নিজেকে জানা হ'ল এই আত্মসাক্ষাৎকারের আর এক রূপ। Know thyself; নিজেকে জানা হ'ল আরিস্ততলীয় দর্শনের প্রান্তিক নিশানা। এই আত্মজ্ঞান হ'ল আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতি। অতএব দর্শনশাস্ত্রে এমন এক বিস্তৃত বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করা হয় যা 'অস্তি'কে অতিক্রম ক'রে সত্তাকে, পরাসত্তাকে অথবা অনস্তিত্বের শূণ্যতাকেও স্পর্শ করে। যেমনটি আমরা পাই আস্তিক্যবাদী হিন্দু অথবা বৌদ্ধদর্শনে; পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদী Gabriel Marcel এর নামকরা বই Metaphysical Journal এর আলোচনার সূত্র ধ'রে বলতে পারি যে দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ক'রেই দর্শন আলোচনার সূত্রপাত। ভারতীয় নব্যন্যায়ের আলোচনার মূলাধারে পাত্রাধার-তৈলাধারের সম্বন্ধটুকুর নির্ণয় প্রয়াস হ'ল প্রকৃষ্ট দর্শন আলোচনার উদাহরণ। পাত্র তৈলকে ধারণ ক'রে আছে না তৈল পাত্রকে আশ্রয় করে আছে—এই চুলচেরা তর্কের মধ্যে অনেকে নিষ্ফলতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এঁরা ন্যায় দর্শনালোচনা পদ্ধতির সমালোচক। এঁরা বলবেন এ আলোচনা নিরর্থক। কেননা এ আলোচনা জীবনকে কোথাও স্পর্শ করে না, ইউটিলিটেরিয়ান দার্শনিক মিলের 'Greatest good of the greatest number' তত্ত্বের পোষক নয় নব্যন্যায়ের এই সূক্ষ্ম বাদবিতণ্ডা। অতএব এহ বাহ্য আগে কহ আর। জীবনকে স্পর্শ করার অর্থ হ'ল জীবনের স্থূল প্রয়োজনকে স্বীকার করা, তার সমস্যাবলী পূরণ করা। নব্য ন্যায় এই অর্থে না কী জীবনকে স্পর্শ করে না। পাশ্চাত্ত্যের অস্তিবাদী

(Existentialist) দর্শন* জীবনের সমস্যা পূরক দর্শন ; Anguish হ'ল সার্বভৌম ব্যাধি ; এই ব্যাধির নিরাময়, এই মূলব্যাধির নিরাকরণই হ'ল এই দর্শন মতের মূল লক্ষ্য। অতএব জীবনপ্রবাহের একটি মৌলস্রোতকে উৎকণ্ঠার কলুষমুক্ত করতে চেয়েছে অস্তিবাদী দর্শন। এতোদ্দেশীয় বৌদ্ধ-দর্শন অষ্টাঙ্গিক মার্গের নির্দেশ দিয়ে জীবনকে পবিত্র করার প্রয়াস পেয়েছে। একদিকে শূণ্যবাদের নৈর্ব্যক্তির মহিমা, অন্যদিকে নৈতিক পথ নির্দেশের কাঠিন্য—এ দুয়ের সম্মিলনেই বৌদ্ধদর্শনের জীবনাশ্রয়ী-আবেদন। জ্ঞান এবং কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। জানার অর্থ হ'ল কর্মে সেই জ্ঞান প্রয়োগের প্রেরণা। যখন বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা পড়ি, উত্তাল নদী পার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র সেই ভয়ংকর রাত্রে তখনই মনে হয় আমরাও যেন ঐ মাতৃভক্তিটুকু অনুকরণ করতে পারি। মন বলে, তোমারও ঐরকম মাতৃভক্তি থাকা উচিত। অননুকরণীয় এই সব মহাপুরুষদের জীবনাদর্শ আমাদের মনে এক ধরণের হতাশা জাগায়। আমাদের মনে পড়ে : 'Dust thou art and to dust returnest'—এর বেশী আমরা আর ভাবতে পারি না। কিন্তু সেটা হ'ল আমাদের অক্ষমতার কথা। মর জীবনের, জৈব জীবনের সীমাকে ব্যক্তিজীবনে মেনে নেওয়ার কাহিনী। কিন্তু এ তথ্য মনস্তাত্ত্বিক সত্য যে আমরা বড় কিছু, মহৎ কিছু দেখলে বা জানলে তাকে অনুকরণ বা অনুসরণ করার প্রচ্ছন্ন বাসনা মনের মধ্যে জাগে। আর এই ধরনের একটা প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জাগে বলেই'ত মহাকবি বললেন :

'যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবস নিশি।'

জ্ঞানমার্গীরা ভক্তি এবং কর্মবাদীদের থেকে আপনাদের যতই স্বতন্ত্র এবং পৃথক মনে করুন না কেন, এই তিনটি মার্গই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অবশ্য বিরোধী মতের অস্তিত্ব জেনেও বলব যে এরা আত্যন্তিক

---

* For the Indian Transcendentalists, there is no such divorce between essence and existence as is generally admitted in the West. (Dr. Kalidas Bhattacharyya : Studies in Comparative Indian Philosophy. R. K. Mission Institute of Culture Bulletin, পৃঃ ১১০ দ্রষ্টব্য : Vol. XXXII,, Vol. 5)

সম্বন্ধে সম্বন্ধ। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত প্রবর এবং ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যের কথা প্রণিধানযোগ্য :

"Some transcendentalists might well have held that even this final awareness of one's existence—Freedom need not be cognition (theoretical knowledge). If the first six cantoes of the Gita be taken as a self-complete section (and it may well be so taken), it at least suggests this view and that strongly enough : for there it is said the Freedom can be attained through Karma-yoga unaided by Buddhiyoga and Bhaktiyoga. This wold be like Kant's view in his critique of Practical Reason (his notion of practical knowledge of self). This is true even of those Mīmāṁsakas (if not all) who hold that Freedom (mokṣa) is at least one final desideratum for man. As all Mīmāṁsakas are wholly for the way of Karma, even this desideratum has to be attained that way i.e. through Karma which means that Vairāgya which is a means to attaining it has to be wholly in the context of action (theoretical) knowledge having only that much of import there which it has elsewhere. তাইত দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের একটা আত্যন্তিক যোগ রয়েছে। মহাদার্শনিক কান্টের বক্তব্য 'Thou oughtest, therefore thou canst' এই আত্যন্তিক যোগের কথা বলছে। যা আমার করণীয় বলে জানি, তা আমার সামর্থের মধ্যেই বিধৃত। আমার করণীয় কাজটুকু করার শক্তি এবং সামর্থ যে আমার মধ্যে রয়েছে, এই সত্যটুকু অতি ভাস্বর হয়ে উঠল কান্টের মহাগ্রন্থ Critique of Practical Reason এর তত্ত্বদর্শী আলোচনায়। আর এই কর্ম করার প্রবৃত্তির সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত না হ'লে কর্ম সুসম্পূর্ণ হয় না। তাই কর্মে একনিষ্ঠ হতে হয়। এই নিষ্ঠারই রূপভেদ হল ভক্তি। অবশ্য ভক্তির ভাবালুতা বা আবেগপ্রবণতা বহু যুক্তিবাদীর কাছেই অগ্রাহ্য। যেমন মহাদার্শনিক কান্ট বললেন যে মা যখন সন্তান পালন করেন তখন তার মধ্যে মাতৃস্নেহ নামক আবেগ সংস্কার ভাবালুতা যেন না থাকে। মা সন্তান পালন করবেন কর্তব্যের খাতিরে। মাতৃস্নেহকে তিনি 'Morbidity' আখ্যা দিয়েছেন। মহাদার্শনিক কান্ট এই নিস্পৃহ কর্তব্যপালনের মূলমন্ত্র হিসেবে বৈরাগ্যকে দেখেছেন এবং এই

বৈরাগ্যই ভারতীয় জীবনদর্শনের কেন্দ্রীভূত ধারণা। এই বৈরাগ্যই পাশ্চাত্ত্য অস্তিবাদী দর্শনের Freedom-এর দ্যোতক। জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম মার্গের যেটিকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন বৈরাগ্যকে মুক্তিপথের দিশারী হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে হবেই। এই প্রসঙ্গে একজন মনস্বী নব্য পণ্ডিতের* মননশীল মন্তব্যের উদ্ধার করে বলি :

"However, whichever way one chooses, one of the main things, one has to perform is the culture of Vāirāgya in some form or other. As a matter of fact, practically half the Sādhanā along at least two of these paths consists in culturing Vairāgya and the whole difference among the Sādhakas on these two lines consists now in whether this Vairāgya results from some (phenomenal) knowledge or is Sui generis i. e. entirely conative from the beginning to the end.

ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিকের অবশ্য অসদ্ভাব নেই। বের্গসঁ এই ভিন্নমতাবলম্বীদের অন্যতম। আমাদের দেশে ভক্তিবাদী দার্শনিকেরা সংখ্যায় অল্প নয়। ভক্তিবাদের লক্ষ্যও হ'ল সেই পরম সত্তাকে জানা, আপন করে জানা। শুষ্ক জ্ঞানের পথ ভক্তির পথ থেকে স্বতন্ত্র হলেও এ দুয়ের লক্ষ্য সেই একই। পরমকে জানাই হ'ল সকল দর্শনমতের শেষ, সকল দর্শন-পন্থার লক্ষ্যস্থল। সাধারণ জ্ঞান, অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা, এসব থেকেও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার সরণী বেয়ে আমরা সেই অসাধারণ সত্তায় পৌঁছুতে পারি। ভাঙ্গা পাঁচিলে নাম গোত্রহীন পুষ্পের বংশ-গোত্র-উৎপত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা সেই 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্' পরম সত্তার সন্নিধানে উপনীত হই। মুখোমুখি হই সেই দিব্য জ্যোতির : The light that never was on sea or land ; রূপ থেকে অপরূপে যাবার এই যে পথ এই পথকে আমরা সহজিয়া সাধনার পথ বলেছি। যেখানে এই অপরূপকে পাবার জন্য ধর্ম পথ নির্দেশ করছে তার আলোচনা হ'ল ধর্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মদর্শন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পরিদৃশ্যমান জগতটার আড়ালে

---

* ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের "Studies in Comparative Indian Philosphy : Ramakrishna Mission Institute of Culture Bulletin, পৃঃ ১১০ দ্রষ্টব্য (Vol. XXXII, No. 5)

যে মহাসত্তার অবস্থিতি আবশ্যিকভাবে কল্পনা করেছি তার সঙ্গে ব্যক্তি সম্বন্ধ স্থাপনের কথা বলেছি। Personal God বা ব্যক্তিরূপী ভগবানের কথা আমরা আলোচনা করেছি। তাঁর সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে আলোচিত হয়েছে প্রেম, ভক্তি ভালবাসার কথা। করুণা ও মৈত্রীর তত্ত্বও এই্ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। মানুষের সেই প্রাথমিক বিচ্যুতি—Primordial alienation আমাদের এক আত্যন্তিক বিরহের মুখোমুখি করে দিয়েছি। মানুষ তার আপন ঈশ্বর সত্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাকেই খুঁজে ফিরেছে সমগ্র মানস বিবর্তনের সরণী বেয়ে। শ্রীরাধার এই অভিসারই বৈষ্ণবদর্শনের কেন্দ্রস্থলে। বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তিমার্গ প্রাধান্য পেলেও জ্ঞানমার্গ একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে শ্রীরাধার উথাল পাথাল প্রেমের কোন হদিসই্ আমরা করতে পারি না। কানু বিনা শ্রীরাধিকার জীবন যে কেন অসহ তার কিনারা করতে হলে আমাদের কানুতত্ত্ব ও শ্রীরাধিকার প্রেমতত্ত্ব সম্যক অনুধাবন করতে হবে। এটুকু হ'ল জ্ঞানের ক'থা। তাইত বৈষ্ণব দর্শনে এই জ্ঞানের কথাটুকু বলা হ'ল ভক্তিরসে আপ্লুত করে। তাইত চৈতন্য ভাগবত দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ হয়েও এতো সুখপাঠ্য।

ধর্মভাব হ'ল ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কটুকু; সখ্যভাব, দাস্যভাব প্রমুখ ভাব হ'ল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধটুকুর যাথার্থ্য নির্ণায়ক। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেকার দ্বৈতবাদী সম্বন্ধ যখন দ্বৈতবাদ পরিহার করে তখন ধর্মের অবসান ঘটে, ভক্ত ও ভগবানের একাত্মতা দর্শনের এক মহাসত্তার ইঙ্গিত করে। Personal God বা ব্যক্তি-ভগবান ধর্মের সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়। Metaphysical Absolute বা দর্শনের পরমসত্তার সর্বগ্রাসী রূপের আবির্ভাব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান তখনো কিন্তু দর্শনের পরমসত্তার আবির্ভাব ঘটেনি। কেননা তখনো ভক্তরূপী অর্জুন বা অর্জুনরূপী ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সমারূঢ়। অতএব বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়েও আমরা ভক্ত ও ভগবান তথা পরম ধর্মের দেখা পাই। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধটুকু নিরূপণের ব্যাপারে ভক্তের আত্মশুদ্ধি ভক্ত ও ভগবানের একাত্মতার নির্ধারক। ভগবান পাপ পুণ্য সমাকীর্ণ ব্যক্তিমানুষের সমগ্রতাকে স্বীকার করে কী না সে সম্বন্ধে বহু তর্ক আছে। দার্শনিক ব্রাডলি থেকে উজান বেয়ে যদি শ্রীশঙ্করাচার্য পর্যন্ত

আমরা যাই ত দেখব যে মানুষের আত্মশুদ্ধি নিয়ে, ভক্ত ও ভগবানের সামীপ্য ও সাযুজ্য নির্ণয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা আছে। ভগবান দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান যদি হন তবে মানুষের এতো দুঃখ কেন? বিশ্বজগত-নিয়ন্তা ঋত কী ভগবানের আজ্ঞাধীন? ভগবান কী যথার্থই মানুষের পাপের স্খালন করতে পারেন তাঁর অপার করুণার পরশটুকু দিয়ে? এ সবই হ'ল নীতিদর্শনের প্রশ্ন। দর্শনশাস্ত্রের চিন্তনপদ্ধতি আমাদের ধর্মজীবনের এবং নৈতিক জীবনের সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করার জন্য যখন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করি তখনই ধর্মদর্শন এবং নীতিদর্শনের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। এই দুইটি বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল। দেশে দেশে কালে কালে এ প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হ'ল যে ভগবানই সকল নৈতিক মূল্যের মূলাধর কী না? তা যদি হয় তবে নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে ব্যক্তি নিরপেক্ষ এক Ideaর দ্যোতক হয়ে পড়ে। আমরা প্লেতোর দর্শন সমগ্রে নীতিবোধের এই Objectivity বা ব্যক্তিনিরপেক্ষতার তত্ত্বটুকু পাই। অবশ্য এই প্লেতোনিক বিচার নিওপ্লেতোনিষ্টদের অনেকেই গ্রহণ করেছেন আবার এর বিরুদ্ধবাদীরও অভাব নেই। সে যাই হোক্ এই ধর্মমত ও নীতিবোধের বিশ্লেষণ ও বিচার ও দর্শনশাস্ত্রের পরিধির মধ্যে বিধৃত। নীতিদর্শন ও ধর্মদর্শন দর্শনসমগ্রের পরিবারভুক্ত।

ধর্মভাব ও নৈতিক বোধ এতদুভয়ই হ'ল মানসিক ব্যাপার। ভগবান তাঁর সপ্তস্বর্গ থেকে ভক্তের কাছে নেমে আসুন আর নাই আসুন, যখন মহাকবি বলেন 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', তখন ভক্ত মাত্রেই আশ্বস্ত হ'য়ে পড়েন ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে। এই আশ্বস্ত হওয়া—এটি হ'ল মানসিক ব্যাপার। নীতিবোধ, ধর্মবোধ, সৌন্দর্যবোধ সর্বোপরি মূল্যবোধ এ সবই হ'ল মানসিক ব্যাপার। মনোদর্শন, অন্ত'দর্শন —সবই মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। মানবের শিক্ষা-সমস্যা ও মনস্তত্ত্বের সমস্যা। প্লেতো কথিত মানব মনের আবেগের ঘোড়াটাকে যুক্তির ঘোড়াটার সাহায্যে সুশাসিত করে তুলে সংযমের মধ্যে বেঁধে রাখাই হ'ল শিক্ষার মূল কথা। মানসপ্রবৃত্তিকে সৎপথে চালিত করাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য। যোগশাস্ত্র চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথা বলেছে : চিত্তবৃত্তি নিরোধ ইতি যোগ : যোগের এই শিক্ষাই পূর্ণ শিক্ষা। জীবসত্তার সঙ্গে মহাসত্তার যে আত্যন্তিক

যোগটুকু অজ্ঞানতবশতঃ আমরা হারিয়ে ফেলি তাঁর পুনঃস্থাপনা করাই ত সৎশিক্ষার লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিলেন: Education is the manifestation of perfection already in man সেই Perfect Being-ই হলেন চিৎস্বরূপ। সেই চিৎস্বরূপের অবরোহন ঘটে ব্যক্তি মানুষের অন্তরে: ক্ষুদ্র মানুষ পূর্ণ হয়ে ওঠে: সীমা ও অসীমের ভেদ ঘুচে যায়। ব্যক্তি তার সীমাবদ্ধ জীবনে ভূমার আস্বাদন করে। মানুষের জীবনমুক্তি ঘটে। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন্মুক্ত পুরুষ দেশের ও দশের সেবা করেন। চিৎরূপী ব্যক্তি মানুষ সমাজসেবী করুণাময় রূপে প্রতিভাত হয়। এই ধরনের কর্মের স্বীকৃতি জ্ঞানমার্গীরাও দিয়েছেন:

The Karma that is accompanied by these jnānamārgins may even be positive free Karma like Nitya and naimittika ones—actions in other words, which are positively moral and social, not merely negative freedom which we have called Vairāgya.

এই ধরনের জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ে মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তির উদ্দীপনায় সংযম আসে: মানুষের চিত্তবৃত্তির নিরোধ সংসাধিত হয়। মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তাই শিক্ষাদর্শনে আমরা সুউচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাবলীর প্রয়োগসার্থকতা লক্ষ্য করি। নীতিদর্শনের সঙ্গে শিক্ষাদর্শনের এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়। মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্বের সঙ্গে আবার শিক্ষাদর্শনের যোগ খুবই নিগূঢ়, এর উল্লেখ আগেই আমরা করেছি।

মানস প্রকৃতির অসংযমকে সংযমের কাঠামোর মধ্যে বেঁধে ফেলাই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে সেই প্রসঙ্গে সৌন্দর্য দর্শনের আলোচনাও খুবই প্রাসঙ্গিক। আবার সৌন্দর্যদর্শনের সঙ্গে ধর্মদর্শনের যোগটুকুও আত্যন্তিক। Bremond একজন খ্যাতনামা ফরাসী দার্শনিক। তিনি তাঁর The Poetry and the Prayer শীর্ষক গ্রন্থে সুন্দরের আরাধনা ও ভগবৎ উপাসনার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেন নি। সুন্দরকে উপলব্ধি করা এবং ভগবদ্ উপলব্ধি করা এ দুয়ের মধ্যে যে নিত্যযোগটুকু রয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেটি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। আকাশে এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, হংসবলাকার সেই সুশুভ্র ছন্দোময় পক্ষ বিধূনন গদাধরকে সেই পরম সুন্দরের সন্ধান দিয়েছিল। তাঁর ক্ষণিক দেখা পেয়েই গদাধরের ভাবসমাধি।

হঠাৎ দেখা এই পরম সুন্দরের আভাস কিশোর গদাধরকে এক তুরীয় অবস্থায় উন্নীত করে দিয়েছিল। এ সত্য আমরা পেয়েছি ঠাকুরের জীবনকথায়। ঠাকুর যে কী দেখেছিলেন, কী তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেন নি, বলেছেন এ যুগের মহাকবি। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। এই সুন্দরের অভিজ্ঞতায় কেমন করে পরমসুন্দর আমাদের হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছেন সেই তত্ত্বটুকু রবীন্দ্রনাথ ছন্দোময় ভাষায় ব্যক্ত করলেন :

চকিত আলোকে কখন সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয়না তবুও ধরা।
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আমার গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে,
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা,
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

এই খণ্ডসুন্দরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরমসুন্দরকে হঠাৎ উপলব্ধি করার তত্ত্ব, এ তত্ত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কাব্য ও দর্শনে স্বতঃ স্বীকৃত। সূর্যাস্ত, সন্ধ্যাতারা —এদের সৌন্দর্য, মোহনরূপ শ্যামের উদার সৌন্দর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। পরমসুন্দর মৃত্যুর symbol হিসেবে আমরা সূর্যাস্তকে, সন্ধ্যাতারাকে দেখেছি। পাশ্চাত্ত্য কবি বললেন :

Sunset and Evening star
And one clear call for me,
May there be no moaning of the bar
When I put out to sea.

সুন্দর হ'ল পরমসুন্দরের symbol; সেই পরমসুন্দর যখন মৃত্যুর মোহন রূপ ধ'রে এসেছে তখন কবির জীবনদর্শনে কোথাও বেদনার লেশটুকুরও প্রতিধ্বনি ছিল না। বিষাদের সুর, বিয়োগব্যথার আতুরতা—এদের স্থান হয়নি কবির বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের বৃত্তবলয়ে; তত্ত্বকথাকে যখন জীবনসত্য রূপে আমরা গ্রহণ করি, তখনই আমাদের জীবনদর্শন সত্য রূপ পায়। দুঃখের অন্ধকারে আমরা আগামী সূর্যোদয়ের পরম লগ্নটির আবির্ভাব সম্ভাবনাকে

প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনোলোকে সম্যগ্ দর্শনের সূচনা ঘটে। আমরা বৌদ্ধদর্শনের প্রবক্তাদের সত্যদৃষ্টির স্বচ্ছতাটুকু অবলোকন করি।

যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে আমরা বাস করি, সেই গোষ্ঠীগত জীবনেরও একটা দর্শন থাকে। যুথবদ্ধতার মানসিক প্রয়োজনই বা কী, কেমন করে ব্যক্তি মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হয়ে ওঠে তার তাগিদই বা আসে কোথা থেকে, এইসব প্রশ্ন সমাজদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ গড়ার মূলে কোন্ ধরনের motivation কাজ করে, এই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের সম্বন্ধটুকুই বা কী, এসবই হ'ল সমাজদর্শনের প্রশ্ন। আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের বাদবিসম্বাদ তত্ত্ব পর্যালোচনা করার সময় আমরা জীবনদর্শনের যে প্রশ্নটির মুখোমুখি হই তা হ'ল অপরাধীকে তাঁর অপরাধের জন্য কী ধরনের শাস্তি দেওয়া দরকার। শাস্তিদানের প্রয়োজন হয় সমাজ দেহকে সুস্থ রাখার জন্য Preventive, Retributive এবং Reformative theory বা শাস্তি তত্ত্ব আমাদের সুপরিজ্ঞাত। যে সমাজে মানুষ বলে—

অয়ং নিজ পরোবেতি
গণনা লঘুচেতসাম্
উদার চরিতানাম্ তু
বসুধৈব কুটুম্বকম্।

সেই সমাজ বলয়ের মধ্যে সামাজিক যে সুস্থ এবং স্বস্থ জীবন যাপন করতে পারবে, এ সত্যটুকু অনস্বীকার্য। মানুষের এই সুস্থ এবং স্বস্থ জীবনের প্রার্থনা সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই শুরু হয়েছে।

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মাং জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতম্ গময়
আবিরাবির্মএধি।'

এই জ্যোতির্ময় জীবনই হল অমৃতময় জীবন, এই আলোকময় জীবনই সচ্চিদানন্দ আশ্রিত জীবন। এ হ'ল মানুষের আত্যন্তিক জীবন চর্যার শেষ পরিণাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রদর্শনের বিবর্তন পথে আমরা খুদে গ্রীক রিপাবলিক থেকে যাত্রা শুরু করে শ্রীঅরবিন্দ কথিত Philosophical

Anarchism-এ এসে পৌঁছেছি। ব্যক্তি মানুষের সার্বভৌম অধিকারকে কখন স্বীকার করেছি আবার কখন বা ব্যক্তিমানুষের অধিকারকে খর্ব ক'রে সমাজের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার স্থান নির্দেশ করেছি। মুখ্য স্থান থেকে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' যেমন বলেছি আবার ঠিক তেমনি জোর দিয়েই Greatest good of the greatest number এর কথা বলেছি। গরিষ্ঠদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে লঘিষ্ঠদের কথা যখনই ভাবতে ভুলে গেছি, তখনই আমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। এই দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নানান তত্ত্বকথার অবতারণা করেছি। নানান্ Theory নানান্ তত্ত্ব নানান্ Ism-এর সত্যতাটুকুকে উদ্ঘাটন করতে পারেনি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Human cycle গ্রন্থে দর্শনের আলোচনায় যে সম্যকদৃষ্টির পরিচয় দিলেন তার তুলনা বিরল। তিনি রাষ্ট্রবিবর্তনের প্রান্তপথে কম্যুনিজমের অভ্যুদয়ের কথা বললেন। আর তাঁর মতে এই বিবর্তনের শেষপাদে যে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ দেখা দেবে তা রামরাজ্যের সমতুল। মানুষ তার আপন সীমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। পুলিশ, কোর্ট, কাছারি এমনকী রাষ্ট্রের কোন শাসনযন্ত্রই থাকবে না। নৈরাজ্যের মধ্যেই মানুষ তার আপন আপন সীমানার মধ্যে সুস্থ এবং স্বস্থ জীবন-যাপন করবে। সীমানা লঙ্ঘিত হবে না কখনও। আর আপন আপন সীমানা লঙ্ঘিত না হলে রাষ্ট্রের খবরদারিরও অবসান হবে। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের মধ্যেই মানুষ তার আপন সার্থকতা খুঁজে পাবে।

এই লেখকের লেখা অন্যান্য গ্রন্থ

রবীন্দ্র দর্শন অন্বীক্ষণ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)

নন্দনতত্ত্ব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)

নীতিবিদ্যা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)

ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা (নলেজ হোম, কলকাতা)

তর্কবিজ্ঞান প্রবেশিকা (শ্রীলীনা নন্দীর সহযোগিতায়)
(ওরিয়েন্ট লংম্যানস্)

মনস্তত্ত্ব প্রবেশিকা (শ্রীলীনা নন্দীর সহযোগিতায়)
[প্রকাশ মন্দির, কলকাতা]

শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে (শ্রীলীনা নন্দীর সহযোগিতায়) [শ্রীভূমি, কলকাতা]

An Enquiry into the Nature and Function of Art
(Calcutta University)

Aesthetics of Romain Rolland (R.K. Mission Institute of Culture, Calcutta)

Studies in Modern Indian Aesthetics (Indian Institute of Advanced Study, Simla)

Art & Aesthetics of Abanindranath Tagore
(Rabindrabharati University)

রূপান্তরের দুর্গম পথে (মার্কিন দার্শনিক এরিক হফারের Ordeal of Change গ্রন্থের ভাবানুবাদ)

শিল্প ও জনমানস (মার্কিন নন্দনতত্ত্ববিদ আরুইন এডম্যানের Arts and the Man গ্রন্থের ভাবানুবাদ)

সূচীপত্র

প্রথম স্তবক ঃ দর্শন-চারিত্র্য

দর্শন-চারিত্র্য

মানুষের ভেদবাদী বুদ্ধির অনাদিকালের জিজ্ঞাসা হ'ল অসঙ্গ যে সত্তা তা কি প্রকাশ-নিরপেক্ষ? ভক্তি-বাদী মানুষ বিহ্বলচিত্তে অনন্ত প্রকৃতির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে তাঁর স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করে। আদিমকাল থেকে মানুষের অসংস্কৃত মন স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছে। সর্বভূতে বুঝি তাঁর প্রতিষ্ঠা। কালক্রমে এই আদিম ভগবানই ব্রহ্মবাদীর পরম সৎরূপে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন বিশ্বসংসারের অণুতে পরমাণুতে। সৃষ্টিতেই স্রষ্টার স্বাক্ষর। তাইতো যুগে যুগে আমরা দেখছি বৃক্ষ ও প্রস্তরের দেবায়ত মহিমা। এই জড়-পূজায় জড়-অধিষ্ঠাত্রী শক্তি পূজা পেয়েছে। সৃষ্টির আদিতে অসহায় মানুষ চরম দুর্যোগের মধ্যে আশ্রয় পেল, ক্ষুধার অন্ন পেল বৃক্ষের কাছ থেকে। তার অসহায় অস্তিত্বের চরম লাঞ্ছনার দিনে সে প্রশান্তির নিবিড়তা উপলব্ধি করল বনস্পতির অকল্প সৌন্দর্যে। তাইতো বৃক্ষ পূজা পেল। নানা গোষ্ঠীর কাছে নানা জন্তু পূজা পেল—পবিত্র পূজা-প্রতীক হ'ল তারা ঘটনার আকস্মিকতায়। বিজ্ঞান-নিষ্ঠ যে মন সেখানে কুসংস্কার সার্বভৌম হয়ে ওঠে। তবু সে কুসংস্কার-ঘনিষ্ঠ যে আলাপন, যে মনন মানুষের আদি ইতিহাসে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে গেল তার পিছনে মানুষের অনুসন্ধিৎসার সজ্ঞান প্রয়াস! যা অস্তিত্ববান তাই কি নিত্য সত্য? অস্তিত্ব এবং সৎ কি সমার্থক? যা কিছু আছে তাই কি সৎ বা সত্যের রূপভেদ? মানুষের বস্তু-অতিক্রমী আত্মা ভারতবর্ষের মাটিতে যে প্রশ্ন উচ্চারণ করল তা হ'ল 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? মানুষের অন্তরের এই নিরন্তর প্রশ্ন দেশে দেশে কালে কালে কত না দেবদেবীর সৃষ্টি করেছে। পুরাতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এবং গবেষণারত পণ্ডিতের দল তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবদেবী-অধ্যুষিত স্বর্গলোকে আপন বিশ্বাস এবং দর্শনগত সততা নির্ভর হয়ে আরও অগণিত দেবদেবীর আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্বের অন্তরতম সত্যটুকুকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। তারা

ভগবানকে দেখতে চেয়েছে অন্তর্যামীরূপে। মানুষের সেই নিরন্তর প্রয়াস তার ভাবনাকে, তার ধ্যান-ধারণাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাইতো একদিন বোধির স্বচ্ছ আলোয় মানুষ প্রত্যক্ষ করল[১] :

"What we call worship is the form in which the finite spirit realises the presence of the Infinite within it. Worship is the ever-deepening consciousness that the Infinite is within and not without us, that it is an ever-present reality in us and not a distant goal which is yet to be realised."

পূজা হল মানুষের আপন অন্তরে অসীম সত্তাকে সীমায়িতরূপে প্রত্যক্ষ করা। ভগবদ্‌পূজায় মানুষের এই মহাসত্যের উপলব্ধি ঘটে যে, আদ্যন্ত-বিরহিত চিৎসত্তা মানুষের অন্তরশায়ী এবং তা হল নিত্য-বিরাজিত। তার সন্ধানে মানুষের অভিসার অন্তহীন। ভগবান দূরাশ্রিত লক্ষ্য নন, তিনি মানবের অন্তরলোকে নিত্য সত্য। বেদাশ্রয়ী ঋষি-প্রশ্নের উত্তর দিল উত্তর-সূরীরা বিভিন্ন দেশে এবং কালে। দর্শনচিন্তার বহমানতায় দেশ-কাল অতিক্রান্ত।

মানুষের অনুসন্ধিৎসা হল দর্শন-জননী। জীবন এবং জগৎ যে সমস্যার উপস্থাপনা করে মানুষের বুদ্ধির সীমানায়, মানুষ তার যে সমাধান করে তা হল দর্শন। বস্তুর রূপ মানবমনে অন্তহীন জিজ্ঞাসার উৎসার ঘটায়। বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রচেষ্টা বার বার ভ্রম দ্বারা খণ্ডিত হয়। দ্রষ্টা কখন কখন রজ্জুতে সর্প অবলোকন করে। বুদ্ধিশাসিত মননধর্ম ভ্রম-প্রমাদের উৎস খোঁজে। রজ্জুতে যখন আমরা সর্প দেখি তখন কোন্ মন্ত্রবলে রজ্জুসত্তার অবলোপ ঘটে, রজ্জু আবৃত হয়? সর্পরূপ অধ্যস্ত হওয়ার সুষ্ঠু মনোবৈজ্ঞানিক অথবা তত্ত্ববৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা আজও সর্বজনগ্রাহ্য হল না। বস্তুর স্বরূপলক্ষণ আজও যথাযথ-ভাবে নির্ণীত হল না। পশ্চিমী দর্শনে বস্তুর কে এবং কি (That and What)-এর সম্মিলন ঘটে কোন্ পথে, সে তত্ত্বটা অতি দুরূহ। ভাবমুখীনতা (ideality) বস্তু-সত্তার কতখানি, ভাবমুখীনতারই বা স্বরূপ

১। John Caird লিখিত 'The Philosophy of Religion' গ্রন্থের পৃ. ৩৯৭ দ্রষ্টব্য।

কি, সে সম্বন্ধেও আলোচনার অন্ত নেই। Ideality বস্তুসত্য হতে চায়, এই হতে চাওয়ার মধ্যেই তার সত্যতা। বস্তুসত্তার[২] এই idealityটুকু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েও ইন্দ্রিয়জ সত্তা-অতীত সত্তার দ্বারা সত্তান্বিত। এই ভাবমুখীনতা বা ideality ইন্দ্রিয় অতীত হলেও তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাকে অস্বীকার করলে দৃশ্যমান দ্যাবা-পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধস্পর্শের আধারটুকু অন্তর্হিত হয়।

মানুষ অনাদিকাল থেকে বস্তুর সহজতম, আদিমতম রূপটুকু দেখতে চেয়েছে। আদিমতম বস্তুর (matter) আবিষ্কার প্রত্যাশায় মানুষ যুক্তিসিন্ধু মন্থন করেছে। গ্রীক দার্শনিক থেলিস বললেন, জলই হল আদিমতম বস্তু। সর্ব রূপবৈচিত্র্য, বস্তুবৈচিত্র্য ও প্রাণবৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে অপ্। মাইলেশীয় ত্রয়ীর অন্য দুজন চিন্তাবীর—আনাক্সিমেন্দার এবং আনাক্সিমিনিস ভিন্নমত পোষণ করলেন। আনাক্সিমিনিস বায়ুকে সৃষ্টিকারণ বলে উল্লেখ করলেন। আনাক্সিমেন্দার যে কথা বললেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানবচিন্তার সেই অভ্যুদয়-প্রত্যূষে এক অসীম সত্তার কথা তিনি শোনালেন। এই অসীম সত্তাই সৃষ্টিকারণ। গ্রীসদেশে যখন দার্শনিক চিন্তার উদ্বর্তন চলেছে এইভাবে, তখন ভারতবর্ষের অনুসন্ধিৎসা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে আবিষ্কার করেছে। এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারণ যে চিন্ময়-সত্তা, যে অপরূপের রূপময় প্রকাশ হল এই বিশ্বসংসার, তার আবিষ্কার ঘটেছে আমাদের দেশে। যে গাছ আদিম মানুষকে আশ্রয় দিল, ছায়া দিল, ক্ষুধায় অন্ন দিল তাকে মানুষ পূজা করেছে অতিপ্রাকৃতের মোহে, অন্ধ-অজ্ঞানতায় এবং গভীর কৃতজ্ঞতাবোধের অনুপ্রেরণায়। তার পরেও মানুষ সন্ধান করেছে জগতের কারণকে। সে কারণ বস্তুভূত পরমাণুই হোক আর সগুণ পরব্রহ্মই হোক, সেখানে রয়ে গেছে দার্শনিক মানুষের আদিমতম দর্শনচিন্তার স্বাক্ষর। সে চিন্তা কখনও কর্তা-ভজনা করেছে আবার কোথাও-বা সে চিন্তায় রয়েছে মানুষের দুর্মদ মননশীলতার আত্মস্বাতন্ত্র্য। ভারতীয় দর্শনচিন্তার কথাই বলি ঃ

২। ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্যের 'The Business of Philosophy' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Proceedings of the Thirteenth Indian Philosophical Congress, Nagpur.

"The systems of Indian Philosophy fall into three main divisions. (1) Systems which are based on the recognition of the authority of the Vedas and profess to teach what is embodied in Sruti (Vaidika), (2) Systems which profess to be based on āgama, i e., on an authority not strictly Vedic and yet also not being Vedavirodhī or inconsistent with Vedic authority (Vedavatya), (3) Systems which are not merely unvedic but anti-vedic (Vedavirodhī).[৩]

এই তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন এবং তন্ত্রাভিসারী দার্শনিক মতবাদ এবং প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসা। ভারতীয় দর্শনের এই বর্ণবৈষম্য মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসায় তার ক্রমিক স্বমনন-নির্ভরতার অভিজ্ঞান।

জগৎ কি সদসৎ অতিক্রান্ত? আমাদের নিত্যদিনের ভ্রম এই প্রশ্নটি বার বার চোখের সামনে তুলে ধরে। বস্তুর সার সত্য কি চরমতত্ত্বে লভ্য? না বস্তুর সত্য বস্তুর অন্তরে নিহিত? রূপময় যে বিশ্বজগৎ তা কি মানুষের জ্ঞান-নিরপেক্ষ? এ সব হল দার্শনিক মানুষের প্রশ্ন। এমনি ধরনের প্রশ্ন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষেরাও করে থাকেন আর এক ভঙ্গীতে। তাদেরও যেমন সত্য-দিদৃক্ষার অন্ত নেই, দাশনিকেরাও তেমনই সত্যসন্ধানে নিত্যপ্রয়াসী। দার্শনিকপ্রবর বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা বলি। তাঁর সত্যদর্শনঅভীপ্সা নতুন নতুন দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করল। বস্তুবাদী (Realist) রাসেলের 'Problems of Philosophy' গ্রন্থে আমরা তাঁকে পুরোপুরি বস্তুবাদীর (Realist) ভূমিকায় পেলাম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় অভিন্ন নয়। বস্তুসত্তার জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। রং, রূপ এবং বস্তু-দার্ঢ্য (hardness) প্রমুখ গুণাবলী হল বস্তুর অবভাস (Appearance)। এই বস্তুনিচয় হল জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ সত্য বস্তু। কিন্তু এই অবভাস-বস্তু সম্বন্ধ নিরূপণ দার্শনিকের

৩। ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্রের 'Fundamental Questions of Indian Metaphysics and Logic' দ্রষ্টব্য।

অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবভাস কি বস্তুর সত্তা-আশ্রয়ী? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ কি বস্তুলক্ষণ বলে পরিগণিত হবে? এইসব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর রাসেলের আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মিলল না। কখনও তিনি প্রাকৃতজনার মতই বলেছেন যে, আমরা বস্তুর যে রূপ সম্বন্ধে সচেতন তার যথাক্রমিক কারক গুণগুলি বস্তু-আশ্রয়ী। আবার কখনও বা পদার্থবিদ্যার অনুসরণে তিনি বললেন যে, বস্তুর অবভাস তার সত্যধর্মকে উদ্‌ঘাটন করে না। তবে এ সত্যটুকু এখানে প্রতিষ্ঠিত করে না যে বস্তুর যে জ্ঞাতাঅনির্ভর সত্তায় সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে তা আমাদের সংস্কারপ্রসূত। মহাদার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বললেন যে, আমাদের বস্তুনিষ্ঠ যে সংস্কার তার জন্যই আমরা বস্তুকে জ্ঞান-নিরপেক্ষরূপে দেখি। বাস্তব-বাদীর স্বতঃসিদ্ধ সত্য হল বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রমুখ জ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে বাস্তব-বাদী মননধর্মের এই অন্ধ সংস্কার। এই সংস্কারই বস্তুকে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। জ্ঞাতার মনন-নিরপেক্ষ বস্তু-সত্তা যে নেই একথা বার্ট্রাণ্ড রাসেলেও তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে স্বীকার করলেন। বস্তুকে তিনি যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা বা logical construction আখ্যা দিলেন। দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতজনের জীবনধর্ম যে বস্তুকে কেন্দ্র করে নিত্য আবর্তিত দার্শনিক সূক্ষ্ম চিন্তার আলোকে সমীক্ষণ দ্বারা তিনি তাকে অস্বীকার করলেন। যে 'আমি' সর্ব প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত, যে 'আমি' নিত্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সম্বন্ধ-নিরপেক্ষ, সে' আমির প্রতিষ্ঠা ঘটল দর্শন জগতের সার্বভৌম সম্রাট হিসেবে। এই 'আমি'র জ্ঞান বস্তু সত্যের ক্রমান্বিত অস্বীকারের মধ্য দিয়েও আসে না। এর জ্ঞানলাভ হল অধ্যাত্ম কর্ম (Spiritual function) যুক্তিবাদী মননধর্মে বস্তুর অসারতা প্রত্যক্ষ হলেও এই 'আমি'র জ্ঞান বুদ্ধি অতীত।

জীবন দুঃখময়—এ কথা দুঃখবাদীর কথা। আশাবাদী বলবেন যে, বছরের যে কটা দিন দুঃখ পেলে সে দিনগুলোকেই বড় করে দেখবে কেন? যে অন্তহীন আনন্দের মেলা বসেছে তোমার সামনে তা থেকে তোমার প্রাণের পেয়ালায় রস ভরে নাও না কেন? দুঃখকে দুঃখ ব'লে স্বীকার ক'রেও আনন্দের আস্বাদন করা যায়। এ কথা অগ্রাহ্য যে, দুঃখ নেই বা দুঃখ আমাদের দর্শন-ভঙ্গীগত বিকার। এ কথা আর যে কেউ বলুক

না কেন বাস্তববাদীরা এ তত্ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করবেন। সে অস্বীকৃতির পিছনের যুক্তি হলো প্রত্যক্ষবাদীর যুক্তি। দুঃখকে স্বীকার ক'রে নিয়েও দার্শনিক ব্রাডলির মত ভাববাদীরা বললেন যে, মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য দুঃখের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ তার চিন্ময় সত্তাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলে এই দুঃখ-পাবকে শুচি-স্নানের মধ্য দিয়ে। দুঃখ সত্য, তবে সে একমাত্র সত্য নয়। এই দুঃখের স্বীকৃতি দার্শনিকের কণ্ঠে, কবির কণ্ঠে বার বার যুগে যুগে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ঃ

'দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার,
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।'

মানুষের জীবনে যদি দুঃখকে সত্য বলে স্বীকার করি তবে দুঃখের উৎসকেও স্বীকার করতে হয়। দুঃখ আনন্দের বৈপরীত্যসূচক। ভগবান যদি কল্যাণের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হন তবে দুঃখ-বেদনাকে কোন্ অনাদি উৎসমুখ থেকে আবিষ্কার করব? ভগবান যদি সকল মঙ্গলকর্ম, চিন্তা এবং আনন্দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবে দুঃখের, বেদনার উৎসমুখ কোথায়? এই জটিল প্রশ্নের সমাধান ঘটেছে নানা দর্শনশাস্ত্রীর হাতে নানান উপায়ে। হিব্রু দার্শনিক তোতলের কল্পনায়, খ্রীষ্টধর্মীয় শাস্ত্র শয়তানের প্রকল্পে, পার্শী-ধর্ম আহুর-ই-মান এবং আহুর-ই-মাজদার ভাবনায় জগতের দুঃখ, কষ্ট, অভাব-বেদনার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। নব্য দর্শনশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই আবার এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন করেন না। দার্শনিক লোট্জা বললেন ঃ "এ তত্ত্ব অভাবনীয় যে, বিশ্বসংসারে পরস্পরবিরোধী সৃষ্টিসত্তা ক্রিয়াশীল থাকবে।[৫] এই বিরোধী সত্তা-উত্তর উন্নততর কোন তৃতীয় সত্তার স্বীকৃতি ব্যতীত সত্তাদ্বয়ের বিরোধ-পরিণতি অকল্পনীয়।" অন্যদিকে আবার ভগবদ্‌সত্তায় অশুভকে আরোপ করা সমীচিন কিনা তাও চিন্তার বিষয়। পরম কারুণিক সর্বশক্তিমান ভগবানের মঙ্গলময় সত্তায় কেমন ক'রে অমঙ্গল অধিষ্ঠিত থাকে তা ব্যাখ্যা-অতীত।

৫। Outlines of a Philosophy of Religion, পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।

ভগবান যদি সর্বমঙ্গলময় হন তবে অশুভ তাঁর চিদ্‌সত্তায় অপ্রাসঙ্গিক, অনভিপ্রেত। পৃথিবীর অমঙ্গল-অস্তিত্ব উদ্দেশ্য-অপ্রণোদিত। মানুষের আত্মানুশীলনের জন্য অমঙ্গল রয়েছে, এমন ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয় না। এই অনুশীলন তত্ত্বে মানুষের স্ব-ইচ্ছা-বশ্যতা তত্ত্ব অব্যাখ্যাত থেকে যায়। মানুষের কর্মে স্বাধীনতা আছে কিনা এ দুরূহ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। অমঙ্গলের অনড় অস্তিত্বে আস্থা স্থাপনায় নিরাশাবাদীরা আপন আপন মতবাদ গড়ে তুলল। নিরপেক্ষ সমালোচক বলবেন যে, জীবন এবং জাগতিক ঘটনা-বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে যে দর্শন-শাস্ত্র ন্যায়মার্গী হবে, তা আশাবাদী অথবা নৈরাশ্যবাদী হ'তে পারবে। জীবনকে দর্শনের ভঙ্গীর ওপরে এই দুটি প্রান্তিক দর্শনমতের প্রতিষ্ঠা। দুঃখবাদীর দল জীবন এবং জগৎ-কারণকে ব্যাখ্যা করার জন্য এক শক্তিমান সত্তাকে স্বীকার করবেন। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের মঙ্গলময়তা এই সত্তা-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবে না। জগতে দুঃখ, বেদনা, অশুভের উপস্থিতি এই কারণ-সত্তার মঙ্গলময়তাকে প্রমাণ করে না। দুঃখকে অস্বীকার না ক'রে মানুষের মঙ্গলময় ভগবদ্‌ধারণার উপযোগী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, দুঃখ পাওয়ার সার্থকতা রয়েছে আত্মশুদ্ধিতে।[৬] এই তত্ত্ব জটিলতর হয়ে ওঠে যখন এর সঙ্গে প্রযুক্ত হয় মানুষের কৃতি বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[৭] বলা হয়েছে যে, মানুষ তাবৎ ভ্রাম্যমান যাবৎ সে আপনাকে কর্মপ্রবাহের কর্তা মনে করে। তার ব্রহ্মলাভ ঘটে না। অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনাও তার কাছে সুদূরপরাহত থেকে যায়। ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান জীব আমরা। আমাদের স্বরূপ-সত্তার পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত। এই বঞ্চনার শেষ হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভে। আমাদের সত্তার ব্রহ্মময়তাই যদি সত্য হয় তবে ব্যক্তি-আমির স্ববশ্যতা-অন্য-বশ্যতার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে পড়ে। আবার মানুষ যদি স্ববশ হয় পরিপূর্ণরূপে তবে আর এক দুরূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয় আমাদের। ভগবানের সঙ্গে আত্মবশ মানুষের সম্বন্ধ নিরূপণের

৬। মহাদার্শনিক প্লেতো তাঁর Republic গ্রন্থের ৩৭২-৮০ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, মানুষ দুঃখ পেয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে। সেটাই তার পরম লাভ।

৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১, ৬।

প্রশ্ন ওঠে। আত্মকর্তৃত্বে যে মানুষ বিশ্বাসী, পরম সত্তার ওপর যে অনির্ভর, সে কি বিশ্ববিধাতার প্রতিস্পর্শী হয়ে ওঠে না? তার সঙ্গে তার স্রষ্টার সম্বন্ধের প্রকৃতি নিরূপণ সহজসাধ্য থাকে না। ধর্মীয় যে পরমসত্তা, হিন্দুশাস্ত্র যাকে ষড়ৈশ্বর্যশালী বলেছেন, মানুষের আদিমতম বিশ্বাস যাকে সর্বশক্তিমান ব'লে মেনে নিয়েছিল, তার সর্বব্যাপ্ত প্রতাপ কি ক্ষুণ্ণ হয় না এই স্ব-ইচ্ছা-অধিষ্ঠিত মানুষের অস্তিত্ব-প্রত্যয়ে? প্লেতো ভগবানের করুণাঘন রূপটুকুকে রক্ষা করলেন তাঁর সর্বশক্তিমানতাকে খর্ব করে। তাঁর কথা উদ্ধৃত ক'রে দিইঃ

"We must be prepared to deny that God is the cause of all things, what is good we must ascribe to no other than God but we must seek elsewhere and not in him, the causes of what is evil."

অশুভের উৎস ভগবান নন, এই তত্ত্বই গ্রীক দার্শনিক আমাদের শোনালেন। গ্রীক দার্শনিকেরা অনাদি স্বতন্ত্র বস্তু-সত্তার কল্পনা করেছেন। জগতের অকল্যাণ বুঝি এখানেই নিহিত রয়েছে। তাই বলছিলাম যে, বহুধা-বিস্তৃত দার্শনিক চিন্তা-সর্জন জীবন-বৈচিত্র্য-আশ্রয়ী। জীবনের সমগ্র ব্যাপ্তিটুকুকে দর্শনচিন্তার অন্তর্ভুক্ত করাই হ'ল দার্শনিকের কাজ। এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই যার দর্শনের মানদণ্ডে বিচার হয় না। দর্শন জীবনকে ব্যাখ্যা করে তার সমগ্রতায়। দর্শনশাস্ত্রের এই সামগ্রিক আবেদনের কথা উল্লিখিত হ'ল সদ্য-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে।[৮] গ্রন্থকার বিজ্ঞানের খণ্ডিত পরিধির উল্লেখ ক'রে বললেনঃ 'পরন্তু দর্শনশাস্ত্র সমগ্র অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে আলোচনা করে। কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন অবচ্ছেদ নেই তার আলোচ্য বিষয়-বস্তুতে। যদি অভিজ্ঞতার কোন ক্ষেত্র দর্শনে স্বীকৃতি না পায় অথবা সুপ্রতিষ্ঠ কোন তথ্য অগ্রাহ্য হয় তবে সে দর্শন 'দর্শন' নাম ধারণের যোগ্যতাটুকু হারায়।' তাই বলছিলাম দর্শনচিন্তা নানা অভিজ্ঞতার সমপ্রসারী।

দুঃখ-বাস্তবতায় সার্বিক প্রতীতি অনস্বীকার্য। দর্শনে জন্মান্তরবাদের উদ্ভাবন ঘটল এই-দুঃখের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কোন কোন দর্শন

৮। ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্রের 'The Main Problems of Philosophy,' পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য।

মতে জন্মান্তরবাদের স্বীকৃতি মিললেও হিন্দুধর্মে তার যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার জুড়ি অন্যান্য দর্শন-মতে দুর্লভ।[৯] আত্মার অমরত্ব জন্মান্তরতত্ত্বে স্বীকৃতি পেল। আত্মা জীর্ণ বস্ত্রের মত জরাজীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ ক'রে নবজন্মে নতুন দেহ গ্রহণ করে। হিন্দুর দর্শনসার শ্রীমদভাগবদ্‌গীতা এইতত্ত্বের[১০] প্রচার করলেন। মানব-আত্মা যদি অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর হয়, তবে জন্মান্তরে বিশ্বাস সহজ ও সুসাধ্য হয়। এই পরাদার্শনিক ব্যাখ্যা ব্যতীত নীতি দর্শনেও জন্মান্তরবাদের সমর্থন মেলে। এমনতর অভিজ্ঞতা একেবারেই দুর্লভ নয় যে সততা-আশ্রয়ী ধর্মভীরু মানুষ আজীবন কষ্ট পেল আর অসদাচারী মানুষ ঋদ্ধিবান হয়ে উঠল বিশ্ববিধাতার কোন এক দুর্জ্ঞেয় বিধানে। সাধারণ মানুষ মূক বিস্ময়ে পণ্ডিতজনার পানে তাকাল। দুর্বোধ্যতার ভারে তারা ভ্রষ্টবুদ্ধি। পূর্বদেশের দার্শনিক ভেবে-চিন্তে বললেন, 'পূর্বজন্মকৃত কর্মণঃ ইহ ফলরূপেণ পরিণতি।' পশ্চিমদেশের দার্শনিকেরা বললেন, 'Fruition of antenatal acts'; তত্ত্বটা একই—সেই জন্মান্তরবাদকে স্বীকার। পরম বিচারক হলেন ভগবান। তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাস্তি-পুরস্কারের হিসাব নিকাশ ঘটে জন্মজন্মান্তরের আবর্তন-ফলে। কালাতীত ভগবানের কাছে নশ্বর মানব-জীবনের অপরিসর ব্যক্তি এতই সঙ্কীর্ণ যে, মানব-কর্মের সবটুকু দেনা-পাওনার পুরো মূল্য চুকিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজন হয় জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী বিরাট বিস্তৃতির। আজ যে ভ্রষ্টবুদ্ধি মানুষ ঋদ্ধিবান হয়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে পূর্বজন্মের সুকৃতি। আজ যে দুঃখ পাচ্ছে সত্যাশ্রয়ী হয়েও তার প্রত্যাশা রয়েছে জন্মান্তরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। জন্মান্তরবাদীরা জীবনের এক দুরূহ সমস্যার অনায়াস সমাধান ক'রে দিলেও মার্কসবাদীরা এর মধ্যে দেখলেন শ্রেণী-শোষণের মন্ত্রগুপ্তি। যারা শোষিত, যারা সর্বহারা, তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হ'ল আগামী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দেখিয়ে। মার্কসবাদীরা জন্মান্তরবাদে শ্রেণী বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখার কৌশল প্রত্যক্ষ করলেন।

৯। ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 'The Fundamentals of Hinduism' গ্রন্থের 'The Doctrine of Rebirth' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০। গীতায় ২, ১২, ১৩, ১৮, ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হয়ত মার্কসবাদীরা একেবারে ভ্রান্ত নন; তাঁদের ব্যাখ্যায় শ্রেণী-সচেতনতার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর থাকলেও এই ব্যাখ্যাকে একেবারে উপেক্ষা করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ব্যক্তি-পুরুষের চারিত্র্য-বৈচিত্র্য অনায়াসে ব্যাখ্যাত হয় জন্মান্তর-তত্ত্বের সহায়তায়। একই পরিবারের সন্তান-সন্ততি বিভিন্ন চারিত্র্য-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে। প্রায়শঃ এমনটা ঘটে যে, একই পরিবেশে মানুষ হয়ে এক ভাই সাধু, বিদ্বান, সদাচারী হ'ল আর অপর এক ভাই কদাচারী হয়ে উঠল। এমনটা কেন ঘটল? এর উত্তরও রয়েছে ঐ জন্মান্তরবাদীদের কাছে। ওঁরা বললেন যে, এই জীবনের চারিত্র্য-উৎকর্ষ যেমন এই জন্মের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ-নির্ভর ঠিক তেমনি আবার পূর্বজন্মের সুকৃতিসঞ্জাত উৎকৃষ্ট মনন-ধর্মের উপরও নির্ভরশীল। বীজ বপন করলেই ফসল ফলে না, জন্মান্তরের পলিমাটি-সমৃদ্ধ উর্বর ক্ষেত্রে এ জন্মে যদি সৎশিক্ষায় বীজ বপন করা হয় তবেই সোনার ফসল ফলে। যার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রইল না পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির জন্য, সে যতই প্রয়াস করুক না কেন বিদ্যার্জনের সব প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ হবে। এখানেও জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা করে মানুষের এ জীবনের আত্যন্তিক অপূর্ণতাকে। জীবন যেখানে প্রশ্নময় হয়ে ওঠে, আপাতঃ রহস্যের মায়াজাল মেলে ধরে, সেখানে দর্শন সৃষ্ট হয় মানুষের জানার প্রয়োজনে। সেখানে অনুভূতির তাগিদে আত্ম-নিবেদনের প্রেরণায় মানুষ এক মহৎ সত্তার কল্পনা ক'রে শান্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, সেখানে তার ধর্মজীবনের শুভারম্ভ। যেখানে অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের পথে তার প্রথম পাদসঞ্চালন ঘটল সেখানে এল দর্শন। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয়, গ্রীক এবং ইয়োরোপীয় দর্শনের এক সর্বগ্রাসী বিরাট সত্তাকে আশ্রয় ক'রে বিশ্বসংসারের ব্যাখ্যা করতে চাইল। অবশ্য কোন কোন শাখা-মত আবার ব্যতিক্রমী মতবাদকেও যে আশ্রয় করেনি, তা নয়। ভারতীয় মতে দর্শন আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন এবং জীবের মুক্তি-প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়। ভারতীয় দর্শনাচার্যগণের মতে দর্শন হ'ল আত্ম-সাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের

১১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে 'দর্শনের স্বরূপ' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

সাধন-শাস্ত্র। অবশ্য অধ্যাত্ম বিষয় ছাড়াও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে ভারতীয় দর্শনে। ন্যায়-দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতির বিশদ আলোচনা আছে, বৈশেষিক-দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার করা হয়েছে। সাংখ্য-দর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধ ও প্রকৃতির পরিণামের বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায় এবং মীমাংসা-দর্শনে বৈদিককর্মের অতি সূক্ষ্ম এবং অতি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাজে কাজেই দর্শনকে অধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থক হিসেবে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। দর্শনে এক বিরাট সর্বব্যাপী সত্তার ধারণার আবিষ্কার ও তদ্দ্বারা সর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা যে অপরিহার্য, এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ। লোকায়ত দর্শনের অস্তিত্বও সর্ব দেশেই প্রত্যক্ষ। নাস্তিকচুড়ামণি চার্বাক, পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী দার্শনিকেরা এবং অগুস্ত কোম্‌তের মত দৃষ্টবাদীরা তাঁদের দর্শনে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করেছেন। ইহলোক, ভৌতিক জগৎ এবং মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত সুখ-সমৃদ্ধির আলোচনাতে তাঁদের দার্শনিক মতবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আধুনিক যুগের উগ্র যুক্তিবাদী দর্শনের বাহক এবং প্রচারকেরা বললেন যে, দর্শনের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বব্যাপী সত্তার সৃষ্ঠু ব্যাখ্যা নয়, দর্শনের উদ্দেশ্য চিন্তা-স্বচ্ছতা। পরামতের আবিষ্কার দর্শনের অবশ্য করণীয় কর্ম নয়। দর্শন মানবের জীবন-জিজ্ঞাসা-প্রসূত মননকর্মের স্বচ্ছতা-বিধায়ক। মহা-দার্শনিক হোয়াইটহেড বললেন :

"Philosophy begins in wonder. And at the end when philosophic thought has done its best, the wonder remains. There have been added, however, some growth of the immensity of the things, some purification of emotion by understanding."

বিস্ময় হ'ল দর্শন-জননী। এই বিস্ময়ের অন্ত নেই, পার নেই। দর্শন পঠন-পাঠনে এই বিস্ময়ের নিরসন হয় না। তবে বিশ্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে ধারণা হয় আর মানুষের মননশীলতা অনুভূতির শুদ্ধি ঘটায়। ইংরেজী 'ফিলজফি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল জ্ঞানানুরাগ।

জ্ঞানানুরাগই যদি দর্শনের স্বরূপ-লক্ষণ হয় তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের প্রভেদ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। অবশ্য এমন কথা হয়ত বলা চলবে যে, বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞানের আধার আর দর্শন পূর্ণ জ্ঞানের। পৃথকীকরণের এই সীমারেখাকে অগ্রাহ্য করলে এবং বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের দিকটাকে যথাযথ স্বীকার করে নিলে দর্শনের আর প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদীরা (Logical Positivists) 'দর্শন' নাম ত্যাগ ক'রে ন্যায়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদে'র কথা প্রচার করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী হ'ল অদূর ভবিষ্যতে দর্শন ব'লে কোন শাস্ত্র থাকবে না।

ভারতীয় দর্শন : চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, চিন্তা ও মননের জগতে তার অবদানে; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনেও থাকে মননশীলতার স্বাক্ষর। ইংরেজ বা রুশ বা ফরাসীজাতি শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সভ্যতার বহিরঙ্গপ্রকাশেই বিশিষ্ট নয়—তাঁদের দার্শনিক চিন্তা শিল্পবোধ ও সুশৃংখল মননও উল্লেখযোগ্য।

ম্যাক্স্ মুয়েল্যর (Max Müller) বলেছেন, প্রত্যেক ভারতবাসী জাত-দার্শনিক। বাস্তবিকপক্ষে, আর কোনও দেশেই বোধ হয় বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার পরিণত ফল এমন করে দেশের জনসাধারণের নিম্নতম স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে নি। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রা বেদান্তের মায়াবাদ দ্বারা প্রভাবিত। অক্ষরবোধবর্জিতা গ্রাম্য রমনীও জানে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের পার্থক্য। বাংলা দেশের বাউল গাইলেন—

তোরই ভিতর অতল সাগর!
মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই॥

আবার,

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার
ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি, যার নিত্যলীলা চমৎকার?

... ...

কারে গুরু বলে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগনণ
কারে গুরু বলে প্রণাম করবি মন?

অথবা, মধ্যযুগের নিরক্ষর সাধক রজ্জব বললেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচ কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যা; রজ্জব বলছেন, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশীই হও, আর রাগই কর।

এমন গভীরতম ভাবের কথা, নিবিড় অনুভূতির কথা, ভারতবর্ষের দেহাতী মানুষও অতি সহজেই অন্তর দিয়ে বুঝে নেয়—তার কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী ভারতের এই অগণিত জনসাধারণ। বাস্তবিক, দার্শনিক চিন্তায় ভারতবর্ষের মানুষের জন্মগত অধিকার।

অধ্যাত্মচিন্তা ভারতের বৈশিষ্ট্য; এ থেকে এমন ধারণা করা ভুল হবে যে, ভারতবর্ষে শুধু তপোবন ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই ছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে কৃষিকর্ম, শিল্পচর্চা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও জীবনকে সমগ্র-ভাবে ও সুন্দরভাবে ভোগ করবারও কোন আয়োজনের অভাব ছিল না। মুণ্ডকোপনিষদে পরা ও অপরা এই দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। "ব্রহ্মবিদেরা বলেন, এই দুই বিদ্যাই জ্ঞাতব্য, পরা ও অপরা। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এগুলো অপরা বিদ্যা; পক্ষান্তরে সেই অক্ষরপুরুষকে জানা যায় যে বিদ্যার সাহায্যে, তা পরা বিদ্যা।"[১] চতুঃষষ্ঠীকলার চর্চা তখন ছিল। সবল, সুস্থ, প্রাণবান ও তীক্ষ্ণ ধীমান জাতির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তাঁরা জীবন থেকে পলায়ন ক'রে আত্ম-রক্ষা করতে চাননি। জীবনে দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু তাকে জয়ের মধ্যেই তো পৌরুষ। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পরাজয়ের নয়, জয়ের ও জীবনের। তাঁরা এ সত্যটুকু জানতেন যে, সমস্ত অপরা বিদ্যার শেষ উদ্দেশ্য সেই পরমপুরুষকে জানা। কিন্তু তাই বলে এই সাংসারিক জীবনও তার সম্ভোগ ও কর্তব্যকে তাঁরা অবহেলা করেন নি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই দেখতে পাই, দেবতার কাছে এই অসঙ্কোচ প্রার্থনা—

রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিশো জহি।

"ঋষিরা এই সুন্দরী পৃথিবীতে মরতে চান নি। তাঁরা মানুষের মাঝে মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছেন। বশিষ্ঠ এই জননী বসুন্ধরার ধন-

১। মুণ্ডকোপনিষৎ—১, ১, ৪-৫

সম্পদকে সহস্র ধারায় দোহন করতে চেয়েছেন ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেছেন—কৌশল শিখবার জন্য, যে কৌশলে এই পৃথিবীরূপ গাভীকে দোহন করা যায়।"[২]

বেদের সর্বত্র প্রাণের আবেগ। আমাদের পিতৃ-পিতামহ একশত শরৎ বাঁচবার মতো ক'রে বাঁচতে চেয়েছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে তাঁরা এই পৃথিবীকে অপ্রমত্ত হয়ে ভোগ করতে চেয়েছেন। তাঁদের কামনা ছিল স্বস্তির, শান্তির ও অভয়ের:

অভয়ং ন করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদাভয়ং নো অস্তু ॥[৩]

"অন্তরীক্ষ দিক অভয়, দ্যৌ-পৃথিবী উভয়কেই দান করুন ভয়হীন শান্তি। আমরা যেন সম্মুখে-পিছনে, উপরে-নীচে সবদিকেই বরাভয় লাভ করি।"

কিন্তু এই অভয়, অলস, নির্বীর্য ও উদাসীনের জন্য নয়। একে উদ্যমের দ্বারা, শুভকর্মের দ্বারা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে আয়ত্ত করতে হয়। দুঃখ-দুর্গম কষ্টকঠোর কর্মের পথেই মানুষ প্রতিষ্ঠা, শ্রী ও শান্তি অর্জন করে। যে এই পথ চলে, সে-ই পায় কল্যাণ, যে কঠিন সংগ্রামে জয়লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করে, সার্থকতা তো তারই জীবনে আসে। যে বীর, যে যুদ্ধ করে বিভূতি তারই।

কিন্তু সুস্থ মানুষ তো শুধু ভোগের কথাই ভাবে না। বুদ্ধিমান মানুষ জানে, ভোগের সঙ্গে ত্যাগ অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাঁধা। শুধু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-ভোগের উপদেশ কোথাও নেই। সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ, সমাজের কল্যাণার্থে। "তাঁরা মঙ্গল ভাববেন, মঙ্গল চাইবেন এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠান করবেন। তাঁরা কল্যাণমার্গে চলবেন।"—

তাঁদের প্রার্থনা হবে:

ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তষ্টুবাংস স্তনূভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

২। মতিলাল দাশ, বেদের কথা (ভারত সংস্কৃতি)
৩। অথর্ববেদ, ১৯।১৫।৫

ব./বি./দর্শন জিজ্ঞাসা/৬৩-২

"হে দেবগণ! আমরা কর্ণে শুনিব কল্যাণময়ী বাণী, হে যজনীয়গণ! আমরা চক্ষু দিয়া দেখিব সুভদ্র কল্যাণময় দৃশ্য। অচঞ্চল, দৃঢ় বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়া আমরা পরমাত্মার পূজা করিব—আমরা জগদ্ধিতের জন্যই জীবন যাপন করিব। কল্যাণময় যে ঋত জগৎসংসার বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সেই ঋতের পালক হইব।"

এই জীবনকে প্রাচীন ঋষিরা বলেছেন যজ্ঞ। জীবনের যা কিছু বিশেষ ঘটনা—জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ সর্বত্রই যজ্ঞ। ঋষির কণ্ঠে প্রার্থনা—

প্রাচীন যজ্ঞধারণা

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।
শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্।
যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম
স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম॥

"আমাদের জীবন যজ্ঞের জন্য নিবেদিত হউক। প্রাণ যজ্ঞের জন্য উৎসর্জিত হউক। আমাদের চোখ, কান, পিঠ যজ্ঞের জন্য সামর্থ্যলাভ করুক। জীবন এক বৃহৎ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হউক। আমরা হইব পরমাত্মার পরমপ্রিয় সন্তান। হে দেবগণ! স্বর্গ হইতে তোমরা এস—আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব।"[৪]

ভারতীয় দর্শন শুধুই হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা, এটা মনে করলে ভুল হবে। ভারতের এই পুণ্যতীর্থে কত মানুষের ধারা এস মিলেছে—

'শক হুন দল, পাঠান মোগল, একদেহে হোল লীন'।

ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা নয়।

আর্য, অনার্য, আস্তিক, নাস্তিক, ঈশ্বর, নিরীশ্বর, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়-বৈষেশিক, মীমাংসা-বেদান্ত ইত্যাদি কত চিন্তা ও মননের বারি সিঞ্চনে ভারতের চিত্তভূমি উর্বরা হয়েছে। এই পুণ্য ভারতভূমিতে

৪। মতিলাল দাশ, বেদের কথা, পৃঃ ২৭

সে সব ধর্ম ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, তারা সকলেই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। চিন্তাজগতে ভারতবর্ষ সকলকেই সাদর আহ্বান জানিয়েছে—কারও পথ রুদ্ধ করে নি, কারও ওপর নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, আচার বা বিশ্বাস চাপিয়ে দেয় নি। 'শান্তিপূর্ণ মহাবস্থানের' এমন উদাহরণ আর কোথায়ও মিলবে না। কিন্তু আশ্চর্য মনে হয়, চিন্তার স্বাধীনতা বিষয়ে যে ভারতবর্ষ এত উদার, সামাজিক আচার-আচরণে সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী এত সংকীর্ণ!

ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে কোন ভেদ-রেখা টানা নেই। ভারত সমস্ত জীবনকে এক অখণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। ভারতীয় দর্শন তাই শুধুমাত্র বুদ্ধির অনুশীলন, প্রয়োগ ও পরিতৃপ্তি নয়। 'দর্শন' কথাটি আমরা ইংরাজী 'Philosophy'র সমার্থ-বাচক বলে ব্যবহার করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এই কথা দুটি সম্পূর্ণরূপে এক নয়। দুইয়েরই উদ্দেশ্য পরম সত্যের অনুসন্ধান; কিন্তু ইয়োরোপে Philosophy হল শুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে কঠোর যুক্তিবিচার দ্বারা সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি। এটা নিতান্তই বুদ্ধিনির্ভর। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় 'দর্শন' অর্থ হল ঋষি মুনির দ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এটা সাধনার বস্তু, শুধুই বুদ্ধি ও বিচার-গ্রাহ্য নয়। বরঞ্চ, অনেক স্থানেই এটা বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ের পথে না বিচারের পথে সত্যের সাক্ষাৎকার মেলে না। ইন্দ্রিয়ের সংযম, দেহের শুচিতা, আত্মশাসন, বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা ঋষি প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করলেই, দৈবকৃপায় ফলে, সত্যের দর্শন মেলে—তখন

দার্শনিক চিন্তা ও প্রাত্যহিক জীবন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।[৫]

সেই পরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ

৫। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২, ২, ৮

অবিদ্যাজনিত ভোগবাসনার অবসান হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং সাধকের সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়ে তার মুক্তি ঘটে। সমগ্র জীবনের সাধনার সঙ্গে এই সত্যদৃষ্টি যুক্ত, তাই একে বলা হল সম্যগ্‌দর্শন। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, এই সম্যগ্‌দর্শন লাভে কর্ম সাধককে আর বদ্ধ করে না; আর যে হতভাগ্যের এই সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ হল না সে, পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্তিত হয়।[৬]

সম্যগ্‌দর্শনের ধারণা

ভারতবর্ষে দার্শনিক মতগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তির জন্য নয়; সেগুলো জীবনে অনুশীলন ও প্রতিফলনেরও বিষয়। সেইজন্যই বিভিন্ন দার্শনিক মত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ-বিশ্বাসে প্রতিফলিত এবং জীবনে অনুশীলিত। তাই ভারতবর্ষে পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শী প্রত্যেকে নিজ নিজ আচার-প্রথা-বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে সহাবস্থান করেছে। একই কারণে সাংখ্য, ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি দার্শনিক মতবাদীরাও এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের মূল বিশ্বাসকে নিজ জীবনে আচরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনির মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট মতগুলিকে জীইয়ে রেখেছেন। অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের যেমন মঠ-আশ্রম আছে, তেমনি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীদেরও পৃথক মঠ, মন্দির, আশ্রম আছে; শৈবদের পৃথক দেব-মন্দির, আরাধনা, শাস্ত্রচর্চা আছে, আবার তেমনি বৈষ্ণবদেরও আছে নিজ নিজ উৎসব, পূজা, নিজ নিজ মতামত চর্চা ও আলোচনার নানা ব্যবস্থা। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন মতবাদগুলি, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও, এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধতা ও অবহেলা সত্ত্বেও তাদের প্রাণশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেনি এবং প্রাচীন ভারতের চিন্তা ও ঐতিহ্যকে বহন করে আমাদের উত্তর পুরুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কাজেই তাঁরা অবজ্ঞা ও অবহেলার বস্তু নয়। বরঞ্চ নূতন ভাবধারা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যময় প্রাণশক্তির সঙ্গে সেই প্রাচীন

ভারতীয় দর্শন জীবন-আশ্রয়ী

৬। সম্যগ্‌দর্শন সম্পন্নঃ কর্মভির্ননিবধ্যতে
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারম্‌ প্রতিপদ্যতে। মনুসংহিতা ৬, ৭৪

চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব আমাদের, একথা যেন আমরা না ভুলি। সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণই ভারতীয় সাধনার মূল সাধনা। "ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, একথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিন চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া, তাহার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[৭] বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতার অসহিষ্ণুতা ও উত্তাপের মধ্যে বারে বারে ভারতবর্ষের এই আন্তরিক ঐক্যসাধনাকে যেন আমরা স্মরণ করি।

ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বেদের স্থান

ভারতের সমস্ত চিন্তার আকরগ্রন্থ হ'ল বেদ। ভারতের বুকে যত ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে, সকলের মূল হচ্ছে বেদ। এতে অতি উচ্চ অধ্যাত্মচিন্তার যেমন

বেদের স্থান

বীজ রয়েছে তেমনি অতি নিকৃষ্ট মন্ত্র-তন্ত্র, তুক্‌-তাক্‌, মারণ-উচাটন ইত্যাদি পদ্ধতিরও ইঙ্গিত আছে। তাই এতে বহু বিরুদ্ধ উপাদান একাকার হয়ে মিশে আছে। চতুর্বেদ নিশ্চয়ই একই কালে রচিত হয়নি। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন বেদে বর্তমান। বেদ চারখানি—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যজুর্বেদ আবার দু'খানি—শুক্ল ও কৃষ্ণ। মোক্ষমূলরের মতে, বেদ রচনার চারটি পর্যায় আছে—ছন্দযুগ, যখন বিক্ষিপ্তভাবে মন্ত্র রচনা হ'তো; তারপর মন্ত্রযুগ, যখন বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সংহিতায় পরিণত হ'ল; তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর সূত্র। প্রত্যেক পর্যায়ে দুশ' বৎসর ধরে বেদ

চতুর্বেদ

রচনার সময়কে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে স্থাপনার সিদ্ধান্ত করেন পণ্ডিতেরা। পাশ্চাত্য

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ ও সমাজ

পণ্ডিত ভিন্টারনিটজ অবশ্য এই মতকে কাল্পনিক ও অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।[৮] মহামান্য তিলকের মতে ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বেদ রচিত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে বেদের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ সালের পূর্বে নয়। যা হোক্, এই বিতর্কমূলক বিষয়, আমাদের আলোচ্য নয়।

ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে বেদের মর্যাদা অসামান্য। ভারতীয় দর্শনকে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই দলে ভাগ করা হয়। ভারতীয় দর্শনে তাঁদের আস্তিক বলা হয় যাঁরা বেদকে অপৌরুষেয় বলে মনে করেন। বেদ মনুষ্যসৃষ্ট নয়—বেদবাক্য তাই স্বতঃপ্রমাণিত। বেদবাক্য স্মৃতিগ্রাহ্য নয়, বেদবাক্য আচার নয়, বেদবাক্য সমস্ত প্রমাণের ঊর্ধ্বে।

বেদ ও আস্তিক দর্শন

সুপরিচিত ষড়দর্শন, যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক এরা আস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নেই। মীমাংসা বা সাংখ্য জগৎস্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না, কিন্তু বেদের অপৌরুষেয়তা তাঁরা স্বীকার করেন; কাজেই তারা নিরীশ্বর হয়েও আস্তিক।[৯]

নাস্তিক দর্শন বলতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য জড়বাদী মতবাদকে বোঝায়। এরা কেউই বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা স্বীকার করেন না। অবশ্য এই দর্শনমতগুলি ঈশ্বর স্বীকার করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। এরা তাই নাস্তিকও বটে, নিরীশ্বরও বটে।

নাস্তিক দর্শন

আস্তিকই হোক্ আর নাস্তিকই হোক্ ভারতীয় কোন চিন্তাই বেদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে না। হয় গঠনাত্মকভাবে, না হয় নেতিমূলকভাবে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিক মতবাদই বেদের দ্বারা প্রভাবিত। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বেদের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন ক'রে, তবে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।

উভয়বিধ দর্শনই বেদ-প্রভাবিত

৮। "Max Müller's hypothetical and really arbitrary determination of the Vedic epochs".—*Winternitz*

৯। Chatteriee and Dutta, An Introduction to Indian Philosophy, p. 5

মীমাংসা ও বেদান্ত তো বৈদিক চিন্তারই অনুসরণ করেছে; মীমাংসায় বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক প্রমাণ দেবার চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে বেদান্ত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা অধ্যাত্ম-চিন্তার সুশৃংখল প্রকাশ। মীমাংসা ও বেদান্ত বেদবাক্যকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে গ্রহণ করে তার সমর্থনে অন্য-যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগ করেছে। অন্যদিকে সাংখ্য-যোগ এবং ন্যায়-বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত তা যে বেদানুযায়ীও বটে, তাই দেখিয়েছে। আস্তিক্যবাদীরা কেউ বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত করেন নি।

ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই বিপুল মর্যাদা ও বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিচ্ছা লক্ষ্য ক'রে, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তার স্থান নেই; তা dogmatic। ইয়োরোপের মধ্যযুগেও দার্শনিক চিন্তা তাদের ধর্মশাস্ত্রকে সর্বাংশে অনুসরণ করত। যা বাইবেলের ব্যাখ্যাতা পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী, তা কঠোর নিন্দালাভ করত এবং অবিশ্বাসীদের ওপর নৃশংস উৎপীড়ন অতিশয় পুণ্যকার্য বলেই গণ্য হতো। এমন কি অবিশ্বাসীদের (heretics) পুড়িয়ে মারার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

আস্তিক্যবাদীরা যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ ও ন্যায় বৈশেষিক দর্শনপন্থীরা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কখনও করেন নি তা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে চিন্তার কদাচ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় নি এবং নাস্তিক্যবাদী চার্বাক, বৌদ্ধ বা জৈন মতাবলম্বীদের নিন্দা করা হ'লেও তাদের পুড়িয়ে মারবার কথা কেউ চিন্তা করে নি। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের সংকীর্ণ অসহিষ্ণুতার সঙ্গে ভারতের আধুনিক কালের বর্বর সাম্প্রদায়িক নৃশংসতারই শুধু তুলনা হ'তে পারে। এমন কি, যাঁরা আস্তিক্যবাদী তাঁরাও কেবলমাত্র বেদবাক্যকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করেন নি। বেদবাক্যের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা উপমান-ভিত্তিক প্রমাণ দিয়েছেন। মোক্ষমূলরের ভারতীয় দর্শনের দুটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য মনে করেছেন: (১) প্রত্যেক প্রস্থানই নিজ নিজ মতবাদকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেছেন; নিজ নিজ মতের ফলাফলও তারা নির্বিচারে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। সত্যকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। (২) প্রত্যেক

ভারতীয় দর্শনই প্রথমতঃ কি করে আমরা জানি, কাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হবে, এই প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে তবেই দার্শনিক চিন্তায় রত হয়েছেন।[১০]

ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই অসামান্য প্রতিষ্ঠার কারণ কি ?

বেদের রচয়িতা ঋষি আছেন, অথচ বেদকে অপৌরুষেয় বলি কেন ? এর অর্থ, বেদ সাধারণভাবে লভ্য নয়; এই আত্মবিদ্যা, এই জ্ঞান বোধির দ্বারা প্রাপ্য—সত্যদ্রষ্টা যাঁরা তাঁরাই এটি জানতে পারেন, তাঁরা এটি ভাবতে পারেন। নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী ঋষিদের জ্ঞানদীপ্ত চিত্তে বেদ প্রতিভাসিত হয়েছিল; তাই বেদ শ্রুতি।[১১] তাই বেদ অনন্য।

বেদ বিদ্যার বৈশিষ্ট্য

প্রাত্যহিক জীবনের সত্য লাভের উপায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান; কিন্তু পরম সত্যকে আবিষ্কারে এরা অসমর্থ। এর জন্য চাই ঋষি দৃষ্টি। যাঁরা তপশ্চর্যা ও সাধনার দ্বারা সেই উচ্চস্তরে উঠেছেন, তাঁরাই শুধু সেই পরম সত্যকে দর্শন করেন, তাঁরাই কেবলমাত্র সেই সত্যোপলব্ধির

১০। There is one thing which we cannot help admiring, and that is the straight-forwardness and perfect freedom with which they are elaborated. However imperfect the style in which their theories have been clothed may appear from a literary point of view, it seems to me the very perfection for the treatment of philosophy. It never leaves us in any doubt as to the exact opinions held by each philosopher......we can always appreciate the perfect freedom, freshness and downrightness with which the searcher after truth follows his track without ever looking right or left.

It has sometimes been said, that Hindu philosophy asserts, but does not prove, that it is positive throughout, but not argumentative. This may be true to a certain extent and particularly with regard to the Vedanta-philosophy; but we must remember that almost the first question which everyone of the Hindu systems of philosophy tries to settle is, how do we know ? In thus giving the Noetics the first place, the thinkers of the East seems to me......superior to most of the philosophers of the West. Max Müller, Six Systems of Indian Philosophy, Preface, XII-XIII

১১। ভারত সংস্কৃতি, প্রবন্ধ:, বেদের কথা, পৃ: ২৩

পথ অন্যকে দেখাতে পারেন। বেদ-রচয়িতা ঋষিদের তাই এত অসামান্য সম্মান। তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলেই শুধুমাত্র সেই পথের সত্যতা প্রমাণ করা যায়। এটা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতালভ্য নয়। দর্শনধন্য ঋষিদের অধ্যাত্ম সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা বেদে প্রচারিত, তাই অন্য সমস্ত প্রমাণ থেকে এটি শ্রেষ্ঠ। বেদের প্রমাণ অন্য সমস্ত প্রমাণের আশ্রয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মূল্য ততক্ষণই, যতক্ষণ এটি ঋষি-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি ঋষির আন্তরিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নাস্তিক্যবাদীরা অবশ্য সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরাও তাঁদের ধর্মের মহাপুরুষদের বাক্যকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উচ্চতর মূল্য দিয়েছেন। একমাত্র চার্বাকই এমন দুঃসাহসের কথা বলেছেন যে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এমনকি অনুমানকেও তিনি প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে মূল্যবান মনে করেছেন এবং বেদবাক্যকেও অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করেছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা বেদকে কখনও অতিক্রম করেন নি।[১২] এটা থেকে বোঝা যাবে, ভারতীয় দর্শনে অনুমানকে অনুশাসনের বন্ধনে পঙ্গু করে রাখা হয় নি। ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য অর্থে 'ডগ্‌ম্যাটিক্‌' নয়।

অধিকারবাদ ও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের ঐক্য

প্রত্যেক মানুষ তার শক্তি, রুচি, প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক। পৃথিবীর সর্বপ্রকার দ্রব্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা গঠিত। সত্ত্বের ধর্ম প্রকাশ, লঘুতা, শুচিতা, আনন্দ ইত্যাদি ; রজের ধর্ম

১২। Indian Philosophy is based on logical reason subordinate to the authority of the Vedas which are believed to embody the intuitions of the seers of truth. The authority of the Vedas is that of intuition. Logical reason is subordinate to intuition. So Indian philosophy is based on rational speculation in harmony with the Vedas and consciously aims at achieving the highest perfection (moksha) attainable in human life. Jadunath Sinha, Outlines of Indian Philosophy, p. 1

সক্রিয়তা, বল, বীর্য, উদ্যম, দুঃখ; তমের ধর্ম আচ্ছন্নতা গুরুত্ব, মোহ, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান। সেই অনুযায়ী তাদের প্রকৃতির প্রভেদ। যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তাঁরা ব্রাহ্মণ; যাঁরা রজোগুণ-প্রধান তাঁরা ক্ষত্রিয়; আর যাঁরা তমোগুণ-প্রধান, তাঁরা শূদ্র। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তার জ্ঞানের বিষয়ও ভিন্ন। প্রত্যেকের প্রকৃতি অনুযায়ী মুক্তির পথও ভিন্ন। বেদাধ্যয়ন সত্ত্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত। তাই শুধু শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণেরই অধিকার শাস্ত্রচর্চায়। শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নেই; কারণ তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতি এই অধ্যয়নের ফলগ্রহণে অসমর্থ। চার বৎসরের বালককে একমণ বোঝা তুলতে দেওয়া হয় না। এটা তার হিতের জন্য। এতে অপমানের কথা কিছু নেই। প্রাচীন ভারত সহজেই এই কথা মেনে নিয়েছিল যে সকলের জন্য একই ব্যবস্থা উপযোগী হতে পারে না। গীতাতে তাই শ্রীভগবানের উপদেশঃ "বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ"। প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের বিভিন্ন সংস্কার। সেই সংস্কার বা বিশ্বাস জোর করে পরিবর্তন করা উচিত নয়। বিদ্যাগ্রহণ যান্ত্রিক একটি পদ্ধতি নয়। শ্রদ্ধা দ্বারা নিজেকে বিদ্যাগ্রহণের উপযোগী করে তুললে তবেই বিদ্যাগ্রহণ সার্থক। এখানে গণতন্ত্রের দাবী নিরর্থক। ভারতীয় সমস্ত প্রস্থানের উদ্দেশ্য হ'ল মোক্ষ লাভ। বিভিন্ন দার্শনিক মত হ'ল বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য পৃথক পৃথক মোক্ষলাভের পথ। ভারতীয় দৃষ্টিতে স্থূল জড়বাদী চার্বাক মত থেকে শুরু করে নির্গুণ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত একটি অনবচ্ছিন্ন ঐক্যের সূত্র বর্তমান। এগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, কিন্তু সেগুলো মানুষের প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করেছে। সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক মতের ইতিহাস আলোচনা-কালে শ্রীমাধবাচার্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মতকে বিন্যাস করেছেন। চার্বাকের জড়বাদ তমোগুণ-প্রধান অবিকশিত-বুদ্ধি সংসারী

মানব প্রকৃতির আত্যন্তিক প্রভেদ

ভারতীয় দর্শন ও মোক্ষ

সাধারণ লোকের উপযোগী, কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রধান তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন সংযত মানুষের জন্য শুধু ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠফল, বিশুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তবাদ।[১৩]

ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্তু ও আলোচনার পদ্ধতি

ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্তু হ'ল, মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ। মোক্ষ হ'ল মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম মানুষের জীবনে কাম্য, কিন্তু মানবজীবনের শেষ উদ্দেশ্য হ'ল, মোক্ষ-লাভ। ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র বুদ্ধির তৃপ্তি নয়, তা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধনের উপায়। মোক্ষলাভ করতে হ'লে চাই অজ্ঞানতার ও মোহের বিদূরণ এবং সত্যের সাক্ষাৎকার। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান (different schools) হল সত্যের অনুসন্ধানের বিভিন্ন পথ।

মোক্ষলাভের পথ

ভারতীয় দার্শনিক জানেন সত্যলাভের একটিমাত্র পাকা বাঁধানো সড়ক নেই। ভারতীয় দার্শনিক বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করেন না, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের বিবেচনা করেন। শান্তভাবে, কঠিন যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকটি প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রথমে খণ্ডন ক'রে, সবশেষে নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন। এই হল উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্ত। পর মতসহিষ্ণুতা-সঞ্জাত আলোচনার পদ্ধতি ভারতীয় দর্শনকে একটি সম্পূর্ণতা ও ঐক্য দিয়েছে, যা পাশ্চাত্য দর্শনে বড় একটা দেখা যায় না। ভারতীয় দর্শনে প্রত্যেকটি প্রস্থান বিপরীত অন্য সমস্ত প্রস্থানের যুক্তি তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ ক'রে খণ্ডন ক'রে, এবং তারপরই কেবল নিজ মত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। সুতরাং প্রত্যেক মতই অন্য মত থেকে পুষ্টি ও তেজ আহরণ করে।

বিরুদ্ধ মত শ্রদ্ধেয়

ভারতীয় দর্শনের আলোচনার আর একটি পদ্ধতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় প্রত্যেক সমস্যাকেই সমগ্রভাবে

১৩। The many systems of philosophy beginning from the materialism of the Carvaka school and ending with the Vedanta of Sankara were thus conceived to offer different paths of philosophical thinking and living, to persons of differing qualifications and temperaments, Chatterjee and Dutta, An Introduction to Indian Philosophy, p. 12

সমস্ত দিক থেকে আলোচনা করা হয়, পাশ্চাত্য দর্শনের মত প্রত্যেক সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করে, এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করা হয় না। এটাই পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যথা, কেউ বা জীবনকে দেখছেন, এর জড় উপাদানের দিক হ'তে, কেউ কেউ দেখছেন জীবতত্ত্বের দিক হ'তে, আবার কেউ বা দেখছেন মনস্তত্ত্বের দিক থেকে। ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় মনস্তত্ত্ব (psychology), জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology), অধিবিদ্যা (metaphysics), সমাজতত্ত্ব (sociology) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয় নি। ভারতীয় দর্শনে সমস্ত আলোচনাই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত। ভারতীয় পণ্ডিত জ্ঞানকে জীবন থেকে বিযুক্ত করে দেখেন নি। সত্যের অনুসরণ তাঁর কাছে বুদ্ধির বিলাস নয়, তা জীবনসমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। তিনি বলেছেন, সত্যজ্ঞানের দ্বারা আত্মোপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন।

সমস্যার সামগ্রিক ও সম্যক্ আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাকলেও, তাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে:

(১) ভারতীয় দর্শনের মূল সমস্যা হ'ল, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান। জীবন দুঃখময়—এমন জীবন নেই, যা কখনো না-কখনো দুঃখের তাপে মলিন হয় নি। প্রত্যেকের জীবনে রোগ আছে, বার্ধক্য আছে, মৃত্যু আছে। আমাদের দুঃখ এই যে আমি

'যাহা চাই, তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই, তাহা চাই না।'

আমাদের দুঃখ অপ্রিয়-সংযোগের এবং প্রিয়জন-বিরহের। তা ছাড়া এই সংসারচক্রের বন্ধন, বারে বারে পৃথিবীতে জন্ম ও মরণের দুঃখ, কারও তা এড়াবার উপায় নেই। চার্বাক অবশ্য জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু এই জীবন যে দুঃখের আকর, তা তিনিও মেনেছেন এবং এই দুঃখের বিশ্বঘেরা জাল এড়াবার জন্য তিনি বলেছেন—"এই জীবনের যে সুখ

দুঃখ ও তার আত্যন্তিক নিবৃত্তি

হাতের কাছে পাওয়া যায় তা আকণ্ঠ ভোগ ক'রে নাও। পেছনে তাকিও না, সমুখে তাকিও না। প্রতিমুহূর্তে যে সুখের সুযোগ এসে উপস্থিত হয় তা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে নাও, কারণ এই জন্মের পরে স্বর্গও নাই, নরকও নাই।" বুদ্ধদেব বললেন—"জীবন দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়জনবিরহ দুঃখ।"[১৪] তিনি চারটি 'আর্য সত্য' প্রচার করেছেন: (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের অবসান আছে. এবং (৪) দুঃখ নিরোধের পথ আছে। জীবনের উদ্দেশ্য হল নির্বাণলাভ—তখন সকল দুঃখের অবসান।

বৌদ্ধ-দর্শনের মূল সমস্যা যেমন দুঃখ, সাংখ্য দর্শনেরও তাই। সাংখ্য কারিকার প্রথম শ্লোক হল—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসাতদভিঘাতকে হেতৌ:
দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥[১৫]

জীবনে আছে ত্রিবিধ দুঃখ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক হচ্ছে—ভূত হতে উৎপদ্যমান ক্লেশসমূহ। অন্য মানুষ, হিংস্র প্রাণী, সর্প, কুম্ভীর ইত্যাদি প্রাণী মানুষের অনেক দুঃখের কারণ। আধিদৈবিক দুঃখ হল দেবতা থেকে উৎপন্ন—যেমন শীত, বর্ষা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

ত্রিবিধ দুঃখ

আধ্যাত্মিক দুঃখ হল নিজ দেহ বা মনের বিকারজনিত নানা দুঃখ। সমস্ত দর্শনের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কি করে এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো যায়। চিকিৎসকের দ্বারা রোগের দুঃখ সাময়িকভাবে উপশম হতে পারে; বন্য জন্তুর উৎসাদন দ্বারা তাদের উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে; সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা ও কঠোর শাসন দ্বারা মানুষের উৎপীড়ন কতকটা রোধ করা যেতে পারে। কিন্তু এতে কোন উপায়েই ত্রিতাপ-

১৪। গৌতম—ন্যায়সূত্র ১, ১, ২ [Ecclesiastes-এর লেখকের মতো তাঁরা বলেন নি: And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also is vexation of spirit for in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.]

১৫। ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্য কারিকা, ১

জ্বালা সম্পূর্ণ জুড়োবার উপায় নেই। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত প্রস্থানেরই মত হল যে, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো যায়। কি করে সেই সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়, এটাই সমস্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয়।

দুঃখই যখন সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মূল, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই সমালোচনা সত্য বলে মনে হতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (Indian philosophy is pessimistic)। কিন্তু পাশ্চাত্য pessimism

ভারতীয় দর্শন সাধারণ অর্থে দুঃখবাদী নয়

এবং ভারতীয় দর্শনের দুঃখবাদ এক নয়। পাশ্চাত্য দুঃখবাদী সোপেনহায়ার বা হার্ডির মতো পণ্ডিতেরা বলেন যে, এক অদৃশ্য প্রতিকূল শক্তি মানুষের সুখ ধ্বংস করবার জন্য সব সময় উদ্যত। এই অশুভ অন্ধ অনৈতিক শক্তির ওপর মানুষের কোনও প্রভাব নেই। তার আঘাত অনিবার্য। গ্রীক ট্র্যাজেডির রচয়িতারা বিশ্বাস করতেন যে, দেবতারা মানুষের সুখ সহ্য করতে পারেন না (gods are jealous)। এই অশুভ অদৃশ্য শক্তিকে তাঁরা নাম দিয়েছেন অদৃষ্ট (Fate)। মানুষের পাপ-পুণ্যের সঙ্গে এই অদৃষ্টের আঘাতের কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই।[১৬]

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের মতে অদৃষ্ট অন্ধ ও অযৌক্তিক নয়। অদৃষ্ট প্রত্যেক মানুষের নিজকর্মফলেরই শুভাশুভ সৃষ্টির শক্তি। কোন

অদৃষ্ট আপন আপন কর্মফলপ্রসূত

অন্ধ অযৌক্তিক অদৃশ্য শক্তি মানুষকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়, এ নিতান্ত শিশুসুলভ কল্পনা। মানুষ নিজের অনিয়ন্ত্রিত বাসনা কামনার বশবর্তী হ'য়ে অন্যায় কর্ম করে এবং নিজ কর্মফলই সে এ-জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করে। মানুষের এই দুঃখ চিরন্তনও নয়, অপ্রতিরোধ্যও নয়। দর্শন আলোচনার দ্বারা যখন তার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়, মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করে —যখন সে বুঝতে পারে যে তার দেহ বা ইন্দ্রিয় তার আত্মাস্বরূপ নয়,

১৬। Streams will not curb their pride,
The just man not to entomb,
Nor lightnings go aside
To give his virtues room.
Nor is that wind less rough which blows a good man's barge.

তখনই সে অন্যায় কর্ম হতে বিরত হবে, মোক্ষলাভার্থ ব্যাকুল হ'য়ে জগতের মূল যে পরমপুরুষ তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে, এবং তখন তার সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল দগ্ধ হ'য়ে যাবে এবং দুঃখের মূল চিরকালের জন্য উৎপাটিত হবে। পাশ্চাত্য দুঃখবাদ যুক্তিহীন ; কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীর নৈতিক ভিত্তি আছে। পাশ্চাত্য দুঃখবাদে দুঃখের কোন অন্ত নেই। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় দুঃখই শেষ নয়; দুঃখকে অতিক্রম ক'রে আনন্দের রাজ্যে উত্তরণ সম্ভবপর। ভারতীয় দর্শন চরম সত্তাকে সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ বলে কল্পনা করেছে। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ব্রহ্ম-বা ঈশ্বর-স্বীকৃতি নেই, কিন্তু তাঁদেরও মতে জীবনের সাধনার শেষ পরিণতি যে নির্বাণ—তা একটি আনন্দময় অবস্থা। কাজেই এই উক্তি খুবই যুক্তি-সংগত যে দুঃখবাদ নিয়ে ভারতীয় দর্শনের শুরু হলেও, দুঃখবাদেই তার সমাপ্তি নয় (Pessimism in Indian Philosophy is initial, but not final)।[১৭]

ভারতীয় দুঃখ-বাদের-বৈশিষ্ট্য

(২) ভারতীয় দর্শন জগতের নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাসী। সমস্ত বিশ্বজগৎ নৈতিক বিধিদ্বারা শাসিত। ঋগ্বেদে এই সর্বব্যাপী নৈতিক বিধিকে বলা হয়েছে ঋত।[১৮] এ ঋতের শাসন কেউ অতিক্রম করতে পারে না। পরবর্তীকালে মীমাংসা দর্শনে এই বিশ্বাসই 'অপূর্ব'র ধারণায় পরিবর্তিত হয়েছে। মীমাংসা মতে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অভ্রান্ত ভাবেই ভবিষ্যতে ফল উৎপন্ন করে। ন্যায়-বৈশেষিকে নৈতিক বিধির অভ্রান্ততায় বিশ্বাস 'অদৃষ্ট'-রূপে কথিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মফল তাকে অনুসরণ করে। অদৃষ্ট রহস্যজনক অযৌক্তিক শক্তি নয়। এ হ'ল নৈতিক বিধির অভ্রান্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ। এই বিশ্বাস সমস্ত নৈতিক জীবন ও ধর্মের মূল।[১৯]

জগৎ নৈতিক ভিত্তি-আশ্রয়ী

১৭। Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 49-50

১৮। Rig-veda, 1. 1. 8, 1. 23. 5, 1. 24. 9 etc.

১৯। Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order and letting loose of hope. James, the Will to Believe.

(৩) কর্মফলবাদে বিশ্বাস সমস্ত ভারতীয় দর্শনের আর একটি মূল ভিত্তি। যেমন বিনা কারণে ব্যক্তির জীবনে কোন ঘটনা ঘটতে পারে না, তেমনি কোনও কর্মের ফলও ধ্বংস হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের ফলদ্বারা আবদ্ধ। সমস্ত কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ ফলে না। জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে, এই হিসাব নিকাশের জের চলে। যে কর্মের ফলভোগ শুরু হয়েছে, তা প্রারব্ধ কর্ম। এই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বাধা দিতে পারেন না। তার ফলভোগ করতেই হবে। যে কর্মের ফলভোগ আরম্ভ হয় নি তা অনারব্ধ। অনারব্ধ কর্ম আবার দু' প্রকারের : (ক) কতক কর্মফল পূর্ব পূর্বজন্মের কৃতকর্ম হতে সঞ্চিত। এবং (খ) কতক হ'ল এই জন্মেই সঞ্চীয়মান বা ক্রীয়মান। কাজেই সমস্ত কর্মের ভাগ ও উপবিভাগ এভাবে বোঝানো যেতে পারে :

কর্মফলবাদে আস্থা

- কর্ম
  - আরব্ধ
  - অনারব্ধ
    - প্রাক্তন বা সঞ্চিত
    - সঞ্চীয়মান বা ক্রীয়মান

জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মীমাংসা মতে কর্মফল স্বাধীন শক্তি। এ অন্য কোন ঊর্ধ্বতন শক্তিদ্বারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে অদৃষ্ট যখন অন্ধ অযৌক্তিক শক্তি নয়, তখন তা পরম চিৎশক্তি ঈশ্বরদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বরই কর্মফল বণ্টন করেন ; তাঁর বিচার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে।

কর্মের শ্রেণীকরণ

আর একভাবে কর্মের বিভাগ করা হয়—সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যে কর্ম কোনও বিশেষ ফল আকাঙ্ক্ষায় করা হয়, তা সকাম কর্ম। ভারতীয় দর্শনের মতে সকাম কর্মই সংসার-বন্ধনের হেতু। সকাম কর্মের ফল সঞ্চিত হয়। এ জন্ম থেকে জন্মান্তরের কারণ। অন্য প্রকার

কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে বিশুদ্ধ কর্তব্য বুদ্ধিতে যে কর্ম করা হয়, তা নিষ্কাম কর্ম। কর্মের ফল নিঃশেষের যদি কোন উপায় না থাকত, তবে জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী সংসারচক্র অনন্তকাল ধরেই চলত, মোক্ষ-বা মুক্তিলাভ অসম্ভব হতো। কিন্তু ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে, যখন মানুষ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় (গন্ধর্বলোক, স্বর্গলোক, দেবলোক ইত্যাদি স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত ফলপ্রাপ্তির আশায় নয়) কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ ক'রে কর্ম করে, তখন তার দ্বারা কোন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। বরং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে কর্ম করলে সঞ্চিত কর্ম ভস্মীভূত হ'য়ে যায় এবং নূতন কোন কর্ম সঞ্চীয়মান হয় না এবং ঈশ্বরানুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা নিষ্কাম কর্ম ও ভগবানে কর্মফল সমর্পণের উপদেশের সুপরিচিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ ঃ

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু-কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্ব কর্মণি ॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনা ময়ম্ ॥[২০]

মানুষের কর্মেই অধিকার আছে, কর্মফলে তার অধিকার নেই। যখন এই প্রতীতি জন্মায় তখন, মানুষের সফলতা-নিষ্ফলতা বিষয়ে সমত্ব জ্ঞান আসে। এরই নাম যোগ। এ-হ'ল কর্মবন্ধন ছেদনের কৌশল।

৫। ভারতীয় দর্শন বিশ্বাস করে যে, এই জগৎ কর্মক্ষেত্র—তপস্যার ক্ষেত্র। এই সংসারেই কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে মোক্ষ বা মুক্তির জন্য সাধনা করতে হয়। এই জগৎ অলীক নয়, মিথ্যা স্বপ্ন নয়। চার্বাক,

২০। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা২, ৪৭-৫১

বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায় বৈশেষিক—সকল দর্শনমতই এ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তই কেবল বলেছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু—জগৎ মায়া। কিন্তু মায়া অর্থে মিথ্যা ও অলীক স্বপ্ন নয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগতের সত্যতা স্বীকার না করলেও, বেদান্ত সাংসারিক দৃষ্টিতে জগৎকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছে। যোগাচারবাদী বৌদ্ধরাই একমাত্র জগৎকে জ্ঞাতার ভাবমাত্র বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁদের মতে, জ্ঞাতার চেতনার বাইরে জগদ্বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মত পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলের অনুরূপ বলা যেতে পারে।

কর্তব্য কর্ম সম্পাদন ও মোক্ষলাভ

এই জগৎ আকস্মিক ও বিশৃংখল নয়। যে ঋত (the rule of law) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালনা করছে, তা এই জগৎকেও শাসন করে। দেশ কাল, কার্য-কারণ বিধি এই বিশ্বব্যাপী ঋত—এরই প্রকাশ। জগৎ শুধু প্রাকৃতিক শক্তির শাসনাধীন নয়, এ নৈতিক বিধি দ্বারাও অনুশাসিত। প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন অমোঘ, নৈতিক বিধিও তেমনি অলংঘ্য। একেও বলা হয়েছে অদৃষ্ট বা কর্মফল। এই জগতের সৃষ্টি, বিকাশ ও লয়ও ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত।

জগতে শৃংখলার রাজত্ব

৬। অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানই সমস্ত বন্ধনের হেতু। সুতরাং ভারতীয় দর্শন সত্যজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্তির সন্ধানকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছে।

মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধনের হেতু

৭। সত্যজ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ। এর জন্য দেহ-মনের উপযুক্ত প্রস্তুতি চাই। ব্রহ্মচর্য, সংযম, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি সদভ্যাস দ্বারা দেহকে শুচি না করলে, গুরুর পদপ্রান্তে বসে সত্যজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না। যোগদর্শনে এই প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরের কথাই পুংখানুপুংখরূপে উপদিষ্ট হয়েছে। দেহকে যেমন বিশুদ্ধ করতে হবে—মনকেও তেমনই প্রস্তুত করতে হবে—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা সত্যকে আত্মস্থ করতে হবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যেমন দেহকে সুস্থ ও পবিত্র করবার উপায়, তেমনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে

সত্যজ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ

যোগযুক্ত হবারও উপায়। ভারতীয় দর্শন জ্ঞানকে শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে স্বীকার করে না। এ সমগ্র জীবনব্যাপী তপশ্চর্যার ফল। ভারতীয় দর্শন পুনঃ পুনঃ এই কথা বলেছে যে, বাসনা-কামনা-প্রবৃত্তিই সত্য দর্শনের পথে প্রবলতম বাধা। ভোগের দ্বারা কখনই প্রবৃত্তির অবসান হতে পারে না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা কেবলই বেড়ে যায়।

> ন জাতুকামঃ কামানমুপভোগেন সাম্যতি
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভি বর্ধতে॥

তাই সমস্ত ভারতীয় শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি-সংযমনের উপদেশ। আত্ম-সংযম দ্বারা সমাধিস্থ হতে পারলে তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার হয়।

৮। ভারতীয় সাধক জীবনের চরম সার্থকতা বাইরে খোঁজেন নি। মানুষের সুখ ও শান্তি উপকরণ সংগ্রহে নয়, সাংসারিক ঐশ্বর্য ও সম্পদ আহরণে নয়, তার অন্তরের পরিপূর্ণতায়। যোগদর্শনে রয়েছে এই আত্মস্থ হবার উপদেশ।[২১] ভারতীয় দর্শন বলে সাংসারিক সুখ ও আরাম নয়—অমৃতত্ব লাভই সমস্ত জিজ্ঞাসা, সমস্ত অনুসন্ধানের শেষ উদ্দেশ্য।

মনুষ্য জীবনের সার্থকতা অন্তরের পরিপূর্ণতায়

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রম ত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যাগ্রহণে কৃতসংকল্প হ'য়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে বণ্টন করে দেবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব শ্রবণে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন করলেন—"যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাংন্বহং তেনামৃতা?" "এই সমুদয় পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তা দিয়ে অমৃত হতে পারব?" উত্তরে ঋষি জানালেন যে,

২১। মধ্যযুগের বৌদ্ধদোহার সাধকদেরও একই কথা—

> এথু সে সুরসরি জমুনা এথু সে গঙ্গা সা অরু।
> এথু পয়াগ বাণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

এই দেহের মধ্যেই গঙ্গা যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর সংগম, এখানেই প্রয়াগ, বারানসী, এখানেই চন্দ্র-দিবাকর।

আবার আর এক দোহায় বলা হইয়াছে—

> "ঘরে রইল তত্ত্ব বাহিরে মরি পুছে' পুছে'।"

দোহাকোষ, ১৭, ৪৭ এবং ১৭, ৬২

বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের কোন আশা নেই। তখন মনস্বিনী মৈত্রেয়ী যে কথা বলেছিলেন, তাহা ভারতীয় দর্শনেরই মর্মকথা :

"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?" "যা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ হবে না, তাহা দিয়ে আমি কি করব?" ভারতীয় দর্শনেরও এই অসংশয় প্রত্যয়—সংসার ও মৃত্যুর পাশ ছেদনই সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত উদ্যমের শেষ লক্ষ্য।

ভারতীয় জীবনসাধনা অমৃতত্ব লাভের সাধনা

৯। ভারতীয় দার্শনিকের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসা শুধুমাত্র অলস মনের বিজৃম্ভন নয়। যে বীর্যবান নয়—সে নিয়ত কৌতূহলী নয়; যে অগ্রসর হয়ে চলতে ভয় পায়, সিদ্ধি তার জন্য নয়। ভারতীয় দর্শনের উৎসাহসূচক বাণী—চরৈবেতি চরৈবেতি।[২২]

২২। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন পথে তাঁকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পরপর পাঁচবার বললেন—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥
পুষ্পিন্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্ব পাপমানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥
আস্তে ভগ আসীন স্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
সেতে নিপদ্য মানস্য চরাতি চরতো ভগ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥
কলিঃশয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥
চরন বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেয়মানং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুবাদ ও ইয়োরোপীয় মনুষ্যত্ববাদ

ঋষি অরবিন্দ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে[১] লিখলেন যে প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কবি এবং শিল্পী, উত্তর জীবনে তিনি হলেন জাতি-সংগঠক ও ঋষি। ভাষা ও ছন্দ, ভাব এবং রূপ এই নিয়ে যাঁর লীলা তিনি কেমন ক'রে কোন নিগূঢ় সাধনার পথে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এক সুপ্রাচীন জাতির মন্ত্রগুরু হলেন, সে তত্ত্ব অনুধাবন করতে হ'লে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ভাব-জীবন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শনকে ভালো ক'রে পর্যালোচনা করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগ। এই নবজাগরণ এল জাতির চিন্তায়, মননে ও কর্মে, তার শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে ও দর্শনে। এর ফলবানতার অনুসারী হ'ল মানবতাবাদ। মানবতাবাদ স্বভাবতঃ আসে এই নবজাগরণের অনুসঙ্গ হিসেবে। ইয়োরোপে তাই এসেছিল, আমাদের দেশেও সেই একই পথে তার আবির্ভাব ঘটল। নতুন যুগ ঘোষিত[২] হ'ল এযুগের মানুষের মননে ও ধ্যানে। এই নতুন যুগের কথা যাঁরা শোনালেন তাঁরা চিরকালের নমস্য। তাঁরা নতুন আদর্শের কথা বললেন, শোনালেন মহত্তর জীবনবোধের বাণী। নবতর জীবনাদর্শের বার্তাবহ এইসব মনীষীর দল চিন্তা ও কর্মের জগতে নব প্রাণনার প্রবাহকে বহমান করলেন। বিশীর্ণ জাতীয় জীবনের রিক্তবক্ষ নদীপথে আবার জোয়ার এল। উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী নব্য মানবিকতা বাঙ্গালীর মনের মাটিতে সোনার ফসল ফলিয়ে দিল।

১। ১৯০৭ সালের ১৬ই এপ্রিল।

২। The renaissance began in Italy in the 14th Century and gradually spread over Western Europe until the domination of Scholasticism, of feudalism and of the church in secular matters was displaced by nationalism. Its precursor was 'The Revival of Learning' incident upon the recovery of classical Greek and Roman literature, led by Petrarch and Boccacio and resulting in humanism.

(New Standard Dictionary, Vol., III. p. 2084)

বাঙ্গলাদেশের মানুষ সে ফসলে মনের খামার ভরে নিল। আজও তা খোরাক যোগাচ্ছে সমগ্র জাতিকে। ইয়োরোপের নব্য মানবিকতা গত শতাব্দীর বাঙ্গালীর ভাব-জীবনে বিপ্লব ঘটিয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সমাজ সাগ্রহে সানন্দে নব্য ইয়োরোপের মানবিকতার আবেদনটুকু গ্রহণ করল ; তাকে গ্রহণ করবার শক্তির আশ্বাস বাঙ্গালীর প্রতিভার মধ্যে নিত্য বিধৃত। সেদিন জাতির বস্তু জীবনে দৈন্যের কঠোর শাসন ছিল। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর শোষণে অপচয় এবং লুণ্ঠনের হাজার প্রণালী বেয়ে জাতির সম্পদ অবশেষিত হয়ে এল। সম্পদের অভাব রইল বস্তু-জীবনে। ভাব-জীবনে এল শিক্ষার দৈন্য। মানুষের সহজাত সম্মান সেদিন স্বীকৃতি পেল না। তাইতো আমাদের পিতৃপুরুষের আত্মসম্মানবোধ কঠোর রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করল। সেদিনের জীবন-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অগ্রচারীদের সব সংস্কার, সব রক্ষণশীলতাকে বিচার করতে হবে। আমরা যখন দ্বারে অর্গল দিয়ে হিন্দুর সহস্র বৎসরের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে শুচিশুভ্র রাখবার চেষ্টায় বিনিন্দ্র রজনী যাপন করছিলাম তখন সাগর পার থেকে এল নতুন ভাবের নতুন আদর্শের কথা। আমরা সে কথা শুনলাম ; তাকে মনে-প্রাণে প্রথম বরণ করল বাঙ্গালী সমাজ। যে পীড়ন শাসকের নিত্য লাঞ্ছনায় প্রতিনিয়ত আমাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করছিল তা আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করল এই নতুন জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে। আমরা এই আদর্শকে গ্রহণ করলাম একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে। আমাদের অবিনাশী প্রাণশক্তি আপনাকে প্রকাশ করল অকল্পিত পথে পথে। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, কলায় আত্মপ্রকাশের সে কী দুর্নিবার প্রচেষ্টা। নতুন ভাব, নতুন আদর্শের সঙ্গে এল নতুন ধর্মবোধ। এদেশে ধর্মের পথে অসাধ্য সাধন করা যায়।

সেদিনের মানুষ কিন্তু ধর্মোন্মাদনা বোধ করেনি। যে নবজাগরণ শুরু হ'ল ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে তা' ধর্মাশ্রয়ী হয়েছিল এ কথা না বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু ধর্মান্ধতা তার মধ্যে ছিল না। এই সত্যটুকুকে গ্রহণ করে কেউ কেউ বাঙ্গালীর ঊনিশ শতকী নবজাগরণকে ধর্মসংস্কার-আন্দোলন বলতেও ইতস্ততঃ করেন নি। রাজা রামমোহনের নতুন ধর্ম

মুক্তির আশ্বাস নিয়ে এল, সে মুক্তি কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে, সে মুক্তি স্বার্থান্ধ ধর্মব্যবসায়ীদের অমানুষতা থেকে। এই নতুন ধর্মের বনিয়াদ হল যুক্তিবাদ। রাজা রামমোহন বুদ্ধি-আশ্রয়ী ধর্মকে মানুষের যুক্তিবাদী মনের কাছে তুলে ধরলেন। বহুদিন এদেশের মানুষ বিচার-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয় নি। কুসংস্কার আর ঐতিহ্য—এদের সাম্রাজ্যে বিচারের অবকাশ ছিল না। রামমোহনের নবধর্ম যুক্তিকে সম্মানের সঙ্গে মানুষের ধর্মের জগতে প্রতিষ্ঠিত করল। রাজা রামমোহন যুগন্ধর মহাপুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী তথা ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্থান সুদৃঢ়, এমন কি সকলের শীর্ষে এ কথা আজকের দিনে অস্বীকার করলে বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হ'বে নিঃসন্দেহে। রামমোহন চিন্তাকে মুক্তি দিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, শ্রেয়কে প্রেয়ের উপরে স্থান দান করেছেন, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রকে সুনির্দিষ্টরূপে আলোচনান্তে উভয়ের সত্য-শাশ্বত রূপ পরিষ্কার-রূপে তুলে ধরেছেন, এ সবই সত্য। কিন্তু এত সত্ত্বেও তিনি হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্তকে অগ্রাহ্য করেন নি, ব্রাহ্মসমাজে সর্বধর্মাশ্রয়ীদের জন্য স্থান ক'রে দিলেও বেদপাঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা পর্দার আড়ালে করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ বিদায় লোকচক্ষুর আড়ালে করাবার ব্যবস্থাও কর্রা হয়।[৩] রাজা রামমোহনের অপক্ষপাতদুষ্ট বিচার-বুদ্ধি একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের অসার আচার-নিষ্ঠাকে লঙ্ঘন করল অন্যদিকে আবার তা' সারবান অনুশাসনগুলোকে স্বীকার করল। যে আচারগুলোর কিছুমাত্র প্রায়োজনিক মূল্য ছিল সেগুলোকে রামমোহন স্বীকার করলেন। তারা হয়ত সব সময়ে তাঁর শাণিত যুক্তির সমর্থন পায় নি। রামমোহনের এই উদার যুক্তিবাদ সে যুগের বহু খ্যাতনামা মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ জননায়কেরা এই নবধর্ম আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। যুক্তিবাদী মননের প্রখর আলোকদীপ্তি এই আন্দোলনকে বুদ্ধিজীবী মানুষের চোখে এক ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করল। এতো গেল বাংলার নবজাগরণের একদিকের কথা। আর

৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার নবজাগরণ' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬৪

একদিকে দিকপাল হলেন অধ্যাপক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে নির্মুক্ত জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা সমৃদ্ধ এক নতুন জীবনাদর্শের তিনি প্রচারক। যুক্তিআশ্রয়ী এই নব্য জীবনাদর্শ ইয়োরোপীয় মানবিক আদর্শসম্ভূত। একদিকে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা অন্যদিকে মনীষী ডিরোজিও যখন যুক্তির শাণিত অস্ত্রে লোকাচার আশ্রিত হিন্দুর বিকৃতরুচি আচার-নিষ্ঠাকে আঘাত করছিলেন, যখন বহিরাগত ভাব-ভাবনার প্লাবনে হিন্দুর নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবনধারা পর্যুদস্ত, তখন সনাতন ধর্মের শাশ্বত, প্রাণশক্তি পুনরায় আপনাকে প্রকাশ করল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়, রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতে ও স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের তূর্যনিনাদে। নব্য হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ঘটল। পুরাতন হিন্দুমতবাদের অযৌক্তিকতাটুকু নবজাগরণের কূল-ডোবানো বন্যায় ভেসে গেল। এই নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিদেশী শিক্ষায় তাঁর মননরীতি মিলের ও অগুস্ত কঁতের মননানুগ হয়েছিল। রুশো, প্রুঁধো, ওয়েন, লুই, ব্লাং কাবে—এঁদের মতাদর্শের প্রভাব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। মিলের হিতবাদ ও কঁতের প্রত্যক্ষবাদ তাঁর জীবন দর্শনে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। তবুও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেশের ও জাতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে পরানুকরণের মোহে পরিত্যাগ করেন নি। আত্মপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি দেশজ পুরাতন জীবন বাদকে, ধর্মমতবাদিতাকে, অশ্রদ্ধার সঙ্গে পরিত্যাগ করেন নি। যুক্তির যাচাই যখন ব্যর্থ হয়েছে তখনই পরিত্যাগের প্রয়োজন ঘটেছে। যা বুদ্ধি দিয়ে সমর্থনযোগ্য,যা বিচার-প্রতিষ্ঠ তার অস্বীকার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ঘটে নি।

অবিচল নিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ঐতিহ্যকে আজীবন সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সমর্থন ধর্মান্ধ স্বার্থান্বেষী মানুষের সমর্থন নয়। প্রখর বুদ্ধির যুক্তিবাদ এবং হিন্দুশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, এই দুটি অমোঘ অস্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। জেনারেল এসেম্ব্লির অধ্যক্ষ পাদরি হেস্টি[৪] যখন হিন্দুধর্মের উপর অহেতুক আক্রমণ করলেন শোভাবাজারের রাজবাটির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নিয়ে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ

৪। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে

সমর্থন জানালেন তা' স্মরণযোগ্য। তিনি 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনামে আবার সনাতন ধর্মের গ্লানি দূরীভূত করার জন্য যে ভূমিকা গ্রহণ করলেন তা বিদগ্ধজনের কাছে পূর্ণ সমর্থন পেলো। পশ্চিমী যুক্তিবাদের হাওয়ায় ভেসে চলল প্রাচ্যের প্রাচীনতম ধর্মের সুবিপুল তরীখানা, তার কর্ণধার হলেন বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীরা। হিন্দুধর্মের ইতিহাসে তখন নবযুগের সূচনা হয়েছে। পশ্চিমী নব্য ন্যায়ের সমর্থন ঘটল, সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিপক্ষ পর্যুদস্ত হ'ল। জাতির মেরুদণ্ড যে ধর্ম, সেই ধর্ম রক্ষা করে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির চরিত্রশক্তিকে নবতর বীর্যে বীর্যবান করে তুললেন। সনাতন ধর্মের স্বর্ণসূত্রে আর একবার তিনি গ্রন্থিত করবার চেষ্টা করলেন আত্মবিস্মৃত প্রবুদ্ধ হিন্দুজাতিকে। প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন যে মহা কর্তব্য সম্পাদন করলেন তার ফলে হিন্দুধর্ম পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠা পেলো নব্যতন্ত্রী যুবসমাজের কাছে। তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন একদিকে যেমন বরণীয়কে বরণ করেছে সব সমালোচনাকে তুচ্ছ ক'রে অন্যদিকে আবার তেমনি যা কিছু অসার, যা কিছু অযৌক্তিক তাকেও আঘাত করেছে অনায়াসে। হিন্দুধর্মের প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও অন্যায় শ্রেণী-বিদ্বেষকে তিনি কখনই গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর উন্নত মানবিক আদর্শ তাঁকে মানুষের যথার্থ সম্মান দিতে শিখিয়েছে। এ কথা কখন কখন বলা হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইসলাম বিরোধী। বঙ্কিমের 'হিন্দু-ঐতিহ্য-গর্ব' অনেক সমালোচকের চোখে নিন্দনীয়। ওদুদ সাহেব[৫] তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে লিখলেন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সার্থক চিন্তা ও অসার্থক চিন্তা এমন জট পাকিয়েছে যে সেই জটিলতা মোচন করতে না পারলে একালে তাঁর চিন্তা থেকে তেমন সুফল লাভের আশা নেই।' ওদুদ সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের হিঁদুয়ানির প্রতি কটাক্ষ ক'রে এই মন্তব্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সংসদ বার্ষিকীতে (১৯৮৪) প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবান নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ওদুদ সাহেবের মত ও অনুরূপ মতবাদিতার সার্থক বিচার এই নিবন্ধটিতে অনুসৃত। জাতীয়তাবাদ এ যুগে ক্ষেত্রবিশেষে অচল হলেও বঙ্কিমের যুগে জাতীয়তাবাদের আবেদন ছিল সবচেয়ে বড়। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর কালের

৫। কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'বাংলার জাগরণ', পৃ. ১০২

পটভূমিতে বিচার করতে হবে। কোনরকম মানসিক আড়ষ্টতা থাকলে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিচারের প্রহসনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। উদাহরণ দিই[৬]: 'দেশের ও জাতির পুনর্গঠনকল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে পরিচ্ছন্ন নয় তার বহু প্রমাণ তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি আলোচনায় রয়েছে।' ওদুদ সাহেব মধ্য বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পটভূমির চিন্তা-নিরপেক্ষতা যদি বঙ্কিম মানসে প্রত্যাশা করেন তবে তা অযৌক্তিক হবে। তাঁর পরিবেশকে স্মরণ ক'রে বঙ্কিম মননরীতির মূল্যায়ন করতে বসলে 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি আলোচনায় তাঁর যে বৈদগ্ধ্যভঙ্গী সমন্বিত মনন সমীক্ষণের পরিচয় পাই তা সত্যই প্রশংসনীয়। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অপদার্থ শাসক ও শোষকদের তিনি নির্দ্বিধা নিন্দা করেছেন। যুক্তিবাদের নিক্তিতে উভয়েরই বিচার হয়েছে বঙ্কিমের এজলাসে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক মননরীতি যদি কেউ বঙ্কিমের মধ্যে দেখে থাকেন, তবে তিনিই ভ্রান্তদৃষ্টি। নব্য যুক্তিবাদের সুদৃঢ় বনিয়াদে তিনি হিন্দুধর্মের, তার আচারের, তার আদর্শ-পুরুষের যে অবিচল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার পিছনে স্বধর্ম-প্রীতি ছাড়াও মহত্তর আদর্শবোধের পরিচয় মেলে। কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ মানব চারিত্র-বৃত্তির যে পরিপূর্ণ রূপায়ণ এ কথা অনস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের রস-সাহিত্যে ও মনন-সাহিত্যে রেনেসাঁসের লক্ষণগুলো যে সুপ্রকট, এ বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। বাঙ্গলার তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সম্মান দিতে অনিচ্ছুক হলে ওদুদ সাহেব তা না দিতে পারেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে সনাতনী গোঁড়া হিন্দুদের সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে না। বঙ্কিম ছিলেন যুক্তিবাদের উপাসক, তাঁর মননে মিল ও অগুস্ত কঁতের চিন্তা স্বচ্ছতার স্বাক্ষর। তাঁকে মুসলিম বিরোধী ভট্টপল্লীবাসী গোঁড়া হিন্দুর ভূমিকায় নামিয়ে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় নি। অনেকদিন আগেই ওদুদ সাহেব তাঁর আর একখানি গ্রন্থে 'বাংলার জাগরণে' কথিত মতবাদের আভাস দিয়েছিলেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি[৭]: "What the modern critic discerns in

৬। 'বাংলার জাগরণ' পৃ. ১০২
৭। Creative Bengal, p. 5

Bankimchandra is a split personality. On the one hand, there are his eager quest after truth and his inborn love of humanity : On the other hand, is his concern, rather inordinate, for his oppressed and bewildered community.”

নির্যাতিত ভ্রান্ত স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তা মহত্তর জীবনাদর্শের সঙ্গে কেমন করে অসঙ্গত হয় তা' আমাদের ধারণা বহির্ভূত। উচ্চতম দার্শনিক চিন্তায় যদি আত্মশ্রেয়বাদ এবং পরশ্রেয়বাদ অসঙ্গত না হয়[৮] তাহলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্বধর্ম-প্রীতি ও বিশ্বজনীন প্রেম কেন অসঙ্গত হবে, তা বুঝি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিঁদুয়ানি নাকি ভারতবর্ষের জননায়কদের মধ্যে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। হিন্দুপ্রীতির অর্ঘ্য বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বা মুসলিম-বিদ্বেষ কী না জানি না। আর যদি তাই হয়, তবুও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় দেন নি। তাঁর মুসলিম-বিদ্বেষ তাঁর প্রগাঢ় স্বধর্ম নিষ্ঠার টীকাকারদের বিকৃত কল্পনাবিলাস। বঙ্কিমের আয়েষা, মীরকাশেম, দলনীবেগম, চাঁদশা ফকির, ওসমান—এঁরা তাঁর অসামান্য সৃষ্টি নৈপুণ্যে সুন্দর, তাঁর সহানুভূতিশীল সৃজন মহিমায় ভাস্বর। জেবউন্নিসা চরিত্রের পরিণতি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, বঙ্কিম-মানসে ইসলাম বিরোধী ভাব-ভাবনার স্থান ছিল না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের গভীরে তাঁর ধর্ম-সম-দৃষ্টিটুকু সযত্নে লালন করেছিলেন সারা জীবন ধ'রে। তাঁর গুণগ্রাহিতায় ধর্ম কখনও বাদ সাধে নি। তাঁর বিশ্বাসের শক্তি এমনই প্রবল, তাঁর গুণগ্রাহিতা এমনই নির্ভীক যে তিনি সাম্যবাদী রুশোকে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্টের সঙ্গে একাসনে বসাতে এতোটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। পূর্ব দেশের এক পরাধীন জাতির জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্গাতা এই মনস্বী ফরাসী বিপ্লবীকে যে সম্মান দিয়েছিলেন জানি না তার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিবৃত্তে কোথাও আছে কী না? রুশোর সাম্যবাদ তাঁর মনুষ্যত্বের সুমহান আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধ্যান, তাঁর ধারণা তাঁকে এমন একটি চলমান প্রাণবন্ত

৮। দার্শনিক Sidgwick-এর মতবাদ দ্রষ্টব্য

জীবনদর্শনের উত্তরাধিকার দিয়েছিল যার মধ্যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মমতের যা কিছু মহৎ, যা কিছু বরণীয় তা সবই যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের পথভ্রষ্ট সন্তানদের সম্মার্গগামী করার জন্য কখন কখন বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে স্বধর্মের মহত্ত্বের কথা অতিকথন দোষযুক্ত হয় পড়েছে, সে বিচ্যুতি আপেক্ষিক। যে পরিবেশ, যে পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের জয়গান করেছেন, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের পূজাপার্বণ, আমাদের দেবদেবী ও মহাকাব্যের রথী-মহারথীদের চারিত্র-সত্তা ও জীবনচর্যার অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন সেটুকু অনুধাবন করলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সঙ্কীর্ণ স্বধর্মিতার উপাসক বলে অভিযুক্ত করতে আমরা দ্বিধান্বিত হ'ব।

তথাকথিত উদার আন্তর্জাতিকতা পন্থী নব্য সমালোচক[৯] হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের আত্ম-ধর্ম সমর্থনকে মানবতাবাদের পরাজয় বলবেন: যে সংস্কারবিমুক্ত স্বাধীন মতবাদিতাকে ইয়োরোপীয় মানবতাবাদের স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়েছে তাকে নাকি বঙ্কিমী মননে হিন্দুসংস্কারের দ্বারা খণ্ডিত করা হয়েছে। প্রচলিত নীতি-ধারণা বঙ্কিম-মানসকে এতখানি প্রভাবিত করেছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত সত্যটুকু পরিবেশন করেন নি। সংস্কারবাদী সমাজের তর্জনী সঙ্কেতে তিনি দার্শনিক দেকার্তের মতই ধর্মগুরু এবং সমাজ গুরুদের অলিখিত অনুশাসন শিরোধার্য করেছেন, তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। এই সমালোচনা আংশিক সত্য-কথনের গৌরবাধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র কখন কখন জাতিধর্মকে ন্যায়প্রসূত ন্যায়ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছেন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির ক্ষয় অবরোধের জন্য। আত্মবিশ্বাস অবলুপ্ত ক্ষীণজ্যোতিঃ এক প্রবুদ্ধ জাতির কর্ণে তিনি আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র দিয়েছেন আত্ম-ঘোষণার পথে। সে ঘোষণায় সত্য অখণ্ডিত। অনৃত ভাষণের দায়ভাগী হন নি বঙ্কিমচন্দ্র, অতি-কথনের দোষ তাঁকে হয়ত স্পর্শ করেছে।

আত্মস্তুতি সমর্থনযোগ্য যদি তা' মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম গুণ কীর্তন সহনীয় যদি তা' একটা আত্মবিস্মৃত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জাতির

৯। শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী লিখিত 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' দ্রষ্টব্য

অভ্যুদয়ের সূচনা করে। ইয়োরোপ আবার বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ কণ্টকিত হিন্দুসমাজের কাছে নতুন করে সাম্যবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করল। ইয়োরোপ বলল যে মানুষের মূল্যায়নের মানদণ্ড হল রক্তমাংসে গড়া মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র সে তত্ত্ব গ্রহণ করলেন। কোন অনৈসর্গিক পার্থক্য বা ব্যবধানকে তিনি সত্য-মর্যাদা দেন নি। যে মন্ত্র অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা-ই আবার ঊনিশ শতকের নব্য ইয়োরোপীয় মনুষ্যত্ববাদের ভিত্তিভূমি। অষ্টাদশ শতাব্দী মানুষের চরম লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাক্ বিপ্লব যুগে ফরাসী বিপ্লবের রঙ্গভূমিতে মানুষের শোণিতে বিলাস চরিতার্থ হয়েছে, ঐতিহাসিক এ কথা বলেন। কার্লাইল এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর স্বভাবোচিত ব্যঙ্গ নিপুণতার সঙ্গেঃ "যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া থেকে ফিরে জন দুই দাস বধ করে তাদের উষ্ণ বক্ষ রক্তে পাদ প্রক্ষালন করতে পারতেন সে আইন আর ইদানীং প্রচলিত নেই।" ঊনবিংশ শতাব্দীর নবতর মানবতার ধারণা মানুষকে দেবতার মর্যাদায় সম্পন্ন করে তুলল। মানুষ দেবতাকে অস্বীকার করল আপন মনুষ্যত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে। এই স্বয়ংসিদ্ধ নর আবার কালক্রমে নারায়ণ হয়ে উঠলেন। প্রত্যক্ষবাদী মিলও ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মানুষের মর্যাদা ত' তার দ্বারা ব্যাহত হল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো তার সীমাহীন গৌরব। মানুষের আত্যন্তিক এই বিশ্বাসটুকু এল ইংরাজী ভাষার পুষ্পক রথে। নব্য মানবতার ধারণা সত্যসন্ধানী বিদগ্ধ ভারতীয় মনে আলোড়ন তুলল। বঙ্কিমচন্দ্র এই মানবতাবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর 'সাম্য' প্রবন্ধে[১০] লিখলেনঃ 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। তুমি যে উচ্চকূলে জন্মিয়াছ সে তোমার গুণ নহে। যে নীচকূলে জন্মিয়াছে সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচ কূলোৎপন্নেরও সেই অধিকর। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন যে, সে-ও তোমার ভাই, তোমার সমকক্ষ।' এই সমদৃষ্টির স্বচ্ছতা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক

১০। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২০০

হলাহলের ঊর্ধ্বে রেখেছিল প্রতিনিয়ত। যে মানুষ মানুষের সত্যমূল্যে বিশ্বাস করেছে সে কখনও সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা গোষ্ঠীবাদে মনেপ্রাণে আস্থা স্থাপন করতে পারে না। কেন না তারা হল তার জীবনাবাদের মূল মন্ত্রটির বিরোধী। তবে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে, সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অনেক কথা বলে যার সঙ্গে তার অন্তরশায়ী আদর্শের হয়ত পরিপূর্ণ যোগ থাকে না। তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী' বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের সামাজিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু-সমাজের সর্বনাশের তীরে দাঁড়িয়ে হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রকে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল তা যথাযথ অনুধাবন করলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দু-ঐতিহ্য-গর্বকে ক্ষমা করা যায়। সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের অন্তরশায়ী সুযুক্তির বনিয়াদটুকু লোকচক্ষে উদ্‌ঘাটিত করলেন। নব্য হিন্দুসমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হল। ইয়োরোপীয় মানবতাবাদ যে যুক্তির পথ বেয়ে হিন্দুর সনাতন পরম পুরুষের ধারণায় উপনীত হতে পারে, এই সত্যটুকু বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করলেন। নব্য ন্যায়ের যে সূক্ষ্ম সরণী বেয়ে তিনি ইয়োরোপীয় মানবতাবাদের আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে কৃষ্ণ চরিত্রের মহিমাকে সু-প্রতিষ্ঠ করলেন তা এমন কিছু দুরধিগম্য নয়। ইয়োরোপীয় হিউম্যানিস্টরা মধ্যযুগকে উপেক্ষা করে ক্লাসিক্যাল যুগকে আদর্শ লক্ষ্য করেছিলেন। ক্লাসিক্‌সে যে দেবোপম আদর্শ মানব চিত্রায়িত হয়েছে তা-ই হল ইয়োরোপীয় মানবতাবাদের আদর্শ। বাইবেলীয় সুপ্রাচীন আদর্শেও হিউম্যানিস্টরা আস্থাবান ছিলেন।[১১] ইয়োরোপে হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদ ক্লাসিক্যাল আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে; আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার পুরুষোত্তমকে আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিভ্রান্ত সমাজের সামনে তুলে ধরে অন্যায় করেন নি। তিনি আমাদের এপিক যুগকে আশ্রয় করেছেন। এপিক যুগের পূর্ণ মানবাত্মা আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের উপাস্য। মানুষের আত্যন্তিক মহত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী।

১১। J. A. Symonds কৃত 'A Short History of the Renaissance in Italy.' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

মানুষে মানুষে যে বিভেদ সৃষ্ট হয়েছে তাকে অস্বীকার করলেও মানুষের মধ্যে যে নৈসর্গিক বৈষম্য রয়েছে তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। যে মানুষ পূর্ণ, সে-ই ধন্য। সে মনন ও চরিত্র-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছে। এই পূর্ণ মনুষ্যত্বের ধারণাকে আমাদের অস্তিত্বের চরম পরিণতি হিসেবে দেখেছেন মিল, কঁত প্রমুখ পণ্ডিতেরা। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের মতানুসারী। পূর্ণ মানবের সাক্ষাৎ পাওয়া হ'ল দুরূহ সৌভাগ্যের কথা। যুগে যুগে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ও অধর্মের নাশ কারণে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে, এ সত্য হ'ল গীতোক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে এই আদর্শ মানবের রূপটুকু ধ্যান করার জন্য দেবতার রূপ কল্পিত হয়েছে। মানুষ তার আদর্শের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছে দেব-দেবীর মধ্যে; আমরা এই সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন মানব-স্বভাবের আদর্শ পেয়েছি। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ মানুষের আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখলেন দেবতার মধ্যে; দেবতা হল মানুষের সৃষ্টি। পরম ভাগবত স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমরা শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে। বঙ্কিমচন্দ্র মানবাদর্শের পরিপূর্ণ রূপায়ণটুকু প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে। এই পরিপূর্ণ মানুষ তো সাধারণ মানুষ নন, তিনি যে নরোত্তম, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ। এই মহৎ আদর্শ মানবের আংশিক প্রতিষ্ঠা আমরা দেখেছি পুরাণোক্ত মুনি-ঋষিদের জীবনে। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি সকলেই আত্মানুশীলনের চরমাদর্শ। নরদেহে এর চেয়েও পূর্ণতর আদর্শের দেখা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র গীতার অধিনায়ক, পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি[১২]: "কিন্তু এইসকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে। যাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমময় চরিত্র কখনও মনুষ্য ভাষায় কীর্তিত হয় নাই।" এই পূর্ণ পুরুষ হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মধ্যে মানব ধারণার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি। মানুষের সমধর্মিতায় প্রত্যয়ী হয়েও এই মানবোত্তর দেবচরিত্রে

১২। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১০

বিশ্বাস করা যায়, পূজা করা যায় তাঁর অতিমানবীয় পূর্ণতাকে, গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় তাঁর মহিমোন্নত দেবত্বে। তাই তো বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে প্রত্যক্ষবাদের প্রাণধারায় পুষ্ট হয়েও হিন্দুর ভগবানে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হয় নি। হিন্দুর ভগবানের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন মানবতার মহিমময় রূপটুকু। তাই তাঁর মানবিক আদর্শ ভগবদ্‌বিরোধী নয়। সেখানে ধর্মের স্থান আছে, যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ভগবানের নিবিড় মিলন ঘটায়। এই ধর্মের নানান রূপভেদ। ধর্ম ভারতীয় জীবনসাধনার ধারাকে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট ক'রে রেখেছে, যুগে যুগে তাকে নতুন প্রাণের পাথেয় দিয়েছে। মানুষের দেবতার মধ্যেই পরম আদর্শের প্রকাশ, পূর্ণ প্রাণের অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-দর্শনে একদিকে পশ্চিমী প্রত্যক্ষবাদ মানবীয় মহোত্তর জীবনাদর্শের সূচনা করল অন্যদিকে আবার সনাতন হিন্দু জীবনবাদ নবতর মহিমায় আপন স্বাক্ষর রেখে গেল। কঁতের পরম মানবিক আদর্শকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। হিন্দুর যুগযুগান্তরের আদর্শ পুরুষ ও ইয়োরোপীয় নব্য মানবতাবাদের আদর্শের স্বাঙ্গীকরণ ঘটল বঙ্কিম মানসের সুবিরাট ব্যাপ্তির পটভূমিতে। প্রতিভার জাদু এই অসাধ্যকে সিদ্ধ করল। বিগত শতাব্দীতে হিন্দু জীবনধর্মের ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরম সঙ্কটের দিনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকুই হ'ল সবচেয়ে বড় দান।

অগুস্ত কঁত ও প্রত্যক্ষবাদ

আধুনিক দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঊনবিংশ শতকের দর্শনশাস্ত্রীরা এ কথা বার বার ভেবেছেন যে, এ আলোচনা কাকে দিয়ে শেষ করতে হবে—হেগেল না কঁত? এ সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে, কঁতকে দিয়েই এ ইতিহাসের শেষ করা দরকার, কেন না কঁত জীবন-বিচারের এক নূতন পদ্ধতি আমাদের দিয়েছেন। আবার কারো কারো মতে হেগেলই হলেন নব চিন্তার-দিগ্‌দর্শক। কাজে কাজেই তাঁকে দিয়েই আধুনিক দর্শন-ইতিহাসের ইতি করা সমীচীন। জেমস্ হাচিসন স্টার্লিং বেশ জোরের সঙ্গে হেগেলের সপক্ষে রায় দিলেন। তিনি বললেন:

"I hold Schwegler to be perfectly right in closing the history of philosophy with Hegel and not with Comte."

অর্থাৎ 'সোয়েগ্‌লার তাঁর দর্শনেতিহাসের বিবরণী হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা করে যে শেষ করেছেন, এটা আমি খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কঁতের দর্শন আলোচনা ক'রে এই ইতিহাস শেষ করা ঠিক হ'ত না।' এখানে অনেকেই হয়ত স্টার্লিং-পন্থী হবেন। অবশ্য বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যাও নগণ্য নয়, এ কথাও সত্য। সে যাই হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে কঁতের দান অসামান্য। সেই অসামান্যতার জন্যই এই ধরনের বিতর্ক উঠেছে। হেগেলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কঁতের নাম করা হয়েছে। আমাদের মতে এই বাদানুবাদের মাধ্যমে আমরা কঁতের যোগ্য সম্মানই দিয়েছি।

লিউস্ বললেন যে, বিজ্ঞানগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া এবং ইতিহাস-বিবর্তনের আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হল দার্শনিক কঁতের বহুমূল্য গবেষণার ফল। এই অমূল্য দানের জন্য দার্শনিক কঁত বিশ্বজনের কাছে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। তিনি ত্রিকালজয়ী হবেন।

লিউসের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফল, তার বিচার আরও অনেক পরে হবে। আমরা আজকের দিনে এইটুকুই বলতে পারি যে, তাঁর মূল্য-নিরূপণ বহুলাংশে বাস্তবানুগ। দার্শনিক মিল এমনি ধরনের কথাই বলেছিলেন কঁত সম্বন্ধে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই। ওয়েস্টমিনস্টার রিভিয়ুতে মিল লিখলেন :

"The fundamental merits attributed to Comte are two in number—(a) His arrangement of the sciences and (b) his so-called law of historical evolution—the metaphysical, the theological and the positive."

দার্শনিক কঁতের মুখ্য গুণ হল দুটো। বিজ্ঞানগুলোকে ব্যাপ্তিগুণ হিসেবে সাজিয়ে দেওয়া এবং ইতিহাস-বিবর্তনের বিধিগুলো আবিষ্কার করা। তাঁর মতে ইতিহাস-বিবর্তন ঘটছে তিনটি কানুনের অনুশাসন মেনে। এই আইন তিনটিকে বলা হয়েছে ধর্মপ্রধান, দর্শনপ্রধান ও প্রত্যক্ষবাদী। কঁতের এই ব্যাখ্যা চিন্তানায়কদের নূতন করে সমাজ-দর্শনের সমস্যাগুলোকে ভেবে দেখার প্রেরণা জুগিয়েছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড এঁরা এই একই কারণে আমাদের স্মরণীয়। এঁদের গবেষণার ফলের চেয়ে গবেষণা পদ্ধতি চিন্তাশীল মানুষের অনেক উপকার করেছে। নূতন করে ভাববার, নূতন পথে চলবার প্রেরণা এসেছে এঁদের কাছ থেকে। চিন্তার জগতে তার দাম কম নয়। কঁতও এ ব্যাপারে এঁদের সমানধর্মী। কঁত নূতন পথের দিশারী।

আমরা আজকের দিনে 'Sociology' বা সমাজ-বিজ্ঞান নিয়ে অনেক গবেষণা করছি। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, দার্শনিক কঁত বিজ্ঞান-সম্মত পথে সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি সমাজ-বিবর্তনের রীতি-পদ্ধতি ও সমাজ সংস্থা গঠনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলেন। ডবল্যু. কে. রাইট তাঁর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে কঁতের দানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন :

"Comte did a valuable service in the introduction of the new science of sociology. He probably has the best claim of any one to be regarded as its founder and many points to which he was perhaps the first to call attention

have become part of the stock in trade of every investigator in the field."

দার্শনিক কঁত এক নূতন সমাজ-দর্শনের অবতারণা ক'রে চিন্তাশীল মানুষের অশেষ কল্যাণ করেছেন। এই নব্য দর্শনের জনক হিসেবে তাঁর দাবী সর্বাগ্রগণ্য। তিনি যে সমস্ত তত্ত্বের ও তথ্যের কথা আমাদের শুনিয়েছেন সেগুলো পরবর্তী যুগের পণ্ডিতেরা অনেকেই অসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের তত্ত্বালোচনার প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর দান কম নয়। আপনার বলিষ্ঠ চিন্তাভঙ্গী ও মৌলিকতার প্রসাদগুণে কঁত দর্শনের ক্ষেত্রে নিজ আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কঁতের প্রত্যক্ষবাদকে শুধু দর্শন বললেই সবটুকু বলা হল না। এটা তন্ত্রও বটে। একে সংহিতা বললে ঠিক বলা হল না, একে সমন্বয়ী সংস্থিতিও বলতে হবে। মানুষের বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণতা ও প্রক্ষিপ্ততাকে সংহত করতে হবে একটি চিন্তাসূত্র-গ্রন্থনের ভেতর দিয়ে, এ কথা কঁত বুঝেছিলেন। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে প্রত্যক্ষবাদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, বিচার করেছেন এর সমস্যাগুলোকে এক নূতন মানদণ্ডের অবতারণা ক'রে। মানুষের বহুধাবিভক্ত জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলোকে সমন্বিত করা হ'ল আমাদের সমাজ-জীবনের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। রুগ্ন সমাজ-জীবনকে সুস্থ করে তুলতে হলে সামাজিক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে এবং তা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা বুদ্ধি দিয়ে জীবনকে বিচার করব। ব্রিজেস্ এই বুদ্ধিধর্মী আন্দোলন ও সামাজিক সঙ্কটের একটা মিলন ঘটিয়ে দেবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। "General View of Positivism" গ্রন্থের ভূমিকায় কঁতের প্রত্যক্ষবাদ সম্বন্ধে তিনি লেখেন:

"It will offer a general system of education for the adoption of all civilized nations and by this means will supply in every department of public and private life fixed principles of judgement and of conduct. Thus the intellectual movement and the social crisis will be

brought continually into close connection with each other."

অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদ একটা সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে সমস্ত সভ্য মানুষের মধ্যে। মানুষের চিন্তা ও আচরণের কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন করে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে কঁতের প্রত্যক্ষবাদ শৃঙ্খলা আনয়ন করবে। প্রত্যক্ষবাদ যে কেবলমাত্র আমাদের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করেছে তাই নয় আমাদের সামাজিক জীবন-রীতিকেও সংহত করেছে। প্রত্যক্ষবাদ প্রচার করেছে প্রেম শৃঙ্খলা ও প্রগতির কথা, মানুষকে দিয়েছে মহত্তর মানবতার ধারণা। কঁত-প্রবর্তিত এই আন্দোলন প্রথম সুরু হয় ফরাসী দেশে। তারপরে ক্রমে ক্রমে সে আন্দোলন পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধি-আশ্রয়ী প্রত্যক্ষবাদ জীবনকে আশ্রয় করেছে, মানুষের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে আপনার আন্তর-শক্তির গুণে।

ঊনবিংশ শতকের কোন ফরাসী দার্শনিক কঁতের সমকক্ষ নন, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। ফলকেনবার্গ বলেছেন:

"Among the French philosophers of this century none can compare in far-reaching influence, both at home and abroad with Auguste Comte, the creator of positivism."

প্রত্যক্ষবাদের জন্মদাতা অগুস্ত কঁত যেভাবে আপনার প্রভাব ব্যাপ্ত করেছেন, তার সঙ্গে কোন ফরাসী দার্শনিকের কীর্তি তুলিত হতে পারে না।

এই প্রথিতযশা দার্শনিক ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্তপেলিয়ার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী রাজস্ব-বিভাগের সামান্য কর্মচারী। তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসে ক্যাথলিক এবং অতিশয় রাজভক্ত প্রজা। বিশ্বাস করাটাই জীবনের পরম কাম্য, সে প্রত্যয় রাজার উপর অথবা ভগবানে ন্যস্ত করা কর্তব্য, এটা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। বালক-কঁত স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস সুরু করলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মার্জিত রুচি অচিরেই শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এইখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ

করা যায় যে, মহাদার্শনিক হেগেল ছাত্রাবস্থায় কঁতের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন না—অন্ততঃ তাঁর সে খ্যাতি ছিল না। ছাত্রজীবনে হেগেল ছিলেন অতি সাধারণ আর কঁত ছিলেন অনন্যসাধারণ। মাত্র পনর বৎসর বয়সে কঁত প্যারিসের পলিটেক্‌নিক বিদ্যায়তনে প্রবেশপ্রার্থী হলেন। বয়স কম ব'লে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করায় সে বছর আর তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ঘটে নি। পরের বছর তিনি বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। গোড়া থেকেই মন দিয়ে পাঠাভ্যাস সুরু করলেন। এখানে তিনি তখনকার দিনের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের কাছে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করতে লাগলেন। ওদিকে ওয়াটারলুর যুদ্ধ আসন্ন। কঁত এবং অন্যান্য ছাত্রেরা জাতীয় সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবার আবেদন জানিয়ে নেপোলিয়নের কাছে পত্র পাঠালেন। সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। ব্যবহারিক জীবন ও মানুষের জীবন-দর্শনের মধ্যে যে একটি আত্মিক যোগ থাকা দরকার, এ কথা কঁত বাল্যকাল থেকেই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কর্মে বিশ্বাস করতেন, অলস জীবনবাদে তাঁর আস্থা ছিল না। কাজের সময় তাই কঁতকে 'হাতীর দাঁতের মিনারে' বসে দার্শনিক সাজতে কখনও কেউ দেখে নি। কাজের ডাক যখন এসেছে, কঁত তখন এগিয়ে এসেছেন সবার পুরোভাগে, জনসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে। তাঁর দর্শন হ'ল জীবন-শিল্পীর দর্শন—যে দর্শন জীবনকে শিল্প ক'রে তোলে এবং শিল্পকে জীবনের রসে সঞ্জীবিত করে। তাই জাতীয় প্রয়োজনের দিনে কঁতকে আমরা কর্মীর আসনে দেখেছি। অক্ষম বুদ্ধি-জীবীর জীবন-দর্শন তাঁকে কখনও মোহগ্রস্ত করতে পারে নি। চলমান মানুষের বলিষ্ঠ জীবনবাদ হল কঁতের। বলা চলে, তিনি ছিলেন উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উপাসক। চলাই হ'ল জীবন, কর্মই হ'ল মানুষের প্রাণ।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনাটি বালক কঁতের চরিত্রের আর একটি দিককে উদ্‌ঘাটিত করেছে। নেপোলিয়নের পতনের পর আবার বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হ'ল। এই নয়া সরকার পলিটেক্‌নিক বিদ্যায়তনটিকে ভালো চোখে দেখতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এটি একটি সাধারণতন্ত্রী দলের আড্ডা। এই বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক একদিন আরাম-কেদারায় শুয়ে সামনের টেবিলে পা

দুটো তুলে দিয়ে একটি শ্রেণীতে পড়াচ্ছিলেন। কঁত তখন এই শ্রেণীতেই পড়ছিলেন। শিক্ষকের এই অমর্যাদাকর ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। শিক্ষক যখন তাঁকে আবৃত্তি করার জন্য নির্দেশ দিলেন তখন কঁত ঐ শিক্ষকের অনুকরণে ঠিক ঐ ভাবে বসে বসে আবৃত্তি করতে লাগলেন। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত রেগে গিয়ে কঁতকে ভৎ´সনা করলে কঁত যা বললেন তার মর্ম হচ্ছে এই : 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও'। তিনি আর বেশী গোলমাল করলেন না, তখনকার মত নিরস্ত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটা তজুহাতে কঁত বিতাড়িত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার আর কোন সুযোগই তিনি জীবনে পেলেন না। এর পরে গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে আর সাধারণের জন্য প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো শুনে শুনে তিনি আপনার চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন। জ্ঞানলাভের এই পথটি অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ। তবু কঁত দমলেন না। ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাঁর পুরুষকারকে উদ্দীপিত করে তুলল। এই অবাঞ্ছিত আঘাত কঁতকে মনুষ্যত্বের পথে নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করল। কঁত সর্বস্ব পণ ক'রে জ্ঞানলাভের জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। সহায়হীন সম্পদহীন তরুণ কঁতের সে কী অক্লান্ত প্রয়াস! সাধনার দীপ জ্বলে উঠল লক্ষ শিখার অনির্বাণ জ্যোতিতে দুঃখ, দারিদ্র অনশন—হল এই জ্ঞানসাধকের নিত্যসঙ্গী।

এই সময়ে কঁতের জীবনে হ'ল সাধু সাইমনের অবির্ভাব। সাইমনকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সাইমন তাঁকে প্রিয় শিষ্যের স্থান দিয়েছিলেন। কঁতের কিছু লেখা প্রকাশিত হ'ল সাইমনের কাগজে। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সাইমন সম্পাদিত "Worker's Political Catechism"-এ কঁতের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। প্রবন্ধটির নাম "A plan for the Scientific work necessary to reorganise society." এই প্রবন্ধটি কঁতকে বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত করল। ভাবীকালের দার্শনিক কঁত সেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন প্রতিভাবান মানুষের গৌরব নিয়ে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই কঁতের জীবনে প্রিয়ার আবির্ভাব হল।

ক্যারোলিন ম্যাসিন ভালবাসলেন কঁতকে। পরম আগ্রহে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম নারীকে কাছে টেনে নিলেন। সমাজের প্রত্যন্ত পথে দুটি নরনারীর প্রেম সার্থক হ'ল পরিপূর্ণ মিলনে। ক্যারোলিন ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীন। তাঁর চরিত্রে কলুষ-কালিমা ছিল, যেমন ছিল সে যুগের প্যারিসে অনেক ছেলেমেয়ের। তবু কঁত তাঁকে বিবাহ করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করেন নি। কারণ তিনি জানতেন যে ক্যারোলিন তাঁকে সত্যসত্যই ভালবেসেছিলেন। ক্যারোলিনও বিবাহের পরে কোনদিন অবিশ্বাসিনী হন নি। যখন কঁতের স্নায়ু-রোগ হ'ল, ক্যারোলিন তখন অবিশ্রান্ত সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাঁকে আবার সুস্থ ক'রে তুললেন। এই সেবাপরায়াণা প্রেমময়ী নারীর কথা কঁত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা ও নিবিড় মমতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ছাড়াছাড়ির পরেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁদের প্রীতি। উভয়ে উভয়কে সাহায্য করেছেন যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ঘুচে গেলেও বন্ধুত্বের, প্রীতির সম্পর্কটি অক্ষুণ্ণ ছিল। বরাবর ক্যারোলিন কঁতের সুখ-দুঃখের খবরদারি করেছেন, আর কঁতও ক্যারোলিনকে সাহায্য করেছেন তাঁর সামান্য আয়ের বেশ একটা মোটা অংশ দিয়ে। উত্তরকালে কঁতের জীবনে অন্য নারীর আবির্ভাব ঘটলেও ক্যারোলিনকে তিনি বিস্মৃত হন নি। ক্যারোলিন ছিলেন তাঁর দুঃখের দিনের বন্ধু, প্রিয়সখী ও সচিব।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কঁতের জীবনে আর এক নারীর আবির্ভাব হ'ল। মাদাম ক্লোতিলদ ছিলেন রূপসী এবং ধনশালিনী। তার স্বামী জুয়াচুরি ক'রে ফেরার হ'য়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই তাঁর পক্ষে আর প্যারিসে ফেরা সম্ভব হয় নি। অনাশ্রিতা রূপসী নারীর প্রেমে ডুবে গেলেন কঁত। সে যুগে ফরাসী আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের চলন না থাকায় কঁত ক্লোতিলদকে বিবাহ করার প্রস্তাব করতে পারলেন না। আর ক্লোতিলদ ছিলেন ধর্মপরায়ণা। তিনি কঁতকে চেয়েছিলেন বন্ধুভাবে। তিনি তাঁকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে চেয়েছিলেন, প্রেম দিয়ে জয় করতে চান নি। কঁতের প্রতিভা আকৃষ্ট করেছিল কবি ও রসিক ক্লোতিলদকে। ক্লোতিলদ কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন। অবশ্য সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিলাভ তিনি করেন নি। ক্লোতিলদের এই সংযম,

এই পবিত্রতা কঁতকে মুগ্ধ করল, তাঁকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলল। ক্লোতিলদের মৃত্যুর পরে কঁত তাঁকে ভুলতে পারেন নি। তিনি তাঁর প্রিয়ার সমাধি-ভূমিতে সপ্তাহ শেষে একবার ক'রে যেতেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

ক্লোতিলদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ কঁতের দার্শনিক মতবাদকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। জীবন-সায়াহ্নে তিনি এক নূতন ধর্মের প্রবর্তন করার জন্য প্রয়াসী হলেন। ক্যাথলিক ধর্মানুরাগীর ধর্মবোধ ও জীবন-দর্শনকে তিনি শ্রদ্ধা করতে শিখলেন। এর মধ্যেও যে অনেকখানি সত্য আছে সে কথা তিনি স্বীকার করে নিলেন। অবশ্য ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসন এবং অধিকাংশ তত্ত্বগুলোকে তিনি বিশেষ আমল দেন নি। তিনি এগুলোকে বর্জনের পক্ষপাতীই ছিলেন। বিগত শতকের কবি অক্ষয়চন্দ্র বড়ালের মানববন্দনা কবিতায় এই দর্শনমতের ছায়া পড়ল:

'নমি তোমা নরদেব, কী গর্বে গৌরবে দাঁড়ায়েছ তুমি,
সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ, পদে শষ্পভূমি।'

বিরাট এক আদর্শ মানুষের ধারণাকে তিনি ভগবানের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মানুষ ভগবানের স্থান অধিকার করল। মাতা মেরীর পরিবর্তে কল্যাণরূপিণী প্রেয়সী নারীর ধ্যানরূপকে তিনি বেশী মর্যাদা দিলেন—সেই চিন্ময়ী প্রিয়ার ধ্যানে বিভোর হতে শিক্ষা দিলেন মানুষকে। তিনি বললেন যে, মানুষের জীবন-দর্শন শুধু বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারে না—তার জন্য প্রেম, অনুভূতি আর ভক্তির দরকার আছে। কঁতের মুখে এ ধরনের কথা একটু বিস্ময়কর। এ কথাগুলো কঁতের দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদ বলে অনেকেই মনে করেন না। তাই কঁতের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে দুটো দল হ'য়ে গেল। যাঁরা কঁতের আগেকার মতগুলোকে সত্য বলে মনে করতেন তাঁরা রইলেন এক দলে, আর অন্য দলে রইলেন কঁতের পরিবর্তিত মতের সমর্থকেরা। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত গ্রন্থ "The Positive Polity" প্রকাশিত হল ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে; চার খণ্ডে বিভক্ত এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল পুরো চার বছর ধরে। এই গ্রন্থে তাঁর পরিবর্তিত মতের কথা সবাই জানতে পারল। এক ধরণের ধর্মের ছোঁয়াচ

লাগল কঁতের যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদে।.কতের গোঁড়া শিষ্যেরা এই ধরনের পরিবর্তনকে ঠিক ভালো চোখে দেখতে পারেন নি, যদিও তাঁর মূল দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে এই মতের বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এই মতগুলোকে দার্শনিক কঁতের মূল তত্ত্বকথার পরিপূরক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। কঁতের এই নূতন ধর্মবোধ তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় নি বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

১৮৩০ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কঁতের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ "Positive Philosophy" প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থখানি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। নির্জনে বেড়াবার সময় কঁত এই গ্রন্থে পরিবেশিত তত্ত্বগুলো ভাবতেন, তার পরে সেগুলো সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করতেন। সবশেষে সেগুলো লিপিবদ্ধ হ'ত। এইভাবে লেখা চলল। সৃষ্টি হল চিন্তার নব নব ক্ষেত্র। কঁত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে এই কথাই বললেন যে, আমাদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাগুলো এবং তাদের সম্পর্ক। এর বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারি না। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা কবি-কল্পনা। স্বর্গ, আত্মা, অমরতা—এসব হল যুক্তিবাদী দার্শনিকের গ্রাহ্যের বাইরের বস্তু। যা ঘটছে তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। নিরীক্ষণ (Observation) পরীক্ষা (Experiment) ও উপমা (Comparison)—এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জগৎকে দেখি এবং বুঝি—বিভিন্ন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি, পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কটুকু অনুধাবন করি। ঘটনাপরম্পরার মধ্যে যেটুকু স্থায়ী সম্পর্ক, সে সম্পর্কটুকু ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা ও সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্থায়ী সম্পর্কগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণয়নের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহার করি।

কাজে কাজেই জ্ঞানকে আপেক্ষিক বলা হয়েছে। অনাপেক্ষিক জ্ঞান কবি কল্পনা। আমরা শুধু দেখি ঘটনা-স্রোতের প্রবাহ—দেখি ঘটনা পারম্পর্য। ক ও খ-কে অনিবার্য যোগসূত্রের দ্বারা গ্রথিত দেখি। খ ক-কে অনুসরণ করে। যখনই ক-এর আবির্ভাব ঘটে তখনই খ-এর আবির্ভাবও অনিবার্য কারণেই ঘটে। এই সদা পুরোগামী ঘটনাটিকে অনুগামী ঘটনাটির কারণরূপে অভিহিত করা হয়। এই কার্য-কারণ

সম্বন্ধটির জ্ঞান আবার ব্যবহৃত হয় আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও মননের প্রয়োজনে। আমরা যখন কোন কার্যের কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করি, তখন হয় আমরা ভবিষ্যতে সেই কার্যটিকে অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে চাই অথবা তার আবির্ভাবকে ব্যাহত করতে চাই। কার্য-কারণ সম্বন্ধটির সঠিক ধারণা না থাকলে এর কোনটি করাই সম্ভবপর হয় না। কখন কখন কার্যটির যথার্থ আবির্ভাবের সময়টুকু আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানের ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করে। ঘটনা-পারম্পর্যের ওপর আমাদের প্রভুত্ব তখনই আসতে পারে যখন—যে নিয়মের বশবর্তী এই ঘটনাগুলো, সেই কানুনগুলো আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কার্য-কারণসূত্রে গ্রন্থিত ঘটনাপ্রবাহের এই জ্ঞান অনাপেক্ষিক জ্ঞান নয়—এ হল আপেক্ষিক। বেকন ও দেকার্ত বর্ণিত অনাপেক্ষিক তত্ত্বে কঁত বিশ্বাস করেন নি। পরম সত্যের অনাপেক্ষিক জ্ঞানের ধারণা কঁতকে কখনই প্রলুব্ধ করে নি। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ কঁতকে একদিকে বেকন ও দেকার্তের আইডিয়ালিজম্, অন্যদিকে দার্শনিক হিউমের' এম্পিরিসিজম্'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে। কঁতের প্রত্যক্ষবাদ ঘটনা পারম্পর্যের সত্যতাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করেছে সেই সর্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে যাদের বশবর্তী হয়ে বিশ্ব-সংসারে প্রলয়-সৃজনের লীলা চলেছে অহরহ।

কঁতের মতে বিজ্ঞানের জীবনেতিহাস তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে—ধর্মপ্রধান, দর্শনপ্রধান ও প্রত্যক্ষধর্মী স্তর। এই স্তর তিনটিকে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় মানুষ বিশ্বাস করে অতি প্রাকৃত দৈবী ব্যক্তিত্বে। প্রকৃতির সব কিছুতে মানুষ দেবত্বের আরোপ করে। বৃক্ষে, প্রস্তরে, বর্ষণে, বিদ্যুতে সে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে। এ দেবতা পূজায় পরিতুষ্ট হন, আবার অবহেলিত হলে মানুষের মতই রুষ্ট হন। এই দেবতাদের খেয়াল-খুশিতেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ঘটে। তার পরে মানুষের বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই বহুদেববাদ একেশ্বরবাদে পর্যবসিত হয়। মানুষ বিশ্বাস করে একটি দেবতার অবিচ্ছিন্ন মহিমায়, তাঁর অপ্রতিহত প্রভুত্বে। এই দেবতা হলেন মানুষের পরিণত বুদ্ধির আবিষ্কার।

তার পরে এল দর্শন-অবস্থা। দেবতারা ছুটি নিলেন। মানুষ কল্পনা করল একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তার। কঁত একে বলেছেন 'Force' বা 'Power' আবার কখন এই ঐশী শক্তিকে 'Nature' বা 'প্রকৃতি' বলা হয়েছে। এই প্রকৃতি কতকগুলো নির্দিষ্ট আইন মেনে বাঁধা পথে চলে। কোন খেয়াল-খুশির অবকাশ নেই প্রকৃতির রুটিনবাঁধা জীবনে। মহাদার্শনিক আরিস্টটল যাকে 'Vegetative Soul' আখ্যা দিয়েছেন তা হ'ল কঁতের এই দর্শন-অবস্থার শক্তিটুকু। সর্বশেষে প্রত্যক্ষধর্মী বা পজিটিভ স্তর এল। কোন ব্যক্তি অথবা নৈর্ব্যক্তিক শক্তির কল্পনা এখানে নেই। এই 'পজিটিভ' অবস্থায় বিজ্ঞান বিশ্বাস করে অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির নিয়মের অস্তিত্বে। এ আইনগুলো নির্ভর করে সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। এখানে কল্পনার কোন স্থান নেই। তবে কঁত এ কথা স্বীকার করেছেন যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মৌলিক কানুনগুলোর ব্যাখ্যা করতে হলে যেন-তেন প্রকরেণ মানুষের অভিজ্ঞতাকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এইভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। এই স্তরত্রয়ীর মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান।

আবার মানুষের মনোবিবর্তনও ঘটছে এই পথেই। মানুষের মন পরিণতি লাভ করেছে এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রথম সে শক্তিশালী দৈব ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে তার অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে, তারপর নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে আশ্রয় ক'রে তার অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে, তারপর প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়ম তাকে আশ্রয় করে জীবনকে ও জগতকে বুঝতে চেষ্টা করে। কঁত বলেছেন, বিজ্ঞানবিবর্তন ও মানুষের মনোবিবর্তন একই ধারাকে, একই রীতিকে আশ্রয় করে। কোন্ বিজ্ঞান কোন্ স্তরকে আশ্রয় করে আছে এ সম্বন্ধে কঁতের মত খুবই সুস্পষ্ট। এই মানদণ্ডের সাহায্যে কঁত বিজ্ঞানগুলোর শ্রেণী-বিভাগ করেছেন—যেগুলোকে তিনি 'বিজ্ঞান' বলেছেন। কঁতের মতে এই ধরনের ছয়টি বিজ্ঞান আছে এবং তিনি তাদের এইভাবে সাজিয়েছেন—(১) গণিতশাস্ত্র, (২) জ্যোতির্বিদ্যা, (৩) পদার্থবিদ্যা,

(৪) রসায়ণশাস্ত্র, (৫) শারীরতত্ত্ব, (৬) সমাজ-বিজ্ঞান। এই শ্রেণীবিভাগে জটিলতর বিজ্ঞানগুলোকে পিছন দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম স্থান পেয়েছে গণিতশাস্ত্র। কঁতের মতে এই শাস্ত্রটিই হল সরলতম এবং অন্যান্য বিজ্ঞানকে এটির সাহায্য নিতে হয়। এইভাবে ঐ শ্রেণীবিভাগে যে বিজ্ঞানটি যত বেশী মৌলিক (Fundamental) এবং সরল সে বিজ্ঞানটি ততো আগে স্থান পেয়েছে। কঁত মনস্তত্ত্বকে এই শ্রেণীতে স্থান দেননি। তিনি মনস্তত্ত্বকে শারীরতত্ত্বের অংশ হিসেবে দেখেছেন। তাই তার জন্য পৃথক আসনের বন্দোবস্ত হয় নি। নীতিশাস্ত্রকেও এই শ্রেণীবিভাগ থেকে কঁত প্রথম বাদ দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁর "Positive Polity" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি সপ্তম বিজ্ঞান হিসেবে নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

এখন কঁতের সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। কঁতের সমাজ-বিজ্ঞানের দুটো অংশ—Statics এবং Dynamics—স্থাবর এবং জঙ্গম ভাগ। স্থাবর অংশে আমরা সমাজের স্থিতির কথা শুনি। সমাজ-শৃঙ্খলা কেমন ক'রে রাখতে হবে, কেমন ক'রে সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও সবল করে তুলতে হবে, তাকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এসব তত্ত্ব আমরা শিখি এই অংশে। মানুষের ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি ও শিল্পনীতিকে একটা সমন্বয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। মানুষের মননধারার এই বিভিন্ন প্রকাশকে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এদের যে কোন একটিতে বিপ্লব ঘটলে অন্যটিতে তার ঢেউ এসে লাগে। এ কথা ইতিহাস বারে বারে বলেছে। যে কোন্ একটি বিভাগে ভারসাম্যের অভাব ঘটলে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের সমস্ত কর্মের যাচাই হবে সমষ্টির কল্যাণের কষ্টিপাথরে। প্রত্যক্ষবাদ এই অনুশাসন জানাল যে, প্রত্যেকটি মানুষকে অপরের কল্যাণের জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে। এ কথা আমাদের সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

'জঙ্গম' অংশে সমাজের বিবর্তনকে, প্রগতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজকে একটি সুমহান বৃহৎ ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং এই

'সমাজ-ব্যক্তি'র অগ্রগতি তখনই সম্ভব হয়েছে যখন মানুষের পশুভাব দেবভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তখনই সমাজ এগিয়েছে যখন মানুষের কাছে পশু-জীবন-রীতির মূল্য গেছে কমে, যখন মানুষ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে। এই অগ্রগতিকে সম্ভব করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি। মানুষের মহৎ প্রচেষ্টার আনুকূল্যে মানুষেরই কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং এই মহান প্রয়াসের সঙ্গে মানুষের শুভবুদ্ধির যোগ হ'ল অবিচ্ছেদ্য। এই 'ইনটেলেক্ট' মানুষকে শুভের পথে অগ্রসর হ'তে সহায়তা করেছে। কেবলমাত্র ভাবাবেগ কখনই কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। তার সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত হওয়া দরকার। ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে কঁত এই বুদ্ধি ও হৃদয়াবেগের সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু সংযোগকে মানুষের কল্যাণের অগ্রদূত হিসেবে দেখেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলও বুদ্ধি এবং হৃদয়াবেগের এই মিলনের প্রশস্তি গেয়েছেন। তিনি তাঁর "Auguste Comte and Positivism" শীর্ষক গ্রন্থে ভাব (idea) এবং হৃদয়াবেগকে (feeling) তরণীর কর্ণধার ও বাষ্পাবেগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কর্ণধার যেমন ক'রে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রপথে তরীকে চালনা করে ঠিক তেমনি ক'রে মানুষের বুদ্ধি মানুষের জীবন-তরণীকে নিরাপদে সমস্যাসংকুল সংসার-সমুদ্রে পরিচালনা করে। হৃদয়বৃত্তি যেন বাষ্পাবেগ। গতি আসে সেখান থেকে। সে গতি অন্ধ। তাকে চক্ষুষ্মান করে বুদ্ধি। তাই কঁত তাঁর সমাজ-দর্শনে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু সংযোগকে সমাজ-কল্যাণের ও ব্যক্তি-কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্যরূপে গণ্য করেছেন। কঁতের এ তত্ত্ব পরবর্তী যুগের অনেক দার্শনিকই অভ্রান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এখানেও বোধ হয় মতভেদের অবকাশ রয়ে গেল।

রবীন্দ্র-দর্শন : কবির মৌল প্রত্যয়

বহুবিচিত্র সৃষ্টির অন্তরালে কখনো দার্শনিক দেখেন এক মনোময় ঐশী শক্তির অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা। যেমন একই মহাচৈতন্যে চৈতন্যময় হল বহুব্যাপ্ত সৃষ্টি, ঠিক তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে দীপান্বিত করেছে একটি দেউটির আলো। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ববোধ' আলোকিত করেছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে। সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়, তাঁর জীবনে ও তাঁর দর্শনে। এই মূল ভাবটিকে অনুসরণ ক'রে আমরা রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনকে অনুধাবন করতে পারি। সর্বমানবের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি, জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিগূঢ় আত্মীয়তা, জাতি ও সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ, এ সবই তাঁর মূল ভাবনার দ্বারা ভাবিত। এই চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা তাঁর সমস্ত ভাবনা ও বেদনাকে আচ্ছন্ন করেছিল, এ কথা বললে সত্য কথাই বলা হবে। উপনিষদের ঋষিদের মত রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহাচৈতন্যকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করার সাধনা, আপনাকে ব্যাপ্তচৈতন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার ভাষা। তাঁর নিজের কথাতেই বলি :

"এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ ক'রে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ—কাল্পনিকতা নয়।" (শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৪৩)

ভারতবর্ষে এই বিশ্ববোধের স্ফুরণ আগেকার দিনে এতই সহজ ছিল যে, সেদিনের মানুষকে এই বোধে নূতন ক'রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য হয়ত কোন ঋষি-কবির প্রয়োজন হয় নি। কালক্রমে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায়

আমরা এই বোধটিকে হারিয়ে ফেলি। জীবনের খণ্ডিত আকাশের ধ্রুবতারাটি হারিয়ে গেল আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টির অন্তরালে। ক্ষতি, টানাটানির গ্লানিকর আবহাওয়ায় ভারতবাসী সেদিন সুস্থ মনের সহজ সম্পদকে হারিয়ে ফেলেছিল, তাই কবিগুরু আমাদের বিভ্রান্ত দৃষ্টিকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদের দিকে —যে সম্পদ প্রাচীনকালে বিশ্বসৃষ্টির মূল তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সহজেই আয়ত্ত করতে আমাদের সহায়তা করেছিল। এই বিশ্ববোধটিকে একান্তভাবে আপনার করে নেওয়ার ফলে কবির জীবন-বেদ বহু-বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

তিনি তাঁর শ্রীনিকেতনে কথিত এক ভাষণে বললেন: "বেদে অনন্তস্বরূপকে বলেছেন, 'আবিঃ' প্রকাশস্বরূপ। তাঁর প্রকাশ আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ। তাঁর কাছে মানুষের প্রার্থনা এই যে, 'আবিরাবীর্য এধি' —'হে আবি, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক'। অর্থাৎ আমার আত্মায় অনন্তস্বরূপের প্রকাশ হোক্। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে আমার অভিব্যক্তি অনন্তের পরিচয় দেবে, এতেই আমার সার্থকতা। আমাদের চিত্তবৃত্তি থেকে, ইচ্ছাশক্তি থেকে, কর্মোদ্যম থেকে অপূর্ণতার আবরণ ক্রমে ক্রমে মোচন ক'রে অনন্তের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্য প্রমাণ করতে থাকব এই হচ্ছে মানুষের ধর্মসাধনা।" এই ধর্মসাধনাটুকু কবি নিজের জীবনে সত্য করবার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন একনিষ্ঠ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। তাঁর জীবনচর্যা তাঁর জীবন-দর্শনকে এমন একটি সত্যমূল্য দিল যা সচরাচর দুর্লভ।

কবির ব্যক্তিসত্তা ব্যাপ্ত হয়েছে শুধু বর্তমানে নয়, অনাদি অতীতে এবং অনন্ত ভবিষ্যতে। কবি আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেন আদিগন্তবিস্তৃত বসুন্ধরার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। কবির মনে হয়—ঐ মূক মাটির মৃন্ময় দেউলদ্বার খুলে তিনি যেন পৃথিবীর পথে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ঐ মাটি, তৃণ, জল সবাই যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। নিখিল-বিশ্বের যে যেখানে আছে, কবি তাদের সবারই আপনার জন। কবি-মানসের যে আমি, সে আমি স্থান কাল বা ব্যক্তিস্বার্থের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, সে আমি সর্ব আমি-তে পরিব্যাপ্ত। সে একাত্মতা উপলব্ধির

মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বার্থের ফাঁকি নেই। সে অসীম আমি একদিকে যেমন কালজয়ী, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিসঙ্কীর্ণতার কূপমণ্ডুকতাকেও সে অতিক্রম করেছে। সে আমির ধারা বয়ে এসেছে অতীত থেকে বর্তমানে, বহমানতার নূপুর-নিক্কনে ঐতিহ্যকে বহন করে। আবার সেই আমির ধারাই বর্তমান থেকে চলে গেছে ভবিষ্যতের দিকে। সেই আদি অন্তহীন আমি-প্রবাহের একটি খণ্ড হল কবিসত্তা। এ কথা কবি জেনেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন এই মহাসত্যকে সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই কবি সে অসীম আমির সুর শুনেছেন, গান শুনেছেন নিজের গাওয়া গানে, নিজের রচিত সঙ্গীতে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি—

যে আমি রয়েছে তোমার আমায়
সে আমি আমারই আমি,
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি
বেজে ওঠে মোর গানে।

(সেঁজুতি, পৃঃ ১৪)

কবি-মানসের এই যে অহংবোধ, এ বোধ তাঁর বিশ্ববোধ থেকে সঞ্জাত। তাই দেখি কবিচিত্তের আঁমি, সে আমি ছড়িয়ে আছে দেশে দেশান্তরে এবং যুগে যুগান্তরে। এ আমির অভিসার চলেছে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এবং এ অভিসার চলবে প্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। নানা ঘাটে তার আনাগোনা, অসংখ্য ঘটে ভরা রয়েছে তার প্রসাদ। তার আত্মীয়তার শিকড় চলে গিয়েছে অনন্ত সৃষ্টির অণুতে-পরমাণুতে। একালের বোদ্ধা সমালোচক রবীন্দ্র-মানসে এই বিশ্ববোধের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন—

"এই যে দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত অখণ্ড যোগ রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের 'আমি-সত্তার' ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই আমির

জীবনেতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে—সেই সুদূর অতীতের অন্ধকারের ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার অগ্রসরণের কাহিনী।"*

অহংবোধের এই সর্বব্যাপী বিস্তার রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের মূলীভূত ধারণা এবং তাঁর কর্মাদর্শের প্রেরণা। যে মানুষ এক মহাচৈতন্যময় বিশ্ববোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাঁর পক্ষে কোন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিসত্তার মোহে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর চেতনা বিশ্বের চেতনার সঙ্গে মালাবদল করেছে, একাত্ম হয়েছে। তাঁর আমির পথপরিক্রমা সুরু হয়েছে অনাদিকাল থেকে এবং তা' চলেছে অনন্তকালের দিকে। কোন বিচারই কবির কাছে স্বতন্ত্র, সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-মানসের বিচার নয়। কবির অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে—সেখানে কবি সকল মানুষের প্রতিনিধি, সসাগরা পৃথিবীর মানব-সন্তানেরা মহাকবির আত্মার আত্মীয়। দেশ-কালের সীমায় কবি আপনাকে সীমায়িত করেন নি। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন যে, দেশ-কালের বেড়া তাঁর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুদ্র করে রাখে নি। কবি-মানসের সে আমির ব্যাপ্তি ঘটেছে সকল কালের সীমানা পেরিয়ে। যেখানে স্বার্থের কলহ বৃহত্তর স্বার্থকে খর্ব করেছে সেখানে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এটা সত্য হয়েছে শুধু তাঁর ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর জাতি-স্বার্থের ব্যাপারেও।

সেদিনের মানুষ কবিকে ভাববিলাসী বলেছে; কোন কোন সমালোচক তাঁকে 'Escapist' বা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলেছেন, কবি তার প্রতিবাদ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মনের বিস্তৃত প্রান্তরে যে পলিমাটি জমা হয়ে উঠেছিল উপনিষদের পুণ্যতোয়া রসের প্রবাহে, সে খবর অনেকেই হয়ত রাখেন নি। তাঁরা বাইরেটাকে বিচার করেছেন, গভীরে যাবার প্রয়াস পান নি। যে মানুষ সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখে, যে মানুষ অতীতে এবং ভবিষ্যতে আপনাকে প্রসারিত করে দেয়, তার পক্ষে নিছক জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে নিজের ভাবকল্পনাকে সীমাবদ্ধ রাখা কতখানি সম্ভব তা' সহজেই বুঝতে পারা যায়। রবীন্দ্র-মানসের আমি-সত্তা, সে ত' কবির ব্যক্তিসীমায় বন্দী নয়—

* শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত 'ত্রয়ী' পৃষ্ঠা ১৭৮ দ্রষ্টব্য

সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।

* * *

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।

(আমি, পরিশেষ)

রবীন্দ্র-দর্শনের এই আমি-তত্ত্বের সম্যক্ অনুধাবন তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সংবেদনশীল মন নিয়ে তাঁর বিশ্ববোধের ধারণাটিকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস পাব। যে চৈতন্যময় প্রেরণা আপনাকে প্রকাশিত করেছে তৃণে, গুল্মে, পুষ্পে, পল্লবে, তারই প্রকাশ হল ব্যক্তি-সত্তায়। তাই ত' কবিগুরুর জীবনে ও দর্শনে, দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে বাজছে একটি একতারার সুর।

এই চৈতন্যময় প্রাণপ্রৈতির স্ফুরণ হয়েছে পুষ্পে, পল্লবে, তৃণে, শাদ্বলে, এ কথা আমরা বলেছি। অনন্ত প্রাণলীলা-প্রবাহে একদা প্রাণের উৎসার হয়েছিল বৃক্ষকে আশ্রয় ক'রে—উদ্ভিদ্‌জগতে সে প্রাণের নয়নাভিরাম প্রকাশ। কবির প্রাণের ভাষা ও গাছের ইশারায় বাণী বিনিময় চলে। কবি তাদের অন্তরের ভাষা বোঝেন। তারা যে একই প্রাণপ্রৈতির বিভিন্ন রূপভঙ্গী। তাদের মর্মরধ্বনি কবির কাছে হারিয়ে যাওয়া সুরের স্মারণিক। ঘুঘু-ডাকা মধ্যাহ্নে কবি কান পেতে শোনেন পল্লবদলের কলকাকলি, কবি পত্র-মর্মরের প্রাণের সুরটি ধরে দেন তাঁর গানের ভাষায়। তাঁর কথাতেই বলি—

"আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা। তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সে-ও

ওই গাছের ভাষা, তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ-যুগান্তর গুণগুনিয়ে ওঠে।"*

গাছের ভাষায় কবি শোনেন যুগান্তরের কথা। কোন স্মরণাতীতকালে প্রাণের প্রকাশ একদা হয়েছিল লতায়, বৃক্ষে, পুষ্পে, পত্রে এবং সে প্রকাশের মধ্যেও যেন কবি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন মানুষ ছিল না। সেদিনের পত্র-মর্মরে কালান্তরের সঙ্গীত যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। গাছের ইঙ্গিতময় ভাষায় আর কবির ছন্দোময় বাণীতে যেন কোথাও একটা প্রাণের যোগ রয়ে গেছে। তাই কবি গাছের ভাষা বোঝেন। প্রকৃতির সঙ্গে কবিপ্রাণের এই মরমী যোগাযোগটি আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব যদি আমরা রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথাটি মনে রাখি যে, মানুষের মনে আর অরণ্যানিকেতনে একই প্রাণের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবসত্তাকে প্রকৃতি-সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্কটি আরো অনেক কবি-মনীষীই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা শুধু ছন্দোগুরুই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদেরও দেখেছি। শুধু ওয়ার্ডস্বার্থ কেন, ভুরি ভুরি ন্যায়বিশারদ দার্শনিক রয়েছেন এই দলে। প্রসঙ্গতঃ হেগেলের উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও হেগেল একই দৃষ্টিতে মানব ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধটিকে দেখেছিলেন। তাঁদের চোখে মানুষ ও প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু এরা পরস্পরের পরিপূরক। কবি মৃত্যুকে দেখেছেন নবীন প্রাণের উৎসরূপে, জীবনের জননীরূপে। কবিদৃষ্টি আবিষ্কার করেছে বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রকে আর হেগেল দেখেছেন একটি 'Concrete moving unity' বা বস্তুগত সঞ্চরমান ঐক্যের অস্তিত্ব। হেগেলের মতে—

"Life is death. And nature is man. Here, too, underneath the surface diversity as apprehended by our fragile senses, there is a profound and moving unity. Nothing external to man is really different from man. The world

* 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

around us is our other self. We see a tree···Its existence is part of us. Our existence is not of it. *

হেগেলীয় দর্শনের এই সর্বব্যাপী ঐক্যের ধারণা রবীন্দ্র-দর্শনের বিশ্ব-বোধের ধারণার অনুরূপ। হেগেল বলেছেন, গাছের অস্তিত্ব এবং মানুষের অস্তিত্ব নিবিড় অরণ্যাণীর সম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং এককে পূর্ণভাবে বুঝতে হ'লে অন্যটির সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সৃষ্টির কেউই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ও হেগেলে সাদৃশ্য আছে।

যে অনন্ত প্রাণের ধারা আপনাকে প্রকাশ করেছে প্রকৃতির শস্প-সম্পদে, মানবের আশায় ও ভাষায়, সেই প্রাণই আবার প্রকাশ পেয়েছে জীবজগতে, পশুপাখীর মধ্যে। তাই কবি পশুপাখী, জীবজন্তুর সঙ্গে আত্মীয়তার হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রটি খুঁজে পাবার জন্য দুরূহ প্রয়াস পেয়েছেন। এরা যেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত। কবি নিজের মধ্যে যে প্রাণোন্মাদনা অনুভব করেন, তাঁর আশেপাশের জীবজগতে সেই একই প্রাণের লীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁর কাছে পশুপাখীরও একটা বিশেষ মূল্য আছে, তাদের বেঁচে থাকার অর্থ কবির কাছে অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। তারা সবাই একই প্রাণপ্রৈতির বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারা মানুষকে প্রাণময় করেছে, তাই-ই আবার মনুষ্যেতর ভুবনেও প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। পশু-পাখীরাও প্রাণের মূল্যে বিকোয়। তাই কবি তাঁর পোষা ময়ূরটির কথা ছন্দোময় ভাষায় লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সরস কাহিনী। ময়ূর কবিকে ভয় করে নি, অসঙ্কোচে কবির কাছে এসেছে, এটা কবির জীবনে একটা মস্তবড় ঘটনা। এ তাঁর গর্বের কথা, জয়ের ইতিহাস। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সেই আদিম মধুর সম্বন্ধটিকে ফিরে পেয়ে কবি পুলকিত হয়েছেন, সে পুলকের মধুটুকু কাব্যের পত্রপুটে ভরে রেখে গেছেন সহৃদয় পাঠকের জন্য। তিনি যে নিত্য পুরস্কার পেয়েছেন এই বিহঙ্গের কাছ থেকে, সে কথা সানন্দে ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়—

* Living Biographies of Great Philosopher—H. Thomas and D. L. Thomas.

সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও
এই মোর নিত্য পুরস্কার। (বনবাণী, পৃঃ ৩৫)

ময়ূরের সখ্যে কবির নিত্য পুরস্কার পাওয়াকে কবি-সুলভ অত্যুক্তি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এর সমর্থন তাঁর অনেক প্রবন্ধেও পাঠক খুঁজে পাবেন। কবি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষ এবং পশুপাখীর মধ্যে এমন একটা নিবিড় আত্মিক সম্বন্ধ রয়েছে যে তাকে অস্বীকার করলে জীবনের এবং দর্শনের অনেক কিছুকেই হারাতে হয়, কাব্যের মূল্যহানি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' কাব্যের কথা বলেছেন। সেখানে আমরা জীবজন্তুর সঙ্গে আদিম মানব-দম্পতির কোন আত্মিক সম্পর্ক খুঁজে পাই না। মহাকবি মিল্টন এই ধরনের বিশ্ববোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি। অথচ এই সহজ সম্বন্ধটিকে স্বীকার না করার ফলে, রবীন্দ্রনাথের মতে, মিল্টনের কাব্যে রসাভাব ঘটেছে। তাঁর মতে জীবের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কটুকুকে স্বীকার করে না নিলে ঠিক তত্ত্বটিকে বোঝা যায় না; কাব্যের আত্যন্তিক মর্যাদার হানি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"মিল্টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে, অতি সহজেই সেই কাজে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। জীব-জন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে, তা-ও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোন সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে।" (শিক্ষা, পৃঃ ১১৮)

এ বাণীটির অভাব মিল্টনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরকে এক মহৎ প্রাণের দ্বারা সমাবৃত করে দেখেছিলেন। সর্বপ্রাণনা ও প্রাণপ্রেতির উৎস. যিনি, তিনি এই বিশ্বপ্রাণের অধীশ্বর। কবি তাঁরই প্রকাশ দেখেছেন এই ভুবনে এবং ভুবনান্তরে।

ঋতু পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে। সৃষ্টির প্রেরণা নূতন করে জাগে জীব-জগতে এই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে। বসন্ত-বোধন শুধু পুষ্পে-পল্লবেই হয় না, তার আগমনী-গান বেজে ওঠে মানুষের মনে। যে সুর বনবাণীকে মধুরতর করে, সেই সুরের মূর্ছনাই মানবের আশায় ও ভাষায় অনুরণিত হয়ে ওঠে। বৈশাখ আসে নবজীবনের উদ্বোধনের বার্তা নিয়ে। সে রুদ্র তাপসের পদপাত শুধু ত' প্রকৃতির শ্যাম শষ্পঘেরা মাটিতেই ঘটে না, তার চরণের ছোঁয়া লাগে মানুষের মনেও; নব অভ্যুদয়ের আগমনী-গান কবির হৃদয়তন্ত্রে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। কবি বৈশাখকে আবাহন করেন—

জাগো ফুলে ফলে তব তৃণদলে,
তাপস, লোচন মেলো হে,
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।
জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে জাগো সন্ধানে,
আশ্বাসহারা উদাস পরাণে
জাগাও উদার নৃত্য। (বনবাণী, পৃঃ ৫৯)

যে সুরটি বাজে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে তারই প্রতিধ্বনি শুনি মানব-মনের অঙ্গনে। প্রকৃতি ও মানবসত্তা যেন একই সুরে বাঁধা। এ দুয়ে মিলে এক বৃহত্তর সত্তাকে প্রকাশ করছে। তাই যখন প্রকৃতি ফলে-ফুলে ভরে ওঠে তার আকাশে-বাতাসে নবজীবনের বন্দনাগান ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তখন সৃষ্টির সেই আদিম চাঞ্চল্য এসে লাগে মানুষের মনে। মানব-মনের ভাব ও ভাবনা প্রকৃতির রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে। একই সুরের প্রাণময়তা শ্রাবণের ধারার মত ঝরে পড়ে ভিতরে এবং বাইরে। প্রকৃতির সঙ্গে কবি নিবিড় নিগূঢ় যোগসূত্রটি খুঁজে পান। মৃন্ময়ী

ধরণীর প্রেমে তিনি আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেন। তাঁর ভুবন ঐ পত্র-পুষ্পে ছাওয়া ধরণীর আনন্দনিকেতনে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। কবি মহৎ বিস্ময়ে আপনার সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির একাত্মতা অনুভব করেন। কবির সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির যোগটুকু নিত্যকালের। তার মধ্যেই কবির পরম আনন্দের দ্যোতনা। তিনি বললেন, এই বিশ্ব-রচনায় বিস্ময়করতা আছে, চারিদিকেই আছে অনির্বচনীয়তা, তার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে নি আমার মনে কোনো পৌরাণিক বিশ্বাস, কোনো বিশেষ পার্বনবিধি। আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হতে পেরেছে এই জগতের। বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হতে পারে না, সেই পূজার দীক্ষা বাইরে থেকে নয়, তার মন্ত্র নিজেই রচনা করে এসেছি। সেই আনন্দবোধটুকুই কবি-মনকে বারবার উদ্দীপিত করেছে নব নব সৃষ্টিতে। কবির কণ্ঠে সেই আনন্দের সংবাদ পাই যখন তিনি বলেন—

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে,
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে,
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো॥ (বনবাণী, পৃঃ ৫২)

কবি বোধ হয় জীবনকে ভালবেসে জগতকে ভালবাসেন নি। ধরণীর মোহে মুগ্ধ কবি জীবনকে ভালবেসেছেন। আগে ভালবেসেছেন পৃথিবীকে, পৃথিবীর মাটিকে, তার অনন্ত আকাশে ছড়ানো অন্তহীন আলোকে, জীবনকে ভালবেসেছেন তার পরে। দুটির স্বরূপ কবির কাছে অবারিত

হয়েছে ধীরে ধীরে। কবি সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, দুটি সত্তা মিশে এক হয়ে গেল এবং এই এককে প্রত্যক্ষ করা, তাকে উপলব্ধি করা মানুষের ধ্যান ও ধারণায়, এটাই হল আমাদের ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্রের উত্তরাধিকার তাঁর জীবনে ও দর্শনে সত্য হয়ে উঠেছিল এ কথা আমরা তাঁর বিভিন্ন লেখায় পড়েছি। পৃথিবী মধুময়, তাই জীবনও মধুময়। জীবনচর্যা অলীক নয়। সুন্দরী ধরণীর আনন্দনিকেতনেই তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সাধনা। তাঁর প্রতিবেশীর দল তাঁর চিত্তের প্রসাদ পেয়েছে। তারা যে তাঁর বড় প্রিয় ছিল। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন প্রাণভরে, দুটি হাত দিয়ে তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন অনন্ত আগ্রহে। দেবতার সন্তান, অমৃতের পুত্র মানুষ—কবি এই দেবতাত্মা মানব-সন্তানকে ভাল-বেসেছেন, আপনার করে নিয়েছেন মানুষকে তার শুভবুদ্ধির বিকার ঘটলেও। এদের দম্ভকে এবং মূঢ়তাকে সাময়িক বিচ্যুতি বলে তিনি উপেক্ষা করেছেন—ক্ষমা করেছেন এদের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ত্রুটিকে। তিনি দুঃখ পেয়েছেন সত্য, কিন্তু এ দুঃখ তাঁর চিত্তের বলিষ্ঠ আশাবাদকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি।

মানুষকে ভালবেসেই তিনি ভগবানকে ভালবেসেছেন। যখন কবির প্রেম শুধু তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবেই সীমাবদ্ধ, তখন তাকে আমরা কবির মানবতাবাদ আখ্যা দিতে পারি। আবার যখন সেই প্রেম মানবলোককে অতিক্রম করে, জীবাত্মাকে উত্তীর্ণ হয়ে পরমাত্মার দিকে প্রধাবিত হয় তখন আমরা কবির ভগবদ্‌ প্রেমকে আস্বাদন করি। এই ভগবদ্‌ প্রেম রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনকে সঞ্জীবনী রসধারায় সঞ্জীবিত করেছে। কবি বললেন—"আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে ত' তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ, যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। তার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে, যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে

সত্যভাবে গ্রহণ করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একককে পূজা করে।” এই সর্বগ্রাসী প্রেমধারণার মধ্যে কবির জীবন-দর্শন বিধৃত। এই প্রেমধারণার সম্যক্ উপলব্ধি ঘটলে তখনই আমরা বুঝতে পারি কেমন করে রবীন্দ্র-দর্শনে বিরোধী অবস্থার সমন্বয় কবি বার বার ঘটালেন। রূপ ও রস, শক্তি ও সৌন্দর্য, জীবন এবং মৃত্যু, সীমা এবং অসীম কবির জীবন এবং দর্শন-ধারণায় বারবার মিলিত হয়েছে, একাত্ম হয়েছে কবির এই পরম-প্রেমধারণাকে আশ্রয় ক'রে। এই মহৎ প্রেমধারণাই কবিকে সকল বিচ্ছেদ, সকল দুঃখের দিনে নির্বাধ শান্তি ও অসীম শক্তির অধিকার দান করেছে।

কবির বেদনার্ত হৃদয় অসহায় আর্তের জন্য কেঁদেছে অঝোর ধারে। তবু তো ছন্দোপতন ঘটে নি কখনও। কে যেন এই বেসুরকে ছাপিয়ে সুর এনে দিয়েছে কবির জীবনে। কবি কান পেতে শুনেছেন ঝঞ্ঝার উন্মত্ত তাণ্ডব লীলায় শান্তশিবের বাণী। শাসক ইংরেজের সীমাহীন অত্যাচারের পটভূমিকায় তিনি এণ্ডরুজ সাহেবকে তাদের সত্যিকার প্রতিনিধি বলে মেনে নিলেন। আর সমস্ত অত্যাচারের পুঞ্জীভূত রক্তময় ইতিহাসকে তিনি শ্বেত জাতির শুভবুদ্ধির সাময়িক বিকার বলে অস্বীকার করলেন, তাকে শাশ্বত সত্যের মর্যাদা দিলেন না। তিনি কখনও এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত পাশবিকতা রয়েছে। তাঁর চোখে এণ্ডরুজ, পিয়ার্সন হলেন শ্বেতজাতির প্রতিনিধি। যারা জালিয়ানাওয়ালাবাগকে লাল করে দিয়েছিল মানুষের বুকের রক্তে তারা কি কখনও মিল্টন, কীটস বা শেলীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতে পারে? সে জাতির ঐতিহ্যের মশাল বহন করেছিলেন এণ্ডরুজ সাহেব। তিনি এই জাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সে কথা কবি আমাদের শুনিয়েছেন: শ্বেতজাতির এই সন্ন্যাসীকল্প প্রতিনিধির অনুপম চরিত্রের স্বর্গীয় আলোকে তিনি দেখেছেন সমগ্র ইংরেজ জাতির ধ্যান ও ধারণাকে। তাই এঁদের শক্তিমান রুদ্র-দূতদেরও তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। মানুষের আত্যন্তিক শুভ প্রচেষ্টাকে তিনি কখনও সন্দেহের চোখে দেখেন নি। মানুষের যা-কিছু

ভাল, যা-কিছু শ্রেয়ঃ তাকেই তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন। মন্দ অধ্রুব এবং অসত্য—তাই তিনি বলেন—

এ দ্যুলোক মধুময়
মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী। (আরোগ্য, পৃ. ১)

এই মধুময় দ্যুলোকে, ভূলোকে, কবির অশ্রান্ত সঞ্চরণ। একটুকরো সবুজের মায়া, অনন্ত আকাশের মোহ, এরা কবিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। হাক্‌স্‌লির মত প্রকৃতির পাশবিক রূপবিকারগুলোকেও তিনি বড় করে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন প্রকৃতির চিন্ময় রূপটিকে। হাক্‌স্‌লি দেখলেন তার হিংস্র পাশবিকতা আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে দেখলেন শান্ত, শিব ও অদ্বৈতের প্রকাশ। "যাদৃশী ভাবনা যস্য"-রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁকে প্রকৃতির মনোময় রূপটিকে দেখিয়েছে আর হাক্‌স্‌লি দেখেছেন হিংস্র উন্মাদনায় মত্ত প্রকৃতির রুদ্র রূপকে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বের এই আনন্দময় রূপটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাতেই তিনি মুক্তির স্বাদ পান; বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে তিনি প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শোনেন। চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা সত্য হয়ে দেখা দেয় কবির জীবনে। যা ছিল তত্ত্ব কথা তা' মূর্ত হয়ে ওঠে ব্যক্তি-জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে। জীবন ও দর্শন সেখানে মিলে গেছে, মনন ও সাধনের আর পৃথক সত্তা নেই। এই সত্যটুকু আমরা এবার খুঁজে দেখব কবির একটি কবিতায়, একটি বিশেষ সৃষ্টিতে।

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কবির একটি কবিতা

আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে নবতম আলোচ্য বিষয় হ'ল Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবাদ। মানুষ তার হারানো সত্তাকে বারবার ফিরে চেয়েছে। সে ফিরে চেয়েছে তার পুরাতন পরিবেশকে। কবির কথায় বলি—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা।"

সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন ধারাটিকে স্বীকার করে নিয়ে কবি চেয়েছেন প্রাক্তনীকে ফিরে পেতে। আধুনিকা নবীনাকে, নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতির নব্য পরিবেশকে কবি প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতাকে, তার জীবন ধারাকে কবি ফিরে চাইলেন। সেই শান্ত তপোবন আশ্রিত নির্লোভ মনুষ্যত্বকে কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন আপনার অন্তরলোকে। এ এক ধরনের উন্নত কোটির চাওয়া, আপনার প্রাচীন পরিবেশকে তার সমাহিত জীবনবোধকে ফিরে পাওয়ার জন্য আকূতি। অন্যদিকে আবার দেখি কবি মানসে আর একটি সর্বব্যাপ্ত সুতীক্ষ্ণ আকূতি। তা কবির জড়জীবনের লক্ষ ঘাত প্রতিঘাত দিগ্ধ আহত অধ্যাত্ম সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার আকূতি। সেই অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যটুকু ফিরে পাওয়ার আকূতি; তার সম্যক্ ব্যাপ্তিটুকুকে অনুভব করার অভীপ্সা। হাজার হাজার বছরের ওপার থেকে শত সহস্র জন্মের দ্বীপ পার হয়ে গিয়ে সেই পুরাতনী প্রাথমিক একাত্মতা, সেই পরম সত্তার সঙ্গে ঐকান্তিক একাত্মতাটুকু ফিরে পাওয়ার জন্য কবি আকুল হয়ে উঠেছেন। কবির এই চাওয়ার ধ্বনি আধুনিক দর্শনে ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষ বুঝি চাইছে এই হাজার হাজার বছরের পুরনো অতীতকে আবার ফিরে পেতে তার অনাবিল সরল হৃদয়ের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে। এই Nostalgia এক ধরনের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের লেখায়

অনুরণিত। মানুষ ফিরে পেতে চাইছে তার পিছে ফেলে আসা অনাদি অতীতকে, তার হারিয়ে যাওয়া আদিম সত্তাটিকে। আধুনিক দর্শনে বিচ্ছিন্নতাবাদের নানান ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যূথবদ্ধ সামাজিকতা থেকে যখন একক জীবনের নিঃসঙ্গতার দ্বারদেশে উপনীত হতে চলেছে, তখনই সে গভীরভাবে অনুভব করেছে এই বিচ্ছিন্নতাকে। তাই Sartre প্রমুখ আধুনিক অস্তিবাদী দার্শনিকদের লেখায় আমরা এই বিচ্ছিন্নতা-বাদের মননশীল আলোচনা পাই।

রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্ম মৌলসত্তার কথা বলেছেন এবং যে সত্তার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিসত্তা অভিন্ন সেই সত্তাটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত; উপনিষদের 'ঈশাবাস্য' মন্ত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সর্বেশ্বরবাদ তত্ত্বকে গ্রহণ ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা যদি অভিন্ন হয় এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি সেই পরমাত্মারই প্রকাশ হয় তাহলে বলা চলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নামরূপান্তরসত্তা ও ব্যক্তিমানুষের অধ্যাত্মসত্তা অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে গ্রহণ ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে তার মানব-সত্তার বিচ্যুতিটুকুকে খুশিমনে কখনই স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি; তাই মিলনের আকুতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সেই হারানো যোগটুকু পুনরুদ্ধারের বাসনাটুকু হ'ল কবির জীবনদর্শনের মৌলতত্ত্ব। একে আমরা আধুনিক পরিভাষায় অধ্যাত্ম বিচ্ছিন্নতাবাদ বা Spiritual Alienation বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার আলোচনা করব। কবিতাটি হ'ল 'উৎসর্গ' কাব্য গ্রন্থের 'প্রবাসী' কবিতাটি, রচনাকাল ১৩০৭ সালের ৩রা ফাল্গুন। মৌল আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে আপন বিচ্যুতি, ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতা, ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-সত্তার সঙ্গে সেই হারানো নাড়ীর যোগটুকুর পুনঃস্থাপনার প্রয়াস, তজ্জনিত নিবিড় বেদনাবোধ—এ সবই এই কবিতাটির উপজীব্য। এই সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে অবশ্যই কবি মুক্ত হ'য়েছেন। তার ইঙ্গিতও আছে এই কবিতাটির মধ্যে, সুদূর বিপুল, সুদূর 'অশেষ', 'অধরা', কৌতুকময়ী—এঁরা সবাই কবির অশান্ত চিত্ততার ব্যাখ্যা-উৎস। এঁদের আহ্বান কবির সেই হাজার লক্ষ যোজন দূরের কোটি কোটি বৎসর পূর্বেকার বিস্মৃত অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই ত' কবির আজন্ম

চলা। তাই ত' কবির 'চরৈবেতি' মন্ত্রে স্বভাব দীক্ষা। সেই দূরকে অপগত করার তত্ত্ব. সেই অধরাকে, অশেষকে লাভ করার কথাও এই কবিতাটিতে পাই। এর মধ্যে আমরা প্রথমেই রবীন্দ্রমননের সেই আত্যন্তিক বিরহের গভীর আকুতিটুকু প্রত্যক্ষ করি। কবিতার প্রথম পংক্তিতে কবি বলছেন:

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,

এই গৃহ অন্বেষণের পর্ব রবীন্দ্রমানসে একধরনের Nostalgia, বা অতীত স্মরণের বিলাসের প্রবর্তনা করেছে। হাজার হাজার বছর পুর্বেকার সৃষ্টি সেই আদিম অতীতকে ফিরে পাওয়ার উদগ্র বাসনা কবিতাটিতে প্রত্যক্ষ করি। এক ধরনের E S.P. (Extra Sensory Perception) বা ইন্দ্রিয় অতীত প্রত্যক্ষণ কবিকে মনে করিয়ে দেয় যে, সব ঘরই তাঁর নিজস্ব, তাঁর আপন ঘর। জাতিস্মর মানুষেরা যেমন অতীতে বাসকরা কোন একটি বিশেষ ঘরকে আপন বলে চিনতে পারে, ঠিক তেমনিভাবেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল অণুতে পরমাণুতে আপন সুপ্রাচীন আত্মীয়তার সম্বন্ধটুকুর রেশ প্রত্যক্ষ করেন। তৃণে পুলকিত পৃথিবীর প্রতিটি তৃণখণ্ড, প্রতিটি ধূলিকণা, তাঁর যুগযুগান্তরের আপনজন। রাত্রির নীলাকাশের বিশাল পরিব্যাপ্তির ইশারা দূর-দূরান্তরের তারকা-মালার আলোক সংকেত, কবিকে এই নিগূঢ় আত্মীয়তার কথা বলে। অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমালা যে ভাষায় ভাব বিনিময় করে কবির একদিন সে ভাষা জানা ছিল; এ কথা কবির স্মরণে আসে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য অণু পরমাণুর সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যতার গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ। অথচ সেই গভীর সত্যটিকে কবি উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ক'রে যখন এই মৃন্ময়ী পৃথিবীর এককোণে তিনি বাসা বেঁধে তার আপন নীড়টুকু রচনা করতে প্রয়াসী হন, তখন কিন্তু তাঁর বাঁধা এই নতুন ঘর তাঁকে পূর্ণ করে তুলতে পারে না; তিনি স্বস্তি পান না। এই অস্বস্তির কারণ হ'ল তিনি তার চিরজনমের ভিটার সঙ্গে লুপ্ত সম্পর্কটুকু পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। এই নতুন ঘর তাঁর চিরন্তনী আবাসনের প্রতিকূলতা করে। সেই পূর্ব স্মৃতি, সেই প্রথম পুরুষের অনুভব আপনার আদিম সত্তার প্রত্যুষে—এ সবই ম্লান হ'য়ে যায় যখন কবি তাঁর এই জন্মের নীড়টুকুর বাস্তবতার মুখোমুখি হন। 'এইঘর'

'সেইঘর' ফিরে পাওয়ার প্রতিবন্ধক। তাই কবির মনে গভীর বেদনার উন্মেষ। কবি বলেছেন যে, যদি তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর আপন লুপ্ত সম্পর্কটুকু পুনরুদ্ধার করতে পারতেন তাহলে তার চিন্তার কোন কারণ থাকত না। তিনি যে সহজে তার 'অন্তবিহীন আপনাকে' বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে 'অসীম বাঁধনে' গ্রন্থিবদ্ধ করেছিলেন কোন এক অনাদি প্রত্যূষে। এই সত্যটুকু তাঁর চিত্তলোকে উদ্ঘাটিত হ'তো। তিনি তাও পারেন নি। এই কবিতাটির প্রথম পর্যায়ে সেই ব্যর্থতা, সেই আত্যন্তিক বিরহের তত্ত্বটুকু ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কবির এই অক্ষমতার জন্যই তার অসীম বেদনাবোধ। তিনি অনুভব করেছেন যে এই বিপুল বিশ্বের অসংখ্য ধূলিকণা তাঁকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করছে। তিনি অনুভব করেছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাটি, জল, আকাশ, বাতাস তাকে দুর্বার আত্মীয়তার আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে যারা পর, দার্শনিক পরিভাষায় 'অপর' (the other) তাদের আহ্বান অন্তরে অন্তরে কবি উপলব্ধি করেন, অথচ তিনি অনুভব করেন এই পুনর্মিলনটুকু তাঁর জীবনে সত্য হয়নি। তাই তার মননে অসীম বিরহ, সুগভীর বিরহবেদনার অনুভূতি।

কিন্তু এই বিচ্ছেদবেদনাকে, এই আত্যন্তিক বিরহবেদনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে জীবনে দুঃখবাদকে আশ্রয় করতে হয়। কবি তা করেন নি। তিনি পরম আশাবাদী, তিনি ঘোষণা করলেন, উদাত্তকণ্ঠে :

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়, আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

যে মানুষ প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁর কাছে বৌদ্ধদর্শনের, জৈনদর্শনের অহিংসাতত্ত্ব, উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ, এ সবই সত্য হয়ে ওঠে। সকল সৃষ্টির উপরেই সেই পূর্ণের প্রতিষ্ঠা ; তাই সবই পুণ্য, সবই মঙ্গলময়। তাই ত' ক্ষুদ্র কণার ও এই প্রেমের দর্শনে মূল্য রয়ে গেল। অণুও পরম মূল্যবান। অণুতে এই মূল্যের প্রতিষ্ঠা। এই মঙ্গলময়তার অনুভব সম্ভব হয় তখনই যখন এই অণুকে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখি। বিচ্ছিন্ন অণুতে তুচ্ছতার প্রকাশ ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গীভূত অণুতে মহত্তের বিকাশ। বিচ্ছিন্নতার অর্থ হ'ল যন্ত্রণা। অস্তিবাদী

দর্শনে একে Anguish আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ যন্ত্রণা পার্থিব পরিবেশগত। রবীন্দ্রনাথের পরম যন্ত্রণার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিরহ।

কবি বললেন, এই আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে প্রেম, তার এই প্রেমের সরণী বেয়েই আনন্দের ভাগীরথী ধারা বহমানা হবে; এক সুশৃংখল অবিচ্ছিন্ন ধারায় অবগাহন করে, মানুষ সত্যটিকে তার স্বরূপে দেখতে পাবে। কোন বস্তুকে তার অস্তিত্বের বহমানতা থেকে পৃথক করে বিচার করলে সে তার সত্যমূল্যটুকু হারিয়ে ফেলে। তাই বস্তুর সত্যকে একটা বিরাট সংলগ্নতার মধ্যে রেখে বিচার ক'রে তার সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে। এই বিচারকেই বোধহয় দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) বলেছেন, *'Viewing things subspecie aeternitatis.'* অর্থাৎ Spinoza-র মতে বস্তুর সত্যটিকে আবিষ্কার করতে হলে তাকে তার বৃহত্তর অস্তিত্বের সংহতরূপের মধ্যে দেখতে হবে। আর এই বিশাল বিশ্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুকে অবলোকন করলে বস্তুর পূর্ণরূপটুকু (হেগেলীয় মতে 'Perfect') প্রত্যক্ষ করা যায়। আমাদের দর্শন মতে এই অবস্থায় আমরা পূর্ণকে প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই ভারতীয় দর্শনমতের অনুসারী।

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
কহিছে একটি চির গৌরব
সে কথা না যদি শিখিলে।

বস্তুর এই পূর্ণতা হ'ল তার আদর্শ রূপ। এই পূর্ণতাকে দেখার দৃষ্টিই হ'ল দার্শনিকের দেখা। এ হ'ল ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'বিজ্ঞান' দৃষ্টি। আর তাঁর ভাষায় যে জ্ঞানের দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলমান। এই চলমানতা আবার সেই পূর্ণের দিকেই প্রধাবিত।

বস্তুর সচলতা হ'ল এই 'পূর্ণে'র জন্য নিরন্তর অভিসার। তাই যদি কেউ বস্তুকে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করেন তাহ'লে তাঁর চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অচলরূপেই প্রতিভাত হবে। কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড রূপদর্শনের ফলেই তার প্রবাস ঘুচে যাবে; এটি ছিল তার মৌল প্রত্যয়।

এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণিকার এই অচল পরিপূর্ণ-রূপটুকু কবির প্রত্যভিজ্ঞায় যেদিন ধরা পড়বে সেইদিনটি কবির পক্ষে স্মরণীয়। একবার সেই দুর্লভ অনুভূতি কবি-মানসে যখন সত্য হয়ে উঠবে তখনই তাঁর প্রবাসীত্ব চিরজন্মের মত অপগত হবে। এই ছিল কবির ধ্রুব বিশ্বাস। অবশেষে এই অঘটনটুকু ঘটল। কবিতার উপসংহারে আমরা সেই ইঙ্গিতই পাই; কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সহজ মিলনটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই তার প্রবাসীত্ব ঘুচে গেল; তিনি নিজেকে ধন্য মানলেন আর এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চিন্ময় স্বরূপকে উপলব্ধি করলেন। তুচ্ছ ধূলি, তৃণকণাও সেই পরমাত্মার প্রকাশ। কবির পরিবেশ সেই পরমাত্মার উপস্থিতিতে চৈতন্যময়। তাই তো তিনি সুদূর ব্রহ্মলোকে তাঁর মুক্তি কামনা করেন নি, তাঁর মুক্তি তার আপন অনুভবের মধ্যেই নিহিত। তিনি যখন অনুভব করলেন যে তাঁর স্বতন্ত্র কবি-সত্তা আর সেই আদিম অধ্যাত্ম সত্তা যেটি তাঁর চিরন্তনরূপ, তারা অভিন্ন। তাঁর পরিত্রাণ তাঁর 'সন্নিধি'র নাগালে। উপলব্ধির গভীরতায় বিশ্বাসের ধ্রুবত্বে তিনি তাঁর Absolute বা পরম সত্যটুকুকে লাভ করেছেন। মুক্তি বা ত্রাণ তাঁর করায়ত্ত হ'ল অনুভূতির অন্তহীন গভীরতার মধ্যে। পূর্ণ অধ্যাত্ম সত্তার (যেটি তাঁর আদিমতম সত্তা) সঙ্গে একাত্ম হওয়ার উদগ্র বাসনা অবশেষে পূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতির সীমাহীন অপার ঐশ্বর্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন; তারপরে তাকে উত্তীর্ণ হয়েছেন অনায়াসে। তাঁর বিচ্ছিন্নতার অনুভবের শেষ হয়েছে। তিনি আর অনুভব করেন না তাঁর সেই আদিম অধ্যাত্মসত্তা থেকে তাঁর বিচ্যুতি। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন:

যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে
আছে তারি পারে তারি পারাপারে বিপুল ভুবন তরণী
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী।

এই যে সন্নিধিবোধ এই বোধটুকুই ধর্মের শেষ সোপান। এর পরের অবস্থা হ'ল ব্রহ্মলীন হওয়া। সেই নির্বিকল্প অবস্থায় ধর্ম উত্তীর্ণ।

ব্যক্তিসত্তা ও ব্রহ্মসত্তার অন্বয় ঘটে এই অবস্থায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভবতারিণীর কোলে চ'ড়ে 'মা' ভবতারিণীকে ভোগের সন্দেশ খাওয়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তার স্বাদ গ্রহণ করেন, তখনই এই অবস্থায় উত্তরণ ঘটে। আলোচ্য কবিতাটির শেষ পংক্তিটিতে ('যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী') এই অবস্থার আভাসমাত্র আছে। এই অবস্থায় 'পূর্ণ' অধ্যাত্ম সত্তা বোধহয় পূর্ণতর হয়। হেগেলীয় Perfect Absolute-এর ধারণা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মূলবিচ্যুত ব্যক্তিসত্তা অপরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আনন্দ বেদনার আস্বাদনের মধ্য দিয়ে 'অপর' সেই মূলেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এটি পূর্ণতর হেগেলীয় ব্রহ্মের ধারণা। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' কবিতায় সেই পূর্ণতর ব্রহ্মের ইঙ্গিত করলেন কবিতাটির উপসংহারে। যে ব্রহ্মসত্তা-বিযুক্ত ব্যক্তি মানুষ তার আদিম সত্তাটিকে লক্ষ লক্ষ জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আবার ফিরে পায়, ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে। সেই ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তিসত্তাই বুঝি হেগেলীয় More Perfect Absolute-এর নামান্তর।

দ্বিতীয় স্তবক : নীতিদর্শন

ভারতীয় নীতিদর্শন

দার্শনিক মূরের মূল্যধারণা : তাঁর শ্রেয়োবাদ

ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা

নৈতালিমের মর্মার্থ : নৈতিক

ভারতীয় নীতিদর্শন

এমন কথা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনে নাকি নীতি চিন্তার অভাব রয়েছে। আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শনে নীতি শাস্ত্রকে পৃথক শাস্ত্র রূপে আলোচনা করা হয় নি। নীতিশাস্ত্র বিভিন্ন দর্শন মতের মধ্যেই অনুসৃ্যত হয়ে রয়েছে। অবশ্য বেদান্তের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথেই আমরা মোক্ষলাভ করতে পারি। মোক্ষলাভে আমাদের কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানী তাঁর সংসারে কোন কর্তব্য থাকে না। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta তত্ত্বের অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ সামাজিক সেবার কর্তব্য থেকে মুক্ত নয়। অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনে জীবন্মুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীর পক্ষে যা কর্তব্য তারই ব্যাখ্যা পাই স্বামী বিবেকানন্দের Practical Vedanta দর্শন তত্ত্বে। আমাদের মূল ভারতীয় দর্শন মতে, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে যে, যাঁরা পরম জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁদের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হলেও চলে। বেদান্তে আমরা যে জ্ঞানের কথা বললাম, সেই জ্ঞানই বিদ্যা-অবিদ্যার প্রভেদটুকু আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিদ্যার দ্বারাই মুক্তি; অবিদ্যাই সমস্ত বন্ধনের কারণ। ঈশ উপনিষদে বলা হল যে, ব্রহ্মকে না জেনে যে মানুষ দেবতার পূজা করে, সে মানুষ গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অতএব ভারতীয় দর্শন মতে জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্ঞানকে মুক্তির উপায় বলে স্বীকার করলেও ভারতীয় চিন্তায় নৈতিক বিচার বিবেচনার অসদ্ভাব নেই। মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে বহু আলোচনা আমরা ভারতীয় দর্শনে পেয়েছি। বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে মানুষের বিশুদ্ধ আচার আচরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাকে সেখানে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ জ্ঞান-মার্গকে প্রাধান্য দিলেও একথা

বলেছে যে, বিশুদ্ধ জীবনচর্যা ব্যতীত সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযম ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনকে সত্য জ্ঞান লাভের সোপান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যোগ দর্শনেও যম এবং নিয়মকে আত্ম-সংযমের উপায় হিসেবে দেখা হয়েছে। যম বা আত্মসংযমের পথগুলি হ'ল, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। নিয়ম হ'ল, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। অতএব, একথা আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে নৈতিক শুচিতার বিধান দেওয়া হয়েছে; তারপর তাকে আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য দেশের নীতি দর্শনে। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে:

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সকল নৈতিক কর্মের ঊর্ধ্বে। অহং বুদ্ধির কাছে ক্ষুদ্রতার নাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারও অনুপস্থিত। অতএব তিনি তো দেহ হৃদিস্থিত হৃষিকেশকে তাঁর সকল কর্মের নিয়ন্তা রূপে প্রত্যক্ষ করবেন। সুতরাং দেহের কাছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় এই ধরনের বিচার অবান্তর এবং অতিরিক্ত। ভগবানের ইচ্ছাই যদি মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় তাহলে মানুষের সকল কর্মই মঙ্গলের বিধায়ক। তাইতো কবি প্রার্থনা করেন, 'তোমারই ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে'; দার্শনিক বলেন: 'What is real is rational and what is rational is real'। অতএব বলা চলে যে, ভারতীয় দর্শনে নৈতিক চিন্তার অভাব আছে, এই অভিযোগ একান্তই অযৌক্তিক। আমাদের মতের সমর্থনে আমরা Maxmüller-এর উক্তি উদ্ধৃত করি: 'Dangerous as this principle seems to be, that whosoever knows Brahman cannot sin, it is hardly more dangerous, if properly understood, than the saying of Saint John, that whosoever is born of God, sinneth not.'* 'যদি বলা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পাপ করতে পারেন না,

* Six Systems of Indian Philosophy, p. 168

এ তত্ত্বটি নৈতিক জীবনধারার পরিবর্ধনের পক্ষে বিপজ্জনক, তা হ'লে সেণ্ট জন কথিত সেই প্রখ্যাত তত্ত্ব যে ঈশ্বর সৃষ্ট কোন ব্যক্তিই পাপ করতে পারেন না। নৈতিক জীবনের উজ্জীবনের পক্ষে এই উক্তি আরো বেশী মারাত্মক। অবশ্য সেণ্ট জন প্রচারিত তত্ত্বের নিহিতার্থটি যথাযথভাবে অনুধাবন করলে তবেই আমাদের উক্তিটির যাথার্থ্য অনুভূত হবে।'

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি
সে আমার নয়'

একথা ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে এযুগের মহাকবি বললেও ভারতবর্ষের চিন্তা বহু সহস্র বৎসর ধ'রে সন্ন্যাসের আদর্শকে লালন পালন করেছে। শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ জীবনের আদর্শ এই সন্ন্যাসের আদর্শকে আশ্রয় করে আছে। ব্রহ্মের চিন্তাই যদি একমাত্র সত্য হয় তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের রূপ, তুমি আমি এই বোধ, এসবই মিথ্যা হয়ে যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে জীবাত্মা ও পরামাত্মার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ক'রে আমরা ব্রহ্মের নিত্য সত্যতা এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনিত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। কর্মের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা, এরা সংসারের, বৈদান্তিক জ্ঞান রাজ্যের নয়। অতএব কর্মের পথে মুক্তির আশা করা মূঢ়তা। 'আমি সেই ব্রহ্ম', একথা বেদান্ত দর্শনে বারবার বলা হয়েছে। এর মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা আমাদের ধৃষ্টতা প্রত্যক্ষ ক'রে থাকলেও মোক্ষমুলর বলেছেন যে, মানুষের এবং ভগবানের মৌল একাত্মতাকে স্বীকার করা, কোন ধৃষ্টতার কথা নয়। শঙ্করের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গই আমাদের ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ; সেই মার্গে কর্ম ও ভক্তির স্থান নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এইটুকু হল শঙ্করাচার্যের বেদান্তের পারমার্থিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে ব্যবহারিক উপদেশ নেই। শঙ্করাচার্য বললেন যে জ্ঞান মার্গে বিচরণের যোগ হয়ে উঠতে হলে আত্ম সংযম অভ্যাস করতে হবে; নৈতিক জীবন যাপনের পথেই এই পরাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

এই নীতিসম্মত পথের আলোচনার অসদ্ভাব ভারতীয় দর্শনে নেই, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি; জীবনের সাংসারিক নীতি, ব্যবসায়গত

নীতি, সামাজিক নীতি এবং ধর্মীয় নীতি, এরা পৃথক নয়। জীবন এক এবং অবিভাজ্য। এই অবিভক্ত জীবনকে যে ধারণ করে থাকে তা-ই হ'ল ধর্ম। তাই ভারতীয় দর্শনে সদাচারের নির্ঘণ্ট না থাকলেও আমাদের আচরণে বিশুদ্ধতা সংযম, করুণা ও মৈত্রী প্রমুখ উচ্চ মানবিক আদর্শের কথা বলা হয়েছে।

শঙ্করের বেদান্ত জগতকে মায়া বা মিথ্যা বলে চিহ্নিত করলেও শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জগতকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং রামানুজপন্থীদের মতে কর্মোদ্যোগ শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়। ইন্দ্রিয়ের সংযম ক'রে বিশুদ্ধ সৎ জীবনযাপন করা, অপ্রমত্ত হ'য়ে অহং বোধের বিনাশ সাধন করা, সংসারে কর্তব্য পালন করা, এ সবই হ'ল মানুষের প্রথম কর্তব্য। ঈশ্বর সাধনকেও বিশুদ্ধ জীবনযাপনের উপায়-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা যে কাজ করি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে সেই কাজের জন্য আমাদের দায়িত্ব রয়েছে; মানুষের মুক্তির জন্য ভক্তি এবং ঐশ্বর প্রসাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বলা হয়েছে। মানুষ আপন কর্মফলের দ্বারাই বন্ধন সৃষ্টি করে এবং তার আচরণের দ্বারা সে তার বন্ধন ক্ষয়ও করে; এইভাবে পাপ ক্ষয় হয়। বিশুদ্ধ জীবন এবং ভক্তি ব্রহ্ম লাভের পথ, একথা রামানুজ বললেন; মানুষ দুঃখ ভোগ করে আপন দুষ্কৃতির ফল হিসেবে। কর্মফলের ভোগের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে মানুষ ঈশ্বরের কৃপা অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা লাভ করে এবং সেই কৃপালাভের পথেই তার ঈশ্বর-সান্নিধ্য ঘটে। তাহলে দেখা গেল, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হল তা রক্তমাংসে গড়া মানুষদের জন্যই। তাইতো রামানুজাচার্য কথিত কর্ম দর্শনে সাধারণ মানুষ তার নৈতিক জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পায়।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এবং বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যে অনেক প্রভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ যে Practical বেদান্তের কথা বললেন, সেই তত্ত্বে কর্মের স্থান আছে। জীবনে কর্তব্যকে অবহেলা করা চলে না। স্বামীজী বললেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষকে

নিস্পৃহ হয়ে সামাজিক কর্তব্য করতে হবে। পদ্মের পাতায় জল থাকলেও পদ্ম পত্রে যেমন তার কোন আভাস থাকে না অর্থাৎ জল যেমন পদ্ম পত্রকে সিক্ত ক'রে তুলতে পারে না তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ প্রকৃত সন্ন্যাসী ; সংসারের সকল কর্মে লিপ্ত হয়েও সেই কর্মফলের দ্বারা প্রভাবিত বা অভিভূত হয়ে পড়ে না। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আদর্শ স্বামীজী আমাদের দেখিয়েছেন। সিংহবিক্রমে বিপুল কর্মময় জীবনযাপন করার আদর্শ হল স্বামীজীর কর্মের আদর্শ। একেই আমরা স্বামীজীর কর্মযোগ বলতে পারি। সমাজের চোখে অদ্বৈতবাদের অর্থ, শুধুমাত্র শুষ্ক জ্ঞানচর্চা নয়। তিনি বললেন সংসারে বীরের মত আমাদের আপন আপন কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। তবে সেই কর্তব্য-কর্ম সমাধার মধ্যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। এই তত্ত্বই হল শঙ্করের বেদান্তে সেই সন্ন্যাসের আদর্শ, গীতার সেই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। অভীপ্সিত বস্তু লাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামই হল স্বামী বিবেকানন্দের নীতি দর্শনের মৌল প্রত্যয়। স্বামীজী যে সেবা মন্ত্র মানুষকে দিলেন, সেই সেবার মন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। 'সর্বজীবে দয়া'—এই তত্ত্বটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনঃপূত হয়নি। তিনি বললেন, জীব ত' শিব, অতএব শিবকে দয়া করা অসম্ভব। প্রকৃত নৈতিক তত্ত্ব হল, সর্বজীবে সেবা। এই নরনারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই স্বামীজী ভগবানকে লাভ করার পথ দেখিয়েছিলেন। যে নৈতিক সাম্যবাদ হিন্দুদর্শনের মুল উপজীব্য, সেই তত্ত্বটিকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দেব মধ্যে পাই। ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে অন্যান্য বর্ণের মানুষের কাছে পূজা এবং সম্মান দাবী করে। স্বামীজী বললেন যে, এর চেয়ে মিথ্যা এবং অনাচার আর কিছুই হতে পারে না। স্বামীজীর কথা উদ্ধৃত করে দিই : আত্মার নিরিখে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এই ধরনের মুল্যায়ন একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেখানে জীবসত্তা সেখানেই তার অন্তরে নিত্যকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকে অনন্তের সেই সেই বাণী ; সেই বাণীটি নেমে আসে বাঙ্ময় পরম সত্তার কাছ থেকে। 'In speaking of the soul, to say that one is superior to the other has

no meaning···For the infinite message is there imprinted once for all in the heart of every being wherever there is a being, that being contains the infinite message of the most High,* বিবেকানন্দের মতে জীবন শুষ্ক কঠোর নয়, জীবন প্রেমের আধার, জগৎ ব্রহ্মময়। মানুষের সেবায় সর্বশ্রেষ্ঠ আধার হল জননী জন্মভূমি। তাইতো স্বামীজী চাইলেন এই জন্মভূমির বুক থেকে সর্ববিধ অনগ্রসরতাকে দূর করতে। তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ, দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্যে, শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মধ্যে বিধৃত হয়ে রইল। তিনি তাঁর ধ্যানের জগৎকে কর্মের জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেশকে বড় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিলের হিতবাদকে (Utilitarianism) গ্রহণ করেন নি ; উপযোগবাদকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মানুষে মানুষে শত্রুতার অর্থ হয় না, কেননা, সকল মানুষই ত ব্রহ্মের প্রকাশ। অতএব, এই বিশ্বাস থেকে আমাদের নৈতিক আচরণের সম্পূর্ণতা সহজেই উদ্ভূত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডয়সনের Philosophy of the Upanishads গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই : বেদান্ত পাঠের সময় আমরা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই। বাইবেলে প্রতিবেশীকে আপনার মত করে ভালবাসবার যে অনুজ্ঞা জারী করা হয়েছে, সে অনুজ্ঞাটি নৈতিক আদর্শ হিসেবে যে অত্যুচ্চ, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই অনুজ্ঞাটি আমার পক্ষে কেন পালনীয় তার যুক্তিযুক্ত উত্তর বাইবেলে নেই। আমি ত' কেবল মাত্র আমার নিজের সুখদুঃখটুকু অনুভব করতে পারি, আমি ত' আমার প্রতিবেশীর সুখদুঃখ অনুভব করতে পারি না। তবে কেন বাইবেলের এই নির্দেশ ? বেদের 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রে এই প্রশ্নের জবাব নিহিত। এই মন্ত্রটিতে পরাতত্ত্ব ও নৈতিক আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে। The highest and the purest morality is the immediate consequence of the Vedanta. The Gospel fits quite correctly as the highest law of morality, 'love your neighbour as yourself.' But why should I do so, since by the order of

* পূর্ণতর বিবরণের জন্য Vedanta and Privilege, Vol. 1. পৃঃ ৪১৯—৪২৩ দ্রষ্টব্য।

the Nature, 'I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour! The answer is not in the Bible—but it is in the Vedas, in the great formula, 'That thou art.' 'Tvat Twamasi' which gives in three words, Metaphysics and Morals together.

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ঃ

'মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।

ঋগ্বেদের ঋষি বিস্ময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পানে তাকিয়ে দেখলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধুময়। তাঁরা জীবনকে মধুময় বলে জেনেছিলেন; বহুর মধ্যে এক বিশ্ব শক্তিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে দেখি, এবং জানি, তাঁরা সেইভাবেই দেবতাদের জেনেছিলেন। সেই বৈদিক যুগে জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড এই দ্বিবিধ অর্থে কর্ম প্রধান হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মচিন্তা এবং তত্ত্বচিন্তাই একমাত্র তৎকালীন মানুষের প্রধান কর্ম ছিল, এমন কথা ভাবলে ভুল ভাবা হবে। জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য মোটেই সে যুগের ধর্ম ছিল না। দীর্ঘ জীবন যাপন, স্বাস্থ্য সঞ্চয়, বিত্ত সঞ্চয়, বুদ্ধি বিবর্ধন ও শত্রু নিপাত প্রমুখ কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য বুঝি তাঁরা যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করতেন। বিচিত্র কর্মকাণ্ডে বৈদিক যুগের আবহাওয়া মুখর হয়ে উঠেছিল। বেদে ক্রমে তাই যাগযজ্ঞকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা ভাগ হল মন্ত্রের সমষ্টি বা মূল বেদ। ব্রাহ্মণ ভাগে রয়েছে এই মন্ত্র সমষ্টির ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। ব্রাহ্মণের তিনটি ভাগ ঃ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণের শেষভাগ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ হল উপনিষদ। উপনিষদ বেদের অন্তভাগ বলে এর নাম হয়েছে বেদান্ত। এই উপনিষদের যুগে কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উপনিষদ বললেন, জ্ঞানের দ্বারাই পাপ ছেদন করা যায় ও মুক্তি লাভ করা যায়। যজ্ঞের দ্বারা ভগবৎ লাভ সম্ভব নয়। আমরা উপনিষদে পরাবিদ্যা ও অপরা-

বিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করার চেষ্টা দেখি। পরাবিদ্যার উদ্দেশ্য হল, শ্রেয়বস্তুকে লাভ করা এবং অপরাবিদ্যার উদ্দেশ্য হল প্রেয়কে লাভ করা। পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রাজ্ঞজন এই পরাবিদ্যা লাভেই উৎসুক। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এদের অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। অপরপক্ষে যার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাই-ই হল পরাবিদ্যা। এই পরাবিদ্যায় যে যে সদ্ বস্তুর প্রকাশকে আমরা পাই তাকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় না। নেতিবাচক বর্ণনার আশ্রয়ে আমরা তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। কেনোপনিষদে বলা হল যে, সমস্ত দেবতা একই মূল উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। কঠোপনিষদে বলা হল যে, সেই এক ব্রহ্মই নানা রূপে বিশ্ব জগতে প্রকট। বেদ এবং উপনিষদ মানুষের মুক্তির জন্য বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ করলেও একটি বিষয়ে তারা একমত; সেটি হল এই যে সামাজিক কর্তব্য পালন ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনই সুখ শান্তি লাভের উপায়। এই সাংসারিক কর্তব্যের মূল হল গার্হস্থ্য; গৃহী হিসেবে চিত্তশুদ্ধি করতে হবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে এবং আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে জীবনের সুখ শান্তিকে আহরণ করতে হবে। গৃহস্থের জন্য যেসব কর্মের বিধান রয়েছে তা একদিকে যেমন গৃহস্থের সুখশান্তির অনুকূল, সাংসারিক ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি তা আবার সেবা, মৃদুতা, নম্রতা, ভীরুতা, ধীরতা, শক্তি, এবং শৌর্য, প্রমুখ সদ্‌গুণের উৎপাদক। এই পথে গৃহী মানুষ বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। সাংসারিক জীবন অর্থহীন নয়; পারলৌকিক কল্যাণের পরিপূরক হিসেবে সাংসারিক জীবনকে বিচার করতে হবে। একথা ভারতীয় দর্শনের কথা, বেদের কথা, উপনিষদের কথা। ভারতীয় চিন্তা নীতি-বিরুদ্ধ নয়। ভারতীয় চিন্তায় কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ এই দুটি পথের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দুটি ছাড়াও ভক্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য বেদে ভক্তি মার্গের প্রাধান্য নেই। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্তে ভক্তির স্থান নেই। কিন্তু শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমাধবাচার্য শঙ্করপন্থীদের এই বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গকে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষে অতি মাত্রায় প্রকট।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কাল এই ষোড়শ শতাব্দী। এই সময়েই ভক্তিবাদ প্রবল শক্তিতে দেশ জুড়ে প্লাবন ঘটিয়েছিল। ভক্তিমার্গের অন্যান্য পথিকদের মধ্যে নানক, কবীর, মীরাবাঈ, দাদু ও রামকৃষ্ণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। গীতায় বিভিন্ন দার্শনিক মতেরও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বেদবাদ, বৈদিক কর্ম মার্গ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য জ্ঞান, সমাধি, যোগ, অবতারবাদ ও ভক্তিমার্গ এইসব আপাত বিরোধী মতবাদের সমন্বয় শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় রয়েছে। সমগ্র উপনিষদের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান গীতার পত্রপুটে ধরা আছে এমন কথা বলা হয়েছে:

'সর্বোপনিষদো গাবোদোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।
পার্থোবৎস্যঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥'

অর্থাৎ উপনিষদের সার হল গীতা, যেমন বেদের সার হল উপনিষদ। মহাভারতের পরের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজে এমন কোন ধর্মমত বা দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যা গীতায় প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে আপনার শক্তি ও সামর্থ্যটুকু সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেনি। শঙ্করাচার্য, মাধবাচার্য প্রমুখ মনীষীরা গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন গীতা-ভাষ্য রচনা করেছেন এবং এযুগের মনীষী শ্রীঅরবিন্দ গীতাতে প্রত্যক্ষ করেছেন দিব্য জীবন সাধনার অভ্রান্ত পথ। মিল, বেন্থামের মার্জিত বহু সুখবাদের সূত্রটুকুতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন গীতার তত্ত্বকে; বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গীতা থেকেই দেশপ্রেমের প্রেরণা-টুকু সংগ্রহ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও এই গীতাতেই আপোষ-হীন সংগ্রামের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবে অহিংসা ও সর্বোদয় আদর্শের মিল কতটা তা এই শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ দর্শনের মূল শূণ্যবাদ এবং সন্ন্যাসবাদের সঙ্গে গীতার ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্মবাদের সমন্বয় সাধন ক'রে পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনের

মহাযানবাদের উদ্ভব হয়েছিল। এই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করা অর্থাৎ পরোক্ষে মানুষকে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপদেশ দেওয়া। তিনি অর্জুনকে বললেন,

'ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।'

শাশ্বত আত্মার মৃত্যু নেই। নশ্বর দেহের যে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু সংসাধন করেন স্বয়ং ভগবান। মানুষ নামে মাত্র কারণ বলে প্রতীয়মান হয়। আত্মা অবিনশ্বর, তাই দেহের বিকারের কথা চিন্তা ক'রে প্রাজ্ঞ মানুষের শোকাতুর হওয়া সাজে না। যাকে কর্তব্য বলে জানব তা সাধন করতেই হবে। বুদ্ধিদীপ্ত পথে মানুষকে আপন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। কর্ম বন্ধন আসে কলুষিত আকাঙ্ক্ষার পথে। মানুষ কোন কাজের কর্তা নয়। অহংবোধ আমাদের চোখে নিজেদের কর্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করে। নিয়ত কাজ করার কথা, গীতার উপদেশ। কাজ আমাদের করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে। সমস্ত ফল ভগবানে অর্পণ ক'রে গৃহীমানুষ আপন কর্তব্য সম্পাদন করবে; কর্মেই ব্যক্তি মানুষের অধিকার। ফলের দিকে তাকিয়ে কাজ না করাই হল গীতার উপদেশ। গীতা আমাদের কর্ম ত্যাগ করতে বলেনি। আমাদের নৈতিক জীবনের পরিপূরক সকল কর্তব্য কর্মই আমাদের করতে হবে। শুধু আমি 'কর্তা' এই বোধটুকু ত্যাগ ক'রে কর্তা বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে যদি আমরা আমাদের কাজ করতে পারি তবে সংসার বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ থাকব না; এই শিক্ষাই হল গীতার শিক্ষা। এই ধরনের নির্লিপ্ত কর্মযোগীকে গীতায় 'প্রাজ্ঞ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে, যিনি, মনোগত সমস্ত কামনা বিসর্জন দিয়ে তুষ্ট থাকেন, তাকেই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে জানবে। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, আবার সুখেও যার স্পৃহা নেই, এবং যিনি ভয় ও ক্রোধশূণ্য তাকে স্থিতধী বলা হয়ে থাকে। এই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' মানুষ হল

সকল নৈতিক প্রয়াসের শেষ লক্ষ্য স্থল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষকে দেখেই আমাদের সুখ দুঃখকে সমজ্ঞানে দেখতে হবে, সংযত হতে হবে, শান্ত হতে হবে এবং নির্ভয় হতে হবে। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষই সকল নৈতিক চেতনার আদর্শ। তার নিরুদ্বেগ শান্তি ও অসীম শক্তির মূলে রয়েছে ভগবানে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের পথে অহংবোধের বিলোপ ঘটে। বৈষ্ণব দর্শনের আধার চৈতন্য চরিতামৃতে ভগবানে সর্বকর্মের ফল সমর্পণ করাকে আত্মসমর্পণ বলা হয়েছে; একে শরণাগতি বলা হয়েছে। এই গরণাগতির ছয়টি লক্ষণ: 'ভগবানের প্রীতিজনক কার্যে সদা প্রবৃত্তি এবং তার প্রতিকূল কর্ম থেকে নিবৃত্তি'; ভগবান ভক্তকে রক্ষা করেন এই তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস; ভগবান ভক্তকে আচ্ছন্ন করে থাকেন বলে তাঁরই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তার কাছে দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ। এই ছয়টি হল শরণাগতির লক্ষণ।

অতএব গীতায় নিষ্কাম কর্মের আদর্শে বলা হল যে গৃহী মানুষকে তার কর্তব্য করতে হবে ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে; ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। আমরা সকলেই সেই ভগবানের ভৃত্য মাত্র। যিনি সত্য জ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এই ভাবেই গীতায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এইরূপ কর্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানব জীবন একটি মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে; সেই যজ্ঞের বেদী জাগতিক হিত, ত্যাগ এবং আত্মবলিদান। যজ্ঞেশ্বর হলেন স্বয়ং ভগবান। হিন্দু ধর্মে গৃহস্থের পক্ষে পাঁচটি যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য। গীতায় তাকে 'স্তেন' অর্থাৎ চোর বলে নিন্দা করা হয়েছে; যে গৃহী মানুষ পিতৃঋণ প্রমুখ পাঁচটি ঋণ শোধের কোন চেষ্টা করে না। হিন্দুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় গীতায় কথিত 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে। কর্তব্য কর্ম ক'রে আপন আপন সাংসারিক কল্যাণ সাধনের পথে মানুষ সকল কর্মের উদ্দেশ্যের মূল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কল্যাণে উপনীত হয়। Bradley কথিত Man and his Station তত্ত্বে যে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে তা গীতার উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যার অনুকূল। গীতা আমাদের বললেন যে, প্রত্যেককে কর্তব্যকর্মটুকু যথাসাধ্য সুন্দর করতে হ'বে; সেখানেই তার সফলতা এবং

এই কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে মানুষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। প্রত্যেক কর্তব্যই সমান মূল্যবান। গীতার এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শ কিন্তু মিল, বেন্থামে পাই না। গীতার প্রেয়োবাদীদের মার্জিত স্বার্থ বুদ্ধির কথা গীতায় নেই। কাণ্টের কর্তব্য কর্ম কঠোর ও নিরানন্দ কিন্তু গীতোক্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা হয় স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ; ফল ভগবানে সমর্পণ করা হয়। এই জ্ঞান থেকেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে ভগবানই যথার্থ কর্তা। অর্থাৎ গীতার কর্তব্যের প্রেরণা আসে আত্ম উপলব্ধি থেকে। অতএব গীতায় যে কর্তব্য সম্পাদনের কথা বলা হল, তা আত্ম উপলব্ধির পথ।

গীতায় প্রথমে জ্ঞান তারপর কর্ম ও সব শেষে ভক্তির কথা আছে এবং এই তিনটির সমন্বয় ঘটেছে ভগবত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞা মানুষকে আয়ত্ত করতে হয় অভ্যাস যোগের দ্বারা। এই কর্তব্য করার নির্দেশ আসে হৃদিস্থিত ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই হলেন গীতার হৃষিকেশ। অতএব এক অর্থে গীতার আদর্শকে Intuitive বলা যেতে পারে। স্বজ্ঞার পথেই গীতার এই প্রজ্ঞাকে লাভ করা যায়। গীতার আদর্শকে পরিপূর্ণতাবাদের আদর্শ বলা চলে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা ও নৈতিক চেতনার উত্তর সাধক রূপে গান্ধীজি ভগবানের সত্যতায় বিশ্বাস করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভগবানকে যিনি সেবা করেন তিনিই সত্য। সেই ভগবান ছাড়া তাঁর কোন উপাস্য নেই এবং সেই সত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি গান্ধীজির অনুরক্তি নেই ; তিনি যে এই সত্য ছাড়া অন্য কারও শাসন মানেন না একথাও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীজির কাছে ভগবানই সত্য এবং অহিংসা ও প্রেমের পথে এই ভগবানকে জানা যায়। তিনি সত্যাগ্রহী ছিলেন, তিনি বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শকে সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ভগবানই সমস্ত নীতি ও সদাচারের মূল। তাই জীবনে সদাচারী হলে ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবানই মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনিই সত্য এবং সত্যই হল ভগবান। তাই গান্ধীজি সজ্ঞানে কখনও মিথ্যাকে আশ্রয় করেন নি। গান্ধীজি বললেন যে, প্রেমের পথেই সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়া যায়। অহিংসা অর্থে যে প্রেমকে গান্ধীজি বুঝেছিলেন সেই মহত্তম প্রেমের পূজারী

রূপে গান্ধীজি মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বললেন যে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না এই দুই দল মানুষই সত্যের প্রয়োজনটুকু স্বীকার করেন। গান্ধীজির নীতি দর্শনের মূল কথা হল সত্যলাভ। সত্যরূপে সেই ভগবানকে মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার পথ হল এই মানুষের সেবা করা। ভগবান পরিপূর্ণ ক্ষমা ও করুণার আধার। তিনিই মানুষের সকল কর্মের নিয়ন্তা।

গান্ধীজির মতে সত্যই ভগবান এবং সত্যের পথের প্রথম পদক্ষেপ হল অহিংসা। হিংসা পরিহার করা নিষ্ক্রিয়তা বা আলস্য নয়। যিনি সমগ্র সৃষ্টির আধ্যাত্মিক সত্তাটুকু উপলব্ধি করেন, তিনি কাউকে 'অপর' বলে মনে করেন না। অতএব তার পক্ষে হিংসার আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব। যিনি অহিংসা পথের সাধনা করেছেন, তিনি হলেন সত্যের সেবক, গান্ধীজির মতে তিনি যেমন একদিকে নির্ভয় তেমনি সকলের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। গান্ধীজির মতে 'হিংসার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ইহাই যে তীব্র সংগ্রামের সময়েও অন্তরে কোন ক্রোধ, ঘৃণা বা বিদ্বেষের লেশমাত্র চিহ্নও থাকিবে না এবং সংগ্রামের অবসানে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হইবে।'

এই অহিংস সংগ্রামকে গান্ধীজি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন; প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অন্তর থেকে ভয়কে নির্বাসিত ক'রে অভয়কে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে অবিচলিত আস্থা রেখে সত্যের অনুসরণ করাই হল সত্যাগ্রহীর একমাত্র কর্তব্য। সত্যাগ্রহী মনে মনে ক্রোধ, ভয় ও প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে বর্জন করবেন এবং তাঁকে মৃত্যু ভয়ও জয় করতে হবে। গান্ধীজি শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে কাপুরুষের মত অন্যায়কে সহ্য না করতে বলেছেন:

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।' (রবীন্দ্রনাথ)

তিনি বললেন যে, কাপুরুষের মত অন্যায় সহ্য করার চেয়ে হিংসার পথে আত্মসম্মান রক্ষা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হিংসার পথে গেলেও আত্মসংযমের প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন অহিংসা হল শ্রেষ্ঠ

বীরত্ব; তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই। "বহু বছর যাবৎ আমি যখন ভীরু ছিলাম তখন আমি হিংসার কথা চিন্তা করতাম। কিন্তু যখন হতে এই ভীরুতা ত্যাগ করতে শিখলাম তখন থেকে অহিংসার প্রকৃত মূল্য আমি বুঝতে শিখলাম।" গান্ধীজির এই জীবনদর্শনটুকু গীতায় ব্যাখ্যাত কর্মযোগ থেকে নেওয়া হয়েছে। গান্ধীজি বলেছেন যে, তাঁর মনের সব সংশয়ের নিরসন হয়েছে গীতা পাঠ ক'রে। তাঁর মতে, 'এমন কোনও অবস্থা কখনও আসে নাই যখন গীতার নিকট হইতে নির্ভুল নির্দেশ লাভ করি নাই। আমি এ-তত্ত্বে বিশ্বাস করি না যে গীতা ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করবার উদ্দেশ্যে হিংসার প্ররোচনা দেয়। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে শুভ ও অশুভের যে সংগ্রাম, গীতা বিশেষভাবে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী।' সেখানে গান্ধীজি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন ক'রে 'মৃত্যু ভয় জয় করিয়া' কর্তব্য পালনের উপদেশ দিয়েছেন। ফলাফল চিন্তা না করে কর্তব্য পালনের এই উপদেশ গীতাতে দেওয়া আছে। অতএব বলা হল যে গীতার কর্মবাদের আদর্শ হল, গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার মূল ভিত্তি। কঠোর ভগবৎ নির্ভরতা, আপন স্বার্থ বিস্মৃত হয়ে কর্তব্য পালন ও সর্ব মানবের একতায় বিশ্বাস, এগুলি হল গান্ধীজির নীতিদর্শনের ভিত্তি। এগুলি তিনি পেয়েছিলেন শাশ্বত ভারতীয় চিন্তা ও কর্মের আদর্শ থেকে। গান্ধীজি বিশ্বাস করেছেন যে, সমস্ত ধর্মেরই মূল এক; সমস্ত ধর্মেরই উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনকে মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যে উন্নীত করা। মানুষ যাতে মহৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে আগ্রহ সৃষ্টি করাই হল সকল ধর্মের উদ্দেশ্য। অতএব আমরা বলতে পারি যে, উন্নততর জীবনের পথ নির্দেশ ক'রে গান্ধীজি আমাদের সকল ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। তিনি বললেন যে, ধর্মীয় জীবন ভোগের, জীবন নয়, এ হল ত্যাগের জীবন। আবার সংসার থেকে পলায়ন ক'রে এই ধর্মজীবন ও নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। অভাব বাড়তে না দিয়ে, যে ভোগ্যপণ্য সকল মানুষের করায়ত্ত নয় তাকে স্বেচ্ছায় বর্জন ক'রে গান্ধীজি জীবনচর্যায় ঔপনিষদিক তত্ত্বের নূতন করে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি গীতাকে অনুসরণ করে বললেন, 'জীবনের যে সব মহার্ঘ সুখ সুবিধা জনসাধারণ ভোগ করতে পারে না

আমাদের উচিত হবে দৃঢ়ভাবে তা ভোগ করতে অস্বীকার করা; এই অস্বীকৃতির ক্ষমতা হঠাৎ একদিনে আসে না। তাঁর মতে আমাদের প্রথম কাজ হ'ল 'সর্বসাধারণের যাহা ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ভোগ করিব না'—এই মনোভাব সৃষ্টি করা এবং তারপর চেষ্টার দ্বারা জীবনকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে তখন ভোগের দ্রব্য ত্যাগ করাও চলতে পারে। সুতরাং গান্ধীজির নৈতিক আদর্শ, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এই ঔপনিষদিক আদর্শকে আশ্রয় করে আছে, একথা আমরা বলতে পারি। গান্ধীজির মতে সংযম ও অভাববোধ নিবৃত্তি এই দুটিই হল মানুষের মহৎ ধর্ম। গান্ধীজি বলেছিলেন, 'অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ' এবং সর্বোপরি সত্য এই চারটি সংযম হল, মানুষের অবশ্য পালনীয়। আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে গান্ধীজি এই চারটি সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমেই বাক্‌সংযমের কথা বললেন। বাক্-সংযম, আত্মসংযমের পথে প্রথম পদক্ষেপ। সংযম এবং সদাচার সেই অনুশীলনের মাধ্যম। 'আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শিখাও'—এই মতাদর্শের উপর তাঁর সমগ্র জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি সদাচারের এমন কোন উপদেশ আমাদের দেন নি যা তিনি নিজে কখনও আচরণ করেন নি। আপনার জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'—অর্থাৎ তিনি যে সদাচারকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সদাচার দেশের সামনে নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এই সদাচার হল সত্যাচার; সত্যের পথ অনুসরণ ক'রে মানুষ এই সদাচারের পথে অগ্রসর হতে পারে। এই সত্য আবার ভগবৎ আশ্রিত। যাঁরা এই সত্যে বিশ্বাস করেন তাদের ভগবানেও বিশ্বাস করতে হবে। এই সত্যের বা ভগবৎ অস্তিত্বের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। গান্ধীজি ভগবানের বিধিকে নৈতিক এবং ধর্ম জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। অতএব তিনি পেইলীর মত বিধিবাদীদের সমগোত্রীয়। অর্থাৎ যাঁরা (Who accepts Law as standard) বিধাতার বিধানকে নৈতিক ধর্ম জীবনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন, গান্ধীজি তাঁদেরই সমগোত্রীয়। তাঁর মতে নৈতিক

আদর্শ আসে মানুষের অন্তরে বিবেকের বাণী থেকে; সেই বাণীই হল ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। অতএব আমরা বলতে পারি গান্ধীজি ছিলেন নৈতিক বোধবাদে বিশ্বাসী। বোধ হয় তাঁকে নীতিশাস্ত্রবিদ বাটলারের সমগোত্রীয় ভাবা যেতে পারে। আবার আরেক অর্থে তিনি মহাদার্শনিক কাণ্টের মত কৃচ্ছ্রতাবাদী; তাঁকে যুক্তিবাদীও বলা যেতে পারে। তাঁর মতে নৈতিক কর্ম সামগ্রিক সামঞ্জস্যটুকু দাবী করে এবং নৈতিক আদর্শের মধ্যে যুক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। আবার তিনি এই মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে উচ্চতর ভিত্তির উপর কখন কখন নৈতিক আদর্শকে স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে মানুষের কর্তব্য পালন করা উচিত সত্য এবং ন্যায়ের অনুশাসনে থেকে। অর্থাৎ যা সত্য নয় বলে বুঝব তাকে কখনই কর্তব্য বলে পালন করব না। এ হল যুক্তিবাদীর কথা। এই অর্থে গান্ধীজি কাণ্টের মত যুক্তিবাদী। আবার গান্ধীজিকে স্বামী বিবেকানন্দের মত কর্মযোগীও বলা চলে। গান্ধীজির কর্ম পথের মুল কথাটি হল, সত্য ও অহিংসা। গান্ধীজি অহিংসা ও সত্যকে অভিন্ন করে দেখেন নি। মানুষ নিজেকে ভগবানের সেবক জ্ঞান ক'রে নিরলস, নিষ্কাম কর্মে নিত্যরত থাকবে। এই আদর্শই হল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এই আদর্শের কথা গান্ধীজি বললেন। এই আদর্শের কথা গীতায় বলা হয়েছিল। অতএব গান্ধীজিকে যদি কেউ প্রেয়োবাদী বলেন, তবে ভুল বলা হবে। উপযোগবাদও -তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বলতে পারি যে, গান্ধীজি ছিলেন সম্পূর্ণতাবাদী; তিনি নিজেকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। সেই একাত্ম হয়ে থাকার মধ্যে তাঁর অহিংসাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত; সেই অভিন্ন আত্মজ্ঞান, সেই সমজ্ঞানই গান্ধীজির সত্যাগ্রহ দর্শনের ভিত্তিভূমি। তিনি সত্যানুসরণকেই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ বলেছেন এবং মানুষকে সেই সত্যের অনুসরণ করতে বলেছেন নির্ভীকভাবে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

দার্শনিক মুরের মূল্যধারণা ঃ তাঁর শ্রেয়োবাদ

বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ভাববাদী ভাব ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ বাস্তববাদীদের অগ্রগণ্য দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মুর। তিনি তার একখানি গ্রন্থের উপসংহারে বললেন, যে কাজকে আমরা ভালো কাজ বলি তার মধ্যে এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে যা কেবল মাত্র মানুষের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং মন্দ কাজে কখনই তা উপস্থিত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজটা ক'রা হয়েছে সেই অবস্থায় অনুরূপ অন্য কোন কাজ ক'রে কৃত কর্মের চেয়ে অধিকতর শুভ ফললাভ করা যেত না। তৃতীয়তঃ কৃত কর্মের ফলকে যদি ভাল বলি তাহলে তার অনুরূপ সমস্ত কার্যকেই ভালো বলব এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্মটিকে পৃথক ক'রে দেখব এবং ঐ মন্দ কর্মকে এবং তার অনুরূপ বা স্বধর্মবিশিষ্ট সমস্ত কর্মকেই নিকৃষ্ট বলে মনে করব।

মুর বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। যাকে আমরা ভালো কাজ বলছি সেই কাজের বা যে কোন কাজের তিনটি অঙ্গকে আমরা নির্দেশ করতে পারি: উদ্দেশ্যাঙ্গ (Intention বা Motive) প্রক্রিয়া এবং ফল। এখন মনে করা যাক্ যে আলোচ্য কর্মটির উদ্দেশ্যাঙ্গ শুভ বলে তাকে ভালো কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় যে দূর প্রসারী দুরূহ বিতর্কের সৃষ্টি হবে তা হ'লো কাজটিকে ভালো বলছি উদ্দেশ্যই শুভ বলে না কর্মফল কল্যাণকর ব'লে। সেটিকে এড়িয়ে গেলেও আমরা মুর প্রদর্শিত আলোচনার সরণি বেয়ে কোন নির্দিষ্ট সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। কেননা ঐ

১। Ethics পৃঃ ১৪০

উদ্দেশ্যটি শুভ হলেও এবং ভালো কাজের লক্ষণ হিসেবে এই শুভ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করলেও মুর নির্দিষ্ট প্রথম তত্ত্বটির সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হয় না। কেননা এমন কথা বলা চলে না যে শুভ উদ্দেশ্যটির আশ্রয় কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই। অশুভ কর্মের পিছনে শুভ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এমন কথা কেবল মাত্র তখনই বলা চলে যখন আমরা বলব যে কাজের আত্যন্তিক মূল্য বিচার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য দিয়েই সাধিত করতে হবে। শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নির্ভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা দুরূহ হ'য়ে পড়ে, কেননা উদ্দেশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি নির্ভর ; তাই মূর কর্মের মূল্য বিচারে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার এই না গ্রহণ করার ফলে উপরি বর্ণিত শুভকর্মের প্রথম লক্ষণটি কেবলমাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে। অভিজ্ঞতা বলে যে এমন বহু কর্ম নিত্য সংসারে সঙ্ঘটিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ হলেও তার ফল অকল্যাণকর হয়েছে। সুতরাং যদি একথা বলা হয় ভালো কর্মের মধ্যে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে যা কেবল মাত্র ভালো কর্মের মধ্যেই থাকবে এবং যা মন্দ কর্মের মধ্যে থাকবে না তা'হলে একথা অসংশয়ে বলা চলে যে সেই গুণটি কর্মের উদ্দেশ্য আশ্রয়ী নয়। তবে সেই গুণটি কী প্রক্রিয়া আশ্রয়ী ? কর্মের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে থাকে এমন কথাও বলা চলে না। প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য এক থাকা সত্ত্বেও দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ফল লাভ করি এবং একটা কর্মকে শুভ এবং অন্য আর একটি কর্মকে অশুভ বলি। বহুশ্রুত গ্রাম্য গো-কবিরাজের গল্প স্মরণ করুন ; চিকিৎসার জন্য প্রথম দিনে আনীত গরুটির ফোলা গলাতে হাতুড়ির আঘাত দেওয়ায় সে ব্যাধিমুক্ত হল আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আঘাত করায় গরুটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিয়া উভয় কর্মের অঙ্গ। প্রথম কাজটাকে ভাল এবং দ্বিতীয় কাজটাকে মন্দ বললে আমরা সেক্ষেত্রে ফল দ্বারাই কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া একান্তভাবে সমধর্মী। পরিবেশ ভেদে অবস্থা ভেদে একই প্রক্রিয়া দুই বিভিন্ন ধরনের ফল

প্রসব করেছে। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি প্রক্রিয়ার উপরে প্রযোজ্য হয় না। এবার ফলাফলের কথায় আসা যাক। শুভ ফলপ্রসূ হ'লে কি কর্মকে আমরা 'শুভ' আখ্যা দিই। তা আমরা সাধারণতঃ দিই না। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে। অর্থাৎ যে কাজ ভালো ফল দিল সেই কাজই 'ভাল' এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল সেই কাজই 'মন্দ'। তবে এখানেও আর একটা বড় প্রশ্ন উঠবে। সে প্রশ্নটা হ'ল কাকে ফল দিল? যদি কর্মকর্তার ভালো মন্দটুকুই কর্মের লক্ষ্য হয় তা হ'লে আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদী হ'য়ে পড়ছি। ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। আবার যদি মনে করা যায় যে এই ফল বিচার হবে কর্মকর্তার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য না রেখে, কেবলমাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এর বিচার হবে, তা হলে আমরা কর্মকর্তানিরপেক্ষ সুখবাদী (Altruistic hedonist) হ'য়ে পড়ছি। তার বিরুদ্ধেও অনেক আপত্তি আছে। এতদুভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের কার্য বা মঙ্গলকে যুক্তিসিদ্ধ (rational) করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ কথিত Philosophical anarchism বা দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের ধারণায় মানুষের শুভাশুভ তার আত্যন্তিক যৌক্তিকতার ওপর নির্ভরশীল। এই আত্মস্বার্থ এবং পর স্বার্থের মধ্যে সীমারেখা মেনে কাজের ফলদ্বারা তার ভাল-মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচার পুঁথিগত হ'য়ে পড়বে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই বলিলেই চলে। কেননা একই কাজের ফল আমার কাছে মন্দ হ'তে পারে আবার তা অন্য জনের কাছে ভাল হতে পারে। এইক্ষেত্রে মূর কথিত প্রয়োজন সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে না। আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের সমন্বয় প্রসঙ্গে মূর বলেছেন: "I think therefore, we must conclude that a maximum of true good, for ourselves, is by no means always secured by those actions which are necessary to secure a maximum of true good for the world as a whole"; আত্মকর্মের সঙ্গে পর কর্মের সমন্বয় ঘটানো

সহজসাধ্য নয়; যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের কল্যাণের সঙ্গে আত্মকল্যাণের সমন্বয় ঘটবে কি না এ সম্বন্ধে মূর সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মস্বার্থ অথবা সামগ্রিক স্বার্থসাধনের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে রায় দান সম্ভব নয়। তবে কখন কী অবস্থায় আমি আত্মস্বার্থ অথবা পরস্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে কাজ করব সেটা হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বা প্রয়োজন সাধনের প্রশ্ন (of practical importance)। মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা এই আত্মস্বার্থ ও পরস্বার্থের দ্বন্দ্ববিরোধের নিরসন করতে পারব না। মনে করা যাক সমানভাবে ধর্মপরায়ণ দুটি ব্যক্তির কথা, ক এবং খ; জগতের কল্যাণের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন; খ তাঁর পুত্রকলত্রের কথা চিন্তা ক'রে, নিজের কথা চিন্তা ক'রে দেশের কল্যাণে দশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলেন না। কর্তব্যকর্মের আহ্বানে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ করা উচিত ছিল। প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ক যে আত্যন্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে অর্জন করলেন খ কি আরো ত্রিশ বৎসর বেঁচে থেকে নানান সৎকর্ম ক'রেও তা অর্জন করতে পারবেন? যাঁরা আত্মস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব মনে করেন তাঁরা বলবেন যে খ যতই ভালো কাজ করুন না কেন কোন দিনই তিনি আত্যন্তিক মূল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন না। এমন কথা সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত।

সুখবাদীরা সুখের পরিমাপে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী। মূর বলছেন যে বোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার সুখবাদীদের দেওয়া সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ সুখের পরিমাণের দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না: "It may therefore possibly be the case that quantity of pleasure is, as a matter of fact, a correct criterion of right and wrong, even if intrinsic value is not always in proportion to the quantity of pleasure contained." যদি আমরা এই সত্যটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই যে আত্যন্তিক মূল্য হল

সুখের পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে যে সুখের পরিমাণের দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ধারিত হয়। মুর বলছেন যে সুখ-আত্যন্তিক মূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রবর্তনায় এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য (Postulate) টিকে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ ক'রে তবেই না সুখের দ্বারা আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ করতে অগ্রসর হন। এই মূল্যায়ন চক্রদোষদুষ্ট।

সুখ যেমন কোন কর্মের আত্যন্তিক মূল্যের যথাযথ নির্ধারণে অপারগ তেমনিভাবে কোন একটি উপাদান (Factor)ও এই আত্যন্তিক মূল্য নিরূপণে অক্ষম। মূরের নিজের কথাতেই বলি :

"We may, I think, say, first of all, that for the same reason for which we have rejected the view that intrinsic value is always in proportion to quantity of pleasure, we must also reject the view that it is always in proportion to the quantity of any other single factor whatever." জ্ঞান, পুণ্য, পরাজ্ঞান, প্রেম এরা কেউই এককভাবে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের উপযোগী নয়। কেননা এককভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটি গুণের সংযুক্তি বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্যভেদ ঘটায়। আমরা অভ্রান্তভাবে বলতে পারি না যে, যে বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্য বেশী, তার মূল্য কেন বেশী হল আর যার আত্যন্তিক মূল্য কম তার মূল্যই বা কেন কম হল? আত্যন্তিক মূল্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এ কথাও সত্য যে যার আত্যন্তিক মূল্য বেশী বলে আমরা বুঝি সেই কর্মটুকুই আমাদের করা উচিত। আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্ম বা বস্তুনিচয়ের অবচ্ছেদক ধর্ম বা পরাজাতি ধর্ম নিরূপণ ও সহজসাধ্য নয়। মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ে প্রমাণ শাস্ত্রসম্মত পন্থা পরিহার ক'রে আমরা যদি আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহীন কর্মের দুটি তালিকা প্রস্তুত করি এবং কর্মগুলিকে মূল্যবান অথবা মূল্যহীন কেন মনে করছি তার কারণ নির্দেশ করি তা হলে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হতে পারব।

সমাধানের এই ধরনের পথের ইঙ্গিত দিয়ে মুর কিন্তু এই পথে অগ্রসর হননি। স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এমন কথাও আমরা স্বভাবতঃই বলতে পারি যে আত্যন্তিক মূল্যের লক্ষণ নিরূপণ না ক'রে কেমন করে আমরা আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান এবং আত্যন্তিক মূল্যে ন্যূন কার্যাবলীর ক্রমান্বিত শ্রেণীবিভাগ করব? আর যদিও করি তবে তা আমাদের প্রয়োজন এবং খেয়ালখুশির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হবে। এই শ্রেণী বিভাজন কর্মটুকু বৈজ্ঞানিক বিভাজন হবে না।

আত্যন্তিক মূল্য ধারণার আলোচনার উপসংহারে মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের অনুভূতি (Feeling) এবং চেতনমনের অন্য কোন প্রক্রিয়া। এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই সুখানুভূতি বিধৃত এবং আত্যন্তিক মূল্যধারণাটুকু যৌগিক এবং মিশ্র (compound); অবশ্য মূর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দুটি লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা 'ভালও না মন্দও না' এমন কর্মেরও অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করতে পারে। সুতরাং দেখা গেল মূরের আত্যন্তিক মূল্যধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে অনির্বচনীয় বস্তুবাদী।

Ethics গ্রন্থে স্থানাভাবের দোহাই দিলেও মূর তাঁর Principia Ethica গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং আত্যন্তিক অশুভকর্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রায় সমস্ত শুভকর্মই জটিল এবং যৌগিক। এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কর্মের বিষয় সম্বন্ধে কর্তার অনুভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মূর করেছেন। মূর আরো বলেছেন, যে কাজগুলিকে আত্যন্তিক মূল্য-সম্পন্ন বলছি তাদের মধ্যে মিল যে খুব বেশী রয়েছে তা নয়; যে যে বিষয়ে তাদের অমিল রয়েছে সেই সেই বিষয়ে মূল্যবান কাজের আত্যন্তিক মূল্যকে তারা বৃদ্ধি করেছে। তাদের পরজাতিধর্ম এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিরঙ্কুশ ভাবে ভাল নয় অথবা মন্দ নয়; কর্মের গুণাগুণ এতদুভয়ের সমন্বয়ের ফল মাত্র।

এই প্রসঙ্গে মুর ত্রিবিধ কর্মের কথা বলছেন: (১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশুভ এবং (৩) মিশ্র শুভ। সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসা হ'ল এই অবিমিশ্র শুভের উদাহরণ। সুন্দর এবং ভাল বস্তুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মুর নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কুৎসিতকে ঘৃণা করার কথা। মুরের এই ব্যাখ্যা যে সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি তিনি আপন গ্রন্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন:

"Many of the judgments, which I have made in this chapter, will no doubt, seem unduly arbitrary: it must be confessed that some of the attributions of intrinsic value, which have seemed to me to be true, do not display that symmetry and system which is won't to be required of philosophers".

প্রথমত দার্শনিক আলোচনায় সুমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকলেও মুরের আলোচনা সার্থক আলোচনা। বহু বিদগ্ধ মনের আলোকসম্মত ঘটেছে উত্তরকালে এই মনস্ব মানুষটির আলোচনায় এবং তাঁর কালে নীতিশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা আমরা করতে পেরেছি।

তাঁর শ্রেয়োবাদ:

১৯০৩ সালে এই মানুষটি ভাববাদী চিন্তানায়কদের ভাব-ভাবনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে একটি নিবন্ধ[১] প্রকাশ করলেন প্রখ্যাত দর্শন-পত্র Mind পত্রিকায়। পণ্ডিত মহল তাঁর চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর থেকে ব্রিটিশ বাস্তববাদীদের (Realists) মধ্যে মুরকে অগ্রগণ্য হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। তাঁর সুনিপুণ বিশ্লেষণ-এ তিনি আমাদের অতি পরিচিত বস্তু-ধারণাগুলোকে দর্শন-সিদ্ধ করে তুললেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের বস্তু-চেতনাকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমাদের বাস্তব-

১। The Refutation of Idealism, Mind, 1903.

বোধকে তিনি যুক্তিবাদী দর্শনের ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। জীবনের নানান ঘটনা ও ধারণার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তিনি আমাদের চোখে অবারিত করে দিয়েছেন সেই ঘটনা বা ধারণার মর্মার্থ টুকু। প্রতিটি ঘটনার নিজস্ব সত্তা আছে। মানুষের মনের আবেগ বা কল্পনা তাকে তার নিজস্ব রূপ রসে সত্তাবান করে তোলেনি। এই যে নির্দিষ্ট পৃথক সত্তা এটাই হল বস্তুর বিশিষ্ট জীবনেতিহাসের পটভূমি। এই স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার করেই মূরের বাস্তব দর্শনের যাত্রা শুরু। এই পৃথক সত্তার স্বীকৃতি যেমন বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে এবং যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আমরা মূরের মধ্যে পেয়েছি তেমনটি বাস্তববাদী দার্শনিক গোষ্ঠীর আর কারো মধ্যে পাই নি। দার্শনিক Widgery[২] (উইডগেরি) মূরের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলেছেন—

"In Moore we see as in no other representative of the school, the application of its most essential method, the careful isolution of each fact or concept in so far as it is necessary to acquaint oneself with its own distinctive character or meaning."

অর্থাৎ আমরা মূরের দর্শনে দেখেছি প্রত্যেকটি ঘটনা বা ধারণাকে পৃথক করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ধরনের পৃথক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল এই ঘটনা বা ধারণার বিশিষ্ট তাৎপর্যটুকু উদ্‌ঘাটন করা। বাস্তববাদী দার্শনিকেরা আর কেউ এই ধরনের বিশ্লেষণে মূরের সমানধর্মা নন্। তবে তাঁরা সবাই এই মত পোষণ করেন যে প্রত্যেক বস্তু হল ঠিক সেই বস্তু এবং অন্য বস্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক। বস্তু-সত্তার এই অপরিবর্তনীয় সহজ রূপটিকে সত্য বলে গ্রহণ করাই হল বাস্তব-বাদীদের দর্শনের প্রথম পাঠ।

মূরের চিন্তায় কেবলমাত্র আধুনিক যুগের দর্শন-চিন্তার অভিঘাত এসে লাগেনি, প্রাচীন গ্রীক দর্শনের প্রভাবেও তাঁর দর্শন প্রভাবিত। গ্রীক ক্লাসিক্‌সের জগতে তাঁর নিত্য গতায়াত ছিল। প্লেতো আরিস্ততলের

২। Albion G. Widgery, 'Contemporary Thought of Great Britain.' পৃঃ ১৫০ দ্রষ্টব্য।

প্রভাব তাঁর চিন্তায় প্রকট। বিশেষ করে প্লেতোনিক চিন্তার প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল। সুখবাদের খণ্ডন করতে গিয়ে মুর প্লেতোর Philebus (ফিলেবাস) শীর্ষক ডায়ালগ থেকে সক্রেতিস্ প্রোতারকাস্ সংবাদ উদ্ধৃত করেছেন। মানুষের কল্যাণ ব্যক্তির সর্বাধিক সুখান্বেষণের মধ্যে নিহিত আছে। এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে সক্রেতিস্ এই কথাই প্রোতারকাস্‌কে বললেন যে মানুষের কল্যাণ তার আত্ম-সুখান্বেষণের মধ্যে কখনই নিহিত থাকতে পারে না। মুর সক্রেতিসের এই মতকে তাঁর কল্যাণবোধের দার্শনিক নীতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি সক্রেতিসের এই উক্তির মধ্যে তাঁর ধারণার সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। মুরের কথা উদ্ধৃত করে দিই[১]: Socrates, we see, persuades Protarchus that Hedonism is absurd. If we are really going to maintain that pleasure alone is good as an end, we must maintain that it is good, whether we are conscious of it or not. We must declare it reasonable to take as our ideal (an unattainable ideal, it may be) that we should be as happy as possible even on condition that we never know and never can know that

১। Principia Ethica, পৃ: ৮৯।

মুর আনন্দ বা সুখকে তার অনুভূতি থেকে পৃথক করে দেখছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য যে সুখানুভূতি থেকে সুখের কোন পৃথক সত্তা আছে কি না? ভাবনার জগতে হয়ত তাদের আলাদা ক'রে দেখা যায় কিন্তু অনুভূতি ছাড়া সুখের কোন যথার্থ অস্তিত্ব নেই এ কথাও সত্য। যে সুখ অনুভূতি-নিরপেক্ষ তাকে আমরা Logical abstraction বলতে পারি। তর্কশাস্ত্রের কূটতর্কে তার স্থান থাকলেও মানুষের ব্যবহারিক জীবনে তার আবেদন নেই বললেই চলে। এতদ্ব্যতীত আর একটি প্রসঙ্গও আমরা উত্থাপন করব। প্লেতো সক্রেতিসের মুখ দিয়ে যে তত্ত্ব আমাদেব শুনিয়েছেন তাকে অভ্রান্ত ব'লে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। সুখবাদী দার্শনিকেরা যখন সুখকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তাঁদের নীতি-দর্শনের Postulate বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে সেই চরম আনন্দ উপভোগের জন্য অনুকূল পরিবেশকে স্বীকার ক'রে নেন। আনন্দকে স্বীকার করব অথচ আনন্দলাভের উপায়কে অস্বীকার করব এ হ'ল বাতুলের কথা। এ কথা নিশ্চয়ইকোন সুখবাদী বলবেন না যে সুখই আমাদের কাম্য, আমরা উপেয়কে শুধু চাই, উপায়কে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে। এই স্মৃতি, জ্ঞান এগুলোকে স্বীকার করলে উপেয় হিসেবে সুখ বা আনন্দের কোন মর্যাদাহানি ঘটে না। প্রাক্ অবস্থাগুলো (condition precedent) আনন্দানুভূতির অনুষঙ্গ। আবার আনন্দকে আনন্দানুভূতি থেকে পৃথক ক'রে দেখা চলে না। মুর কোন কোন সুখবাদীদের বিরুদ্ধে সুখানুভূতি কথাটি ব্যবহার না করার জন্য অভিযোগ করেছেন। অবশ্য নিজে স্থানান্তরে স্বীকার করেছেন যে সুখবাদীরা সুখ বলতে সুখানুভূতিকেই বুঝিয়েছেন। শুধু সমালোচনার জন্যই যেখানে মুর সমালোচনা করেছেন সেখানে লেখকের প্রত্যয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

we are happy. We must be willing to sell in exchange for the mere happiness every vestige of Knowledge, both in ourselves and in others, both of happiness itself and of every other thing. Can we really still disagree? Can any one still declare it obvious that this is reasonable? That pleasure alone is good as an end.

এর মর্মার্থ হল আমরা দেখি সক্রেতিস্ প্রোতারকাস্‌কে এই কথাই বোঝালেন যে সুখবাদ নীতি হিসেবে অগ্রাহ্য। যদি আমরা সত্য-সত্যই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করি যে সুখ বা আনন্দই হল আমাদের সর্ব কর্মের লক্ষ্য এবং এই সুখই হল মঙ্গল তাহলে এ কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সুখ বা আনন্দ সচেতনতা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা যদিও না জানি বা না জানতে পারি যে আমরা সুখী তবুও আমাদের এ কথা বলতে হবে যে এ ধরনের সুখই আমাদের জীবনের আদর্শ লক্ষ্য। যদিও সুখবোধ না থাকে তবুও সেই বোধহীন সুখই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের এবং অপরের সুখের এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিনিময়ে আমাদের কেবলমাত্র সুখকে গ্রহণ করতে হবে। এর পরেও কি আমরা এই কথাই বলব যে আদর্শ হিসেবে সুখই একমাত্র কাম্য? এতদ্ব্যতীত মানুষ যদি আত্মসুখকে চায় তবে তার জীবন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক ও আপনার স্বার্থবেষ্টিত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়বে। মুর প্লেতোর অনুকরণে বললেন যে যদি সুখই কাম্য হয়, আত্মতুষ্টিই যদি জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ হয় তবুও সেই মহৎ সুখ আস্বাদনের জন্য মানুষকে দৃষ্টি, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, যুক্তি ও জ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল হ'তে হবে। এগুলো ছাড়া আনন্দ বা সুখের কোন অনুভূতি হওয়াই সম্ভব নয়। অধ্যাপক সিজ্‌উইকের সুখবাদের খণ্ডন করতে গিয়ে মুর প্লেতোর উপরোক্ত মতটি উদ্ধৃত ক'রে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে সার্বিক কল্যাণ কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের সুখবোধের মধ্যে সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। সে সামগ্রিক কল্যাণের ধারণা ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত। তার অর্থ ব্যক্তিস্বার্থের সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে গেছে। এই সার্বিক কল্যাণ কখনই ব্যক্তিবিশেষের সুখানুভূতিতে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে না। আমরা তাকেই ভাল বলব না যা হল কেবলমাত্র সুখপ্রদ। ভালকে, কল্যাণকে আমরা উপায় (Means) হিসেবে দেখব

না, কল্যাণ হ'ল উপেয় (End) শুভ বা কল্যাণের ধারণার সত্য বা সামর্থ্য তার মধ্যে নিহিত। বাইরের কোন ধারণা অর্থাৎ যা কল্যাণ-ধারণার অন্তবর্তী নয়, তাকে মূর এবং মুর-পন্থীরা কখনই শুভের ধারণার নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেন নি। মূর তাঁর Principia Ethica শীর্ষক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই শুভের (Good) ধারণার সম্বন্ধে দুটি কথা আমাদের মনে রাখতে বলেছেন। প্রথমটি হ'ল কল্যাণের ধারণা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ধারণা হ'ল Intrinsic অর্থাৎ আত্যন্তিকভাবে যথার্থ। প্রত্যন্ত বিশ্লেষণে এ সত্যই আমরা পাই যে কল্যাণের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে। সে ধর্মের তন্ত্র-মন্ত্র তার জগতেই সীমাবদ্ধ। যদি কল্যাণের সংজ্ঞা দিতে হয় তবে বাইরের কোন নতুন ধারণার আমদানি ক'রে তার সাহায্যে কল্যাণের ব্যাখ্যা করা অনুচিত। আবারএই তত্ত্বে বিশ্বাস করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবো যে কল্যাণের ধারণা অনির্দেশ্য, এর সহজ সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। হিতবাদীদের মত মূর শুভ এবং প্রয়োজনীয়কে সমার্থক হিসেবে দেখেন নি। শুভকে প্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনলে তাকে আমরা আর উপেয় বা end হিসেবে পাই না, তাকে উপায় বা means হিসেবে পাই। শুভকে উপায় হিসেবে দেখলে তার যথার্থ (Intrinsic) মূল্যের হানি ঘটে। দ্বিতীয়টি হ'ল শুভের ধারণার মধ্যে একটা সার্বিক আবেদনের ধারণা আছে। এ আবেদন সর্বজনমান্য ও সর্বজনগ্রাহ্য। যে কারণেই হোক্ আমার কল্যাণের ধারণার সঙ্গে আর পাঁচজনের কল্যাণের ধারণার কোথায় যেন একটা যোগসূত্র রয়ে গেছে। কল্যাণ বা শুভকে এই ধরনের সার্বিকতার মর্যাদা দিয়ে মূর এবং তাঁর অনু-পন্থীরা পুরোনো জড়বাদী দার্শনিকদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করলেন। এখানে আমরা মূরের কল্যাণ-দর্শনে মহাদার্শনিক প্লেতোর প্রভাব দেখতে পাই। কল্যাণের ধারণার সঙ্গে এই সার্বিকতার ধারণাটুকু ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সার্বিকতা কল্যাণ-ধারণার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এইটুকু বাদ দিলে মূর-ভাবিত কল্যাণকে তার স্বরূপে আমরা পাবো না, এ কথাই একজন আধুনিক দার্শনিক[১] আমাদের শোনালেন।

১। A. G. Widgery, 'Contemporary Thought of Great Britain', পৃঃ ১২১ দ্রষ্টব্য।

দার্শনিক মুর[১] তাঁর কল্যাণের ধারণাটুকু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন যে সব সময়ে আমরা একথা মনে রাখব যে কল্যাণের ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে কিছুটা অনুভূতি, কিছুটা অন্য-সচেতনতা আর কিছুটা সুখ-সচেতনতা। এরা কেউই কল্যাণের সমার্থক নয়। এঁদের সমন্বয় ঘটেছে কল্যাণের ধারণায় তবু এরা কেউই কল্যাণের বিশিষ্ট গুণ বা ধর্ম নয়। এই গুণগুলি কল্যাণ-ধারণা ব্যতীত অন্যত্রও বিদ্যমান। সুতরাং এই গুণগুলি মুরের কল্যাণ-ধারণার অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হ'লেও তারা এই ধারণার ধারক ও সংগঠক নয়। যাকে আমরা 'মন্দ' আখ্যা দিই, যাকে আমরা ভালো-মন্দ নিরপেক্ষ (Indifferent) বলি সেখানেও হয়ত উপরিকথিত গুণগুলি থাকতে পারে। মুর বলেছেন: "But it is important to insist (though it is obvious) that neither of these characteristics is peculiar to intrinsic good; they may obviously also belong to things bad and indifferent."

কোন কোন দার্শনিক অন্ততঃ সুখ-সচেতনতাকে কল্যাণের বিভেদক হিসেবে দেখেছেন। মুরের মতে এই সুখ-সচেতনতা মন্দ বা ভালো-মন্দ-নিরপেক্ষ ধারণার মধ্যেও থাকতে পারে। এখানেই মুরের বৈশিষ্ট্য।

মুর আর একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে কল্যাণ-ধর্মের স্বরূপ বুঝতে গেলে আমাদের বেশ ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে হবে প্রয়োজনীয় বা দরকারী কাজের সঙ্গে কল্যাণ-কর্মের পার্থক্যটুকু। কোন একটি কর্ম কতখানি যথার্থ ভালো এবং কি পরিমাণে যথার্থ মন্দ সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হবে। আনুষঙ্গিক গুণের ধারণা যেন আমাদের ভালো-মন্দ বিচার-কর্মকে প্রভাবিত না করে। আবার আমাদের এটাও বিচার ক'রে দেখতে হবে যে কোন্ কাজ সামগ্রিকভাবে ভালো অথবা সে কর্মটি কোন্ বৃহত্তর কল্যাণ-কর্মের অংশ বিশেষ। সাধারণতঃ আমরা কল্যাণ-কর্মকে এই দ্বিবিধ অর্থেই ব্যবহার করি। দৈনন্দিন জীবনে আবার কখন কখন কল্যাণ এবং প্রয়োজন সমার্থক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুর

১। Ethica, পৃ: ২৪৯

আমাদের বারবার সাবধান ক'রে দিয়েছেন। এই ধরনের একাধিক অর্থে যদি আমরা কল্যাণকে ব্যবহার করি তবে ভুলের ফসলের পাহাড় জমে উঠবে আমাদের নীতি-দর্শনের গোলাঘরে। মুরের[১] কথায় বলি :

"All these mistakes are liable to occur, because in fact, the degree of goodness or badness of a thing in any one of these three senses is by no means always in proportion to the degree of its goodness or badness in either of the two; if we are careful to distinguish the three different questions, they can, I think, all be avoided."

কল্যাণ (Good) ধারণার অর্থটিকে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে। আমাদের মনে এই ধারণাটি সুস্পষ্ট থাকা উচিত যে কোন্ অর্থে আমরা 'কল্যাণ' শব্দটি ব্যবহার করেছি। এদিকে সজাগ থাকলে, মুরের মতে, ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। অবশ্য এই ধরনের নেতিমূলক মার্গ অবলম্বন ক'রে আমরা খুব বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পারব না। এ ভাল নয়, ও ভাল নয় এই ধরনের নেতিবাচক পন্থায় কল্যাণের অস্ত্যর্থক স্বরূপ জানা সম্ভব নয়। এ পথ অনির্বচনীয় তত্ত্বে পথিককে নিয়ে যায়। শঙ্করাচার্য প্রমুখ চিন্তানায়কেরা এ পথের পথিকৃৎ। মুরের চলাও সেই একই পথে। মুর প্রাকৃতিক গুণগুলোকে (Natural Property) কল্যাণের থেকে পৃথক ক'রে দেখলেন। আবার কল্যাণ এবং কল্যাণবোধ তারাও পৃথক। কাল-সংস্থায় কল্যাণ নরালম্ব হয়ে, কোন বস্তু-অনাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। অথচ প্রাকৃতিক গুণ (Natural Property) মুরের মতে বস্তু-নিরপেক্ষ। কল্যাণ কখন আশ্রয়-নিরপেক্ষ হয়ে বাঁচতে পারে না। বল্লরী যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে ঠিক তেমনি ক'রেই শুভ বা কল্যাণ আশ্রয় করে মানুষের কোন কর্মকে, অথবা প্রকৃতির কোন অঙ্গকে। বস্তুর প্রাকৃতিক গুণগুলিতে বিধেয়ের স্বরূপ-লক্ষণ নেই। তারা বস্তুর বস্তু-সত্তাকে সত্তাবান করে। কল্যাণের এ ধর্ম নয়। বস্তুর প্রাণের সাথে তার নিবিড় যোগ নেই। সে অধ্যস্ত হয় বাইরে থেকেই। কল্যাণ যেন

১। Ethics, পৃ: ২৫২

অতিথি, বাইরের মহলে তার বাস, অন্দর মহলে তার যাতায়াত নেই। কল্যাণ বা শ্রেয় বাইরে থেকে বস্তুর উপর অধ্যস্ত হয় এ কথা বলতে আমি কল্যাণকে মিথ্যা বলছি না। শঙ্কর-দর্শনের গোঁড়া অনুবর্তীরা হয়ত এ কথা ভাবতে পারেন। আমরা এইটুকুই বোঝাতে চাচ্ছি যে রজ্জুতে যখন সর্প-ভ্রম হয় তখন রজ্জু এবং সর্পের সম্বন্ধটুকু অনির্ণেয়, অনির্দেশ্য। এখানেও তেমনি বস্তুর সঙ্গে বস্তু-আশ্রয়ী শুভের সম্বন্ধটুকু অনির্ণেয়। কল্যাণ বা শুভকে আমরা বস্তু-আশ্রয়ী হয়ে থাকতে দেখেছি। তবু কল্যাণ বস্তুর আন্তরগুণ বা আন্তর সম্পদ নয়। বস্তুর প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে, তার বস্তু-সত্তার সঙ্গে কল্যাণের কোন আন্তরিক যোগ নেই। বস্তুর অন্তরের যোগ আছে সেইসব প্রাকৃতিক গুণের সঙ্গে যারা তাকে সত্তাবান করে। আমরা যেন কল্যাণকে প্রাকৃতিক গুণগুলির অন্যতম একটি গুণ হিসেবে না দেখি। আবার কোন প্রাকৃতিক গুণকে যেন কল্যাণ বলে ভুল না করি। এ ভ্রান্তি অনেকেরই হয়েছে। তাঁরা বস্তুর কোন স্থায়ী প্রাকৃতিক গুণকে (Natural Property) কল্যাণ ব'লে ভুল করেছেন। এই ধরনের ভ্রান্তির নাম দেওয়া হয়েছে' 'Naturalistic fallacy' বা 'প্রাকৃতিক প্রমাদ'। এই ভ্রান্তির বশবর্তী হ'লে নীতি-দর্শনের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। হয় মনস্তত্ত্ব, না হয় সমাজ-বিজ্ঞান, না হয় অন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান এসে নীতি-বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করে। এই-ভাবেই মিল মনস্তত্ত্বকে, অধ্যাপক ক্লিফোর্ড সমাজ-বিজ্ঞানকে ও টিণ্ডাল পদার্থ-বিজ্ঞানকে নীতি-বিজ্ঞানের স্থানে বসিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মূরের মতে কল্যাণের অর্থ হল Unique বা অনন্য। অন্য কোন প্রাকৃতিক গুণ দিয়ে কল্যাণের ব্যাখ্যা করা যায় না। কল্যাণের ধারণা হ'ল অসংজ্ঞেয়। ঈশ্বরের মতই সে যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্যে সমাচ্ছন্ন।[১]

১। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্লেতো কল্যাণকে (good) ঈশ্বরের সাথে সমার্থক হিসেবেও দেখেছেন। ভগবান যেমন জ্ঞানের বস্তু হ'লেও জ্ঞানের অতীত ঠিক তেমনি ক'রেই মূরের কল্যাণ বা Good জ্ঞাত বস্তু হ'লেও দুর্জ্ঞেয়। কল্যাণ যে আছে, কল্যাণ যে সুখ নয়, এও ত জ্ঞানের কথা। শুধু যখন মূর কল্যাণকে অসংজ্ঞেয় বলেন তখন আমরা প্লেতোর সুস্পষ্ট প্রভাব দেখি মূরের ধারণায়। প্লেতোর দর্শনে যেমন আমাদের সঙ্গে, জগতের বস্তু পুঞ্জের সম্বন্ধের সঠিক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা করা হয়নি ঠিক তেমনি ক'রেই মূর তাঁর দর্শনে কল্যাণের সাথে মঙ্গলকর্মের যথার্থ সম্বন্ধটুকুর সংজ্ঞা দিলেন না। এ সম্বন্ধটুকু অনির্দেশ্য হ'য়ে রইল।

দার্শনিক সিজউইক্[১] মূরের মতই কল্যাণের সংজ্ঞা-উত্তর প্রকৃতিতে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য মূর এবং সিজউইক্ দুই ভিন্ন পথে এই পরম তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। সিজউইক্ ছিলেন সুখবাদী'; সত্যকে জানা বা সুন্দরের অনুধ্যান, এ সবেরই মূলে আছে আমাদের সুখ-পিপাসা। আমাদের ক্লেশ এবং সুখের লাঘব করা এবং সুখ ও আনন্দের বৃদ্ধির জন্যই আমরা সত্য-সাধনা করি, সুন্দরের উপাসনা করি, একথা সিজউইক্ বলেন। তবে কল্যাণ এবং সুখ তাঁর কাছেও সমার্থক ছিল না। কল্যাণ সুখপ্রদ তবে সুখ ও কল্যাণ এক বস্তু নয়। মূর সুখকে কল্যাণের সহচর বা আংশিক কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুখের মধ্যে কল্যাণের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা নেই। কল্যাণ সুখকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, সুখ তার নাগাল পায় না। আমরাও কল্যাণের সমগ্র রূপটিকে ধরতে পারি না। তাইত তাকে মূর অসংজ্ঞেয় আখ্যায় ভূষিত করেছেন। যাঁরা কল্যাণের অর্থটুকু অন্য ধারণার সহায়তায় আমাদের বোধগম্য করতে চেয়েছেন মূর তাদের ভুলভ্রান্তিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা বলি। স্পেন্সার এ কথাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে মনুষ্য চরিত্র যত বেশী বিবর্তিত হবে ততই সে উৎকর্ষ লাভ করবে। উৎকৃষ্ট হওয়া এবং বিবর্তিত হওয়া এ দুটোর মধ্যে একটা নিত্য কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। এই তত্ত্বই হার্বার্ট স্পেন্সারের[২] বিবর্তনবাদী সুখবাদের ভিত্তি। স্পেন্সারের কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই:

"Guided by the truth that as the conduct with which Ethics deals is part of conduct at large, conduct at large must be generally understood before this part can be specially understood; and guided by the further truth that to understand conduct at large we must understand the evolution of conduct; we have been led to see that Ethics has for its subject matter, that form which universal conduct assumes during the last stages of its evolution."

১। তাঁর Methods of Ethics, Bk 1, chap iii দ্রষ্টব্য।

২। তাঁর Data of Ethics গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ মানুষের নৈতিক চরিত্র বা নৈতিক ব্যবহার তার সমগ্র চরিত্র বা সাধারণ ব্যবহারের অংশ বিশেষ। কাজে কাজেই নৈতিক চরিত্রের বিশ্লেষণ বা আলোচনার পূর্বে আমাদের বোঝা দরকার মানুষের সাধারণ আচরণ বা শীলতার প্রকৃতি। মানুষের চরিত্রের সামগ্রিক রূপটুকুর ইতিহাস লুকিয়ে আছে মানব-চরিত্র বিবর্তন তত্ত্বে। এই চরিত্র বিবর্তনের শেষের দিকের পর্যায়গুলি হল নীতি-শাস্ত্রের উপজীব্য। এই বিবর্তন-প্রান্তিক অবস্থাকে নৈতিক অবস্থা বলেছেন দার্শনিক স্পেন্সার। কিন্তু মূরের মতে স্পেন্সার-দর্শন প্রথম থেকেই একটি মহৎ দোষে দুষ্ট। উল্লিখিত পুস্তকের প্রথম দুই অধ্যায়ে স্পেন্সার এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে মনুষ্য চরিত্রের কোন কোন দিক বেশী পরিমাণে বিবর্তিত হয়েছে। তাঁর আর একটি বক্তব্য হ'ল যে বিবর্তনের অনুষঙ্গ কতকগুলি গুণ যে পরিমাণে মানুষের চরিত্রে বিদ্যমান থাকবে সেই পরিমাণে মনুষ্য চরিত্রকে আমরা বিবর্তিত বলে গ্রহণ করব। কিন্তু এ তত্ত্ব তিনি কোথাও প্রমাণ করলেন না যে মানুষের চরিত্র যত বিবর্তিত হবে ততই সে উৎকর্ষ লাভ করবে। উৎকর্ষের সঙ্গে বিবর্তনের কোন আত্যন্তিক যোগের প্রতিষ্ঠা করলেন না স্পেন্সার। মূর স্পেন্সারের দর্শনে বিবর্তিত মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষের কোন নিত্যযোগের প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হয়নি ব'লেই মত দিয়েছেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি ঃ

"We shall look in vain for any attempt to show that 'ethical sanction' is in proportion to 'evolution' or that it is the 'highest' type of being which displays the most evolved conduct ; yet Mr. Spencer concludes that this is the case. It is only fair to assume that he is not sufficiently conscious how much these propositions stand in need of proof. What a very different thing is being 'more evolved' from being 'higher' or 'better'. It may, of course, be true that what is more evolved is also higher or better. But Mr. Spencer does not seem aware that to assert the one is in any case not the same thing as to assert the other." অর্থাৎ নৈতিক অনুমোদন ও বিবর্তনের

মধ্যে স্পেন্সার কোথাও কার্য-কারণ সম্পর্কটুকুর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাননি, এ কথাও তিনি কোথাও প্রমাণ করেননি যে সর্বাপেক্ষা বিবর্তিত মনুষ্য চরিত্র মহত্তম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করবেই। এগুলিকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন ব'লেই প্রতীতি হয়। দার্শনিক মূর বলেছেন যে এই সত্যগুলিকে তর্কশাস্ত্রের বনিয়াদে শক্ত ক'রে প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল স্পেন্সারের। এগুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ। এদের প্রমাণ-সাপেক্ষতা স্পেন্সার লক্ষ্যই করেননি। যে বস্তু বেশী বিবর্তিত তার উৎকর্ষ থাকতে পারে। কিন্তু এতদ্বারা উভয়ের কার্য-কারণ সম্পর্কটুকু প্রমাণিত হয় না। একই সাথে আবির্ভাব বা তিরোধান ঘটলেই দুটি বস্তুর কার্য-কারণ সম্পর্কটুকু বা নিত্যযোগটুকু প্রমাণিত হয় না। তাই মূরের কাছে স্পেন্সারের বিবর্তনবাদ অগ্রাহ্য।

অধ্যাপক সিজউইক্ বা মিলের নীতিবাদকেও তিনি গ্রহণ করেন নি। এঁদের সুখবাদ ঠিক এক ধরনের নয়। মিলের সুখবাদকে প্রত্যক্ষবাদী সুখবাদ (Empirical Hedonism) বলা হয়েছে। মূর এঁদের কারো সঙ্গেই একমত হ'তে পারেন নি।[১] সুখই একমাত্র ভালো, সুখই মানবের সর্বকর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সত্যকে জানা বা সুন্দরের অনুধ্যান এ সবেরই লক্ষ্য হ'ল সুখলাভ। সিজউইক্-উক্ত এই তত্ত্বে মূর বিশ্বাস করেন নি। তাঁর মতে কল্যাণের অর্থ শুধু সুখ নয়। তিনি বললেন সুখ ভাল, সে কথা স্বীকার্য। সুখ কাম্য সে কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু সুখই যে একমাত্র কাম্য, মানবের সর্বকর্মের একমাত্র লক্ষ্য, এ তত্ত্বকে তিনি সত্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি। মিল এ কথা বললেন যে কল্যাণ, বাঞ্ছিত (Desired) ও বাঞ্ছনীয় (Desirable) সমার্থক। আবার মিল মনোবাঞ্ছার মধ্যে স্তর-ভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি উৎকৃষ্ট ও মহত্তর বাঞ্ছিতের (Better and Nobler objects of desire) কথা ব'লে কল্যাণের স্তর-ভেদের ইঙ্গিত করেছেন। কেননা মিলের সংজ্ঞা অনুসারে যা পাওয়ার ইচ্ছা মানুষ করে তাকে ভালো বলতে হবে আবার মহত্তর অভিলাসের বস্তুকে অধিকতর কাম্য, অধিকতর কল্যাণকর ব'লে স্বীকার করতে হবে। তা ব'লে এ কথা সত্য যে মানুষের কাম্য বস্তুই ভাল

১। **Principia Ethica**, পৃ: ৪৯

বা কল্যাণকর নয়। আরো ভালোর, মহত্তর কল্যাণের ধারণা তাহ'লে কেবলমাত্র আমাদের চাওয়ার উপরেই নির্ভর করে না। মিলের এ কথা কি গ্রহণযোগ্য যে বাঞ্ছিত ও বাঞ্ছনীয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য রকম মত দেয়। সে বলে কেবলমাত্র চাওয়াই ত কল্যাণের রূপ নির্ধারণ করে না। আর তাই যদি করত তাহ'লে বাঞ্ছনীয় ব'লে কিছু থাকত না। আমাদের চাওয়াটাই পরম চাওয়া হ'ত। সেখানে আদর্শ চাওয়া বা বাঞ্ছনীয়ের সাথে বাঞ্ছিত অভেদাত্মক হ'ত। মিলের এই ভ্রান্তিকে মূর প্রাকৃতিক প্রমাদ আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কল্যাণকে কখনই সুখের সাথে সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কল্যাণের চারদিকে একটা দুর্জ্ঞেয় ভাবের অস্তিত্ব আছে।

মূর সুখবাদের বিরুদ্ধে আর একটি 'গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি' তুলেছেন। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীরা এ কথা বলেছেন যে কোন কিছু চাইবার মূলে আছে সেই অভিপ্রেত বস্তুটি পাওয়ার প্রত্যাশিত আনন্দের ধারণাটুকু। মূর এই তত্ত্বের প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে কেবল আনন্দের ধারণাটুকু কখন অভিলাষকে (Desire) জাগ্রত করতে পারে না। অভিলাষকে বা ইচ্ছাকে জাগ্রত করার জন্য আনন্দের প্রয়োজন। অভিলাষিত বস্তুটির ধারণা মনের মধ্যে যে আনন্দের সৃষ্টি করে সেই আনন্দই ইচ্ছাকে নতুন করে জাগ্রত করে। যদি মূরের মতকে গ্রহণ করতে হয়, তবে অভিলাষিত বস্তুর ধারণাসম্ভূত আনন্দ ও সুখকে ঐ অভিলাষ পূরণের আনন্দ থেকে পৃথক ক'রে দেখা শক্ত হবে। প্রসঙ্গতঃ মূরের দেওয়া উদাহরণটি ব্যবহার করছি। মদ্যপান করব এই ধারণাজনিত যে আনন্দ সে আনন্দের সঙ্গে মদ্যপানজনিত আনন্দের পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন হবে অর্থাৎ অভিলাষের আগের আনন্দ ও পরের আনন্দ—এই দুই আনন্দের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত অভিলাষ বা ইচ্ছার মধ্যে যে একটি অভাববোধ আছে সে বোধটিকে মূর অস্বীকার করেছেন। ইচ্ছার (Desire) মূলেও যদি আনন্দ থাকে ও অভাববোধ না থাকে এবং তজ্জনিত বেদনা না থাকে, তা হ'লে অভিলাষ বা ইচ্ছা যে মানুষের সমস্ত কর্মের প্রেরণা সে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। যদি ইচ্ছার মূলেই আনন্দ থাকে তবে ইচ্ছা পূরণের উদ্যম আর মানুষের

মধ্যে আসবে না। সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত চেষ্টার অপমৃত্যু ঘটবে। এইদিক থেকে দেখলে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদীদের আনন্দের ধারণাটুকু মূরের যথার্থ আনন্দের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সুখবাদীদের আদর্শ বা মত গ্রহণ করলেও বিতর্কের অন্ত থাকে না। সুখের সংজ্ঞা. বিভিন্ন রকমের ভিন্নধর্মী, ভিন্নরুচি মানুষের সুখের ধারণা ও আদর্শ কোন কালেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নয়। কাজে কাজেই সুখকে কল্যাণের নির্দেশক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে মানুষের নৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই মূর সুখকে যথাযোগ্য স্থান দিয়েও কল্যাণকে আরো উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন যে সুখ এবং কল্যাণ সহচর বটে তবু সুখকে দিয়ে পুরোপুরি কল্যাণকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কল্যাণ হ'ল অসংজ্ঞেয়। তিনি তাঁর সুনিপুণ বিশ্লেষণান্তে এই কথাই আমাদের বললেন:

Good, then is indefinable, কল্যাণ হল অসংজ্ঞেয়।

ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা

এই আলোচনাটি একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করছি।

"India is not only the land of romance or art and beauty. It is in religions earth's central Shrine. India is religious." (Cramb) ধর্ম এবং নীতি ভারতীয়দের জীবনে এবং কৃষ্টিতে যে প্রাণরস সঞ্চার করেছে তার কালগত উৎস অতীতের তমিস্র গর্ভে লুপ্ত হয়ে আছে। আমাদের এই ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে আত্যন্তিকভাবে ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য এবং পরম কাম্য এক পরম কারুণিক মহাসত্তার ধারণা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মজীবনে ভগবানের অস্তিত্ব অবিসংবাদী। ধর্মজীবন এই পরম সত্তাকে কেন্দ্র ক'রেই উৎসারিত এবং আবর্তিত। আমাদের ধর্মজীবনের সবটুকু প্রত্যাশা ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানকে ঘিরে। ভগবদ্ করুণা লাভের প্রস্তুতিটুকু মানুষের ধর্মজীবনের অঙ্গ। এই প্রস্তুতি হ'ল আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি আসে নীতিআচরণের মাধ্যমে নৈতিক সংস্কার ধর্মসংস্কারের আনুকূল্য করে, আবার ধর্মসংস্কার নীতিসংস্কারকে করে প্রাণবাণ। যেখানে ধর্মের বিকার ঘটেছে সেখানে নীতি পথভ্রষ্ট হয় আর যেখানে কলুষ-নীতির আধিপত্য সেখানে ধর্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ক্ষেত্রবিশেষে নৈতিক সংস্কারের নব নব রূপায়ণ ঘটে ধর্মীয় প্রেরণায়। নতুন ধর্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মহাজনেরা নীতির ক্ষেত্রে নতুন ভাবাদর্শের প্রর্বতন করেছেন। এসব নজির ইতিহাসে অনেক মেলে। ধর্ম এবং নীতি পরস্পর পরিপূরক।

তবে এ কথাও সত্য যে এমন চিন্তাধারা রয়েছে যেখানে ধর্ম এবং নীতির এই পারস্পরিক সম্পর্কটুকু অস্বীকৃত। উদাহরণ হিসেবে প্রত্যক্ষবাদীদের (Positivists) কথা বলা যায়। এঁদের কাছে নীতি সত্য হ'লেও ভগবদ্ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কোন ধর্মজীবন সত্য নয়। নীতিজীবন সমাজভিত্তিক এবং সামাজিক, ধর্মজীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং

গোপনতাচারী। ধর্ম যেখানে সমাজগত হয়েছে, সেটা ধর্মের বহিরঙ্গ, তাকে আমরা ধর্মাচার বলব। ধর্ম যেখানে নেই, শুধুমাত্র আচারের খোলসে আবৃত হয়ে ধর্মাচারী হওয়া যায় না। ধর্মের মূল কথা হ'ল ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক। এই পবিত্র অন্তর্গূঢ় আধ্যাত্মিক সম্বন্ধটুকুর সম্ভাবনাই সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে আত্যন্তিক ধর্মভাব এবং আচার এদের দুটিকেই ধর্মের অঙ্গ ব'লে মেনে নেওয়া উচিত। হিন্দুধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন অধ্যাপকপ্রবর ডকটর টি. এম. পি· মহাদেবন্। আচারকে ধর্মজীবনের অঙ্গ বললে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সমাধান সহজসাধ্য নয়। বৈদিক আচারের নানান রূপভেদ ঘটেছে। কোন্‌টিকে স্বীকার করব এবং কোন্‌টিকে করব না তা' নিয়ে বহু ভাবনার অন্ত থাকে না। এই আচার স্বীকৃতির মানদণ্ড কী হবে তা নিয়েও বহু বাদানুবাদ চলবে। কাজে কাজেই আমরা ধর্ম বলতে আচারকে বুঝব, না ভগবানের সঙ্গে অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মত আমাদের যে সম্বন্ধটি প্রতিনিয়ত আমাদের সমগ্র সত্তাকে ধারণ ক'রে আছে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধটুকুই বুঝব? ধর্মশিক্ষা মন্ত্রদানের মতই গুহ্য ব্যাপার। বিদ্যায়তনে এই অর্থে ধর্মশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যদি ধর্মকে কেউ আচারগত এবং অনুষ্ঠান আশ্রয়ী ব'লে মনে করেন তবে তা' বিদ্যালয়ে পালন করাও যেতে পারে এবং এই ধরনের ধর্মশিক্ষা দেওয়াও সম্ভবপর হ'তে পারে। কিন্তু যে ধর্ম মানুষের অন্তরশায়ী, যাকে সদ্ধর্ম বলা হয়েছে, তা' মানুষ একান্তে আচরণ করে। তা' কাউকে শেখানো যায় না। এর উদ্বোধন ঘটে ভিতর থেকে। আমরা যাকে সাধারণতঃ ধর্মশিক্ষা ব'লে থাকি তা' নীতিশিক্ষারই নামান্তর। ধর্মের উপাখ্যান ব'লে বা ধর্মশাস্ত্র থেকে কিছুটা পাঠ ক'রে শিক্ষার্থীকে তা' থেকে নীতিকথা শিক্ষা দিই। হয়ত বা তত্ত্বকথা শেখাই। একে দর্শনশিক্ষা বা নীতি-শিক্ষা বলব। একে ধর্মশিক্ষা বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ধর্মশিক্ষার নামে কোন এক বিশেষ ধর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শন করাই ধর্মশিক্ষকদের লক্ষ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচার কার্যকেও ধর্মশিক্ষা বলব না। এই দৃষ্টিবিন্দু থেকে বিচার করলে সাতচল্লিশ-

উত্তরকালে এদেশে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ করায় ধর্মের হানি ঘটেনি। ধর্মব্যবসায়ীদের অসুবিধা হয়ত ঘটেছে। ধর্মের নামে যে ধর্মান্ধতা এবং ভেদবুদ্ধির বীজ রোপিত হচ্ছিল সংখ্যাহীন শিক্ষানিকেতনে, তার বিনষ্টিসাধন করেছে রিপাব্লিকান ভারতবর্ষের নব্য শাসনতন্ত্র।

ধর্মশিক্ষা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ এদেশের বিদ্যালয়ে অসিদ্ধ হ'লেও নীতি-শিক্ষার অবকাশ এখানে সুব্যাপ্ত। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান-লাভ নয়। শিক্ষার অর্থ মানুষের সমগ্র চেতনায়, তার সমগ্র সত্তায় শৃঙ্খলাবোধ আনা। চিন্তায় ও কর্মে যে মানুষ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করল, তার শিক্ষা সম্পূর্ণ। এই ধরনের শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে আজও অলভ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সমগ্র চেতনায় শৃঙ্খলাবোধ আনা। এর জন্য তথ্যের দরকার, তত্ত্বের দরকার, নীতিকথার দরকার, ধর্মের দরকার, দর্শনের দরকার, তাই নীতিশিক্ষা প্রবর্তনা সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত। নীতি মানুষের বোধকে ন্যায়শাসিত করে, বুদ্ধিকে শুভবুদ্ধির পর্যায়ে উন্নীত করে। এই নীতিই হ'ল ধর্মজীবনের সোপান। আধ্যাত্মিক সংযম আসে নৈতিক সংযমের ভিতর দিয়ে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এরা পঞ্চশীলের তত্ত্বে বিশ্বাসী।

হিন্দু জীবনবাদের পঞ্চনীতি হ'ল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পঞ্চশীল হিন্দু জীবনধারাকে সংযমের মহিমা দান করে। এই পঞ্চনীতিকেই ধর্ম বলা হয়েছে এবং এই নীতি-আচরণই ধর্ম আচরণ। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করলে এই ধরণের সামাজিক আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধর্ম মানুষের শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "Religion is the innermost core of education." প্রাচীনকালে ধর্মশিক্ষাই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যায়তন ছিল ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ব্রাহ্মণ ও ধর্মযাজকগণের হাতে ছিল শিক্ষাদানের ভার। ভারত ও ইয়োরোপের মধ্যযুগে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। আধুনিককালে শিক্ষার উদ্দেশ্য বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবন্ধন নীতি শাস্ত্রানুগ। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্বন্ধ, সমাজের বিভিন্ন

মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এই নীতিশাস্ত্রে অনুমোদিত হ'লে বিরোধ-দ্বন্দ্বের অবসান হয়। ব্যক্তি ও সমাজ স্ব স্ব অভীপ্সিত পথে আত্মোন্নতি ঘটাতে পারে। সত্য কথা বলা, জীবে দয়া, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেমবান হওয়া, এসব তত্ত্ব নীতিশাস্ত্র কথিত। নীতিশাস্ত্রের অনুজ্ঞা পালনে পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের পথ সুগম হয়। এই নীতিশাস্ত্র পালন যেমন একদিকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে শৃঙ্খলা, সংযম ও পরিমিতিবোধ এনে দেয়, অন্যদিকে আবার পরোক্ষভাবে ধর্মজীবনকে উদ্দীপ্ত করে। খ্রীস্টধর্মের ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে প্রধানতম হ'ল: 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।' এই ভালবাসার মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে যে ভগবান স্বপ্রতিষ্ঠ তাঁকে ভালবাসা হবে। এই অনুশাসনটির শুরু নীতিশাস্ত্রে কিন্তু তার শেষ হ'ল ধর্মজীবনে। ধর্মের দ্যোতনা তার সার্বিক ইঙ্গিতে নীতিশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, দর্শনে প্রত্যক্ষ, বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ, কাজে কাজেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তা' সে যে ধরনের জ্ঞানলাভই হোক না কেন, ধর্মজীবন পুষ্ট হয়। ধর্মপ্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই বোধ হয় আনুষ্ঠানিক ধর্মে শিক্ষাদান ভারতীয় শাসনতন্ত্র-প্রণেতারা এদেশের ছেলে-মেয়েদের জন্য আবশ্যিক ব'লে মনে করেন নি। নৈতিক জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই মানুষের ধর্মজীবন পুষ্ট হয়। মহাভারতকার বিশ্বধর্মের প্রসঙ্গ অবতারণা ক'রে বললেন: 'তুমি নিজে যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর না সে ব্যবহার অন্যের প্রতি করো না। তোমার জন্য যা কিছু প্রত্যাশা কর, সেই প্রত্যাশাটুকু অপরের জন্যও করবে।' ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা যে সত্য উদ্ঘাটিত করল তা-ই ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হ'ল খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীতে: "Whatsoever ye would desire that men should do unto you, do ye even so to them." খ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ছুশো বছর পরে ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন: "সেই হবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম যখন তুমি তোমার জন্য যা ইচ্ছা কর তা-ই অপরের জন্য ইচ্ছা করবে। যে বেদনা তোমার পক্ষে পীড়াদায়ক, তাকে অপরের পক্ষেও পীড়াদায়ক মনে করবে"—(হাদিস)। সেই একই নীতিকথা যা হ'ল সার্বিক, তা যুগে যুগে উচ্চারিত হ'ল। বুদ্ধদেব, মহাবীর, কনফুশিয়াস সেই একই কথা বললেন। মনুসংহিতা,

গীতা, ভাগবত এই মন্ত্রটিকে বিভিন্ন স্বরগ্রামে আবৃত্তি করলেন। তত্ত্ব এক, নির্দেশ এক, শুধু পরিবেশ এবং পরিবেশন ভঙ্গী ভিন্ন।

বর্তমানের পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার যে কতখানি প্রয়োজন তার পুনরালোচনা হওয়া একান্ত দরকার। এ বিশ্বাস শিক্ষা-অধিকর্তাদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ভারতের চিন্তানায়কেরা আজ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এই যে বিশ্ব জুড়ে মানুষে মানুষে কাটাকাটি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাকার অশান্তির আতঙ্ক রয়েছে, এর মূল কারণ আমাদের নৈতিক অধঃপতন এবং আদর্শের অভাব। আমাদের জীবনযাত্রা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভেসে চলেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষাদানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। মানুষ যদি মানুষকে মর্যাদা দিতে শেখে তবে সেই শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে যে মানবীয় ধর্মপালনের জন্য মনুষ্যসমাজকে উদ্বুদ্ধ করলেন তা' একদিকে যেমন ঔপনিষদিক ভাবপুষ্ট, অন্যদিকে আবার তা' ইয়োরোপীয় প্রত্যক্ষ-বাদীদের প্রভাবেও প্রভাবান্বিত। মানুষের মধ্যেই মানবীয় মূল্যের পরিপূর্ণ বিকাশ-সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ ক'রে, আদর্শ মনুষ্যত্বকে লক্ষ্য ক'রে যদি আমাদের জীবনচর্যা চলে তবে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে, অন্যথায় আস্তিক্যবাদীদের চোখে নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা সার্থক হবে না। নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষার পরিপূরক। এই উভয় শিক্ষাই শিশু মনের, কিশোর মনের গঠনের এবং পরিপুষ্টি সাধনের একান্ত অনুকূল। নীতি-শিক্ষা ছাত্রছাত্রীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যে দেশের মানুষ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, সে দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের বিপদ আছে। এখানে 'ধর্মশিক্ষা' বলতে আমরা অনুষ্ঠানগত ও আচারগত dogma শাসিত ধর্মের কথা বলছি, যেমন—হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম। এই সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মকে প্রচারের সুবিধা দিলে, ছাত্রসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে। তাই আমাদের নব্য শাসনতন্ত্রে ধর্মশিক্ষাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিশুরা আপন পরিবারে, আপন আপন সমাজে ধর্মশিক্ষা করবে ; সেখানেই তাদের ধর্মশিক্ষা পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মকে বিদ্যালয় গৃহে আমদানি

করার সুযোগ দিলে তার কি ভয়াবহ পরিণাম ঘটে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ১৯৪৬ সালের ধর্মোন্মাদদের প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায়। তাই আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রণেতারা এ দেশকে 'সেক্যুলার স্টেট' আখ্যা দিয়ে অনুষ্ঠান ও আচারগত dogma শাসিত ধর্মশিক্ষাকে এ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে অপাংক্তেয় করে দিয়েছেন। অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই ঘটবে দেশের এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি গ্রহণের ফলে।

ধর্ম আমাদের দেশের আকাশে-বাতাসে। দেশের মাটিতে আর মানুষের মজ্জায় যে ধর্মের বীজ উপ্ত হয়েছে তা একদিন মহীরুহ হবেই। গৃহে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ আমাদের মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করবে, দেশের ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করবে, মানুষকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে মহীয়ান করে তুলবে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান বাঁচতে পারে না। আমাদের জাতীয় ধর্ম এবং নীতিগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে আমরা চলতে পারি না। তাই আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের পক্ষে ধর্ম এবং নীতি—এই উভয়বিধ শিক্ষাই একান্তভাবে কল্যাণকর হবে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই জীবনে সংযম আসবে, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিমিতিবোধের দ্বারা লালিত হবে। ধর্ম এবং নীতির ক্ষেত্রে যে সব মহাপুরুষের অমৃতময় উপদেশ রয়েছে, তা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সচ্চিন্তায়, সৎকর্মে ও সম্যক্ জীবনসাধনায় উদ্বুদ্ধ করবে। যে অসংযম আজ অতি আসন্ন তাকে প্রতিরোধ করবার হাতিয়ার হল এই ধর্ম এবং নীতিশিক্ষা। এই শিক্ষাই মানুষকে আধ্যাত্মিক মূল্যে আস্থাবান করে। আধ্যাত্মিক জীবন ধীরে ধীরে এই শিক্ষার মাধ্যমেই বিকাশলাভ করে। পৃথিবীর মহাপুরুষরা এই আধ্যাত্মবিদ্যার কথা বার বার বলেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন শুভবুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ মানুষের ধর্মে আস্থাবান হোক্, নরনারায়ণকে পূজা করুক, সর্বশক্তিমানের আরাধনা করুক আপন জীবনের সুপরিসর ব্যাপ্তিতে। এঁদের আধ্যাত্মিক সাধনায় রাম এবং আল্লা, খ্রীষ্ট এবং কৃষ্ণ সমার্থক। তাঁরা সর্বধর্মসমন্বয়-বাদী ছিলেন। তাঁরা আমাদের পরমতসহিষ্ণুতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়েছেন, পরধর্মাবলম্বীকে ভালবাসতে বলেছেন:

"তারা বলে গেল ক্ষমা কর সবে
বলে গেল ভালবাস,
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ।"

আমরা এই মহামানবদের আবেদনে কর্ণপাত করিনি। ভারতীয় ইতিহাসের চরমতম দুর্দিনেও আমরা পরম উপেক্ষায় এঁদের ফিরিয়ে দিয়েছি ব্যর্থ নমস্কারের আস্ফালনে। যে ভগবৎ-প্রেরণা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা' আমাদের কাছে অলভ্য থেকে গিয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে প্রতিকূল পরিবেশে আমরা ঘৃণা করলাম পরস্পারের ধর্মবিশ্বাসকে। বিদ্বেষের কালোমেঘে ছেয়ে গেল আমাদের অন্তরাকাশের প্রত্যন্ত সীমা। আমরা ভুলে গেলাম যে সব ধর্মের ভগবানই সেই একই ষড়ৈশ্বর্যশালী পরম সত্তা। মহাপুরুষের সাবধানবাণী ব্যর্থ হয়েছে অতীতে। নতুন পৃথিবীতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে তার জন্য আমাদের চেষ্টিত হতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নীতিশিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নতুন জীবনের উত্তরাধিকার দিতে হবে। নীতি-শিক্ষার ক্ষেত্র হবে বিদ্যালয়গুলি, ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্র হবে গৃহ এবং সামাজিক পরিবেশ। পৌরাণিক কাহিনী, শাস্ত্রীয় উপাখ্যানের উপদেশগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে দেশের মানুষের জীবনে ও মননে। এই পথেই ভারতীয় সুপ্রাচীন ধর্মবোধ আবার জাগ্রত হবে এ যুগের জড়বাদী চেতনায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মানুষের অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য শুধু পশুজীবনের শ্রীবৃদ্ধি নয়। আমাদের মননে ভগবদ্-প্রেরণাই পরম কাম্য। এ যুগের ছেলেমেয়েরা জীবনের পরম পরীক্ষার দিনে দুষ্টবুদ্ধিরূপী শয়তানকে যেন বলতে পারে—, 'Man does not live by bread alone but by the words of God.'

এই মহৎ জ্ঞানের জন্য তাদের শিক্ষায় এবং সাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে হবে। তবেই যুগধর্ম জড়বাদের অস্থিরতা থেকে রাহুমুক্ত হবে।

নৈতালিমের মর্মার্থঃ নৈতিক

নৈতালিম হ'ল মানুষের নৈতিক জ্ঞানের উদ্বোধক এক প্রাণদায়ী শিক্ষামন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ হ'বে এক পূর্ণাঙ্গ নৈতিক জীবনের ধারক ও বাহক। কাজ করতে করতে শেখো বা Learn while you earn এই ধরনের সহজ কথা ব'লে যাঁরা নৈতালিমের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাঁরা পাঠককে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেছেন বলেই মনে হয়। পশ্চিমদেশীয় প্রয়োজনবাদ অথবা ব্যবহারিক প্রকৃতিবাদের সমগোত্রীয় মনে করলে নৈতালিমের স্বরূপটুকু অনুপলব্ধ থেকে যাবে। নৈতালিম একটা বিরাট দর্শনের প্রবর্তন করেছে; সে দর্শন বলছে যে, মানুষের সামগ্রিক জীবনকে পূর্ণতাপন্ন করতে হবে। মানুষ যেখানে ব্যক্তি, যেখানে সে সহৃদয় সামাজিক, যেখানে সে গোষ্ঠীভুক্ত, সেখানে সে বিশ্বনাগরিক—মানুষের বহু রূপসমন্বিত এই বিরাট ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে চেয়েছে নৈতালিমী ব্যবস্থা। সাম্যবাদ এবং বিশ্বযোগ নৈতালিমের লক্ষ্য। যে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় কোন ভেদ নেই, না অর্থনৈতিক, না সামাজিক, না বর্ণগত, না জাতিগত, সেই সমাজব্যবস্থা হ'ল নৈতালিমের কাম্য, তা হ'ল তার নৈতিক লক্ষ্য। বিনোবাজী নৈতালিমের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে, নৈতালিম অর্থাৎ নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন ভাল বলব? তা নতুন বলেই কি ভাল? সব নতুনই কি ভালো হয়? ভাল হওয়ার মাপকাঠি কি নতুন হওয়া? না, তা নয়। নৈতালিম বিভেদহীন নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিভূমি: নৈতালিমকে আশ্রয় ক'রে দূর ভবিষ্যতে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে উঠবে। সেই নতুন সমাজের মানুষেরা শ্রমের মর্যাদা বুঝবে, উপলব্ধি করবে যে সব শ্রমই সম-মর্যাদা-সম্পন্ন; যিনি কাঠ কাটছেন, যিনি লোহা গালাই করছেন, আর যিনি শিক্ষকতা করছেন—তাঁরা সবাই সমান। হাতের কাজ আর মাথার কাজের দামের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না, যেমনটি আজকের দিনে রয়েছে। এই নতুন সমাজে সন্থ ম্যাট্রিক পাশ করা তরুণ যুবক আর বুড়ো

কুমোর, কুমারকে তুমি বলে সম্বোধন করবে না। কেন না, নৈতালিমের শিক্ষাদর্শনে সবরকমের কাজই হল নীতিসম্মত। যে মাঠে চাষ করছে, যে ধান কাটছে, যে জেলে মাছ ধরছে, আর যে লেখাপড়ার চর্চা করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছে, এদের সকলের কাজই নীতিশাস্ত্রানুগ। এরা সকলেই সম্মানার্হ। নীতি-মূল্যে কাজের যাচাই হবে—কাঞ্চন-মূল্যে নয়। কাঞ্চন-মূল্যে কাজের যাচাই হলে তবেই না ছোট বড় ভেদটা চোখে পড়ে। কাজের অর্থ নৈতিক মূল্যটুকু নির্ধারিত হবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে। প্রয়োজন কাজের মর্যাদা নির্ধারণ করবে না; ছোট বড় বিচারটা আর কাজ দিয়ে নিষ্পন্ন হবে না। আমরা যেন কাজের মর্যাদা এবং মূল্য বিচার না করি তার পারিশ্রমিকের বহর দেখে। পারিশ্রমিকটা যেন কাজের মূল্যবিচারের শেষ কথা না হয়। যে মানুষ দিনমজুরি করে, তার পরিশ্রমের মূল্য যৎসামান্য। সে যদি হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসে যার মূল্যায়ন আর দিনমজুরির মাপকাঠিতে মাপা চলে না, তখন তার মূল্য বিচার করতে হয় ভিন্ন মানদণ্ডে। মনে করা যাক্ দৈনিক দু'টাকা মজুরির দিনমজুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমজ্জমান একটি বালককে উদ্ধার করল। সে ত' দশমিনিটে প্রাণ রক্ষা করল বালকটির। এখন এই কাজটির মূল্য বিচার হবে কি দৈনিক দু'টাকা রোজের হিসেবে দশমিনিটের পরিশ্রমের মূল্য নির্ধারণ ক'রে? না, নীতিশাস্ত্রের কোন বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজটুকুর মূল্য যাচাই হবে? কাঞ্চন-মূল্যে দিন মজুরির হিসেব করে মানুষের কর্মের বিচার করা চলে না। তবু আমাদের এমনই মূঢ়তা যে, কাঞ্চন-মূল্যে আমরা মানুষের পরিশ্রমের মূল্য যাচাই করি। পরিশ্রমের মর্যাদা পরিশ্রম হিসেবে আমরা আজও দিতে শিখিনি। অসাম্য-কণ্টকিত সমাজ-ব্যবস্থায় পারিশ্রমিকের হার বিভিন্ন। মসীজীবী যে আয় করে, শ্রমজীবী তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম করেও সেই পরিমাণ উপার্জন করতে পারে না। মসীজীবী ত' তিন আঙ্গুলে কাজ করে, আর শ্রমজীবীর দশটি আঙ্গুলই পরিশ্রমে তৎপর। তবু তার মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান হয় না। ভিন্নধর্মী কাজের বিভিন্ন পারিশ্রমিকের হার দেশের মানুষের মধ্যে অসাম্যের বীজ বপন করছে। এই ধন-অসাম্য থেকেই অসন্তোষ উদ্ভূত হচ্ছে আর তা কালক্রমে ছড়িয়ে

পড়ছে সমাজের সর্বস্তরে। এই সর্বনাশা অসন্তোষকে রুদ্ধ করতে পারে নৈতালিম ব্যবস্থা। কেননা নৈতালিমের অর্থ নৈতিক ব্যঞ্জনা হল কায়িক শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকার বেড়াটাকে ভেঙ্গে দেওয়া। নৈতালিম-ব্যবস্থায় অমঙ্গলের সঙ্গে, অশুভের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই।

ভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখি যে' নৈতালিম কাজকে এবং লেখাপড়া করাকে, কর্মকে এবং জ্ঞানকে একাত্ম বলে বিবেচনা করে। কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, এ আলোচনাটা অবান্তর এবং অতিরিক্ত। কর্ম এবং জ্ঞানের সমন্বয় যেখানে ঘটে সেখানে নৈতালিম-ব্যবস্থা সফল হতে পারে। কাজ এখানে খেলারই সামিল; শিক্ষার্থী একবারও মনে করে না যে তাকে জোর করে কাজ করানো হচ্ছে বা কাজ করাটা তার রোজগারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ছেলে-মেয়েরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করতে শেখে, মুক্ত বাতাসে তারা আনন্দে কাজ করে; এই আনন্দের সঙ্গে তাদের কাজের যোগটুকু নিত্য সত্য। বিনোবাজী নৈতালিমতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন যে, নৈতালিম হল সৎ-চিৎ-আনন্দ, কর্ম, জ্ঞান এবং আনন্দ একাকার হয়ে গেছে এই নৈতালিমী ব্যবস্থায়। এই শিক্ষার মাধ্যমে কাজ খেলা হয়ে ওঠে আর খেলার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভ করে; সেই জ্ঞান সার্থক হয়ে ওঠে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। মানুষ যখন কাজের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পায় তখন তার কর্মের পুরস্কারটুকু কর্মের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে থাকে। তাই মিথ্যা গর্ব আর অহংকারের ঝুটো রাঙতায় কাজকে মুড়িয়ে ধ'রে তার মূল্য যাচাই করতে হয় না। আর ঝুটো রাঙতায় সাজসজ্জা করে নকল রাজা মন্ত্রীরা দেশে-বিদেশে ছুটাছুটি করে বেড়ায় না; সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

ভারতীয় সমাজে এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত দুরূহ। অস্পৃশ্যতার দ্বারা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রমুখ নানান ভেদবুদ্ধির দ্বারা আমরা আমাদের সনাতন ভারতীয় সমাজকে শতধাবিভক্ত করে রেখেছি। আর সেই ভেদরেখাগুলোর এপারে-ওপারে মেশবার কোন পথ খোলা রাখিনি। আধুনিক যুগে নব্য মিলনতন্ত্রটুকু মিলেছে নৈতালিমী ব্যবস্থায়, এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ববিধ বিভেদবিনাশক। বিনোবাজী বললেন

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-৯

যে, নৈতালিমী ব্যবস্থা শেষনাগের সঙ্গে তুলনীয়। শেষনাগ যেমন অনন্তশক্তির আধার, যেমন তা বিশ্বভুবনকে মাথায় ধারণ করে আছে, ঠিক তেমনি নৈতালিমী ব্যবস্থা বিশ্বজোড়া আধুনিক সমাজকে ধারণ করে রাখতে পারে। এই শিক্ষায় আমরা জীবনের প্রায়োজনিক অঙ্গটাকে ভুলি না, জীবনধারণের জন্য প্রায়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞানের চর্চা আমরা করি, এবং বাঁচার মত বাঁচতে হলে যার প্রযোজন নেই সেই জ্ঞানচর্চার দিকে নৈতালিমের কোন ঝোঁক নেই। তবে নৈতালিমী ব্যবস্থায় এ অনুশাসনও রয়েছে যে কোন জ্ঞানচর্চার সুযোগই হেলায় হারাবে না। প্রথমদর্শনে এদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে বলে মনে হলেও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে এদের মধ্যে সত্যিকারের কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, নৈতালিমী-ব্যবস্থার সমাজদর্শনগত লক্ষ্য হল সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যের দিকে ধ্রুবদৃষ্টি প্রসারিত ক'রে আমরা যদি জ্ঞান এবং কর্মের অনুশীলন করি, তা হলে আর উপরিউক্ত বিরোধের অস্তিত্ব থাকে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে নৈতালিমী ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্যবাদের উদ্বর্তন সম্ভব, এমন কথা বিনোবাজীও বিশ্বাস করেছেন একান্তভাবে। আর বিনোবাজীর এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে স্বয়ং গান্ধীজির প্রেরণা। গান্ধীজি এ কথা বার বার বলেছেন যে, জাতির হাতে তিনি যে শ্রেষ্ঠ দানটি দিয়ে গেলেন—তা হল নৈতালিম ব্যবস্থা। গান্ধীজি ভেবেচিন্তে অপ্রগলভ কথা বলতেন। তাই কেবল কথার কথা হিসেবে আমরা যেন এই উক্তিটিকে গ্রহণ না করি। গান্ধীজি তাঁর ঋষিদৃষ্টি দিয়ে এই মহৎ সত্যটুকু দেখেছিলেন যে, বিংশ শতকে সাতচল্লিশ-উত্তরকালে ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে তার জন্য প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থার। এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থাই এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করতে পারবে। এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা আদি মানুষকে দেওয়া তিনটি দৈবদানের তত্ত্বকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল। মানুষের ক্ষুধা, তার সহজাত সহানুভূতি আর তাঁর জিজ্ঞাসা তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে মানুষকে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়েছে, তার বুদ্ধিকে রীতিমত খেলিয়ে তবেই সে তার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পেরেছে। ক্ষুধার

তাড়নায় যখনই সে কোন কাজে হাত দিয়েছে অমনি সে জ্ঞানলাভ করতে আরম্ভ করেছে তার চারপাশের বস্তু জগৎ সম্বন্ধে। তার শিক্ষালাভ শুরু হয়ে গেছে তখনি। মানুষের এই ক্ষুধার তাড়নাটুকু না থাকলে সে কাজও করত না, আর তার ভাগ্যে জ্ঞানলাভও ঘটে উঠত না, আর জ্ঞানলাভ না ঘটলে তার বুদ্ধিবৃত্তিও শাণিত হবার সুযোগ পেত না। এইভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াসের পথেই আমাদের প্রথম শিক্ষালাভ ঘটে। প্রকৃতির এই আদিম শিক্ষাদানপদ্ধতিটুকু নৈতালিমী ব্যবস্থায় বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের সহজাত সহানুভূতি এবং মমত্ববোধ তাকে, তার প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখের অংশভাগী করেছে। তাইত সে তার প্রতিবেশীকে দেখেছে একান্ত আপনজন হিসেবে। এর ফলে উভয়ে উভয়কে জানবার সুযোগ পেয়েছে। মানুষ মানুষকে জেনেছে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এই জ্ঞানের সূত্রপাতই তার জিজ্ঞাসাকে বারবার উদ্দীপ্ত করেছে। নতুন থেকে নতুনতর জ্ঞানের সন্ধান সে করেছে। এমনি করেই তার জানার জগৎ বিস্তৃতিলাভ করেছে। লোক থেকে লোকান্তরে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে তাঁর জগতের সীমানা প্রসারিত হয়েছে তার আন্তর কৌতূহলের, তার জিজ্ঞাসার প্রসাদে। উপরি-উক্ত তিনটি দৈবাদানকে ভিত্তি করেই নৈতালিম ব্যবস্থার পরিকল্পনা। এই বুনিয়াদী শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। আগামী যুগের সমাজ-ব্যবস্থা যে নৈতালিম শিক্ষাব্যবস্থাকে আশ্রয় করবে তার মধ্যে একদিকে রয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা আর অন্যদিকে রয়েছে কারুকলা। এই দুয়ের সম্মিলন ঘটেছে এই নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থা সত্য, সহযোগিতা, অহিংসা এবং সামাজিক সমতার মন্ত্র প্রচার করে।

এই নৈতালিমী ব্যবস্থার জনক হলেন গান্ধীজি। শিক্ষা হ'বে পুরোপুরি নৈতিক।* দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের অগণিত

* তাই ত' গান্ধীজি Aldous Huxley ব্যাখ্যাত উপায় এবং উপেয় (Ends and means) তত্ত্বটির সঙ্গে একমত না হয়ে বললেন যে End অর্থাৎ উপেয়কে উপায়ের মতই নৈতিক বা নীতিসম্মত হ'তে হ'বে! অনৈতিক উপায়ের দ্বারা কখন কখন সাধু উপেয়ে উন্নীত হওয়া গেলেও গান্ধীজি এই উপায় এ উপেয়ের কোনটিকেই গ্রহণ করেননি। কেননা অনৈতিক উপায়ের দ্বারা সাধু উপেয়ে কখন যদি বা উপনীত হওয়া যায়, তখনো কিন্তু অসাধু উপায়ের জন্যই সাধু উপেয়ের স্বধর্মনাশ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব যখন গিয়ে পড়ল জাতীয় সরকারের ওপর, তখন গান্ধীজি এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন। দরিদ্র দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের অমোঘ অস্ত্রটি গান্ধীজি জাতীয় সরকারের হাতে তুলে দিলেন। তিনি বললেন, সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে; এই প্রাথমিক শিক্ষার সময়েই মাধ্যমিক স্তরে দেয় সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার্থীকে দেবার ব্যবস্থা থাকবে; এই শিক্ষা হবে কর্মাশ্রয়ী শিক্ষা। কাজ করতে করতে ছেলেমেয়েরা উপার্জন করবে এবং শিখবে। স্বোপার্জিত অর্থে দরিদ্র ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা বিদ্যাভ্যাস করবে। গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখিত বিবিধ প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষা-পরিচালনার ব্যাখ্যা করলেন। বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তাঁর পরিকল্পনাটি 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত জাকির হোসেন কমিটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বললেন যে, মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে গান্ধীজির পরিকল্পনা সত্যসত্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রসূ। আধুনিক শিক্ষাদর্শনের পটভূমিতে নৈতালিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তৃতীয় স্তবক ঃ শিক্ষা-দর্শন

শিক্ষা-দর্শন

শিক্ষা-দর্শন ও মনোবিজ্ঞান

হিন্দু শিক্ষাদর্শ

বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শ

গ্রীসের শিক্ষাদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

মানুষের যে চারিত্র-প্রবণতা সহজাত তাকে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে তোলাই হল শিক্ষার কাজ। মানুষ অতীত জীবনের সম্পদকে বহন করে নিয়ে আসে তার বর্তমান জীবনে। পূর্ব জীবনের কৃতকর্মের ফলবানতায় বিশ্বাস না করলে একই পরিবারের আবহাওয়ায় পুষ্ট একই পিতামাতা থেকে জাত দুটি সন্তানের ভিন্ন মনন-ধর্মিতার কোন সদব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য এই বিভেদকে একান্তভাবে আকস্মিক বললে আর জন্মান্তরবাদ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করতে হয় না। তবে শুধুমাত্র 'আকস্মিক' বলে ব্যাখ্যা করলে তাকে আমরা ব্যাখ্যা বলব না, তাকে অপব্যাখ্যা (Explaning it away) বলব। মানুষের মধ্যে এই শক্তি-সামর্থ্যগত প্রভেদগুলো পণ্ডিতজন-স্বীকৃত। দার্শনিক প্লেতো থেকে আরম্ভ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই প্রভেদকে স্বীকার করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ভিত্তিতে এই পারস্পরিক বিভেদকে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্যালটন, চারেট, ক্যাটেল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা মানুষের মধ্যেকার আত্যন্তিক বিভেদটুকুকে পরিষ্কার করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। এঁদের মধ্যে কেউ বা ব্যক্তি-জীবনে বংশানুক্রমিকতার প্রভাবকে সবচেয়ে বড় বলেছেন, আবার কেউ বা বলেছেন যে, মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাবই প্রধান। কোন্ প্রভাবটা সবচেয়ে বড় সেটা নির্দেশ করা দুরূহ। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বংশানুক্রমিকতা এবং পরিবেশ—এ দুটোই শিশুর উত্তর জীবনকে প্রভাবিত করে।[১] শিক্ষক শিক্ষার্থীর বংশানুক্রমিকতা এবং তার সহজাত শক্তিটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হবেন; যথাযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে সুন্দর মানুষ কৃষ্টিবান

১। Gates-এর 'Psychology for Students of Education', গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

মানুষ, আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা যায়, এটাই হল সমস্ত শিক্ষা-দর্শনের গোড়ার কথা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধি, কল্পনা, মেধার বিশেষ পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। বংশানুক্রমিক যে-সব প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে দেখা যায় তারও মূলোচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্য হবে খারাপ প্রবৃত্তিগুলোকে সংযত করে ভালো প্রবৃত্তিগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। এর জন্যই আমরা শিক্ষার লক্ষ্য এবং আদর্শের কথা চিন্তা করি। এর জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানান্ দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ করা হয়। অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মতই শিক্ষা-দর্শনও সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়ে ওঠে।

শিক্ষা-দর্শন বলতে একটা বিশিষ্ট দর্শনমতের সামগ্রিক প্রয়োগ বোঝায় শিক্ষাক্ষেত্রে, এইধরণের ব্যাখ্যা করলে তা সমর্থন করা শক্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব দর্শনমত আমরা প্রয়োগ করি তার বহু বিকার এবং পরিবর্তন সাধন করতে হয় প্রয়োগের সুবিধার জন্য। Naturalism বা স্বভাববাদ বলতে আমরা দর্শনের ক্ষেত্রে যে বিস্তৃত প্রকৃতিবাদকে বুঝি, শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক তাকে বুঝি না। তার বহু সংকোচন ঘটে। দর্শনের প্রকৃতিবাদ বলতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রকৃতিবাদকে বুঝি, যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদকে বুঝি ও প্রাণজ প্রকৃতিবাদকে বুঝি; শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষোল্লিখিত প্রকৃতিবাদের প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়েছে। যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদের সামান্য প্রভাবও পড়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই উক্তির সত্যতা আরও উদ্ঘাটিত হবে যদি আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বভাববাদীদের অগ্রগণ্য রুশোর মতামত নিয়ে আলোচনা করি। বস্তুতঃ, প্রকৃতিবাদ হল রেনেসাঁসের অবনমিত মানবতাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তিনি তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ Emile (Education) এ বললেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে উল্টে দাও তা হলেই ঠিক পথে চলা হবে। আমরা যে-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি তা আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং স্ববিরোধী চিন্তার কথাই ঘোষণা করেছে। কাজে কাজেই এই ধরনের স্কুলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। বালককে 'সুবোধ বালক' করতে গিয়ে আমরা তার মানবিক গুণগুলোকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলি। আমরা

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তার ফলে ভবিষ্যতের স্বপ্নও অলব্ধ থাকে, বর্তমানের সত্যও উপেক্ষিত হয়। তাই প্রকৃতিবাদী ম্যাকডুগ্যাল বললেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রবৃত্তিগুলোকে স্বাভাবিক পথে চালিত ক'রে প্রকৃতি মানবজীবনের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। এ কথাই এঁরা বলছেন যে, প্রকৃতি মানুষের জন্য কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শ নির্দেশ ক'রে দেয়নি; পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটলেই ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তাই আমাদের শিখতে হবে কেমন ক'রে চললে প্রকৃতির সঙ্গে, আমাদের পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে চলা যায়; যেন কোথাও তালভঙ্গ না ঘটে। নব্য ডারুইনীয় মতবাদের প্রভাবে শিক্ষাবিদ্‌রা এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, পরিবেশের সঙ্গে মানুষকে সম্যক্‌রূপে মানিয়ে চলার শিক্ষা দেওয়াই হল নব্য প্রকৃতিবাদের গোড়ার কথা। এখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠবে যে, প্রকৃতি বা আমাদের পরিবেশের সঙ্গে যদি আমাদের জীবনযাত্রা কোথাও অসঙ্গত না হয় তা হ'লে শুধুমাত্র ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বটুকু নির্বিঘ্ন হবে না অন্য কোন ফললাভও মানুষের ভাগ্যে ঘটতে পারে? যে বিবর্তনের সরণী বেয়ে আমরা প্রাণীজগতের নিম্নতম সোপান বেয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান-সমৃদ্ধ বর্তমান জীবনের অধিকারী হয়েছি, সেই বিবর্তনের উপর প্রকৃতিবাদের প্রভাব কতটুকু? বার্নার্ড শ প্রমুখ মণীষীরা এর উত্তরে বললেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে নব্য প্রকৃতিবাদের প্রয়োগ করলে এ কথা আমাদের বুঝতে হয় যে, বিবর্তনের ধারাকে এই শিক্ষা দ্রুততর করবে। বংশানুক্রমিকতার মধ্য দিয়ে আমরা যে-সব উন্নত গুণাবলীর অধিকারী হই সেই গুণগুলোকে যথাযথ রক্ষা করা, তা অনুচারী বংশধরদের দিয়ে যাওয়া, এবং এই গুণগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো, এটি হল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণজ প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য।

রুশোর কথা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। তাঁর কথায় আবার ফিরে আসি। রুশো বললেন যে প্রকৃতিবাদের সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, শিশুকে শিশুর মত করে বিচার করতে হবে। রুশোর শিক্ষা-দর্শনের ভাষ্যকার মনরো বললেন যে, রুশোর মতে শিক্ষা হল সেই

পদ্ধতি যার দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আনন্দময়, শিশুর মনকে স্ফূর্তিপূর্ণ, শিশুকে সমাজের প্রয়োজনীয় মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। এই পদ্ধতিটা অবশ্যই শিশুর জীবনধারার কোথাও কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অনুসরণ করতে হবে। শিশুর মনোযোগ আপনা থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই মনোযোগ আকৃষ্ট হবার ফলেই সে জানতে পারবে তার শিক্ষার সূত্রপাত এইভাবে হওয়া চাই। কোন শিক্ষকের নির্দেশে যেন শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত না হয়, এটা প্রকৃতিবাদীরা বারবার বলেন। এই শিশুচিত্তের প্রবৃত্তি-গুলোকে বিকশিত হতে সাহায্য করার জন্যই মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর জন্য এমন সব খেলনার বন্দোবস্ত করা হয়েছে যার দ্বারা শিশু সহজেই আপনার সুপ্ত সামর্থ্যকে জাগ্রত করতে পারে এবং শেখবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। রুশো বললেন, প্রকৃতিবাদের দুটো অঙ্গ রয়েছে—একটি অসদর্থক, অন্যটি সদর্থক। রুশো প্রথম অসদর্থক (Negative) দিকটির আলোচনা করছেন। তিনি বলেছেন যে, ৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুজীবন-এ শিক্ষার অসদর্থক অঙ্গটির (Negative aspect) প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এই সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। এই সময়ে শিশু তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে উন্মুখ, তীক্ষ্ণ এবং অনুসন্ধানী করে তুলবে। যাতে করে যথাসময়ে সে সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলো সংযত হয়ে উঠলে উত্তরজীবনে জ্ঞানলাভ খুব শক্ত হয় না। শিক্ষার এই অসদর্থক অঙ্গটি শিশুকে পুণ্য করতে শেখায় না, পাপ থেকে নিবৃত্ত হতে শেখায়; কিন্তু এই সময়ে সত্যজ্ঞান লাভ না করলেও সে ভুল না করতে শেখে। কাজে কাজেই এই ৫ থেকে ১২ বছর সময়টুকু শিশু-জীবনের 'অলসকাল' (Idle time) নয়।

এ কথা অসংশয়িত সত্য যে, এই প্রকৃতিবাদ মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রেও রুশোকে পথিকৃৎ বলে স্বীকার করতে হয়। তিনিই প্রথম বললেন যে, শিশুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিশুর বৈশিষ্ট্য জানতে হলে শিশু-মনের খবর নিতে হয়। রুশোর এই মূলসূত্রটি থেকে পেস্তালৎসী,

হার্বার্ট, ফ্রোবেল প্রমুখ পণ্ডিতেরা তাঁদের মনস্তত্ত্ব-নির্ভর শিক্ষা-দর্শন গড়ে তুললেন। আজকে এ যুগের শিক্ষাগত প্রকৃতিবাদ মনঃসমীক্ষণকে আশ্রয় করে অনেক দূর এগিয়েছে। সেক্স মানুষের সর্বপ্রকার চিন্তা-কর্মের নিয়ন্তা, এ কথা উত্তর-ফ্রয়েডীয় যুগে বসে অসঙ্কোচে বলা চলে। প্রাক্-ফ্রয়েডীয় যুগে সেক্স সম্বন্ধে আমাদের যে গোপনতাবিলাস ছিল আজ আর ঠিক তা নেই। পণ্ডিতজন এ কথা বলছেন যে, এই একটি বিলাসে বিলসিত হওয়ার ফলে সমগ্র মানবসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মানুষের পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন পর্যুদস্ত হয়েছে সেক্স অবদমনের জন্য। সেক্স এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে আমরা শিশুকালে যে অবদমন অভ্যাস করি উত্তর-জীবনে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এইজন্য শিশুকাল থেকেই সেক্স সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া এবং সে সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনায় সুপারিশ করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা। মনঃ-সমীক্ষণের ফলে সেক্সের প্রতি শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়াও যে-কোন ধরনের ইচ্ছাকে অবদমিত করার বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদেরা বলেছেন। অবদমিত ইচ্ছাই আমাদের চরিত্রের নানা-রকম বিকার এবং জটিলতার জন্য দায়ী। এ যুগের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের অবদমনকে অস্পৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। দৈহিক শাস্তি বা অন্য ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ হয়েছে। নীতিবাগিশতায় শিশুদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। শিশুরা, রুশোর মতে, নীতিই হোক আর প্রকৃতি পরিচয়ই হোক, সবই নিজে নিজে শিখবে। এই নিজে নিজে শেখার কথা বলতে গেলে খেলার কথা বলতে হয়। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু অনেক সামর্থ্য এবং যোগ্যতার বিকাশ ঘটায় এবং শিক্ষকও বুঝতে পারেন যে, কোন্ পথে শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটবে। সুতরাং শিক্ষায় প্রকৃতিবাদীরা খেলার উপর প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই প্রকৃতিবাদ কেমন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তার বিবরণী দিয়েছেন এ. এস. নেইল; তিনি তাঁর 'That dreadful school' গ্রন্থে বলেছেন তাঁর সামারহিল বিদ্যালয়টির কথা। এই বিদ্যালয়টিতে শিশুদের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তারা মুক্ত প্রাঙ্গণে

খেলাধূলা করে, তাদের ভয় দেখানো হয় না। তাদের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি জন্মাবার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা নানা ধরনের খেলনা নিয়ে সারাদিন খেলে বেড়ায়। যদি তারা কোন কিছু তৈরী করতে চায় তবে তাদের সে কাজে বাধা দেওয়া হয় না। তারা যে ধরনের কাজকে মূল্যবান মনে করে তাদের সেই ধরনের কাজই করতে দেওয়া হয়। এ কথা মনে রাখা হয় যে, শিশুদের মূল্যবোধ বয়স্ক মানুষদের মূল্যবোধ থেকে স্বতন্ত্র। আমরা ক্লাসিকাল সঙ্গীত বা ক্লাসিকাল পেন্টিং ভালবাসি বলে শিশুরাও যে সেটা ভালবাসবে এমন কোন কথা নেই। কাজে কাজেই শিশু বয়সে তাদের মাথায় বড় বড় কালচার-সম্পর্কিত ধারণা সামারহিল বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোন বন্দোবস্তই নেই। সামারহিল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-অধিকর্তা নেইল বলছেন যে, প্রকৃতিবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের দুটি দিক রয়েছে। একটি 'অসদর্থক' বা Negative এবং অন্যটি সদর্থক বা Positive; যখন এই প্রকৃতিবাদকে এইভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তার অসদর্থক অঙ্গ হল শিশুকে কোন ব্যাপারে বাধা না দেওয়া এবং সদর্থক অঙ্গটি (Positive aspect) হল শিশুর সব কাজকে ক্ষমার চোখে দেখা এবং শিশুকে ভালবাসা। শিশুদের খোলাখুলি আলোচনায় উৎসাহিত করে দেখা গেছে, সেক্স সম্পর্কিত এবং আনুষঙ্গিক অবদমনে তাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশের কোন ক্ষতি হয় না। তারা যাতে করে নিজেদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তার জন্য তাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর দ্বারা তাদের বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রাবাসের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থাপকমণ্ডলী প্রয়োজন হলে শাস্তির ব্যবস্থা করে। তবে এই শাস্তিদানের ফলে শিশুচিত্তের কোন ক্ষতি হয় না। কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ বা দলাদলি সামারহিল বিদ্যালয়ে দেখা যায়নি বলে নেইল দাবি করেছেন। পরন্তু এদের মধ্যে এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে এদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতির কোন অবনতিই ঘটেনি। আত্মশক্তির সুপ্তাবস্থা থেকে জাগ্রতাবস্থায় উত্তরণই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে এই প্রক্রিয়ায় সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য হয়। এইভাবে স্বশাসন এবং প্রবৃত্তি-উৎসাহিত

কর্মে আত্মনিয়োগের ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিশুর সুপ্ত চারিত্র-ধর্ম জাগ্রত হয়ে ওঠে। অন্তরশায়িত গুণাবলী বিকশিত হয়ে ব্যক্তি-চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে। নেইল বলছেন যে, শিশুদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত এবং বিকশিত করার ব্যাপারে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সামারহিল বিদ্যালয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

প্রকৃতিবাদ শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও এই তত্ত্বে শিক্ষার কোন আদর্শ নির্দিষ্ট হয়নি। কেবলমাত্র 'বাধা দিয়ো না', 'বারণ করো না' এই সব অসদর্থক নীতির উপর কোন সুষ্ঠু শিক্ষা-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বর্তমান কাল এবং নিকটবর্তী ভবিষ্যতের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্য প্রকৃতিবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে আংশিকভাবে অবহেলা করছে। শিশুর স্বভাবের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটাতে চায় প্রকৃতিবাদ; অবশ্য আমরা 'প্রকৃতি' বলতে যদি মানুষের ইন্দ্রিয়গত জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে বুঝি তবে প্রকৃতিবাদের অনেক দুর্বলতাই দূর হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ঘটানোর কাজেও যদি প্রকৃতিবাদ আত্মনিয়োগ করে তা হলে প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির অনেক কারণই চলে যায়। তবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করার কাজে প্রকৃতিবাদ অক্ষম; শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাববাদের (Idealism in Education) আলোচনা করতে হবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কোন দিগ্‌দর্শন করতে না পারলেও শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করেছে, এ কথা অসংশয়ে বলা যায়। রাস্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Philosophical Bases of Education-এ বলেছেন যে, মানুষের পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বস্তুগত পরিবেশ এবং (খ) কৃষ্টিগত পরিবেশ। বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষের কলা-কুশলতা অসীম। অনেকে এমন কথা বলেন যে, জীবজন্তুর মধ্যেও এই বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টির কলাকুশলতা দেখা যায়। বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষও

জীবজন্তুর কলা-কুশলতা স্বীকার করে নিলেও এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, কৃষ্টিগত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেরই আছে, জীবজন্তুর নেই। এই কৃষ্টিগত পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের সহজাত মননশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ তার মননশক্তির সহায়তায় সৃষ্টিধর্মী কর্মে ব্রতী হয়। ধর্ম, নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান হল মানুষের মননকর্মের ফল। এই মননকর্মের ফলেই মানুষের কৃষ্টি উপজাত হয়। এই কৃষ্টির অধিকার শুধু মানুষের। এই কৃষ্টিকে পুষ্ট করা এবং পরিবর্ধিত করা সমগ্র মানবসমাজের অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষাপদ্ধতির সহায়তায় এই কৃষ্টিকে বংশানুক্রমিকভাবে হস্তান্তরিত করা হয়। কৃষ্টি যত ব্যাপক হবে শিক্ষার দায়িত্বও ততই বাড়বে। কেননা পূর্বপুরুষের কৃষ্টিকে উত্তর পুরুষের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার। সেই কৃষ্টির ধারাকে প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী করার দায়িত্বও শিক্ষা-ব্যবস্থার। রাস্ক বলছেন যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেমন ক'রে আমরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে স্বল্প ব্যায়ে এই কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করা। গ্রীকদার্শনিক প্লেতোর মতে শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল আমাদের কৃষ্টিগত জীবনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করা। ভাববাদী দার্শনিকেরা বিশ্বসংসারকে Rational বলেছেন। এই Rational বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাপ আছে, দুঃখ আছে, অন্যায় আছে, অসত্য আছে, এবং এদের জয় করাই মানুষের সাধনা। যে-কোন শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়া উচিত এই দুরূহ সাধনায় মানুষকে সাহায্য করা।

ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে সেটা বিবেচনা করে দেখা দরকার। ফ্রোবেল একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে শিক্ষকের ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যালয় যদি উদ্যান হয়, শিশু-শিক্ষার্থী যদি বৃক্ষ-শিশু হয় তবে শিক্ষক হচ্ছেন যত্নশীল উদ্যান-রক্ষক। তাঁর কাজ হচ্ছে বাগানের গোলাপগুলোকে বাড়তে যেমন সহায়তা করা তেমনি বাঁধাকপিগুলোকেও বাড়তে সহায়তা করা। অর্থাৎ বিভিন্ন সহজাত শক্তি এবং প্রকৃতিসম্পন্ন শিশুদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য। আত্মোপলব্ধি (Self-

realisation) হল ভাববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ; শিক্ষক শিশুকে আত্মোপলব্ধি করতে সাহায্য করেন মাত্র। প্রকৃতিবাদীদের মতে আত্ম-স্ফূরণই শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং এই শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষকের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনে এই যে 'আত্মোপলব্ধি'র কথা বলা হল এই আত্মোপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব সামাজিক জীব হিসেবে। সুতরাং ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনে সামাজিক পটভূমিকে অস্বীকার করা হয়নি। ব্যক্তি যে কল্যাণের (উদাহরণস্বরূপ প্লেতোনিক আদর্শের কথা ধরা যাক) আদর্শকে সত্য করে তুলতে চায় তার সার্বিক ধর্ম সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা সাযুজ্য বোধ এনে দেয়, তাদের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। আধুনিক প্রকৃতিবাদে মনস্তত্ত্ব যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবাদের প্রবর্তন করেছে তার বিরুদ্ধে ভাববাদ বলল যে, বংশানুক্রমিকতার (Heredity) দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এ কথা বললে শিক্ষা-দর্শনে নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) প্রতিষ্ঠা পাবে এবং এর ফল খুবই খারাপ হবে। আমরা যদি শিশুর মানসিক সামর্থ্য মেপে ব'লে দিই যে শিশুর এই হারে মানসিক সামর্থ্য আছে, সুতরাং তার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না, তা হ'লে এর থেকে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। বস্তুতঃ শিশুর আত্মস্ফূরণের সম্ভাবনা অনির্দেশ্য। তাকে মনস্তাত্ত্বিকের পরীক্ষণ-রীতির দ্বারা একেবারে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া যায় না। মনস্তাত্ত্বিকের এই পরীক্ষণ-রীতি মানুষের মূল্যের যে জগত (World of Values) রয়েছে তাকে অস্বীকার করেছে। ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনে মানুষের মূল্যবোধ পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে। এঁদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, এই মূল্যবোধটি মানুষের মনে জাগ্রত ক'রে দেওয়া। মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ত্রিমূর্তি—সত্য, শিব ও সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা তিন রকমের কাজ করি—বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক, এই ত্রিবিধ কর্মই হ'ল আধ্যাত্মিক কর্ম[২]। শিক্ষাবিদ্ রসের মতে এই ত্রিবিধ কর্মই ধর্মে সমন্বিত হয়। আমরা তাকেই জীবন-ধর্ম বলব যার মধ্যে সকল

২। Clutton Brook লিখিত 'The Ultimate Belief' দ্রষ্টব্য।

প্রকার কর্মই বিধৃত। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় আমাদের এই ত্রিবিধ কর্মের ব্যাপ্তি এবং উন্নতি ঘটানো তবে অবশ্যই শিক্ষার লক্ষ্য হবে আমাদের ধর্মজীবনের সম্যক পুষ্টিসাধন করা। কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম হ'ল আমাদের ধর্মের সমার্থক। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের ধর্মজীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। এই ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনে মানুষের বস্তুগত পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্বীকৃতি রয়েছে। এই দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভাববাদী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য।[৩]

এই প্রসঙ্গে প্রয়োজনবাদ বা Pragmatism-এর আলোচনা করা যাক।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনবাদের অনন্তর্নিহিত দুর্বলতা হ'ল মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধকে এই তত্ত্ব অস্বীকার করেছে। এই মতের পোষকেরা বলেন যে, মূল্য উপজাত হয় যখন আমরা কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করি। মানুষের মনে মূল্যের কোন সংস্কার নেই। এদের মতে শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুর মনে তার নিজের মত মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। এঁরা ভাববাদীদের মত বিশ্বাস করেন না যে, শিক্ষা হল মূল্য-দর্শনের ক্রিয়াশীল রূপ। এঁদের মতে শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য যে-সব অসুবিধা রয়েছে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষা-দর্শনের কাজ। এই অসুবিধাগুলো দূর করতে গিয়ে আমরা নতুন নতুন মূল্যের সৃষ্টি করি।[৪] প্রয়োজনবাদীরা বলেন যে শিশুকে যথাযোগ্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশটুকুর মধ্যে স্থাপন করলে তার মানসিক বৃত্তিগুলো যথাযোগ্যভাবে স্ফূর্তি লাভ করে। অর্থাৎ প্রয়োজনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যথাযোগ্য সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে আমরা অনুকূল পথে শিশুর মানসিক উন্নতিকে এগিয়ে দিতে পারি। এখানেই প্রয়োজনবাদীদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদীদের মৌল পার্থক্য। তবে প্রকৃতি-বাদীদের মত এঁরাও বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার কোন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে না। শিশুর মানসিক বৃত্তি, তার সামর্থ্য এবং পছন্দ, এইগুলোকে পরিবর্ধিত এবং পরিপুষ্ট করাই শিক্ষার লক্ষ্য। কোন উচ্চ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। পরিবেশের

৩। Rusx লিখিত 'The Philosophical Bases of Education', গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।
৪। Dewey লিখিত 'Democracy and Education' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ঙ্গে সংঘর্ষজনিত যে অপূর্ণতা শিশু বোধ করে তার নিরাকরণ করাই ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই ধরনের শিক্ষার সুবিধা হল এই যে শিক্ষার্থী ত্যন্ত ক্রিয়াশীল চলমান বুদ্ধির অধিকারী হয়। জীবনের যে-কোন রিস্থিতির মধ্যেই সে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। জীবনের কোন অবস্থাতেই সে পরিবেশের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে পড়ে না। সমাজের ঙ্গে তার যোগসূত্রটি কখনও ছিন্ন হয়ে পড়ে না। সমাজের সঙ্গে এই যত্নলালিত আত্মীয়তাবোধটি নানা সদ্ কর্মে তাকে অনুপ্রাণিত করে। মাজের ক্ষতিকারক কোন কাজে সে আত্মনিয়োগ করে না। এইভাবে কলে যখন পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তখন ামাজিক জীবদের প্রভূত উন্নতি বিধান হয়। তবে এই প্রয়োজনবাদের একটা বড় ত্রুটি হল এই যে, শিশুর শক্তি-সামর্থ্যে যে জন্মগত প্রভেদ রয়েছে তাকে যথাযথভাবে এই শিক্ষা-দর্শন স্বীকার করে না।

প্রয়োজনবাদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষ। সেখানে কোন পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে যখন প্রয়োজনবাদকে প্রয়োগ করা হয় তখন দেখা যায় যে, শিশুই শিক্ষকের মূল উপাদান ; কোন আদর্শ, কোন লক্ষ্য, কোন ভবিষ্যতের স্বপ্নই শিশুর বর্তমান প্রয়োজনটুকুকে খর্ব করে না। বর্তমানকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছে প্রয়োজনবাদ। তাই মূলতঃ প্রয়োজনবাদ পদ্ধতিমূলক, লক্ষ্যকেন্দ্রিক নয়। এই মতবাদ শিশুকে সৃষ্টিধর্মীকাজ এবং সাধারণ কাজের মধ্য দিয়ে শিখতে বলে। প্রয়োজনবাদীদের মতে সত্যিকারের জ্ঞান হল পুস্তক বা গুরুজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা নয়। এ জ্ঞান হল কোন-একটি পরিবেশে ঠিক কাজটি করা। প্রয়োজনবাদ তাই শিশুকে কোন্ পরিবেশে কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দেয়। এই কাজকে কেন্দ্র ক'রে যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার কাছে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কৃত্রিম ভেদটা গৌণ হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজনবাদীরা বলেন যে, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কৃত্রিম ভেদটা মানার দরকার নেই। দার্শনিক দেকার্ত এবং কঁত মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অখণ্ডতা প্রচার করেছিলেন ; প্রয়োজনবাদ তাঁদের মতবাদকে স্বীকার করে

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-১০

নিয়েছে। আলডুস হাক্সলে[৫] এ দের অনুসরণ করে বললেন যে, জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার স্বাঙ্গীকরণ (Integration) ঘটাতে হ'লে মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করতে হবে। শিশু-শিক্ষার্থী তার শিক্ষার সময়েই বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতাটুকু হৃদয়ঙ্গম করে। তাই প্রয়োজনবাদী রেমণ্ডকে যখন শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের স্বাঙ্গীকরণের পটভূমিকায় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তা হ'লে পরীক্ষা-ব্যবস্থার কি হবে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন[৬]—

"If the present examination system is to be regarded as irrevocably fixed, we may as well cease to think about education at all."

অর্থাৎ এঁরা প্রয়োজনবাদের মূলনীতিগুলোর আলোয় পরীক্ষণ-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন চান। বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের পরিপন্থী ব'লে প্রয়োজনবাদীরা বিশেষজ্ঞের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী না হ'লেও ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীর জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য এঁরা বিশেষজ্ঞের দেওয়া শিক্ষা অনুমোদন করেন।

প্রয়োজনবাদ নৈতিক শিক্ষাকে একেবারে প্রকৃতিবাদের মত উপেক্ষা করে না। এঁরা বলেন যে, সুপরিকল্পিত বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেলে তাদের মধ্যে Self-discipline বা আত্মসংযম দেখা যাবে। তবে পূর্ববর্তী যুগের মানুষেরা তাদের নৈতিক আদর্শ, তার পরবর্তী যুগের মানুষদের হাতে তুলে দেবে, আর তারা সেটাকে আদর্শ বলে মেনে নিয়ে কাজ করে যাবে অন্ধভাবে, এ কথা প্রয়োজনবাদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক যুগের মানুষ প্রয়োজনমত নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করবে। তারা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নীতি, আদর্শ প্রভৃতির উদ্ভাবন করবে। একে এঁরা Project Method নাম দিয়েছেন। এঁরা বলছেন যে, এই শিক্ষাদান পদ্ধতি বাইরের ব্যবহারিক জীবনের মতই বাস্তব এবং উদ্দেশ্যমূলক হবে। তাই এঁরা এঁদের

৫। তাঁর Ends and Means গ্রন্থের ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬। Modern Education : its Aims and Methods, পৃষ্ঠা ১০৮ দ্রষ্টব্য।

Project Method-এর মাধ্যমে জীবনের নানা বিষয়ের (ডাকঘর, দোকানপাট প্রভৃতি) সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েরা এইসব কাল্পনিক বাস্তব জগৎ নিয়েই খেলা করে। এই খেলার মাধ্যমে তারা পড়তে, লিখতে এবং অঙ্ক কষতে শেখে। কেননা এইগুলো না শিখলে তাদের খেলা ভালোভাবে জমে না। তবে এই Project Method এর আত্যন্তিক দুর্বলতা হল যে, শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা কমে যায়। কেননা তখন কিভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না ; এইভাবে শিক্ষা পদ্ধতিটা পূর্বনির্দিষ্ট হ'লে শিক্ষাপদ্ধতি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হল, এ কথা বলা হবে। সেটা প্রয়োজনবাদের নীতি-বিরুদ্ধ। তবে এ কথা স্বীকার্য যে Project Method কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেয় তার মধ্যে বহু ফাঁক থেকে যায়। এই ফাঁকগুলো পূর্ণ করতে হ'লে শিক্ষা-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার। তাই অধ্যাপক গডফ্রে টমসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, এই Project Method-কে পূর্ণতাদান করতে হ'লে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অপরিকল্পিত রাখলে চলবে না। তাছাড়া শিশুকে যদি কোন-একটা সমস্যার সম্মুখীন করে তার সমাধান চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়, তবে সব সময়ে যে বাস্তব সমস্যার দরকার হবে, এমন নয়। বুদ্ধিগত কোন সমস্যাও (যেমন, জ্যামিতি বা গণিতের কোন সমস্যা) শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা যায়। আবার যদি শিক্ষার্থীর এই সব বুদ্ধিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ থাকে তবে এই ধরনের সমস্যা উপস্থাপন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। Project Method-এর দোষগুলো আলোচনা ক'রে রেমণ্ড বলেছেন যে, শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে Project Method-ও অন্যান্য পদ্ধতির মতই অসম্পূর্ণ।

সবশেষে বাস্তববাদের (Realism) আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। শিক্ষায় বাস্তববাদ (Realism in Education) এল পুঁথিগত পণ্ডিতির প্রতিবাদ হিসেবে। শিক্ষা যখন ইংলণ্ডে রেনেসাঁ-উত্তর যুগে কেবল শুষ্ক পণ্ডিতি আর ব্যাকরণের কচকচিতে এসে ঠেকল তখন বাস্তববাদের অভ্যুদয় ঘটল। বাস্তববাদীরা বললেন যে, মানুষ এবং তার পরিবেশ হবে আমাদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। শিক্ষার্থীকে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে

বলা হল। মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ঘটাতে চাইলেন এই বাস্তববাদীরা। এঁদের মতে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে জ্ঞানার্থীর সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সার্বভৌমতার কথা প্রচার করলেন এই বাস্তববাদীরা। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সার্বভৌমতা-তত্ত্ব পুনঃপ্রচার করলেন এঁরা। বিজ্ঞানের জ্ঞানে এঁরা আস্থাবান। সাহিত্য এবং ভাষাগত জ্ঞানে এঁদের আস্থা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদ সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিল। বিজ্ঞানের অভাবিত প্রচার এবং অকল্পনীয় প্রগতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দাবিকে অগ্রগণ্য করে তুলল। হার্বার্ট স্পেনসার এবং টমাস হেনরী হাক্সলে প্রমুখ মনীষীরা বিজ্ঞানের এই অগ্রগমনের পটভূমিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাবার জন্য প্রয়াসী হলেন। এঁরা বললেন যে, সাহিত্য এবং ভাষা না পড়ে আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার আমাদের পরিবেশে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পরিবেশের বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তবেই শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

এই বাস্তববাদের প্রান্তিক মতানুসারীরা বললেন যে, পুস্তক পড়ার দরকার নেই। জ্ঞান হবে বস্তু থেকে উপজাত এবং বস্তু-অভিমুখী। এঁরা ভাষা, কথা, ধ্বনি[৭], এদের নির্বাচিত করতে চাইলেন শিক্ষার জগৎ থেকে। এঁদের মতে কেবল বস্তু এবং বস্তুজ্ঞান থাকলেই চলবে। অর্থাৎ আরাম-কেদারায় শুয়ে কেবল পণ্ডিতি করলেই চলবে না। বাস্তবতা-বিবর্জিত যে জ্ঞান শুধুমাত্র ভাষা আশ্রয় করে থাকতে চায় তা বাস্তববাদীদের কাছে অগ্রাহ্য। 'পাত্রাধার কি তেল কিংবা তৈলাধার কি পাত্র' এই নিয়ে নৈয়ামিক তর্কযুদ্ধে মেতে উঠলেও বাস্তববাদীদের কাছে এই সূক্ষ্ম তর্কের কোন মূল্যই নেই; কেননা এই বিশ্লেষণ শুধুমাত্র ভাষাগত, এই বিশ্লেষণ বা এই আলোচনা জীবনকে কোথাও স্পর্শ করে না। তাই বিভিন্ন দেশে এই বাস্তবতাবিবর্জিত শিক্ষা-দর্শনেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উগ্র হয়ে উঠেছে। স্পেন্স রিপোর্টে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সেখানে

৭। T. H. Huxley লিখিত 'Collected Essays', Vol, iii পৃষ্ঠা ১০০ দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের বাস্তবজীবনের কোন যোগ নেই। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে ইংলণ্ডে কমিশন বসাবার প্রয়োজন থাকলেও এদেশে সে প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যহীন শিক্ষালাভ, তাদের শিক্ষা উত্তর জীবনের ব্যর্থতা এবং হতাশা এই সত্যটুকুকে আমাদের সকলের কাছে অবশ্য স্বীকার্য করেছে। শিক্ষা কেবলমাত্র কৃষ্টিমূলক হবে, এমন কথা আমরা আর এদেশে কেউ বলব না। জীবনের যুদ্ধে যোগ্য সৈনিক হবার যোগ্যতা মানুষকে দিতে পারে এমন শিক্ষার দরকার। যে শিক্ষা একদিকে জীবিকার্জনের জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা দেবে এবং অন্যদিকে সংস্কৃতিকে দৃঢ় বনিয়াদে পত্তন করবে তেমন শিক্ষার দরকার। শিক্ষা যদি একমুখী হয় তবে তা নিরর্থক হবে। শিক্ষা শুধুমাত্র আমাদের কর্মজীবনেরই ধারক এবং বাহক হবে এমন কথা ভাবলেও আবার ভুল ভাবা হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন কাজ আছে তেমন কর্মবিরতির অবকাশও ত' আছে। শুধু কাজের ঠাসবুনানি যদি হয় জীবনটা তা হলে মানুষ হাঁপিয়ে উঠবে। যেখানে শুধু কাজ আর কাজ অবকাশের আকাশ যেখানে কাজের চাপে সঙ্কুচিত সেখানে জীবন ফুলে-ফলে-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, আকাশে ফাঁক না থাকলে বাঁশী বাজে না। যেখানে কাজের ফাঁক নেই, সেখানে জীবনেরও কোন মাধুর্য নেই। কাজ সেখানে শুধুমাত্র বোঝা। তাই কর্মীর জীবনে অবকাশের একান্ত দরকার। যে শিক্ষা-দর্শন শুধুমাত্র কাজকে স্বীকার করে, অবকাশকে স্বীকার করে না সে দর্শন একদেশদর্শী। তার দ্বারা মানুষের বহুমুখী জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদ আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারে না। শুধু জীবিকার্জনের পথনির্দেশ সুষ্ঠুরূপে করলেই শিক্ষা-দর্শনের কাজ শেষ হ'ল না। কাজের পরে আমরা জীবনের অবকাশটুকুকে যাতে মাধুর্যে পূর্ণ করতে পারি, রসধন্য করতে পারি আমার কর্মবিরতির অবসরটুকুকে, তেমন শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগের শিক্ষা-দর্শনে কাজের সঙ্গে অবকাশকে যুক্ত করে ব্যক্তি-মানুষের এই অখণ্ড জীবন-প্রবাহকে সামগ্রিকভাবে দেখে তার জন্য এক সমন্বয়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রয়োজন

অনুভূত হয়েছে। এই অনুভূতিটুকু আধুনিক মানসিকতার লক্ষণ। কোন দেশে এর প্রকাশ দেখেছি কয়েক বছর আগে, আবার কোন এক দেশে বা একে প্রত্যক্ষ করছি চলতি কালের পটভূমিতে। এই প্রয়োজনটুকু জন্ম নিয়েছে নতুন যুগের নব্য শিক্ষা-দর্শনে। এই শিক্ষা-দর্শন ট্রাডিশানাল শিক্ষা-দর্শনগুলো থেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদেরই সমন্বয়-ভূমিতে এই নব্য শিক্ষা-দর্শন জন্ম নিয়েছে। এই নবজাতক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলে দেশে দেশে শিক্ষাসমস্যাগুলো সহজ হয়ে উঠবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-দর্শন

থেলিস-ডান স্কোটাস এরিজেনার সুব্যাপ্ত মনীষাদীপ্তি যে যুগকে আলোকিত করেছিল সেই বিস্তৃত কালখণ্ড গতায়ু। মধ্যযুগের সাধনা নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে। আধুনিক যুগে জড়জগতে এবং মনোজগতে যে ব্যাপক বিপ্লব দেখা দিয়েছে তার নিশানা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। শিক্ষাবিদ্ বলবেন যে এ যুগের অন্যতম শ্লাঘা হল এ কালে মানুষ মনস্তত্ত্বকে তার সুবিস্তৃত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে। গল্প-উপন্যাস মনোবিশ্লেষণ আশ্রয়ী হয়েছে। কাব্য শুধু চিত্রধর্মী হ'লেই রসোত্তীর্ণ হবার প্রত্যাশা করে না। স্রষ্টার অবচেতন-মানসিকতার ছাপ রইল না যে কাব্যে তার দাম আধুনিক সমালোচকের চোখে খুব বেশী নয়। মানুষের নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে নানান সংস্কার সাধিত হয়েছে মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে। যে মনকে কর্মকর্তারা এতোদিনে আমল দেননি তাকে নিয়ে আজ আর আড়ম্বরের অন্ত নেই। যাঁরা এতোদিন ম্যামনের ভজনা ক'রে এসেছেন তাঁরাও যেন অনেকে খানিকটা সাত্ত্বিক হয়ে উঠছেন যুগধর্মে। বাণিজ্য-শিল্পপতিরা বলছেন যে শ্রমিকের মনের খবর নাও, উৎপাদন যদি বাড়াতে হয়, সামগ্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি উন্নততর করতে হয় তবে শ্রমজীবীদের মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় হবে। এদের মনের খবরদারি করতে গিয়ে মালিককে অনেক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়েছে মেহনতী মানুষের জন্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের আধিপত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মনোবিকলন এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানের রীতি গ্রাহ্য হয়েছে শিক্ষার সর্বস্তরে। শিশুশিক্ষা, বিকৃত মস্তিষ্কের শিক্ষা, প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা এবং অন্য যে-কোন ধরণের শিক্ষার কথাই চিন্তা করা যাক্ না কেন শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব সেখানে অগ্রগণ্য হবে। শিক্ষককে প্রাথমিক কর্ত্তব্য হিসেবে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতাকে বুঝতে হবে। কোথায় প্রাপ্ত বয়স্কের মানসিক অবদমন তাকে স্বচ্ছন্দ

এবং সুস্থ হ'তে দিচ্ছে না তার খবর শিক্ষককে রাখতে হবে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদ্ বলবেন যে শিক্ষকের শুধু লাতিন জানলেই চলবে না, তাঁকে শিক্ষার্থীর মনোধর্মকেও বুঝতে হবে। শিক্ষকের এই দ্বিমুখী জ্ঞানের উৎকর্ষ তাঁর শিক্ষক জীবনের সম্ভাবনাকে রূপদান করে।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসদেশের এথেনীয় শিক্ষা-ঐতিহ্য স্মরণযোগ্য। মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন আজকের মত এতো প্রবলভাবে অনুভূত না হলেও সেযুগের লোক-শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বকে একেবারে অবহেলা করেননি। প্লেতোর মতে নাটক (যা লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন ব'লে পরিগণিত হ'ত) দর্শকের মনকে ভাবরুদ্ধ ক'রে দেয়, তাকে জগতের সকল কাজের অযোগ্য ক'রে তোলে। তাই প্লেতোর চোখে নাটক প্রমুখ সর্ববিধপ্রমোদধর্মী শিল্পকলাই বর্জ্জীয়। এথেনীয় শিক্ষা-দর্শন অধ্যাত্ম-জীবনবাদ আশ্রয়ী। তাই পরাসত্যের অসদ্ভাব যেখানে ঘটে তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেনি প্লেতোনিক দর্শন। যাই হোক্ এ সত্যটুকু লক্ষণীয় যে মহাদার্শনিক প্লেতো কথিত শিল্পতত্ত্ব দর্শকের মনস্তত্ত্ব-আশ্রয়ী। মহাদার্শনিক আরিস্ততল প্লেতো কথিত দর্শকমনের ভাবরুদ্ধতাকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে দেখালেন যে গ্রীক নাটক দর্শকের মনে অবদমন বা অবরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে অনুভূতির মুক্তি ঘটায়। এর ফলে আমরা সুস্থ চিত্তে জাগতিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারি। গ্রীক নাটককে লোক-শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীক নাটকের লোক-শিক্ষক-রূপে অত্যুচ্চ মর্যাদা ছিল, এ কথা আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বলছেন। গ্রীকদার্শনিকেরা অনেকেই এবুগীয় রুস, নান প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তাধারার অগ্রচারী। সুইস শিক্ষক পেস্তালৎসী আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ চাইলেন। তাঁর সে স্বপ্ন বুঝি সফল হ'তে চলেছে। পেস্তালৎসী পূর্ব যুগে রোমক লোকশিক্ষক Quintilian বাগ্মিতা-শিক্ষার্থীদের সহজাত শিক্ষা-ক্ষমতা বিচার ক'রে তাঁদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন। ইয়োরোপীয় রেণেসাঁস এবং রেণেসাঁস পরবর্তী যুগের চিন্তা-নায়কদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। লক, রুশো এবং কমিনিয়স

এঁদের অন্যতম। তবুও পেস্তালৎসীকে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগের পথিকৃত ব'লে থাকি কেন না রুশো কথিত মনস্তত্ত্ব আশ্রয়ী শিক্ষা-দর্শনকে তিনিই প্রথম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। শিক্ষা দর্শনে এই যে মনোবিজ্ঞনের অভিঘাত ঘটল তার ফলে যে নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল তার লক্ষণ হ'ল রুশোপ্রভাবিত স্বভাববাদী আন্দোলনকে ক্লাশরুম-শিক্ষাবিধিতে রূপান্তরিত করা।[১] এই নতুন মনস্তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা-আন্দোলনের লক্ষণ হ'ল: (ক) শিক্ষাবিধির দিকে নতুন ক'রে মনোযোগ দেওয়া। (খ) শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী এবং সংগঠনসূচী শিশু শিক্ষার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা। (গ) প্রাথমিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং (ঘ) সার্বিক শিক্ষা-সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। এই নতুন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় আশু সুফল এই যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যেকার যুগসঞ্চিত দূরত্ব দূরীভূত হ'ল। শিক্ষক তাঁর গৌরবের অত্যুচ্চ হিমশিখর থেকে নেমে এসে তাঁর ছাত্রদের জানবার চেস্টা করতে লাগলেন। নতুন যুগের সূত্রপাত এইভাবে হ'ল।[২]

মনস্তত্ত্ব শিক্ষার্থীর সহজাত শক্তি-সামর্থ্য এবং মানসিক প্রবণতার বিচার করলেও শিক্ষা সম্পর্কিত কোনো নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বকথার আলোচনা অবিধেয় মনে করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কিত আলোচনা মনস্তত্ত্ববহির্ভূত। মনস্তত্ত্ব বিষয়নিষ্ঠ (Positive) বিজ্ঞান। মান নিরূপণ বা আদর্শ নিরূপণ মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে নব নব শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা-দর্শনের প্রভাব সুকুমারমতি বালকবালিকার মনে কী প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে তা আমাদের মনস্তত্ত্ব জানাচ্ছে। আবার নতুন নতুন শিক্ষা-দর্শন সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মনস্তত্ত্ব সরবরাহ করছে। ছেলেমেয়েদের মানসিক প্রবণতা, শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে তাদের ভালোমন্দ-লাগা, এ সবের খবরদারি

১। P. Mombe প্রণীত 'A Brief Course in the History of Education', পৃ: ৩৪৮ দ্রষ্টব্য।

২। K. K. Mookerjee প্রণীত 'New Education and its Aspects' গ্রন্থের পৃ: ৩৪ দ্রষ্টব্য।

মনস্তত্ত্ব করলেও বিদ্যায়তনরূপ ল্যাবরেটরিতে এইসব শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োগের উপযোগিতা রয়েছে। এই প্রয়োগের পথেই সামাজিক নানান্ অসুস্থতার হাত থেকে সমাজ মুক্তি পায়। এই মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা মনস্তত্ত্ব করছে। অসুস্থ যে মন তাকে কেমন ক'রে সুস্থ স্বচ্ছন্দ ক'রে তোলা যায় এর সমাধান দীর্ঘকালগ্রাহ্য ইনট্রসপেক্সনের পথে সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার ব্যাপারে শিশুশিক্ষার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ শিক্ষা-দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগে শিশু-মানস-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যনীয় এবং শিক্ষা-দর্শনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ এই ব্যবহারিক মানদণ্ডে বিচার্য। শিশুমনের প্রতিক্রিয়া ইনট্রসপেক্সনে অলভ্য। সুস্থ বিচার-বুদ্ধি-বঞ্চিত হতভাগ্যের সংখ্যা সমাজে নেহাৎ নগণ্য নয়। নতুন নতুন শিক্ষা-প্রণালীর 'সরণী বেয়ে এদের অসুস্থ মানসিকতাকে সুস্থ এবং পুষ্ট করে তুলতে হবে। ইনট্রসপেক্সন এই কর্ম সম্পাদনেও অক্ষম। ইনট্রসপেক্সনবাদীরা স্বয়ং এ কথা মেনে নিয়েছেন যে তাঁদের বিচারপদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উল্লেখ্য অবদান দিতে পারবে না। শিক্ষকদের চোখে মনস্তত্ত্বের মৌল ধারণাগুলির মূল্য অসীম।[৩] এই ধারণাগুলোই শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা অনুধাবন ব্যাপারে শিক্ষককে সাহায্য করে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার্থী কিভাবে তার অধীত বিদ্যাকে আপনার করে নেয়, কোন্ চিন্তনপ্রক্রিয়া অথবা মানস ক্রিয়া তাকে আনুকূল্য করে সদ্যলব্ধ জ্ঞানকে সুচিরসঞ্চিত করে রাখতে সে তত্ত্বটুকুও শিক্ষকের জ্ঞাতব্য। মনস্তত্ত্ব এই জ্ঞানটুকু শিক্ষককে দেয়। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ষ্টাউট বললেন: "The main principle which psychology lends to theory of education, as its starting point is the need that all communication of new knowledge should be a development of previous knowledge". অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব শিক্ষা-দর্শনকে যে মূল সূত্রটি দেয় তার প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে, তা হল এই যে লব্ধ বিদ্যার প্রসার হিসেবে বিচার করতে হবে সমস্ত নতুন জ্ঞানকে। নতুন জ্ঞান বিদ্যার্থীর অধীত বিদ্যার সঙ্গে সম্যকরূপে যুক্ত হ'য়ে তবেই সার্থক হয়। বিহেভিয়রিষ্ট এবং গেষ্টল্ট

৩। James . Talks to Teachers on Psychology গ্রন্থের পৃ: ৭ দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায় ইনট্রস্পেক্সনে প্রত্যয়বান নন। ষ্টিমুলাস্-রেস্পন্স এবং প্যাটার্ণতত্ত্বে এঁদের আস্থা। নতুন যুগের এই ধারনার মনস্তত্ত্ব নব নব শিক্ষা-দর্শন সৃজনে সহায়তা করেছে।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর শিক্ষাসমস্যা জটিলতাসঙ্কুল। এই আক্ষরিক বিদ্যাদানকার্য বহু বাধার দ্বারা বিঘ্নিত। এ যুগে এই দুরূহ কর্ম অপেক্ষাকৃত সহজ হচ্ছে মনস্তত্ত্বের আনুকুল্যে। আমাদের দেশে নয়া-শিক্ষা (Neo-literary) আন্দোলনকে শিক্ষা-অধিকর্তাদের মনস্তত্ত্ব-নির্ভরতা যে অনেকখানি শক্তিশালী করেছে এ কথা সুধীজনস্বীকৃত। শিশু-মনস্তত্ত্ব নয়া-শিক্ষার রূপ-বদল ঘটিয়েছে। শিশু-কল্পনা চিত্রাশ্রয়ী। শিশুকে শিক্ষাদানকালে চিত্র এবং চিত্রকল্প অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুমন আবার বৈপরীত্যেও আকৃষ্ট হয়। তাই দেখি শিশু পাঠ্যপুস্তকে বর্ণ বৈপরীত্যের সমারোহ। তথ্য-অতিরিক্ত সমারোহ শিশুমনের জন্য, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নয়। তাই নিওলিটারেটদের পাঠ্যপুস্তক এবং শিশু-পাঠ্যপুস্তক একরকম নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেন। তাই তাঁদের পাঠ্য-পুস্তকের তথ্য এবং তত্ত্বকথা সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে তাদের বুদ্ধির দরজায় পৌঁছে দিতে হয়। বুদ্ধি নতুন জ্ঞানকে অধীত বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করে আত্মস্থ করে। পুনরাবৃত্তির জন্য Law of association বা অনুষঙ্গবিধি তাঁদের সহায়তা করে। এ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল থাকলে তবেই অনুষঙ্গবিধির কার্যকারিতার অনুকূল পরিবেশে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে তবেই নতুন জ্ঞানকে আপনার ক'রে নেওয়ার অধিকার সুসাধ্য হবে। শিক্ষাবিদ্ Thomas Fuller[৪] ভালো শিক্ষক হবার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বললেন যে ভালো শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তবেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন পাঠ্যপুস্তকের মত যত্ন করে। স্যার জন এ্যাডামস্ এই মতের অনুসারী; নব্য শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম অগ্রাধিনায়ক হলেন এ্যাডামস। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রচনাকুশলতার সঙ্গে তিনি লিখিলেন: "Verbs of teaching govern two accusatives, one of the person,

৪। তাঁর গ্রন্থ 'Holy State and Profane State' দ্রষ্টব্য।

another of the thing, as 'Magister Johannem Latinam doouit'—The Master taught John Latin." শিক্ষাদান কার্যের একদিকে রয়েছেন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষণীয় বিষয় অন্যদিকে শিক্ষক এবং শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। সে গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁকে সহায়তা করছে মনস্তত্ত্ব। এ মনস্তত্ত্ব কেবলমাত্র আবেগপ্রবণ শিশুর মনস্তত্ত্ব নয়। পক্ক বুদ্ধি প্রাপ্তবয়স্কের জন্য এই মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজন না হলেও[৫] নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের আক্ষরিক এবং প্রাথমিক জ্ঞানদান কার্যে মনস্তত্ত্ব যে অকল্পনীয় আনুকূল্য করে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠ সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাই শিক্ষার বহুধাবিস্তৃত বিচিত্র ক্ষেত্রে আজ মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ সহজ এবং স্বাভাবিক হয়েছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং কানাডায় প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলছে। আক্ষরিক বিদ্যা থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞানে যাতে তারা পারঙ্গম হতে পারে তার পথ সহজ করার জন্য তাদের মানসিক প্রবণতার সতর্ক বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জ্ঞান কখন চিত্রমার্গ, কখনও বা প্রতীকমার্গ আশ্রয় করে। কখন বিশুদ্ধ চিন্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আশ্রয় আবার কখনও বা সে বাস্তব জগতের ঘটনা পরম্পরা থেকে আহৃত হয়। শিক্ষার্থীর মনোধর্মের প্রস্তুতি এবং পরিণতি তার মার্গটুকু নির্ণয় করে। দেশ-বিদেশের নয়া-শিক্ষা আন্দোলনগুলো তাই মনস্তত্ত্ব মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তি চরিত্র সুষ্ঠুরূপে সৃষ্টি করা। শিক্ষা মানুষের সমগ্র সত্যটুকুর খবরদারি করবে। এ নির্দেশ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা দিলেন। শিক্ষার্থীর বয়স অথবা পরিবেশ ভেদে শিক্ষা লক্ষ্য বা শিক্ষকের দায়িত্বের কোন তারতম্য ঘটবে না। যুগাচার্য শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষকদের বললেন যে যদি কোন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাথীর মনের খবর না নিয়েই শিক্ষকেরা শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হন তবে তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শ্রীঅরবিন্দের সাবধান বাণী এ যুগের শিক্ষাবিদেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন।[৬] তাঁরা

৫। J. E. Ross-এর 'Groundwork of Educational Psychology', পৃষ্ঠা ১১ দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত 'A System of National Education' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীকে জানবার চেষ্টা করছেন আর সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানও তাঁদের কাম্য। এ যুগের শিক্ষক এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছেন যে নিজেকে না জানলে, আপনার মানসিক প্রবণতা এবং রুচি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন না হলে উৎকৃষ্ট শিক্ষক হওয়া যায় না। দার্শনিক নীৎসের শিক্ষকের আত্মশিক্ষা বা আত্মজ্ঞানতত্ত্ব আজ আর অশ্রদ্ধেয় নয়। শিক্ষক মনোবিকলনেও যত্নবান হয়েছেন আত্মজ্ঞানলাভ প্রয়াসে। আধ্যাত্মিক আদর্শবাদী, জড়বাদী এবং অবস্থানুসারে ব্যবস্থা-বাদী-দার্শনিকেরা মনস্তত্ত্বকে গ্রাহ্য করছেন। পরমাত্মা জীবাত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় পরাবিদ্যার অন্তর্গত হলেও আধ্যাত্মিক আদর্শ-বাদীরা মনোবিজ্ঞানকে শিক্ষা-দর্শনের নিয়ামক এবং সহায়ক বলে গণ্য করেন। জড়বাদীরা যে সমাজ দর্শনে বিশ্বাস করে সে সমাজ দর্শন শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট নাগরিক বৃত্তি শিক্ষার উপায় হিসেবে গণ্য করে। কাজে কাজেই সেখানেও মনোবিজ্ঞানের স্বীকৃতি। অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবাদ আমেরিকা মহাদেশে শিকড় গেড়েছে। সেদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই মতবাদের অবিচল প্রতিষ্ঠা। এঁরা শিক্ষার্থীর মনোধর্মকে জানা শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছেন। শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি জানা হলে তবেই ব্যবস্থা দেওয়া সম্ভব হবে কোন্ পথে কেমন করে তাকে অভীষ্ট শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তোলা যাবে। কাজেই এই শিক্ষাদর্শনে আস্থাবান দার্শনিকেরা আদর্শ শিক্ষা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেননি, কেননা সে চিন্তার প্রয়োজন হয়নি। এঁরা বললেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুর প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা, শক্তি, আসক্তি প্রভৃতির গতির পরিবর্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সাধন। এঁদের চোখে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব বহুমূল্যবান। সুতরাং এ কথা আজ অবিসংবাদিত সত্যের মর্যাদা পাচ্ছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের বর্তমান ভূমিকা শিক্ষার প্রসারে অপরিহার্য। এর বিরুদ্ধবাদিতার সম্যক্ অসদ্ভাব ঘটেছে। তাই এ যুগের শিক্ষা-দর্শন এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপ্লবমুখী এবং বিপ্লব লক্ষণাক্রান্ত।

হিন্দু শিক্ষাদর্শ

হিন্দু শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সুনিয়ন্ত্রিত জীবনসাধনা, বুদ্ধির সাহায্যে কেবলমাত্র জ্ঞানানুশীলন নয়, বিষয় সম্বন্ধে বোধ অর্জন করা বা জ্ঞানলাভ করাকে হিন্দুশিক্ষা কখনই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। শিক্ষা যে অর্থে মানুষকে ব্যাপক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, সেই অর্থে শিক্ষাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, ব্রাহ্মণে এবং সংহিতায় নানান গল্প উপাখ্যানে অসংখ্য নির্দেশ এবং উপদেশে হিন্দু শিক্ষাদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিশোরের উপনয়ন অবশ্য কর্তব্য, উপনয়ন দেবেন আচার্য ; উপনয়নের ব্যুৎপত্তিগত হল গুরুর সমীপে আনয়ন করা। এই উপনয়নের মাধ্যমেই শিশু দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতা তাকে পৃথিবীর আলো দেখান, সেটা তার প্রথম জন্ম। আর আচার্য শিশুকে জ্ঞানের আলো দেখান, সেটা তার দ্বিতীয় জন্ম। এই দ্বিতীয় জন্মের সূত্রপাতই হল শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত।

ছাত্র গুরুগৃহে বসবাস করত। যে পরিশ্রমের মর্যাদা বিষয়ে আমরা আজ ছাত্রসমাজকে সচেতন করবার জন্য সদা সচেষ্ট, সেই কায়িক পরিশ্রমটুকু সেযুগে সকল শিক্ষার্থীরই অবলম্বন ছিল। গুরুর সেবা, সমাজের সেবা ক'রে তবেই ছাত্রকে গুরুগৃহে জ্ঞানার্জন করতে হতো। হাতে কলমে কাজ করতে করতে শিক্ষা পেলে তবেই যথার্থ শিক্ষা হয়, এমন কথা আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের গুরুগৃহে এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। চতুরাশ্রম-ধর্ম পালন সমস্ত সামাজিক মানুষের অবশ্য কর্তব্য ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের প্রথমটি হল শিক্ষার্থীদের জন্য। এই আশ্রমই কিশোরের চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের উন্মেষসাধনা উত্তরজীবনে সামাজিক কর্মকুশলতা ও জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া হতো এগুলো তারই লক্ষ্য ছিল। এই আশ্রমের শুরু হতো উপনয়ন উৎসব দিয়ে আর এর শেষ হতো সমাবর্তন উৎসবে। সমাবর্তন

উৎসব-অন্তে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হয়ে গুরুগৃহ ত্যাগ করত। গৃহস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত তারা 'স্নাতক' নামে খ্যাত হতো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মেয়েদের 'উপনয়ন' হতো না। তবে এর ব্যতিক্রম ছিল। 'ব্রহ্মবাদিনী' কন্যাদের উপনয়ন হতো। তারা পিতৃগৃহে বেদপাঠ, ভিক্ষা প্রভৃতি ব্রহ্মচারীদের পালনীয় বিধি-আচারের অনুষ্ঠান করতেন। মেয়েদের শিক্ষান্তে সমাবর্তন করার কথাও কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধির পূর্বেই এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল না। ক্রমশঃ মেয়েদের উপনয়ন-বিধি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার দ্বার তাদের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়।

এখন আমাদের হিন্দু ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম অর্থাৎ উচ্চ তিনবর্ণের শিশুদের শিক্ষা গ্রহণকাল শুরু হতো মাতৃগর্ভে আগমনের বারো বছরের মধ্যে। ব্রাহ্মণশিশু আট বছর বয়সে, ক্ষত্রিয় শিশু এগারো বছর বয়সে এবং বৈশ্য শিশু বারো বছর বয়সে পাঠারম্ভ করত। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এইভাবে উচ্চ তিনবর্ণের জন্য বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। ঋষি গৌতমের লেখায় পাওয়া যায় যে, শূদ্র যদি স্বেচ্ছায় বেদপাঠ, শ্রবণ বা বেদজ্ঞান লাভ করে তবে তার শাস্তি হল মৃত্যু। প্রাচীন গ্রীকশিক্ষাদর্শের মতই প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাদর্শ সমাজের একটি বিরাট অংশকে জ্ঞানের আলোক থেকে নিত্য-বঞ্চিত করে রেখেছিল। তার ফলে এই দুটি শিক্ষাদর্শই সার্বভৌমত্ব লাভ করতে পারল না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীর কী কী শাস্ত্র পাঠ করা উচিত এ সম্বন্ধে মহামুনি নারদের নির্দেশ ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে। চতুর্বেদ, ইতিহাস-পুরাণ (পঞ্চম বেদ), ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধবিষয়ক শ্রাস্ত, কালি (গণিত), দৈব (উৎপাত বিজ্ঞান), নিধি (গুপ্তধন আবিষ্কার বিদ্যা), ব্যাসবাক্য (প্রশ্নোত্তর নীতি বা তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষা এবং ছন্দ), ভূতবিদ্যা (ওঝার বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, (নাচ গান, বাজনা ইত্যাদি)। এইসব বিদ্যা তিনি স্বয়ং আয়ত্ত করেছিলেন। নারদ অধীত এই পাঠ্যসূচীটি হল আদর্শ পাঠ্যসূচী। এই পাঠ্যসূচী সাধারণ বিদ্যার্থীর পক্ষে

আয়ত্ত করা সম্ভবপর ছিল না। মহামতি কৌটিল্যের মতে ত্রয়ী (তিন বেদ) অন্বীক্ষিকী (দর্শন ও ন্যায়)। বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য) এবং দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রনীতি), এই চারিটি বিদ্যা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষেই শিক্ষণীয়। তবে সকলেই যে সকল বিষয় পাঠ করত তা নয়। বৃত্তি এবং পছন্দ অনুযায়ী ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ শিক্ষা গ্রহণ করত। উচ্চ তিনবর্ণের ছাত্রেরা সকলেই বেদপাঠ করত। এছাড়া রাজকুল, ক্ষত্রিয়কুল, বৈশ্যকুলের জন্য বিভিন্নধরণের বিষয় শিক্ষার নির্দেশ ছিল। এই শিক্ষা তাদের বৃত্তির পরিবর্ধনে সহায়তা ক'রত।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সাধারণতঃ ছাত্রদের গুরুগৃহে থাকতে হতো। ছাত্রেরা গুরুর, গুরুপত্নীর, ক্ষেত্রবিশেষে গুরুদেবের আত্মীয় পরিজনদের সেবাযত্ন করত এবং স্নেহ-যত্নও তাঁদের কাছ থেকে লাভ করত আর লাভ করত বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা। গুরুগৃহে বাস ছাত্রদের পক্ষে সাধারণ রীতি হলেও রাজা-মহারাজেরা আচার্যকে স্বগৃহে রেখে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে শ্রমসাধ্য জীবনযাপন করতে হতো। তার থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ধনী সম্প্রদায় আচার্যকে নিজ গৃহে রেখে ছাত্রদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করত। সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রকে ১২ বৎসর বাস করতে হতো গুরুগৃহে। এই গুরুগৃহে বাস কালে গুরুকে কোন বেতন বা পারিশ্রমিক দিতে হতো না। শিক্ষাশেষে ছাত্র গুরুর প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে সাধ্যমত দক্ষিণা দিত। গুরু বা আচার্য সমাজের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আচার্য খুব সম্মানিত ছিলেন না বলে আমরা প্রবন্ধান্তরে বলেছি। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরু নিত্য সম্মানিত। আচার্যদের আপন চারিত্র দার্ঢ্যের দ্বারা শিষ্যের চরিত্র-গঠন কার্যে সহায়তা করতেন, জীবনের মহত্তম আদর্শে ছাত্রকে উদ্বুদ্ধ করতেন। গুরুগৃহে শিক্ষার্থী অল্পাহার করত; অল্পাহার নীরোগ দীর্ঘজীবনের আকর। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের অধোবাস এবং উত্তরীয় পরিধান করার রীতি ছিল। ব্রহ্মচারীকে কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন করা, স্ত্রীসঙ্গ কামনা না করা, ব্রহ্মচারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল।

এইভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়েই প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রহ্মচারীর শিক্ষা সমাপ্ত হতো।

গুরুকুল বা আচার্যগৃহ প্রকৃতির মনোরম মুক্ত পরিবেশে বিরাজ করত। এ যুগের হাঁপধরা নোংরা শহুরে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত না। প্রকৃতির আহ্বান তাদের অন্তর স্পর্শ করত অহোরাত্র। প্রকৃতির স্পর্শপুলক তাদের চিত্তকে আনন্দাপ্লুত করে রাখত। তাই তাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নিত্যযুক্ত ছিল। যে শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, তা অচিরেই সার্থক হয়ে উঠত শিক্ষার্থীর জীবনে। শিক্ষার্থী শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের পথেই বেদের মর্মার্থটুকু ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করত। অবশ্য গুরুগৃহে ছাত্র-সংখ্যা কখনই খুব বেশী হতো না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি আচার্যের সজাগ দৃষ্টি রাখা তাই সম্ভবপর হতো। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সম্যকরূপে শিক্ষা দেওয়াই আচার্যের লক্ষ্য ছিল। তাই শিক্ষাদানকালে কোন ছাত্র অনুপস্থিত হলে যে বিষয়টিতে সেই অনুপস্থিত ছাত্রটি অন্য সকলের সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করছিল সেই বিষয়টি শেখানো সাময়িকভাবে স্থগিত থাকত। আজকের দিনে আমরা কোন শ্রেণীতেই পাঠদানকালে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি না। কেননা ক্লাসে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবং তাদের মধ্যে কেউ না কেউ অনুপস্থিত থাকেই। প্রাচীন ভারতীয় গুরুগৃহে এই পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল, কেননা সেযুগে ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। গুরুগৃহে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হত। এই বিতর্ক সভাগুলিতে তার্কিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষিত হতো। দৈনিক পাঠাভ্যাসের ফাঁকে ফাঁকে ছুটি বা অনধ্যায়েরও ব্যবস্থা ছিল। এই অনধ্যায়ের কারণ আকস্মিক হলে তাকে বলা হত নৈমিত্তিক অনধ্যায় এবং যে সব কারণে নিয়মিতভাবে পাঠ বন্ধ থাকত, তাকে বলা হত নিত্য অনধ্যায়। প্রাচীন গ্রীস দেশের সোফিস্টদের মত আমাদের দেশেও ভ্রাম্যমাণ আচার্যেরা শিক্ষা দিতেন। আবার ছাত্রেরাও বিভিন্ন দর্শন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করার জন্য বিভিন্ন গুরুকরণে যেতো। যে সব ছাত্রেরা প্রায়শই গুরুবদল করত, তাদের বলা হতো তীর্থকাক। গুরুগৃহে শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। অপরাধ বা ত্রুটি

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-১১

ঘটলে পিঠে বেত মারার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, মধুর বাক্য দ্বারাই ছাত্রদের শাসন করা প্রশস্ত।

প্রাচীন গুরুগৃহের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ করে শিক্ষার্থীকে শারীরিক শিক্ষা দেওয়ার প্রথা ছিল না। শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম গুরুগৃহে করতে হতো তা-ই ছাত্রদের শরীর ভালো রাখবার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। তবে সন্ধ্যাবন্দনার সময় প্রাণায়াম করা সকল শিক্ষার্থীরই অবশ্য কর্তব্য ছিল। আর এই প্রাণায়ামের ফলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকত। স্পার্টার শিক্ষাদর্শে শারীরিক শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা যে এর অসম্ভব লক্ষ্য করি তার মূলে রয়েছে ভারতীয় জীবনদর্শনের ভিন্নধর্মিতা। আমরা জৈবিক সত্তার চেয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে বেশী দাম দিয়েছি। তাইত প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বোবা, কালা, অন্ধ, বিকলাঙ্গদেরও উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল, তারাও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পেতো। সাধারণভাবে ছাত্রেরা বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষা করত। পারিবারিক শিক্ষা ছাড়াও তারা স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে শিক্ষানবিশি করত। শিক্ষার ব্যাপারে কোন বর্ণবৈষম্য সাধারণতঃ পালন করা হতো না। এই প্রসঙ্গে মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, জ্ঞানী চণ্ডালের কাছ থেকেও প্রয়োজন হলে ধর্মশিক্ষা করা উচিত। শিক্ষার্থী যদি মনে করে যে চণ্ডালপ্রমুখ নিম্নজাতির মানুষের কাছে তার শিক্ষণীয় জ্ঞান রয়েছে, তবে সে অসংকোচে সেই গুরুর পদপ্রান্তে বসে জ্ঞানটুকু আহরণ করে নেবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে গুরুকে এমনই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। আবার আধুনিক কালের পড়ুয়া-শিক্ষকের মত আমাদের দেশেও 'সমাদিষ্ট'দের কথা পাওয়া যায়। আচার্যের আদেশেই 'সমাদিষ্ট'রা ছাত্রদের শিক্ষা দিত। তারা আচার্যের মতই সম্মান পেতো। যথাযোগ্য সম্মান করাটা আমাদের রক্তে রয়ে গেছে। বহুদিনের ঐতিহ্য আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি বলেই শিক্ষক-শিক্ষাথার পারস্পরিক সম্বন্ধটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্তমান জীবনধারা কিছুটা ঐতিহ্য অভিমুখী হলেই আমরা আমাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করতে পারব বলে মনে হয়।

বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শ

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় কাল। মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে এই শতকে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে মহাযান বৌদ্ধ মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধধর্ম এবং জীবনাদর্শকে সাধারণ গৃহস্থের গ্রহণীয় করে তোলার ব্যপারে মহাযানীদের অবদান অনস্বীকার্য। যে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন মঠবাসী ভিক্ষুদের ঘিরে এতোদিন আবর্তিত হচ্ছিল, তার স্রোত স্পর্শ করল সারা এশিয়ার মানুষের জীবন, এই মহাযান-পন্থীদের আনুকূল্যে এবং চেষ্টায়। বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণভাবে ধর্মীয় ভিক্ষু প্রতিষ্ঠান বলা চলে। শ্রমণদের পরিচালনাধীনে বৌদ্ধবিহারের চৌহদ্দির মধ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা আবদ্ধ ছিল, মহাযানীদের চেষ্টায় তার বিস্তার ঘটল গৃহীমানুষদের মধ্যে। এঁরাই দেশের বিভিন্ন অংশে যে সব মহাবিহার স্থাপন করলেন, তা কালক্রমে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রমুখ খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ছিল প্রধানতঃ নৈতিক। মহাযানীদের হাতে পড়ে বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধি আশ্রিত এবং কূটন্যায়াশ্রয়ী হয়ে উঠল। এই বৌদ্ধ-জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি ছিল বৌদ্ধসংঘ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শিক্ষা, দীক্ষা এবং সাধনা সবই চলত এই সংঘ আশ্রয় ক'রে। সুতরাং বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংঘ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজা, মহারাজা এবং ধনি-শ্রেষ্ঠীরা তাঁর শিষ্য হতে আরম্ভ করল, তখন ধীরে ধীরে নগরীর উপকণ্ঠে বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা হল এই ধনী বুদ্ধশিষ্যদের আনুকূল্যে। এঁদের দানে এইসব সংঘের ব্যয় নির্বাহ হতো। এই সংঘে বাস করতে হলে কতকগুলি বিধিবদ্ধ অনুশাসন মেনে চলতে হতো; এই অনুশাসনকে বলা হতো 'প্রতিমোক্ষ'। এই সংঘে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দীক্ষা দেওয়া

হতো। হিন্দুদের উপনয়নের মত বৌদ্ধদের এই দীক্ষা; এই দীক্ষা দ্বিবিধ-প্রব্রজ্যা অর্থাৎ প্রারম্ভিক দীক্ষা এবং উপসম্পদা অর্থাৎ চূড়ান্ত দীক্ষা। বর্ণনির্বিশেষে এই দীক্ষা গ্রহণ করা চলত। তবে রাজকর্মচারী, ক্রীতদাস, চোর, ডাকাত, নপুংসক প্রভৃতিকে কোন প্রকার দীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বিকলাঙ্গ মানুষদের এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্থ, দুরারোগ্য, চর্মরোগগ্রস্থ, ক্ষয়রোগ এবং মৃগী রোগগ্রস্থ মানুষদেরও দীক্ষা দেওয়া হতো না। সাধারণতঃ ১৫ বছর বয়সে দীক্ষা দেওয়া হতো। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ভিক্ষুকে দশটি অনুশাসন (দশশিক্ষা পদানি) পালন করতে হতো। এইভাবে সন্ন্যাস-জীবন পালন করতে করতে বিশ বছর বয়স হলে যদি সে চূড়ান্ত দীক্ষার যোগ্য বিবেচিত হতো, তখন তাকে উপসম্পাদা প্রদান করা হতো। এইভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন আনুষ্ঠানিক দীক্ষা সম্পন্ন হতো। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মনীতির আলোচনা করতেন এবং ত্রিপিটক বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি নিয়মিত পাঠ করতেন। ধর্মের প্রকৃতি এবং ধর্মীয় তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হতো। তবে ছাত্রের যোগ্যতা বিচার করে তবেই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং গুহ্য তথ্যগুলি সম্বন্ধে তাদের আলোচনা করতে বলা হতো। সংঘে পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আপন আপন যোগ্যতা এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতো এইসব পরীক্ষার মাধ্যমে। মহাযান মতবাদের উদ্ভবের পূর্বে কোন বৌদ্ধ সংঘে সংস্কৃত পঠনপাঠনের বা আলোচনার স্থান ছিল না। সংঘবাসীরা লোকায়ত দর্শন, জ্যোতিষ, যজ্ঞ বা দৈব সম্বন্ধেও কোন প্রকার আলোচনা করতেন না। অবশ্য মহাযান মতবাদের প্রচলনের পরে বৌদ্ধ সংঘগুলিতে এই সংকীর্ণ মতবাদিতার অবসান ঘটে। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল মাতৃভাষা। সংস্কৃতকে শিক্ষার বাহন হিসাবে এঁরা গ্রহণ করেননি; বৌদ্ধ শিক্ষা-দর্শন এদিক থেকে আধুনিক শিক্ষা-দর্শনের সমগোত্রীয়। শিক্ষাকে যদি জনগণের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হয়, অল্পায়াসে শিক্ষার্থীকে যদি বিস্তৃততর জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, তাহলে অবশ্যই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে হবে। এই মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষার নীতিকে ভারতবর্ষের মত বহু ভাষাভাষী উপমহাদেশে নিষ্ঠার সংগে আশ্রয় করে

থাকা কঠিন ব্যাপার, বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় এই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছিল। একই বিহারে ভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের আপন আপন ভাষার মাধ্যমে। এই শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মৌখিক। সেই যুগে লিপির প্রচলন থাকলেও মৌখিক পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হতো। সাধারণতঃ বৌদ্ধবিহারে ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা কূটতর্কের মাধ্যমে দেওয়া হতো না। বুদ্ধপ্রবর্তিত সরল উপকথা বা উপদেশপূর্ণ ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নীতি ও ধর্মের অনুশাসনগুলি বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থীদের চরিত্র-প্রবণতা, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হতো। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দিকটিও আধুনিক শিক্ষা-দর্শনের প্রাক্‌চারী। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা বিচার করে তবেই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত, এমন কথা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরা বলছেন। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও আমরা এই তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। বৌদ্ধ শিক্ষা-দর্শনকে আমরা মনোবিকোলন-মূলকও বলতে পারি।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুর স্থান ছিল অতি উচ্চে। গুরু ছিলেন আদর্শ ভিক্ষু। ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ জ্ঞান-গরিমায় তিনি হতেন সবার আদর্শস্থানীয়। তিনি শিষ্যকে, শিক্ষার্থীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করতেন, শিক্ষার্থীকে নিরলস জ্ঞান সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতেন। শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সাহায্য করা, তার বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে দেওয়া গুরুর কর্তব্য ছিল, ক্ষেত্র বিশেষে গুরু শিষ্যের সেবাও করতেন। অনাচার ঘটলে বা শিষ্যকে অযোগ্য মনে করলে গুরু শিষ্যকে সংঘ থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন। আবার গুরু অনাচারী হলে শিষ্যেরও কর্তব্য ছিল গুরুকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা, গুরুর মানসিক শান্তি-বিধানের জন্য শিষ্যকেও যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করতে হতো। প্রয়োজন হলে, ক্ষেত্রবিশেষে শিষ্য গুরুর ভ্রমপ্রমাদের প্রতিবাদও করতে পারত। এদিক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা খুবই গণতান্ত্রিক ছিল। তবে সাধারণতঃ শিষ্যকে গুরুর নির্দেশ পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে হত। গুরুর কোন রকম অসুবিধা না হয়, তাঁর শান্তি যেন কোন কারণেই

বিঘ্নিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ছিল শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা দ্বিবিধ গুরুর সাক্ষাৎ পাই—উপাধ্যায় এবং আচার্য। উপাধ্যায় ব্যতীত ভিক্ষু-জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই মনে হয় যে, উপাধ্যায় ছিলেন আচার্যের চেয়ে পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর। এই শিক্ষকেরা প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। ভিক্ষুজীবনের চরম শাস্তি ছিল ভিক্ষুত্বচ্যুতি। ধর্ম সংঘের নিয়ম লঙ্ঘন করলে তবেই এই শাস্তি বিধান করা হতো। ভিক্ষুর পালনীয় আচার-আচরণের লঙ্ঘন ঘটলে কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকলেও সংঘের জীবনযাত্রা একেবারে নীরস ছিল না। শিক্ষার্থীদের অনুভূতি এবং ভাবপ্রবণতার যথোপযুক্ত পুষ্টি সাধনের জন্য আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। ভিক্ষুদের দেহ যাতে সুগঠিত হয়, যাতে তারা নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হতে পারে তার জন্য রথচালনা, অসিযুদ্ধ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বীররসাশ্রয়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হতো। পাশাখেলা, ভেঁপুবাজানো, সঙ্গীত চর্চা এবং মেয়েদের সঙ্গে নৃত্যকরার প্রথাও সংঘজীবনে প্রচলিত ছিল। এইভাবে একদিকে যেমন শরীর এবং অনুভূতিকে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে তোলার সাধনায় ভিক্ষু আত্ম নিয়োগ করত, তেমনি আবার বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত এবং তীক্ষ্ণ করে রাখার জন্য সংঘে পাক্ষিক আলোচনা সভারও ব্যবস্থা ছিল। একে বলা হতো 'উপোসথ'। এই পাক্ষিক আলোচনা সভায় ধর্মালোচনা, অপরাধ স্বীকার প্রভৃতি কর্ম সম্পন্ন হতো। সংঘজীবনে ক্রমে ক্রমে নারীরাও প্রবেশ করে। এই ভিক্ষুণীদের মেনে চলতে হতো ভিক্ষুদের নির্দেশ উপদেশ এবং আধিপত্য। প্রতিমাসে দুবার করে ভিক্ষুণীদের ধর্মোপদেশ দেওয়ার রীতি ছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় কায়িক পরিশ্রমকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন কলা ও শিল্প শিক্ষাকে স্বয়ং বুদ্ধদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন, তাই তিনি বিভিন্ন বৃত্তিধারী গৃহীদের আপন আপন বৃত্তিকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রয় করে থাকবার জন্য পরামর্শ দিতেন। বৌদ্ধসংঘে শিক্ষাথাদের সুতোকাটা, কাপড় বোনা, দর্জির কাজ প্রমুখ বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হতো। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখাবার ব্যবস্থাও

বিভিন্ন সংঘে করা হতো। এই বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা একান্তভাবে সংঘাশ্রয়ী হলেও এই শিক্ষা ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কল্যাণে। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের গৃহী শিষ্য এবং শিষ্যাকে বলা হতো 'উপাসক' এবং 'উপাসিকা'। এঁরা সন্ন্যাসীদের নানাভাবে সেবা এবং পরিচর্যা করতেন। বৌদ্ধগুরুরাও এদের ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতেন, দানধ্যান করা, কামনা-বাসনা বিহীন সৎ জীবনযাপন করা, বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করা, আপন আপন বৃত্তি ও পেশা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা প্রভৃতি কর্মে গুরুরা গৃহী সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বৌদ্ধ-ধর্মকে, বৌদ্ধশিক্ষাকে গৃহীজনসাধারণ-এর ধর্ম এবং শিক্ষারূপে প্রচার করার মূলে রাজা অশোকের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। বৌদ্ধশিক্ষা সর্বশ্রেণীর মধ্যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল। গণতান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের অনুষঙ্গ হল গণতান্ত্রিক বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নতমশ্রেণীর মধ্যেও ধর্মচর্চা এবং জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটল।

গ্রীসের শিক্ষাদর্শ

শাক্যমুনি যখন ভারতবর্ষে তাঁর অহিংসার মন্ত্রটি প্রচার করছিলেন সেই সময়ে গ্রীক সৈন্যের সঙ্গে পারসিক সৈন্যদের এক বিরাট লড়াই চলছিল। এই যুদ্ধের সমাপ্তির পরেই নব্য গ্রীসের অভ্যুত্থান, পেরিক্লিসের স্বর্ণযুগের অভ্যুদয়। আমরা যে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের গৌরবের কথা পড়ি তা মূলতঃ এথেনীয় বা আয়োনীয়। গ্রীকজাতি ত্রিস্রোতা, তিনটি শাখায় বিভক্ত। এই জাতির তিনটি ধারা হ'ল—(১) এয়োলীয় (২) আয়োনীয় এবং (৩) ডোরীয়। এয়োলীয় শাখার ইতিহাস বিস্মৃতির ঘন তমিস্রাচ্ছন্ন। আয়োনীয় শাখার কথা বহুশ্রুত, আয়োনীয় শাখাই এথেন্স-সভ্যতার জনক ও ধারক। ডোরীয় শাখা স্পার্টানগরীতে আপন আধিপত্য বিস্তার করে। স্পার্টান শিক্ষাদর্শও প্রণিধানযোগ্য।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাদর্শ বলতে আমরা এই আয়োনীয় ও ডোরীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বুঝি। প্রথমে আমরা এই আয়োনীয় শিক্ষাব্যবস্থার কথা আলোচনা করব। ঐতিহাসিক কারণে, পারস্য বিজয়ের পরে এথেনীয় সংস্কৃতি পুষ্ট হ'ল, পূর্ণতাপন্ন হ'য়ে উঠল তাদের শিক্ষার ধারণার প্রসঙ্গে মনুষ্যপ্রকৃতিতে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর এবং প্রার্থনীয় তারই সর্বাঙ্গীণ প্রস্ফুটন এবং প্রকাশই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। জীবনের সকল প্রবৃত্তির একটা নিগূঢ় সমন্বয় ঘটানোই ছিল এই শিক্ষাদর্শের লক্ষ্য। স্পার্টার মানুষের মত একটা অদ্ভুত দুঃসাহস দেখানো এথেনীয় মানুষের কাছে আদর্শ ব'লে গণ্য হয়নি। মিতাচার তাঁদের জীবনের বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধ জীবনদর্শনেও এই মিতাচারের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেছে। এথেনীয় শিক্ষাদর্শন ন্যায় বিচার এবং স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে সহায়তা করেছে প্রত্যেক নাগরিককে। এই নাগরিকেরা এই শিক্ষাই পেয়েছিল যে, মনুষ্যধর্ম তথা নাগরিকের ধর্ম হ'ল রাষ্ট্রের

মঙ্গলের জন্য তার দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক শক্তির সামগ্রিক প্রয়োগ। নাগরিকের এই যে ধর্মের কথা বলা হ'ল, এ ধর্ম সুন্দর-আশ্রিত। এথেনীয় দর্শনে সুন্দরের সাধনা এবং উপরোক্ত ধর্ম-সাধনা-সমার্থক। অবশ্য এই ধর্ম সাধনা শুধুমাত্র বিজেতাদের জন্যই সত্য ছিল, এই ধর্ম সাধনায় বিজিতদের কোন অধিকার ছিল না; তাই এথেনীয় শিক্ষাদর্শে শিক্ষা-সাম্যের কোন কথা পাওয়া যায় না। শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার, এমন তত্ত্বেরও সেখানে অসদ্ভাব। আজকের প্রগতিশীল শিক্ষাদর্শনে যেমন কায়িক শ্রমের মূল্য এবং মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তেমনটি হ'তে পারেনি এথেনীয় শিক্ষাদর্শনে। এথেনীয় বিজেতারা কোন কায়িক শ্রম করতেন না, বিজিত দাসেরাই এই কায়িক শ্রমটুকু ক'রত। তাই দেখি, কাজের সার্বভৌম মর্যাদা এথেনীয় শিক্ষাদর্শনে স্বীকৃত হয়নি। আধুনিক শিক্ষাদর্শনে যার জন্য গৌরবের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে তা এথেনীয় শিক্ষাদর্শনে একেবারেই অপাংক্তেয়। অবশ্য কর্মের মর্যাদা, কায়িক পরিশ্রমের মূল্য স্বীকৃত না হ'লেও শারীর শিক্ষার আদর্শ এথেনীয় শিক্ষাদর্শের অঙ্গবিশেষ। গ্রীকদেশে সুন্দর দেহের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হ'ত এই শারীর শিক্ষার মাধ্যমেই। তাঁরা বলেছেন সুন্দর দেহে সুন্দর মনের অধিষ্ঠান। সুস্থ, সবল, সহজ মনের জন্য প্রয়োজন অটুট স্বাস্থ্যের; শরীর যদি ভগ্ন হয়, যদি পঙ্গু হ'য়ে পড়ে দেহ, তবে মনটাও ভেঙ্গে পড়ে ধীরে ধীরে। তার শক্তি, তার সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই মহামতি প্লেতো, হোরোদোতাস প্রমুখ মনীষীরা সুখের যে যে উপাদান নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য এবং দৈহিক সৌন্দর্যের উল্লেখ। এথেনীয় শিক্ষালয়ে কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ, সন্তরণ, ব্যায়াম, লম্ফঝম্ফ, বর্শা ও ডিসকাস ছোঁড়া প্রভৃতির মাধ্যমে শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল। এর ফলে এথেনীয় বালকের দেহই যে শুধু সুগঠিত হ'য়ে উঠতো তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বালকের বিচারবুদ্ধি, সংযম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রমুখ সদ্‌গুণেরও বিস্তার ঘটত। তাই দেখি এথেনীয় শিক্ষা-ইতিহাসে প্যালেস্ট্রা এবং জিমন্যাসিয়ম প্রমুখ স্বাস্থ্যচর্চালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এথেনীয় শিক্ষাদর্শ শুধু শরীরকে কেন্দ্র করেই থাকেনি। তা

মানুষের মনের উৎকর্ষ সাধন চেয়েছিল। এথেনীয় সংস্কৃতিতে সংগীতের অদ্ভুত প্রভাব পড়েছে। প্যালেস্ট্রা জিমন্যাসিয়ামে ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বা অন্যান্য বাজনা বাজানো হত। শরীরের পুষ্টি সাধন করে ব্যায়াম, আর আত্মার পুষ্টি সাধন করে সঙ্গীত। মহাদার্শনিক প্লেতো তাঁর গ্রন্থে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদিকে সংগীতের অন্তর্বর্তী করেছেন। এথেনীয় শিশু ব্যাকরণের পাঠ এবং শরীরচর্চার প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত করার পরেই যেত সংগীত বিদ্যালয়ে। দেহের জন্য যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন ছিল, তেমনি আত্মার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংগীতের আবশ্যিকতাও উপলব্ধ হয়েছিল। মহামতি প্লেতো শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এথেনীয় শিশু মহাকাব্য ইলিয়ড এবং ওডেসি মহাকাব্য থেকে অংশবিশেষ আবৃত্তি করত বীণা বাদনের সংগে সংগে ; ছেলেরা গান শিখত, তারপর বাঁশী ও গীটার প্রমুখ বাদ্যযন্ত্রে তাদের শিক্ষাদান করা হ'তো। গান এবং বাজনা এ দুটোর মূল্য শিক্ষার্থীর জীবনে অপরিসীম, এমন তত্ত্ব গ্রীক শিক্ষাদর্শনে সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছিল। সংগীতের ছন্দ, তান, লয়, মাধুর্য মানুষের আত্মাকে সৌন্দর্য এবং ঐক্যের সন্ধান দেয়, তার প্রকৃতির উগ্রতাকে খর্ব করে, তার চরিত্রকে সমগ্রতা দান করে। যাঁরা জীবনে সফল হয়েছেন, বড় হয়েছেন, সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের শিক্ষাকেও অসম্পূর্ণ বলা হত—যদি তাঁরা সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী না হ'তেন। এথেন্সে আইন-কানুন সংগীতের মাধ্যমেই প্রচারিত হ'তো, ধর্মমূলক কর্তব্য সম্পাদন করতে হ'লেও গান গাইতে হ'তো। গ্রীক শিক্ষাদর্শনে এই যে সংগীতকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, এটা খুব একটা দুর্লভ ঘটনা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং মহাচীনেও শিক্ষার্থীর জীবনে সংগীতের স্থান ছিল অত্যন্ত উচ্চে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদমন্ত্র গাওয়া হ'ত বিদ্যাভবনে ধর্মপদ গীত হ'ত। মহাচীনের সুপ্রাচীন সংস্কারের অন্যতম সংস্কার ছিল যে, দেশ-শাসককে সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হ'তেই হবে। দেশ শাসন হ'লে যে উচ্চগ্রামের ধীশক্তি এবং আত্মকর্তৃত্ব শাসকের থাকা দরকার, তা লাভ করা যায় না, শাসক সংগীত বিদ্যায় পারদর্শী হন। তা হ'লে দেখা গেল, সংগীতকে শুধুমাত্র এথেনীয় শিক্ষাদর্শনেই

যে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে, তা নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীতের মর্যাদা এবং গৌরব সর্বজন স্বীকৃত।

গ্রীকদের কাছে গানের চেয়েও প্রিয় আর একটি চারুকলা ছিল, সেটি হচ্ছে নৃত্য। মানুষের আদিম বিস্ময় এবং আবিষ্কারের আনন্দ প্রকাশ পেয়েছিল তার বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায়। মানুষের অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন পেলব ছন্দে লীলায়িত হ'য়ে উঠেছিল নৃত্যের অনুপম মাধুর্যে। এই নৃত্য থেকেই অতুলনীয় গ্রীক নাটকের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। এথেনীয় সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও নৃত্যের সমধিক প্রচলন ছিল। যুদ্ধনৃত্যের প্রচলন এথেনীয় সমাজে যেমন ছিল, সমসাময়িক অন্যান্য সমাজেও তার অপ্রচলন ছিল না। তবে এছাড়াও এথেনীয় সমাজে আনন্দনৃত্য, করুণ-নৃত্য, ভোজের নৃত্য, বসন্তনৃত্য, ডায়োনিসাস নৃত্য প্রমুখ নৃত্যের সমধিক প্রচলন ছিল। গ্রীক বালক এই সব বিভিন্ন প্রকৃতির নৃত্যের মাধ্যমে আপনার শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রত। এই নৃত্য এবং গীতের সংগে গ্রীক কবিতাকেও যুক্ত করা হ'ত, কেননা গ্রীকদের চোখে নৃত্য-গীত এবং কবিতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। এই তিনের সহজ এবং স্বাভাবিক সমবায়ে এথেনীয় শিশুর যেভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তো তা আবার আধুনিক যুগে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে। গ্রীক নবজাগরণের সময়ে এথেন্সে শুধুমাত্র ট্রাজেডি, কমেডি বা গীতিকাব্যেরই প্রচলন হয়নি—দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাই দেখি গ্রীসের স্বর্ণযুগে এইসব বিদ্যার প্রভূত প্রচলন এবং প্রসার। গ্রীকবালক ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পেত। তারপর ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে তারা যেতো সোফিস্ট প্রমুখ শিক্ষকদের কাছে দর্শন-বিজ্ঞানে আপন আপন শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য; ১৮ বছর বয়সপূর্তির সংগে সংগে এথেনীয় যুবক নগরীর সভ্য হিসাবে গৃহীত হ'তো এবং তাকে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হ'ত। এথেন্সকে রক্ষা করাই ছিল তার ধর্ম। শত্রুর আক্রমণ থেকে তার প্রিয় নগরীকে রক্ষা করার জন্য সে দেবালয়ে শপথ গ্রহণ ক'রত। এমনি করেই এক সুদৃঢ় সুব্যাপ্ত মানবিক শিক্ষার বনিয়াদে এথেনীয় নাগরিকের জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ত। তাই ত'

আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা ক'রে থাকি। তবে এথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা প্রসঙ্গে এ কথা না বলে পারি না যে, দেশের বিজিত মানুষদের জন্য তারা তাদের শিক্ষাকে ব্যাপ্ত ক'রে দেয়নি ; তাদের মেয়েরাও এই শিক্ষালাভের কোন সুযোগই পেতো না। এথেন্সবাসীদের নারীর ধারণা বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল। তাদের মতে নারী শুধুমাত্র গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক এবং সন্তানের গর্ভধারিণী। এই ভ্রান্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা এথেনীয় শিক্ষাদর্শনের সম্পূর্ণতার পরিপন্থী। আর একটি কথা। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, প্রাচীন এথেন্সে শিক্ষকের সম্মান খুব উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল না। এথেনীয় শিক্ষাদর্শের মূল্যহানি ঠিক ততখানি ঘটেছে, যতখানি অসম্মান তারা ক'রেছে তাদের গুরুদের। যে সম্ভ্রম, যে শ্রদ্ধা শিক্ষকের প্রাপ্য তার সবটুকু এথেনীয় শিক্ষার্থী শিক্ষককে দেয়নি।

এবার স্পার্টার শিক্ষাদর্শের কথা বলি। এথেনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক, সংস্কৃতি এবং চারুকলার চর্চা হয় বাঁধাধরা নিয়মের রাজত্বের বাইরে ; তাই এথেনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় লাগামের বাঁধুনিটা শিথিল, আর স্পার্টার শিক্ষাদর্শ হ'ল লৌহ নিয়মের নিগড়ে বাঁধা দুরন্ত পশুশক্তি সম্পন্ন পূর্ণাবয়ব মানুষ সৃষ্টি। স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় অর্থাৎ ডোরীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অমানুষিক কষ্টসহিষ্ণুতা, দুর্দম তেজ এবং অসীম দুঃসাহসিকতা শিক্ষার্থীকে কালক্রমে আয়ত্ত করতে হ'ত। ডোরীয় বিজেতার দল বিজিতদের মধ্যে আয়োনীয়দের মত মিশে যেতে পারেনি, তার ফলে তারা সব সময়েই বিপদ আশংকা করত এই বিজিত মানুষদের কাছ থেকে। এই বিজিত-ভীতিই স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এক অভাবিত রূপদান করেছে। স্পার্টার ছেলে-মেয়েদের শরীরচর্চা করতে হ'ত নিয়মাবদ্ধভাবে, তারা একসংগে ব্যায়াম করত, বীর-প্রসবা হওয়াই মেয়েদের আদর্শ ছিল। তারাও তাই পুরুষের মতই ব্যায়ামে এবং রণকৌশলে পারদর্শিনী হ'য়ে উঠত। ছেলেরা যুদ্ধ করতে ভালবাসত, তাদের সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। যুদ্ধের গান ছাড়া অন্য কোন প্রকারের চারুকলার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। স্থূল দৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা জীবনের সকল

সমস্যাকে বিচার ক'রত। আমরা বলি, লজ্জাই নারীর ভূষণ। স্পার্টার রমণী এই লজ্জাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিত, উৎসব প্রাঙ্গণে তারা নগ্নদেহে পুরুষের সামনে নৃত্য করত। বীরসন্তান প্রসব করতে হ'লে লজ্জাকে স্থান দেওয়া যায় না। তাই তারা লজ্জা ত্যাগ করেছিল। ছেলেদের তারা সাত বছর বয়সেই সামরিক শিক্ষার জন্য সামরিক শিক্ষালয়ে পাঠিয়ে দিত। দেহমনে অমানুষিক কৃচ্ছ্র সাধন—যা সৈনিক জীবনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, তা পালন করতে করতে স্পার্টার ছেলে-মেয়েরা মনে যান্ত্রিক এবং দেহে বজ্রপেশী সম্পন্ন হয়ে উঠত। দুর্মদ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা তারা অর্জন করত। বিপদের দিনে দৈহিক শক্তি দিয়ে মানুষে যা সম্পন্ন করতে পারে, তার সবটাই তারা অনায়াসে সম্পন্ন করত। তবে স্পার্টার যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা তাদের নর-নারীর মনটাকে পঙ্গু ক'রে দিল ক্রমে ক্রমে, মানসিক ক্ষিপ্রতার অভাব সামাজিক জীবনে সংগতি রক্ষা ক'রে চলার অক্ষমতা তাদের ক্রমে ক্রমে বাইরের মানুষের কাছে অপ্রিয় ক'রে তুলল। রাষ্ট্রনীতিবিদ্ শাসক হিসাবে তারা কোন রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারল না। শরীর চর্চার লৌহ শাসন স্পার্টার ছেলে-মেয়েদের উদ্ভাবনী শক্তিকে পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল। তারা ক্রমে ক্রমে আপন কর্মকুশলতা হারিয়ে ফেলল। নৈতিক স্বাবলম্বন তাদের জীবনে আর রইল না। তবু খ্রীষ্টপূর্ব শতকে এই স্পার্টার শিক্ষাদর্শই এথেন্সে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন প্লেতো। প্লেতোর চিন্তাপ্রমাদ ঘটেছিল এথেন্সের সংস্কৃতি-কোমল যুবকদের কমনীয়তা দেখে ; পরবর্তী-কালের শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে রুশো মণ্টেন প্রমুখ মনীষীরা স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থার প্রশংসা করেছিলেন ; মহাদার্শনিক আরিস্ততল এই শিক্ষাদর্শের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বহু নিন্দাপ্রশংসা সম্বর্ধিত স্পার্টার শিক্ষাদর্শ আধুনিক যুগে ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলিকে শরীর চর্চার শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ

এ যুগে মন্তেসরী, পেস্তালৎসি প্রমুখ পশ্চিম দেশীয় চিন্তানায়কদের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে আমাদের সম্যক্ পরিচয় ঘটেছে, সমধিক পরিচয় ঘটেছে পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে। এঁরা দর্শনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের শিক্ষা-প্রয়োজনটাকে বিচার করেছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে এবং এর ফলে শিক্ষাদর্শনে বিভিন্ন মতবাদিতা সৃষ্টি হল। নব্য দার্শনিক ডিউঈ-র মতবাদ শিক্ষাজগতে আলোড়ন তুলল। আবার অল্পকাল পরেই তার স্তিমিত তরঙ্গভঙ্গ চোখে পড়ল অনুসন্ধিৎসু দর্শকের। এঁরা সবাই হ'লেন পুঁথিগত বিদ্যায় রত ব্যবহারবাদী শিক্ষকের দল। ব্যবহারবাদটাকে আঁকড়ে ধ'রে এঁরা নানান্ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় দর্শন-মতের পোষকতা করলেন, যিনি নিজেকে শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শবাদী ব'লে মনে করেন তিনিও শেষ পর্যন্ত ব্যবহারটাকেই বড় ক'রে দেখেন এবং এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য শিক্ষাদর্শনের মৌল যোগ্যতাটুকু বিচার করেন্। শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁদের কথা আলোচিত হয়, যাঁদের মত প্রাধান্য পায়, তাঁরা সকলেই সংসার বন্ধনে বদ্ধ জীব। তাঁদের কারো কারো মতে ভগবান সত্য, কেউ কেউ মনে করতেন আবার ভগবানের অস্তিত্বটুকুই ধ্রুব সত্য। আলোচ্য নিবন্ধে এমন একটি পূর্ণ মানুষের শিক্ষাচিন্তা আলোচিত হচ্ছে, যিনি জীবে শিবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যিনি ভগবানের প্রতিষ্ঠাকে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন বিশ্ব চরাচরে। বীর বিবেকানন্দ মৃত্যু-জরা-দারিদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে অমৃতের বার্তা শুনিয়েছেন বিশ্বজগৎকে। অগ্নিগর্ভ এই বাণীতে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান আর আধুনিক মানুষের বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর ভগবৎ উপলব্ধিজাত পরম সত্য দর্শনের অভিজ্ঞতা-টুকু। তাই মৃত্যুজয়ী এই বীর সন্ন্যাসীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাটুকু পরম প্রণিধানের বস্তু।

প্রাচীন স্পার্টায় যুবকদের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল। একথা আমরা জানি যে, এথেনীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যচর্চা এবং ব্যায়ামচর্চাই শেষ কথা বলে স্বীকৃত হয়নি। মানুষের কৃষ্টিকে অব্যাহতরূপে বর্ধমান করার জন্য এথেনীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল পরম উৎসাহী। স্বামীজি স্পার্টার শিক্ষাবিদদের মত বললেন যে, এতদ্দেশীয় যুবকদের শরীরচর্চায় উৎসাহিত করতে হবে। অক্ষম, পঙ্গু, দুর্বল অশক্ত মানুষে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে। এই বিরাট দুর্বল মানুষের সমাজ কোন মহৎ কাজেই ব্রতী হতে পারে না। তারা কোন কৃষ্টিমূলক বা অধ্যাত্ম কর্ম সাধনে অক্ষম, তাদের কোন মহৎ কর্মেই অধিকার নেই। এদেশে অধিকারবাদ নিত্যস্বীকৃত। দুর্বল মানুষের, অক্ষম মানুষের ধর্মে অধিকার নেই। আমাদের যত দুঃখ, যত বেদনা, তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য আমাদের দুর্বলতাই দায়ী। আমাদের শারীরিক অসামর্থ্য আমাদের অলস ক'রে তুলছে। প্রাণশক্তির অভাবে আমরা ক্রমে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমাদের পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞান আমরা পেয়েছি, কিন্তু সেই জ্ঞানমতে কর্ম করার শক্তিটুকুও আমাদের নেই। তাই স্বামীজি বললেন যে, মৃতকল্প আমাদের দেশের মানুষকে প্রথম উদ্দাম প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত ক'রতে হবে। তিনি বললেন—ছেলেরা, তোমরা, ফুটবল খেলো, গীতাপাঠ ক'রো না। গীতাপাঠে তোমাদের মোক্ষলাভ ঘটবে না, ফুটবল খেলেই তোমরা স্বর্গে যাবে। অর্থাৎ গীতাপাঠ ক'রে অর্জুনের অতিমানবীয় শক্তির কথা, সুদর্শনচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের পরম বীর্যের কথা তারা কেমন ক'রে উপলব্ধি করবে, যদি তারা অশক্ত, দুর্বল এবং নির্বীর্য হয়। আমাদের প্রথম কর্তব্য হ'ল, যুবসমাজকে শারীরবিদ্যায় বিদ্বান করে তুলতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে শরীর চর্চার মাধ্যমে শক্তি অর্জন করতে হবে। অধ্যাত্ম শক্তির যোগ্য পীঠস্থান হবে শারীর-শক্তির প্রাচুর্য। অধ্যাত্মজ্ঞান, ধর্ম-সাধনা, এসব হ'ল পরবর্তী অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় শুধু শরীর চর্চা নিয়ে। আমাদের শাস্ত্র, আমাদের বেদ-উপনিষদ এই কথাই আমাদের বলেছেন যে, ধর্ম হ'ল অনন্ত শক্তি। এই অনন্ত শক্তি থেকেই কল্যাণ জাত হয়। দুর্বলতাই হ'ল অশুভের জনক। আমার চিত্তের দুর্বলতাই

আমাকে স্বার্থপর, কূপমণ্ডুক ক'রে তুলছে। সেই দুর্বলতাকে পরিহার করতে হ'লে প্রাণবন্ত দুর্মদ শরীরের দরকার। আমি কেমন ক'রে বলব 'সোহম', অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির সঙ্গে আত্ম স্বাঙ্গিকরণ ঘটানো কেমন ক'রে সম্ভব হ'বে—যদি আমাকে অশক্ত দুর্বল দেহটাকে টেনে টেনে সারা জীবন চলতে হয়? অশক্ত দুর্বল মুখে নির্ভীক সত্যের প্রকাশটুকু কেমন ক'রে ঘটবে? সত্য যে পরম শক্তি থেকে জাত হয়, সেই পরম শক্তিটুকু হ'ল আত্মার শক্তি, সে শক্তি মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। সেই শক্তিটুকুর বলেই ভারতীয় সন্ন্যাসী উদ্ধত রাজাধিরাজ আলেকজান্দারকে বলেছিলেন, আমি আত্মা, আমাকে তোমার আঘাত স্পর্শ করে না। আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নই। আত্মার এই দুর্মদ শক্তির আধার অক্ষম দুর্বল মনুষ্যদেহ নয়। এই পরম শক্তি দুর্বল ইন্দ্রিয় আর স্নায়ু শাসিত ততোধিক দুর্বল দেহকে আশ্রয় করে না—এই শক্তি আশ্রয় করে বীরের বীর্যবান শরীরকে। তাইত' স্বামীজি বললেন—শিক্ষার প্রথম সোপান হবে শারীর শিক্ষা। তবে মুক্ত সন্ন্যাসীর শারীর শিক্ষাদর্শনে আর এথেনীয় এবং স্পার্টার শারীর শিক্ষাতত্ত্বে আকাশ-মাটির ব্যবধান। স্বামীজি শারীর চর্চাকে দেখলেন অধ্যাত্ম চর্চার প্রথম সোপান হিসেবে, আর স্পার্টার রাষ্ট্রনায়কেরা শারীর চর্চাকে দেখেছিলেন বিজিত মানুষদের ওপর অত্যাচার চালানোর উপায়রূপে। স্বামীজির চোখে শাসক ও শাসিতের ভেদ লুপ্ত হয়েছিল; তবুও যথার্থ বৈদান্তিকের মতই সংসারের ব্যবহারিক সত্তাটুকুকে তিনি অস্বীকার করেননি। ব্যবহারিক সত্তাকে স্বীকার করেও পারমার্থিক সত্তার সন্ধান মেলে। তাইত স্বামীজি শারীর চর্চার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তিনি বললেন যে, আমাদের বেদশাস্ত্রসার উপনিষদ 'অভীঃ' শব্দটির বহু বার পুনরাবৃত্তি করল। অভয় মন্ত্রের এমন প্রচার আর কোন ধর্মগ্রন্থে দেখা যায় না, একথা স্বামীজি বলেছেন। উপনিষদ স্বামীজির কানে এই অভিষ্ট মন্ত্রটি আবৃত্তি করেছে লক্ষ বার। স্বামীজি অনন্ত শক্তি আহরণ করেছেন আমাদের এই সুপ্রাচীন শাস্ত্র থেকে। এই অভীক মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে সেই অন্তরে যে অন্তর শক্তিমান শরীরকে আশ্রয় করেছে। তাই স্বামীজি শারীরবিদ্যা শিক্ষার কথা

বললেন এমন জোর দিয়ে। শিক্ষাক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শারীর-চর্চাকে গ্রহণ করবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন।

এই অভয় মন্ত্রে মানুষের দীক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন সে দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক ব'লে জানবে। অভয়মন্ত্রে দীক্ষার প্রথম সোপান হ'ল সবল স্বাস্থ্য। কিন্তু তারও বিবর্তন ঘটে। শরীরকে স্বীকার করেই শরীরকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'লে, দেহকে আশ্রয় ক'রে মনের শক্তি বর্ধিত হয়। এই ক্রমবর্ধমান শক্তিরও একটা সীমা আছে, তার প্রতিরোধক্রিয়াও সীমিত। তাই মহাবলশালী ব্যক্তিরও ভয় থাকে যে মহত্তর বলশালী ব্যক্তির আঘাতে সে ধরাশায়ী হবে। কিন্তু যিনি এ কথা ভাবতে পারেন যে দেহটা ত' আমি নই, আমি ত' আত্মা—তিনি অজেয়। এমনি ধরনের একজন মানুষ প্রবল পরাক্রান্ত আলেকজান্দারকে তাঁর শক্তিমদমত্ত দম্ভের জন্য উপহাস করেছিলেন—সে কথা আগেই বলেছি। তাই ভয়কে জয় করতে হ'লে, মরার আগে হাজার বার মরার হাত থেকে বাঁচতে হ'লে দেহ এবং আত্মার ভিন্নতাটুকু উপলব্ধি করতে হবে। সেটা প্রারম্ভিক পর্যায় নয়, সেটা শেষ পর্যায়। আমাদের দেশের লক্ষকোটি ভয়ে ভীত মানুষকে স্বামীজি এই অভয় মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চাইলেন। ভীত মানুষ ভিক্ষা করে। ভিক্ষায়াৎ নৈব নৈব চ—ভিক্ষার দ্বারা কোন কিছুই সম্পাদন করা যায় না। স্বামীজি বুঝেছিলেন যে, অভয়মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করতে না পারলে তার এই ভিক্ষা করার নেশা ছুটবে না। এই ভিক্ষুক-বৃত্তির সর্বনাশা অধঃপতন থেকে জাতিকে বাঁচাতে হ'লে তাদের ভয় থেকে মুক্ত করতে হ'বে, সে ভয়ের অনন্ত প্রকার ভেদ: রাজ-ভয়, লোক-ভয়ের সীমাহীন বেড়াজাল আমাদের ঘিরে ধরেছে। তার থেকে মুক্তি না ঘটলে আমাদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। এই ভয় দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক অবিশ্বাসও দূরীভূত হবে। অবিশ্বাস নাশনের সঙ্গে আসবে একটা সামগ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। স্বামীজি এই ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেছেন, অজ্ঞ মুচি-মেথরকে 'ভাই' বলেছেন তিনি। জাতিভেদটা কর্মকেন্দ্রিক, তার আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন বিভ্রান্তিকর। জাতিভেদের সংকীর্ণতা হিন্দুসমাজকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সেই পঙ্গু

জাতিকে চলমান এবং প্রাণবান ক'রে তোলার জন্য যে মূল বিশ্বাস যে প্রারম্ভিক সত্যটুকু আমাদের আয়ত্ত করতে হবে, স্বামীজি তাঁর নির্দেশ দিলেন। স্বামীজির শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য আমাদের আক্ষরিক জ্ঞান দেওয়া নয়। পারমার্থিক পরমতাত্ত্বিক জ্ঞানে আমাদের সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল, অধ্যাত্ম জ্ঞানের, পারমার্থিক বিশ্বাসের পরশমণির স্পর্শে আমাদের সকল কলুষ কালিমা অপগত হবে, আমরা ধার্মিক হ'য়ে উঠব। বিভেদের হাজারটা বেড়া দিয়ে আমাদের চেনা জগৎটাকে সংকীর্ণ হ'তে সংকীর্ণতর ক'রে তুলে ধর্মসাধন করবার প্রয়াস পেলে সে ধর্মসাধন শুধুমাত্র আচারগত হ'য়ে পড়বে। ধর্ম ত' আচরণ মাত্র নয়। ধর্ম মানুষকে পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে, মানুষের অন্তরলোকের রূপান্তর ঘটায়। ভয়ের কালো সরিয়ে দিয়ে ধর্ম নিয়ে আসে অভয়ের আলোটুকু। স্বামীজি চেয়েছিলেন অধ্যাত্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে সারা দেশের মানুষের অন্তরে এই অভয়ের আলোটুকু প্রকাশিত হোক্।

যে চিত্ত ভয় থেকে বিমুক্ত, সেখানেই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। জ্ঞান ত' তথ্য-আহরণ মাত্র নয়। জ্ঞান হ'ল সত্যজ্ঞান। এই সত্যজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে মানুষের অন্তরলোকে। পূর্ণতা সুপ্তাবস্থায় সব মানুষের অন্তরেই রয়েছে। সেই সুপ্ত পূর্ণতাকে উপলব্ধি করতে হ'লে শিক্ষার দরকার, সাধনার প্রয়োজন। যে দীপ অন্তরে জ্বালানো হয়নি তাকে প্রজ্বলিত করাই হ'ল শিক্ষা-সাধনার কাজ। শিক্ষার কাজে প্রধান সহায়ক হলেন শিক্ষক। উদ্যানরক্ষক শিশুগুল্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করে থাকে মাত্র, শিশুগুল্ম যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আপন আন্তর শক্তির উন্মাদনায়, ঠিক তেমনি ক'রে শিশু বেড়ে ওঠে আপনার প্রাণশক্তির প্রসাদে. তার মনের প্রসার ঘটে কৌতূহলের তাগিদে, শিক্ষক উদ্যান-রক্ষকের মতই শিশুর মনের প্রসারকে সুব্যাপ্ত করে দেন মাত্র। স্বামীজি বললেন যে, গাধাটাকে পিটিয়ে ঘোড়া করবার দায়িত্ব শিক্ষকের নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদদের মতই স্বামীজি বললেন যে, শিশুর আন্তর-শক্তির উন্মেষ ঘটাবেন শিক্ষক। তার শ্রীবৃদ্ধির অনন্ত সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে সত্য ক'রে তুলবেন শিক্ষক। শিক্ষার্থী

তার আন্তর প্রয়োজনের প্রেরণায় কাজ করবে, শিখবে, সমৃদ্ধ হবে,' শিক্ষক হবেন তার সহচর, সহায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে অবহিত করবেন। শিক্ষার্থী শিখবে আপনা-আপনি, জোর ক'রে বাইরে থেকে জ্ঞানসম্ভার শিশু-মনের ওপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সে শিক্ষা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। শিক্ষা হ'ল আবিষ্কার। শিশু আবিষ্কার করবে নিত্য নতুন জগৎকে, সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কুটুই তার জানার পরম পুরস্কার। সে জ্ঞানকে আপন অন্তরলোকে আবিষ্কার করে। স্বামীজি বললেন যে এই আবিষ্কারতত্ত্ব যেমন শিশু-মানসে প্রযোজ্য ঠিক তেমনি তা প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানপ্রবুদ্ধ নরনারীদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি বললেন যে মহাজ্ঞানী নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন, তা তাঁর মননজাত। তার আশ্রয়ও তাঁর মনোলোকে। বহির্জগতে আপেলের বৃক্ষচ্যুতি তাঁর মানসলোকে আলোড়ন তুলেছিল, সেই আলোড়নজাত অমৃতটুকু বিশ্ববাসী পেলো মাধ্যাকষণের জ্ঞানে। তবে এই জ্ঞান উন্মেষের যথাযোগ্য সময় এবং পরিবেশটুকুর একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক শিশুমনকে উদ্দীপ্ত করবেন, তার মনে জ্ঞান-উন্মেষের অনুকুল যথাযোগ্য পরিবেশ রচনা করবেন। এইটুকুই হল শিক্ষকের কাজ। জ্ঞান-তা ধর্মীয়ই হোক আর বস্তুজগৎ বা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধীয় হোক না কেন তা রয়েছে শিক্ষার্থীর অন্তরে। স্বামীজি জ্ঞানের এই জ্ঞাতানির্ভরতা তত্ত্বে একান্তভাবে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে তা আধুনিক শিক্ষানিয়ামকদের দ্বারা সমর্থিত। উপরন্তু স্বামীজির শিক্ষাদর্শনে শিক্ষককে 'গুরুর' মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গুরু হলেন তিনি যে ব্যক্তির 'আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক।' আর যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই অধ্যাত্মশক্তির বিনিময় ঘটে। এই পরমশক্তিটুকুর সঞ্চার না ঘটলে গুরুশিষ্যের মধ্যে যথার্থ সম্পর্কটুকু প্রতিষ্ঠিত হয় না। আজকের

দিনে এই সৎ সম্পর্কের অভাবের জন্য আমরা দুঃখ করি। কিন্তু এ-কথা মনে রাখা দরকার যে আজ আর সেই অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী গুরুও নেই এবং সেই শক্তি গ্রহণ করবার আধারেরও একান্ত অভাব। তাই ত' নব্য শিক্ষাদর্শন এ-যুগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ-আশ্রিত' সমস্যাটুকুর সমাধানে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

স্বামীজি জন্মান্তর সংস্কারে বিশ্বাসী। শিশু যে সব প্রবণতা নিয়ে এসেছে, এজন্মে তা নির্দিষ্ট হয়েছে জন্মজন্মান্তরের কর্মফলে। তার চিত্তবৃত্তি রূপ পেয়েছে প্রাক্ জন্মের সঞ্চিত কর্মফলে। তার বুদ্ধি তার মন, তার মানসিকতা সবই পূর্বনির্দিষ্ট। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হ'ল শিশুমনকে ঢেলে সাজা, তার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে সম্মার্গগামী করা। এই সম্মার্গগামী প্রবৃত্তিগুলো শৈশবে ছেলেমেয়েদের চারিত্র-বনিয়াদটুকু পাকা ক'রে গেঁথে দেবে। এর ফলে দেশে 'মানুষ' গ'ড়ে উঠবে; আর সৎ শিক্ষার কাজই হ'ল এই মানুষ তৈরী করা। মানুষ তৈরী করা তখনই সম্ভব হবে যখন শিক্ষার্থীর ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হবে এমনভাবে যে তা যেন সুফলপ্রসূ হযে ওঠে। এই শিক্ষাকে স্বামীজি প্রকৃত শিক্ষা বলেছেন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে দেশের ছেলেদের শরীরে লৌহদৃঢ় পেশীর সঞ্চার করা, ছেলেমেয়েদের ইস্পাত-কঠিন স্নায়ুতন্ত্রী গঠন করা এবং দুর্জয় ইচ্ছার অধিকারী ক'রে তোলা দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে। শিক্ষার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তবেই সত্যিকারের মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হবে। এই যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করার কথা স্বামীজি বলেছেন, তার মুলে রয়েছে গভীর মনঃসংযোগ। মনকে একাগ্র ক'রে যে-কোন বিষয়েই তাকে নিযুক্ত কর না কেন সেই বিষয়টুকু অধিগত হতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না; মনের এই একাগ্র 'নিয়োগই হল জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথেই ভগবদ্ জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সামান্যতম বিষয়ে জ্ঞানও লাভ করা যায়। মনকে একাগ্র করে যত জটিল ব্যাপারেই সন্নিবিষ্ট করা হোক না কেন, এই মনোনিবেশ জ্ঞানের বিষয়কে স্বচ্ছ এবং সহজবোধ্য করে তোলে। পরমযোগী থেকে অতি সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত সকলেই আপন আপন

ক্ষেত্রে, মনোসন্নিবেশটুকু করছেন এবং তার ফলে ঈপ্সিত ফললাভটুকুও তাঁর ভাগ্যে ঘটছে। এই মনোসন্নিবেশটুকু হল মানবসমাজের বিভেদক। মানুষের উচ্চতর মানসিকতা এই বিভেদকের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কাজে কাজেই যে শিক্ষার্থী যে অনুপাতে মনোনিবেশ করবে, তার বিদ্যালাভও সেই পরিমাণেই ঘটবে। মনের একাগ্রতা বিদ্যার্জনের পক্ষে একান্ত অনুকূল। স্বামীজির মতই রবীন্দ্রনাথও শিশু শিক্ষার্থীর মানসিক একাগ্রতার একান্ত প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। তাই তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিক কর্মসূচীতে 'ধ্যান'কে স্থান দিলেন। যদি ভগবদ্ অনুধ্যান না হয়, তাতে কবিগুরুর আপত্তি নেই কিন্তু ধ্যানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তি একাগ্র হয়ে ওঠবার অবকাশ লাভ করবে। আর একাগ্র চিত্তবৃত্তি শিক্ষার্থীর সার্থক শিক্ষালাভের পক্ষে একান্ত অনুকূল । এই মনোবিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বে কবি এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পরম আস্থা। এই আস্থা অহেতুক নয়, এ মনোবিদ্যসিদ্ধ। তাই স্বামীজি একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে বললেন যে, আবার যদি নতুন করে বিদ্যাশিক্ষা করা শুরু করতে পারতাম তা হলে কোন তথ্য আহরণের দিকে আমি আর ঝুঁকতাম না। জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে একান্তভাবে মনোনিবেশ করার অভ্যাসটুকু আয়ত্ত করতাম আর মানসিক বৈরাগ্যটুকু পুরোপুরি আয়ত্ত করার জন্য সাধনা করতাম। নিরাসক্ত চিত্তে বিষয়ে মনোনিবেশ করলে তবেই বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান হয়। তাই স্বামীজি বললেন যে নিরাশক্ত চিত্তে মনোনিবেশ করবার কৌশলটুকু পৌনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করে তবেই তথ্যাদি আহরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। মনকে কেন্দ্রীভূত করে কোন বিষয়ের ওপর একাগ্র করে স্থাপন করার কৌশলটুকু রাজযোগের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়। 'রাজযোগ' গ্রন্থের অবতরণিকায় স্বামীজি বললেন :

"এইরূপ মন সমুদয় ইন্দ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের অপর অন্তর্দৃষ্টি আছে। এই শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি-শক্তির বিকাশসাধন করাই যোগীর উদ্দেশ্য, মনের সমুদয় শক্তিকে একত্র করিয়া ও ভিতরের দিকে ফিরাইয়া, ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চাহেন।

ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কতগুলি দার্শনিকের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র।"[১]

এই মনঃসংযোগ করার শক্তি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিভিন্ন। সংযম এবং ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে সংহত করে তোলা যায়। তাই ত' হিন্দু শিক্ষাদর্শে চতুরাশ্রম-ধর্মকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে মন একাগ্র হয়। একাগ্র মনই আমাদের বুদ্ধিকে এবং অধ্যাত্মশক্তিকে তীক্ষ্ণ এবং ব্যাপ্ত করে। তাই স্বামীজি বললেন যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যপালনের অভ্যাসটুকু আবশ্যিক। একদিকে ব্রহ্মচর্যপালনের ধারা বিক্ষিপ্ত মনকে সংহত এবং একাগ্র করে বিষয়ে স্থাপিত করলে বিষয়ের জ্ঞান যেমন সহজেই জন্মে, অন্যদিকে আবার ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা আমাদের যৌনশক্তিকে সংহত করতে পারলে তা আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে বর্ধিত করে। চিত্তবৃত্তিকে সাম্যাবস্থা দান করে এই ব্রহ্মচর্যপালন ; চিত্তের এই সাম্যাবস্থা বিদ্যার্জনের পক্ষে একান্ত অনুকূল। ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে মেধা বর্ধিত হয়, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী একাগ্র ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে শ্রুতিধর হয়ে ওঠে। বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাটুকু শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। শ্রদ্ধার দ্বারা জ্ঞানলাভের পথ নির্দিষ্ট হয়েছে ভারতীয় শিক্ষাতত্ত্বে। শ্রদ্ধাহীন শিক্ষার্থী কোন বিদ্যাই আয়ত্ত করতে পারে না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া এবং শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা—এ দুটি শিক্ষার্থীকে পালন করতেই হবে। শিক্ষার্থী বিশ্বাস করবে যে, সে আত্মা। জড় দেহটা ত' আমি' নয়, আমি' হল তার অন্তরস্থিত পরমাত্মা। এই মহৎ সত্যটুকুর জ্ঞান শিক্ষার্থীকে আত্মশক্তিতে শক্তিমান করে তুলবে। নিজেকে অক্ষম এবং ক্ষুদ্র ভাবার মধ্যে আর যাই থাক না কেন আত্মসম্প্রসারণের এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার কোন অবকাশ নিশ্চয়ই নেই। তাই স্বামীজি বললেন যে, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসটুকু জাগ্রত করতে হবে। সেই জাগ্রত আত্মবিশ্বাস, আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ নিবেদিত হবে গুরুর চরণে পরম শ্রদ্ধায় এবং আগ্রহে। এই শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান লাভ

১। ভক্তিযোগ, পৃঃ ২৭।

করা যায় না, তথ্য আহরণ করা যায় মাত্র। স্বামীজি তথ্যচয়নকে 'শিক্ষা' 'আখ্যা' দেননি। চিন্তায় এবং কর্মে বিশুদ্ধতা না থাকলে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং শ্রদ্ধাবান হওয়া যায় না। এই বিশুদ্ধ চিন্তা এবং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠিত হয়, নীতি এবং মহৎ আদর্শে তারা আস্থাবান হয়ে ওঠে। ক্রমে তাদের কর্মে এবং মননে আদর্শের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং সার্থক হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যময় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সকল মহৎকর্মের উৎস। আমরা ভাববাদী ঋষি এবং সাধুসন্তদের উপদেশ মানি, সমকালের ওপর, কালান্তরের উপরও তাদের প্রভাব ব্যাপক। এই ব্যাপক প্রভাবের মূলে তাদের পাণ্ডিত্য নেই। ঈশা-মুশার চেয়ে, বুদ্ধ-চৈতন্যের চেয়ে পণ্ডিত মানুষ তাঁদের সমকালে, পূর্বকালে অথবা উত্তরকালে যে ছিল না, তা নয়, তবে মানুষেরা এঁদেরই গ্রহণ করলেন জগৎগুরু বলে; এর মূলে রয়েছে এঁদের মহৎ এবং দিব্য ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মহাপুরুষের বাণীকে এমন একটা শক্তি এবং মর্যাদা দেয় যা তাকে দুর্নিবার এবং সর্বত্রগ করে তোলে। স্বামীজি বললেন যে সৎ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে গড়তে হবে। পূর্ণব্যক্তি মানুষের বড়ই অভাব রয়েছে সমাজে। আমরা জনতার সৃষ্টি করি, কেননা আমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব। এই অভাবটুকু দূর করবার জন্য স্বামীজি তাঁর অধ্যাত্ম-মূল্য-আশ্রিত শিক্ষাতত্ত্ব প্রচার করলেন।

স্বামীজি বললেন যে, যোগসাধনের দ্বারা আমরা আমাদের চিন্তা এবং কর্মের মূল উৎসের সন্ধান পাই। স্বামীজি মানুষের ত্রিবিধ স্তরপর্যায়ের কথা বললেন: স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ এবং আত্মা। তাঁর কথাতেই বলি, "অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তৎপরে সূক্ষ্ম শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থূলদেহের সমুদয় শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।"[২] এই অধ্যাত্মচেতনাকে আবিষ্কার না করতে পারলে, যে শক্তি আমাদের চিন্তা এবং কর্মরূপে প্রকট, সে শক্তির কোন সন্ধানই আমরা পাবো না। আর এই শক্তির সন্ধান এবং অনুধ্যান যদি আমাদের অনায়ত্ত হয়

তা হলে আমাদের চিন্তা এবং কর্মের সম্যক্ বিধিবন্ধ লাভ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। বিক্ষিপ্ত চিন্তা এবং কর্ম বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। চিন্তা এবং কর্মের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বামীজি যোগসাধনের কথা বললেন। যোগসাধনার দ্বারাই এই সার্বিক নিয়ন্ত্রণ শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। আর এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাটুকু আয়ত্ত না হলে যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে চিন্তা এবং কর্মরূপে আপনাকে প্রকাশ করছে তার সন্ধান অলভ্য থেকে যাবে। তার সন্ধান না মিললে কেমন করে শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়ে আমরা আমাদের মননে এবং চিন্তনে, কর্মে এবং ব্যবহারে সুশালীন সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি? মৌল অধ্যাত্মশক্তিটুকুই হ'ল জড়, মন এবং এতদ্-উভয়াতীত দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য বিশ্বসংসারের মূলীভূত কারণ। এই শক্তির সন্ধান মিললে অধ্যাত্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। যোগের মাধ্যমে এই শক্তির সাক্ষাৎ মেলে। যোগজাত অলৌকিক শক্তিতে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীরই অধিকার নেই, সে অধিকার গৃহীরও আছে। যে গৃহী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করছেন তাঁর মধ্যেও সেই শক্তি উপজাত হয়! স্বামীজি একটি গল্প বলে আমাদের বুঝিয়েছেন গৃহীর এই কর্তব্য-যোগের মূল্য। গল্পটি হ'ল:

এক সন্ন্যাসী বহুদিন তপশ্চর্যা করেছেন বনে; তপস্যান্তে বৃক্ষতলে যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন তখন কলহরত একটি কাক এবং একটি বক সন্ন্যাসীর শিরে ভগ্ন বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করে। সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ লোচনে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নয়নের ক্রোধবহ্নিতে কাক এবং বক উভয়েই দগ্ধ হয়ে গেল। সন্ন্যাসীর যোগজাত শক্তি এই অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করল। সন্ন্যাসী খুশি হলেন আপনার শক্তিমত্তা দর্শনে; অহংকার এসে মনে আসন পেতে বসল। সন্ন্যাসী ভিক্ষায় চললেন। গ্রামের প্রথম কুটীরে তিনি ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। বাড়ীর অন্দর মহল থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, 'বাবা একটু দাঁড়াও, ভিক্ষা দিচ্ছি।' সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন "তোমার ত' স্পর্ধা কম নয়। বনে আমি পক্ষীদের দগ্ধ করেছি। প্রয়োজন হ'লে তোমাকেও দগ্ধ করতে পারি।" ভিতর থেকে আবার নারীকণ্ঠ ভেসে এলো: "বাবা

আপনি বসুন, আমি কাজ সেরে আসছি। এখানে বায়স-সারসেরা থাকে না, এ মনুষ্যের আবাসস্থান।" সন্ন্যাসী চকিত হয়ে উঠলেন। কেমন করে এই নারী জানলেন তাঁর নিভৃত চিন্তা? তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করলেন এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্না মহিলাটিকে দর্শন করার জন্য। একটু পরে ভিক্ষা হাতে নিয়ে সামান্যদর্শনা মহিলাটির আবির্ভাব ঘটল। তিনি এসেই বললেন, বাবা, আমি আমার অসুস্থ স্বামীর সেবা করছিলাম, তাই বিলম্ব হ'ল। সন্ন্যাসী মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কোন্ যোগবলে তাঁর এই অলৌকিক শক্তি লাভ করেছেন? মহিলাটি উত্তরে বললেন যে তিনি কায়মনোবাক্যে তাঁর কর্তব্যটুকু সারা জীবন ধরে পালন করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কোন যোগ, কোন কৌশল তাঁর আয়ত্তে নেই। বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে তিনি পিতামাতা এবং পরিজনবর্গের প্রতি কর্তব্যটুকু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। বিবাহের পরে তিনি পতিগৃহে এসে স্বামীর প্রতি এবং পতিগৃহের অন্যান্য সকলের প্রতি তাঁর কর্তব্যটুকু মনপ্রাণ দিয়ে করেছেন মাত্র। এইভাবেই তিনি তাঁর শক্তিটুকু অর্জন করেছেন। এই কর্তব্যপরায়ণতার মধ্য দিয়েও গড়ে ওঠে সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব এবং একাগ্র মন। এরাই কালক্রমে আমাদের অলৌকিক শক্তিটুকু দান করে। তা' হলে দেখা যাচ্ছে যে নীতিশাস্ত্র-আশ্রিত শিক্ষাবিধি যদি আমাদের কর্তব্যটুকু সাধনে যথাযথ উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তবে শুধুমাত্র কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেই আমরা যোগজ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে পারি। আর এই শক্তি আয়ত্তে এলে আমরা আমাদের জড়জগতের এবং মনোলোকের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারব। তাই স্বামীজি-প্রচারিত শিক্ষা-দর্শনকে সম্যক্‌রূপে নীতি আশ্রিত শিক্ষাদর্শন বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে না। তবে সত্য সুপ্রতিষ্ঠ হবে—যদি আমরা একে অধ্যাত্মলক্ষ্য-আশ্রিত শিক্ষাদর্শন আখ্যা দিই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

ভারতবর্ষে উনিশ শতকে নব জাগরণের মূলমন্ত্র হল পশ্চিমী মানবতাবাদ। হিন্দু তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের অচলায়তন যে সংস্কার সৃষ্টি করেছিল প্রায় দু'হাজার বছর ধ'রে, তার মূলে কুঠারাঘাত করল নব্য চিন্তা —ভারতের রেনেসাঁস। এই নব অভ্যুত্থানের প্রাথমিক লক্ষণ হ'ল স্বাধীন মানুষের যুক্তি যাকে গ্রহণ করবে তাকেই সত্য মূল্য দিতে হবে—এ হ'ল হিউম্যানিজমের গোড়ার কথা। ভারতীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে যখন হিউম্যানিজমের এই মন্ত্রটি বার বার খণ্ডিত হচ্ছিল মানুষের ঐতিহ্য পরায়ণতার জন্য, যখন যুক্তি বুদ্ধি বার বার লঙ্ঘিত হচ্ছিল সংস্কারের পূজায় তখন ঘটল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। যে স্বাধীন চিন্তার বীজমন্ত্র রাজা রামমোহন এবং ডিরোজিও নব্য বাংলার প্রাণে প্রাণে রেখে গেলেন, তার যথাযোগ্য উদ্বর্তন ঘটল উনিশ শতকের বাঙ্গলা দেশে। বার বার নানান মনীষীর জীবনে হয় সংস্কার, না হয় ধর্ম, না হয় চলিত নীতিকথা বড় হয়ে দেখা দিল। যাঁরা পশ্চিমী জ্ঞান-সভ্যতার ধ্বজা ওড়ালেন তাঁরা পূর্ব দেশে শুধু কুসংস্কারই প্রত্যক্ষ করলেন। আর যাঁরা প্রাচ্য দেশের প্রজ্ঞা এবং মনীষার পোষকতা করলেন তাঁরা পশ্চিমী জীবনবেদে শুধু স্বৈরাচার অবলোকন করলেন। কোথাও যুক্তি প্রাধান্য পেল না। যুক্তির নামে গোঁড়ামির নিশান আচ্ছন্ন করেছিল উনিশ শতকী বাংলার চিন্তালোক। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন উনিশ শতকের প্রত্যন্ত সীমায়। এ রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী, হিউম্যানিস্ট। তাঁর চিন্তায় কোথাও সংস্কার-পূজার আভাস নেই। অতি নব্যতার ব্যর্থ আস্ফালনে তাঁর মানসিকতা ভারাক্রান্ত হয়নি। সংস্কার যেখানে বোঝা হ'য়ে উঠেছে সেখানে সংস্কার তিনি ত্যাগ করেছেন, সে সংস্কার ধর্মেরই হোক আর জাতীয়তাবাদেরই হোক। ধর্ম যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বকে অসম্মান

করেছে, তিনি সেখানে ধর্মদ্রোহী হয়েছেন। জাতীয়তাবাদ যেখানে মানুষের অন্তরশায়ী ভগবানকে ঘৃণার বিষে জর্জরিত করেছে, সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী নন, মধ্যযুগীয় সংস্কার নব মানবিকতায় আদর্শ-উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেনি। মধ্যযুগে পুরোহিত তন্ত্রে বিশ্বাস মানুষের বিচার বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আধুনিক যুগের চেতনা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল। পশ্চিমী হিউম্যানিজম আমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিল ভারতবর্ষের শাশ্বত চিন্তার কথা। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এ সত্য শুধুমাত্র চণ্ডীদাসের উক্তি নয়, এ হ'ল ভারতবর্ষের শাশ্বত মর্মবাণী। এই মর্মবাণী রবীন্দ্রনাথ আপন মননে ও কথনে সত্য করে তুললেন। কোন প্রলোভন, কোন নিন্দা তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচলিত করেনি। উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যেমন আপন বিশ্বাসের প্রেরণায় তিনি বিদ্রোহ করলেন, ঠিক তেমনি আবার স্ব-জাতির নিগ্রহে এবং অপমানে তিনি বজ্র-নির্ঘোষে প্রতিবাদ জানালেন বিদেশী স্বৈরাচারের। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ যুক্তি তাঁকে সত্যের পথে অবিচলিত রেখেছে। যেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন, সেইখানেই তিনি নতমস্তকে বার বার অভিবাদন জানিয়েছেন সে দেশের মানুষদের। রুশিয়ার আমন্ত্রণে যখন তিনি সে দেশে যান, তখন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রচার নিয়ে সে দেশে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। তারা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করেছিল, তা কবিকে বিস্মিত করে দেয়। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্রের অভূতপূর্ব সাফল্যকে স্তুতিবাদ করলেন। তিনি লিখলেন, "রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমে চোখে পড়ল সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় আজ থেকে ষাট বছর আগে ভারতীয় জনসাধারণেরই মত নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে, দেড়শ বছরেও আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের 'দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ' স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও

সাহস পায়নি, এক্ষণে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলাম দিগন্ত বিস্তৃত।"[১] কবি নব্য রুশিয়ার এই সাফল্যকে অভিনন্দিত করে তাঁর নিজের দেশের পটভূমিকায় এই সাফল্যটুকু কামনা করলেন।

হিউম্যানিস্ট রবীন্দ্রনাথ এ যুগের অন্যতম শিক্ষাধিনায়ক। বিদেশী শাসক এদেশে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষার কল প্রতিষ্ঠা ক'রে মুখস্থবিদ্যাবিশারদ ভুরি ভুরি কেরাণী সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ মনীষী এতোদ্দেশীয় এই শিক্ষা পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাই দেখি, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাংলাভাষার মাধ্যমে দেশের মানুষের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা চলেছে। পশ্চিমদেশীয় অনেক পণ্ডিতও এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এতোদ্দেশীয় অনেকেই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রকে সহজলভ্য করার জন্য বাংলাভাষায় শাস্ত্র পুরাণাদি অনুবাদ করেছিলেন। এই ভাবে যখন মানুষকে দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সুস্থ এবং সবল করে তোলবার চেষ্টা চলছিল তখন এলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবনবাদ সমগ্রতার জীবনবাদ। মানুষ বুদ্ধিকেন্দ্রিক নয়। মানুষের জীবন তার বুদ্ধির সীমানায় নিঃশেষিত নয়। তার অনুভূতি আছে, সৌন্দর্য পিপাসা আছে, আত্মধর্মের উন্মাদনা আছে। যে শিক্ষা মানুষের মানবীয় সত্তার সমগ্রতা-টুকুকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির পাখায় ভর ক'রে—সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলেন। সে অস্বীকার শুধু কথনেই সীমাবদ্ধ রইল না। বালক রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে সে শিক্ষাপদ্ধতিকে অস্বীকার করলেন। যে শিক্ষায় অনুভূতি নিঃসাড় হয়ে আসে, বালক রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন। দার্শনিক ব'লবেন মানুষের সত্তা খণ্ডিত সত্তা নয়। তার চেতনায় সমগ্র জীবন প্রতিবিম্বিত। তাই কবি তাকেই যথার্থ শিক্ষা বললেন যা মানুষের মনন ধারায় শৃঙ্খলা আনে, যা তার অনুভূতিকে পুষ্ট এবং সমৃদ্ধ করে, যা তার আনন্দ-বেদনাকে সুস্থ এবং সংযত করে। তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ যখন সংগীতের আনন্দধারায়

১। রাশিয়ার চিঠি পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য

আত্মহারা হয় না, প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুলকিত হয় না, তখন তার জীবনে শিক্ষা-সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। যে শিক্ষা মানবের মনোজগতে মাত্র একটি তন্ত্রীকে স্পর্শ করল, ব্যবহারিক প্রয়োজনের খেয়া পারাপারে যাত্রীকে শুধুমাত্র পার ক'রে দিল—তাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলে স্বীকার করেন নি। জ্ঞানের সঙ্গে যদি রসের চর্চার সমাবেশ না হয়, তবে মানুষের জ্ঞান বোঝা হ'য়ে জ্ঞানার্থীর স্কন্ধে ভর করবে। তাই তিনি বিশ্বভারতীতে জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে কলাবিদ্যা চর্চার সুযোগকে যুক্ত করলেন। কবির সুচিন্তিত অভিমত তাঁর আপন ভাষাতেই ব্যক্ত করি: "হৃদয়বৃত্তির দ্বারা মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে প্রমাণ করে। এই ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য থাকিবেই আর থাকাই শ্রেয়।··· ···এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ কলাবিদ্যার সাহায্যেই ঘটে। সভ্য-অসভ্য সকল দেশেই এই সকল কলাবিদ্যার পক্ষে দেশের লোকের দরদ আছেই। কেবল আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থায় এই কলাবিদ্যার কোন স্থান নাই।" কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সে যুগের শিক্ষিত সমাজের কাছে কলাবিদ্যাকে অপাংক্তেয় করে রেখেছিল। কলাবিদ্যা পৌরুষ বিকাশের, ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটনের পরিপন্থী বলে অনেকেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ জার্মান জাতির সংগীতপ্রিয়তা ও জাপানীদের পুষ্প বিলাসিতার উল্লেখ করে বললেন: "আনন্দ প্রকাশ জীবনশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়।··· ···যে জাতি আনন্দ করতে ভোলে, সে জাতি কাজ করতে ভোলে।··· ···আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় পায়, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে।" তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংকল্পের কথা অভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সংকল্প হউক।"[১] তিনি বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করে বললেন:

"যস্মাহতে ন সিদ্ধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন স ধীনাং যোগমন্বেতি।"

১। কলাবিদ্যা, শান্তিনিকেতন, ১৩২৬ অগ্রহায়ণ।

অর্থাৎ যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, তিনি বুদ্ধিযোগের দ্বারাই মিলিত হন, মন্ত্রের যোগে নয়, যজ্ঞমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়—তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি"।[২] শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি যে শিক্ষাদর্শকে সত্য করে তুলতে চাইলেন, তার মধ্যে এই ধী এবং আনন্দের সম্মিলন ঘটল।

ইঁটকাঠে গড়া নীরস খাঁচায় মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ত প্রকৃতির আনন্দনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। শিশু বৃক্ষ যেমন আলো-বাতাসের স্পর্শ চায়, ঠিক তেমনভাবেই মানবশিশুও সেই স্পর্শ কায়মনোবাক্যে কামনা করে। উদার আকাশ, অবাধ বাতাস, প্রশান্ত আলোকের আশীর্বাদে শিশুমন সমৃদ্ধ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যুগ-যুগান্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানবচেতনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি এই মহৎ সত্যটি স্বীকার করেনি বলেই তার এমন নিদারুণ বিফলতা। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল প্রকৃতির মোহময় পরিবেশে। উপনিষদের ভাবপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির দুলাল; তিনি চাইলেন তাঁর জাতির উত্তর সাধকদের সার্থক করে তুলতে তাদের ঐকান্তিক জীবনসাধনায়। সে সাফল্যের মূল রয়েছে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাই মানুষকে ছাড়িয়ে তার পরিবেশকে বিচার করেছে। প্রকৃতির সান্নিধ্য কবিকে ধন্য করেছে, কবি তার স্পর্শে পুলকিত হন, গর্বিত হন তার আত্মীয়তায়। এই বোধ কবির শিক্ষা-দর্শনেও অনুস্যূত। তিনি তাই তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বৃক্ষতলে শ্যামল শস্পাসনে বসবার বিধি প্রবর্তন করলেন। প্রাচীর নেই, বাধা নেই, নিষেধ নেই। তবে নিয়মের শৃঙ্খলকে কবি অস্বীকার করেন নি। শিক্ষার্থীদের জীবনে শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের শিশু-প্রাণের দুর্বার প্রাণশক্তিকে প্রবাহিত করতে হবে সুশৃঙ্খল ভাবে। শিক্ষার্থীদের দেহমনে তিনি সংযমের প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

২। আত্মপরিচয়—পৃঃ ১১৯।

শিক্ষার্থীরা আশ্রমে আবাসিক হয়ে থেকেছে। নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিজেরাই সম্পন্ন করেছে।[১] রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন আত্ম-নির্ভর। নিজের কাজ তিনি নিজের হাতে করতে ভালবাসতেন। দাস-দাসীর সেবা নেওয়া তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। রবীন্দ্র-জীবনীকার একথা আমাদের বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যজনিত অশক্ততায় বন্দী হ'বার আগে পর্যন্ত কখনও দাসদাসীর সেবা গ্রহণ করেন নি। এই দুর্নিবার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা কবির জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি। তাঁর শিক্ষাদর্শনেও তাই তিনি শিক্ষার্থীর স্বনির্ভরতাকে বড় করে দেখেছেন। শিক্ষার্থী আত্মনির্ভর হ'বে। কবি চাইলেন, তাঁর দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনে স্বনির্ভরতা আসুক। স্বাতন্ত্র্য ফুটুক তাদের চিন্তায়, ব্যবহারে ও কর্মে। সে সুস্থ-চিত্ততা তাদের উত্তরকালের জীবন সাধনায় প্রমূর্ত হোক। অধ্যয়ন এবং অধ্যবসায় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। কবির জীবনে এই অধ্যবসায়ের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর অতিপ্রত্যক্ষ। শ্রম ও অনলস কর্মসাধনা জ্ঞানার্থীর পরম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে জ্ঞানসাধনার এই নিগূঢ় সত্যটিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ জীবনের সকল স্তরেই অশ্রান্ত কর্মী। একথা রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন যে, প্রৌঢ় পীড়িত রবীন্দ্রনাথকে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তিক বিশ্রাম গ্রহণ করানো যায় নি। জাতির জনক গান্ধীজিকে শান্তিনিকেতনে আগমন করতে হয়েছিল 'তাঁর গুরুদেবকে' বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করার জন্য। এই অনলস কর্মী রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর দেশের ছেলেমেয়েরা শ্রমবিমুখ যেন না হয়। তাদের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত হোক। জাগ্রত সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য তারা দেশ-বিদেশের জ্ঞানভার থেকে জ্ঞান আহরণ করুক। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছেন। সুযোগ্য পণ্ডিত এবং শিক্ষকদের ওপর ভার দিয়েছেন এই সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীদের চিত্তবৃত্তির সম্যক বিকাশ সাধনের। বুদ্ধি তাদের যেমন শাণিত হয়েছে, তেমনি তাদের অনুভূতির ব্যাপ্তি ও প্রসার হয়েছে, নৃত্যে, গীতে, অঙ্কনে, অভিনয়ে মানবশিশু পূর্ণতাপন্ন হয়ে উঠেছে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষাবিদ্

১। আশ্রমের শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আজ দেশের দিকে দিকে নৃত্যগীতের উৎসব। এযুগের শিক্ষিত সমাজ তথা শিক্ষাবিদেরা শিক্ষায় চারুকলার আবশ্যিকতাকে সাগ্রহে স্বীকার করেছেন। বিংশ শতকের প্রথম পাদেও এই বোধ লক্ষিত হয়নি শিক্ষিত সমাজে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নৃত্য-গীতাদি চারুকলার যে মর্যাদামণ্ডিত স্থান রয়েছে, তা আধুনিক কালে আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অন্ধ দেশ, মূঢ় সমাজ সেদিন কবির কথায় কর্ণপাত করে নি। কবির বিরূপ সমালোচনা করেছে পণ্ডিতমূর্খের দল। আজ আমরা কবি প্রচারিত শিক্ষাদর্শনের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারছি। এযুগে চারুকলার সাধনায় কবি ছিলেন পথিকৃৎ। দেশের বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নব-ভাবনার প্রবর্তক।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যখন মাধ্যমিক স্তরে ও ইংরাজী ভাষাকে আশ্রয় করে রইল, তখন তা ফলবান হ'ল না বলে এদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে। যে কয়জন ভাগ্যবান স্মৃতির খেয়ায় ফলের গন্ধমাদনকে বহন করতে সক্ষম হ'ল তারাই সার্থক, সফল হ'ল। আর অসংখ্য অগণিত মানুষ এই অসাধ্য সাধন করতে পারল না ব'লে অপাংক্তেয় হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাটুকু উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।[১] তিনি চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষ। তাদের হাতে সুলভে যাতে সহজবোধ্য ভাবে দেশবিদেশের জ্ঞান আসে, কবি সেই পথের নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন চায়নি যে দেশের মানুষ যথার্থই শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তাই সুফল ফলল না। কর্তৃপক্ষ পুরানো রীতিপদ্ধতিকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন দেশের মানুষকে অভুক্ত, অতৃপ্ত রেখে। একক যাত্রায় আস্থাবান নিত্য যাত্রী কবি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনি নব নব তন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। দেশের প্রাচীন জ্ঞান সুলভ সংস্করণ গ্রন্থে প্রচারিত হ'ল মাতৃভাষার মাধ্যমে। বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হ'ল এদেশের ইংরাজী

১। শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ

অনভিজ্ঞ মানুষের কাছে। দেশের উপবাসী পিপাসু চিত্তে জ্ঞানের সঞ্জীবনী ধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। কবি যেমন বললেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের কথা, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি আবার তেমনি জোরের সঙ্গে বললেন। তবে তাঁর মতে শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। কবি-কথিত নীতি স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যৎ অতীতকে স্বীকার করেছে তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমগ্রতাবাদী একথা আগেই বলেছি। একদিকে তিনি যেমন ব্যক্তিমানবের সমগ্র সত্তায় শিক্ষাশৃঙ্খলার সংযম প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তিনি সার্বিক শিক্ষার (mass education) সমর্থক ছিলেন। শিক্ষায় জন্মগত অধিকার সমস্ত মানুষের। কবির ঔপনিষদিক জীবনদর্শন তাঁকে সমদর্শী করে তুলেছিল। যে পরাসত্তা চেতনে-অচেতনে পরিব্যাপ্ত, মানুষে ত তাঁরই প্রতিষ্ঠা। তাই সে পরাসত্তা সর্ব-আমিতে আত্ম-আমির ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করলেন। তাই ত' কবি এতো বিশ্ব-ঘনিষ্ঠ। সকলের আত্মীয়তায় কবি সার্থক, ধন্য। তিনি চাইলেন আমাদের দেশের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসংখ্য গ্রামের অগণিত নরনারীকে সুশিক্ষার আলোকে চক্ষুষ্মান করে তুলতে। দেশের সামগ্রিক রূপটুকু কবির চোখে সত্য। খণ্ডিত রূপ, বিচ্ছিন্ন সত্তা কবির ভাবনায় অসিদ্ধ। আরিস্ততলের মতোই রবীন্দ্রনাথ সমগ্রতাবাদী। তাঁর কথায় বলি: "আমি আশ্রমের আদর্শ রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। তা পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতঃই সেই আদর্শকে আমি কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি, বলতে চেয়েছি 'পশ্য দেবস্য কাব্যং', মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো। আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সে পূর্ণতা বস্তুর নয়, আত্মার। তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়।" কবি আত্মার পরিপূর্ণতাকে লক্ষ্য করেছেন বিশ্ব চরাচরে। তাই ত সমগ্রতার তত্ত্ব, প্রেমের মন্ত্র কবির ধ্যান-ধারণায় অনুস্যূত। কবিমানসের গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের কালে এই কথাটি মনে

রাখলে আমাদের ভুল-প্রমাদ ঘটবার অবকাশ সংকুচিত হয়ে আসবে। রবীন্দ্রমানস বিচারে এই সমগ্রতার ধারণাটুকু কবিকে জাতীয়তাবাদের পল্বল থেকে আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে লীলাময় হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে। রবীন্দ্রমানস বিচারে এই সমগ্রতার ধারণাটুকু কবিকে বোঝার পক্ষে আবশ্যিক। রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শন এই সমগ্রতার ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। উদাহরণ দিই : বিদ্যালয়ের কাজ এবং বিদ্যালয়ের অবকাশ নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মরূপের সমগ্রতা। শুধু কাজ, দমবন্ধ করা অশ্রান্ত কর্মচক্রের আবর্তন কবির কাছে অগ্রাহ্য। কাজের বিরতি চাই, অবকাশ চাই। কাজের যেমন দরকার, কর্ম বিরতিরও প্রয়োজন তার চেয়ে কম নয়। এই বিরতি না থাকলে কাজের রূপটুকু উপলব্ধি করা যায় না। কবি বললেন : অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারিদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন ক'রে ধরে যে, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না।

এইজন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নতুন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবলমাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়। (ছুটির পর, শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়)। রবীন্দ্রনাথ এখানে বলছেন যে, কাজ এবং ছুটি, এ দুটোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে দেখলে তবেই কাজের পূর্ণ রূপটুকু উপলব্ধি হয়। গতি যেমন বিচ্ছিন্নভাবে সত্য নয় —গতির সত্যতা স্থিতিকে নিয়ে, ঠিক তেমনি কাজের সঙ্গে বিরতি যুক্ত থেকে কাজকে পূর্ণ করে, কাজ অকাজের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়। সমগ্রতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসমবায়ের কথা বললেন। "আজ পৃথিবীর এমন বয়স হইয়াছে যে, জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলিন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে। অতএব আমাদের দেশে বিদ্যা সমবায়ের একটি বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হইবে। যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার

ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।" বিশ্ববিদ্যার এই পূর্ণায়তন রূপের জন্য কবির সাধনা। তিনি এই বিশ্ববিদ্যার ধারাকে দেশের শিক্ষার্থীর মানসতটে বহমান করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই দুরূহ কর্মকে সম্পাদন করতে হলে ভারতীয় জ্ঞানের পূর্ণরূপটুকু ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় জ্ঞানের ধারা বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন-প্রধানতঃ এই চারিটি শাখা আশ্রয়ী। এর পরে আছে ইসলামের প্রভাব। নব্য ইউরোপীয় ভাবধারা কবির শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বীকৃতি পেল। পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। কবি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ইংরাজী পঠন-পাঠনে গভীর মনোনিবেশ করলেন। তিনি স্বয়ং ব্রাউনিং-এর ক্লাস নিতেন। ইংরাজী অনাচারকে অশ্রদ্ধা করলেও তাঁদের সাধনা ও সিদ্ধিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। তিনি সৌখীন আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন না। তাই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা এত গভীর ও ব্যাপক হতে পেরেছে। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শ। কবি বলেন যে, আমাদের তপোবনে একদিন অনন্তের বার্তা এসে পৌঁছেছিল। সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধামবাসী' বলে জেনেছিল। সেদিন ভারতবাসী সমগ্রতার মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করেছিল বলেই ভারতীয় প্রজ্ঞা সেদিন যে মন্ত্রটির জন্ম দিল তা হচ্ছে—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

যিনি সর্বভূতকে পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন, তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না। কবিগুরু এই মহামন্ত্রটিকে সাগ্রহে বরণ করেছিলেন। তাই তিনি মহামানবের সাগরসঙ্গমে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন সার্বভৌম মর্যাদায় সম্পন্ন হল।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন।[১] 'সাতচল্লিশ সালের পূর্বে দেশজোড়া শাসন ছিল ইংরেজের। জেলখানা আর ঘানিঘরে সর্দারি, ক'রে, পিটুনি পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র জবরদস্ত শাসকের ভূমিকাই যে তাঁরা নিয়েছিলেন তা নয়। ইম্পিরিয়েল সার্ভিসের উর্দি পরে সরকারী কলেজগুলোর গুরুপদে তারাই বৃত হয়েছিলেন আর তাঁদের শাসন আর নির্দেশ প্রশাসনিক হাজারো পথ বেয়ে দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধটুকু গ'ড়ে উঠতে পারত তা গ'ড়ে উঠবার সুযোগ পায়নি। এই ব্যর্থতার কারণ বিশেষভাবে নির্দেশ করতে গিয়ে কবি বললেন যে ইংরেজ অধ্যাপক যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আসে রাজশক্তি, তাঁর পতিতোদ্ধারের ব্রতই তাঁর অহংটাকে মাত্রাহীন-ভাবে বড় ক'রে দেয়। অধম জাতির সন্তানদের 'মানুষ' করবার জন্য এদেশে এসেছি, তার এই ধারণাটাই সেযুগে বিদেশী শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের স্বাভাবিক মধুর সম্পর্কটুকু দানা বাঁধবার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিত। শিক্ষক দু'হাত বাড়িয়ে ছাত্রদের ডাকতেন না, আর ছাত্রেরাও সংকোচে, বিতৃষ্ণায় ইংরেজ শিক্ষকের ত্রিসীমানায় যেতেন না, ছাত্র-শিক্ষকের অবাধ সম্পর্কে কৃত্রিম বাধার বহিরাবরণ সৃষ্ট হতো। ভেদ-বুদ্ধিটা সংক্রামক। কর্তৃপক্ষস্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের আচরণের অনুকরণ করতেন এতোদ্দেশীয় অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ কেউ। তার ফলে সমস্যাটা আরো বড় হয়ে দেখা দিত। প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্বে এতদ্‌সম্পর্কে আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এ সমস্যাটা আর নেই। কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্কটা তার স্বাভাবিক পরিবেশে

১। 'ছাত্র শাসনতন্ত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। দৈনিক কাগজে গুরু-নিগ্রহের খবর প্রায়ই পড়া যায়। অবশ্য গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সংবাদ যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না যে, আধুনিককালে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু ক্রমেই অপ্রাকৃত এবং শিথিল হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীর অনেক অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, শিক্ষকেরও অভিযোগের অন্ত নেই। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেখায় না। শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন না, কল্যাণ-কামনাও করেন না। শিক্ষক আজ অর্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী মাত্র—শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্বন্ধটুকু আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নেমে এসেছে। ছাত্র মনে করে সে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বেতনের পরিবর্তে শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ নিচ্ছে। সেখানে শ্রদ্ধা, বিনয়, সম্মান প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। অথচ আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এ কথা অসংশয়িত সত্যরূপে প্রচার করেছে যে, বিদ্বানই বিনীত। 'বিনীত' এবং 'বিদ্বান' এই দুইটি শব্দকে বহুক্ষেত্রেই সমার্থক বলা হয়েছে। জ্ঞানলাভ করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। শিক্ষক বুদ্ধিজীবী মাত্র নন। তিনি 'শচিষ্ঠ', তিনি 'গাতুভিৎ'। শিক্ষককে বেদে 'গাতুভিৎ' বলা হয়েছে। ক্ষুধা, অবিদ্যা এবং অস্বাস্থ্য থেকে মুক্তির পথ তিনি দেখান বলেই তিনি গাতুভিৎ। সংসার অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন। অজ্ঞানতা সর্ব পাপ এবং দুঃখের উৎস। এই অজ্ঞানতাই রোগ এবং অস্বাস্থ্যের আকর। তাই এই অজ্ঞানতা দেশ থেকে দূরীভূত করতে পারলেই দেশের লক্ষকোটি মানুষ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে। মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য দরকার এবং তারজন্যই করতে হবে উন্নততর প্রণালীতে খাদ্যোৎপাদন। এরজন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞানের, অর্থাৎ যথাযোগ্য টেকনিক বা উৎপাদন-শৈলীতে খাদ্যোৎপাদন করতে হ'লে তারজন্য নিয়োগ করতে হবে উন্নততর জ্ঞানের। এই জ্ঞান দেবেন শিক্ষক, তিনি হবেন কারুকার, তিনি হবেন শিল্পী। জ্ঞানই শক্তি। যিনি পরম জ্ঞানী তিনিই অনন্তশক্তির অধিকারী। আমাদের দেশে শিক্ষককে 'জ্ঞানী' বলা হয়েছে। তাই তিনি অসীম বলে বলী, জ্ঞানের এই মহতী শক্তি শিক্ষকের আয়ত্তাধীন, তাই তিনি 'শচিষ্ঠ'।

একদিকে রয়েছেন এই গাতুভিৎ শিক্ষকের দল, অন্যদিকে রয়েছে স্ফুটনোন্মুখ তরুণ প্রাণের পদ্মকোরকগুলি। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসছে দলে দলে তাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকার্শ সাধনের জন্য। তারা আসবে সেবার মন্ত্র নিয়ে, তাদের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হয়ে থাকবে গুরুর চরণে, তারা গুরুর সেবার মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের সেবা করবে। বিনয় হবে তাদের মনের পরম ভূষণ। তারা যখন গুরুগৃহে আসবে তখন ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে আসবে তারা, ভোগটাকে আশ্রমের বাইরে পরিহার ক'রে আসবে। রাজার তনয়ও ভুলে যাবে যে সে রাজপুত্র। গুরুর সেবা দশের সেবা, দেশের কল্যাণ সাধন ; এর মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। গুরুর ব্যক্তিগত কাজকর্মের অবকাশে ছাত্র বৃহত্তর সমাজের কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। সন্ন্যাসীকল্প গুরুর সমিধভার আহরণ, গোপালন প্রভৃতি কর্মে কতই বা সময় কাটান যায়? অথচ সকল ছাত্রকেই গুরুর সেবা করে এই সেবার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তাই ত' আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রীরা বলছেন যে, প্রাচীন যুগের এই 'গুরুসেবা' হ'ল সমাজ-সেবারই নামান্তর। শিক্ষার্থী যখন গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য যেতো, তখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনে সেবার কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিত, জ্ঞানের কথাটা, শিক্ষার কথাটা, উহ্য থাকত। তাই ত' ঋষি বিশ্বামিত্র যখন তাঁর যজ্ঞাদি রক্ষার জন্য রাম এবং লক্ষ্মণকে চাইলেন রাজা দশরথের কাছে, তখন সেবার কথাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণের শিক্ষার কথাটা একবারও কেউ উচ্চারণ করেন নি। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন যে, আপনি রাম-লক্ষ্মণকে ঋষিমুনিদের সেবায় নিয়োজিত করুন। এই সেবার পথেই তারা জ্ঞানবান হবে। এইভাবে তারা যে জ্ঞান আহরণ করবে তা অন্য কোন বিদ্যাগৃহ থেকে কখনই তারা লাভ করতে পারবে না। এই সেবাব্রতী শিক্ষার্থীর দল যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হতো, তখন গুরু তাদের স্বাগত জানাতেন সমবায়ী সমাজের কর্মী হিসাবে। তাদের পুত্রাধিক স্নেহে গ্রহণ করতেন আপনার মানসপুত্ররূপে। তারা গুরুর চোখে কখনই 'অনাবশ্যক' 'অতিরিক্ত'রূপে প্রতিভাত হতো না। গুরু ছাত্রকে বিদ্যাদান করেন, গুরু ছাত্রের সেবাও করেন—যেমন সেবা পিতা

করেন তাঁর পুত্রদের। তাই ত' দেখি ঋষি বিশ্বামিত্র পাতার শয্যা পাতছেন তাঁর শিষ্য রাম ও লক্ষ্মণের জন্য, তাই ত' গুরু বিশ্বামিত্রকে দেখি ব্রাহ্মবেলায় তাঁর ছাত্রদের ঘুম ভাঙাচ্ছেন। আশ্রমের নতুন পরিবেশে রাজপুত্রেরা ব্রহ্মচারীর জীবনধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। এই পারস্পরিক সেবাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সম্পর্কটুকুকে অক্ষয় করে রেখেছিল। বৈতনিক সম্পর্কের কলুষতা আমাদের প্রাচীন শিক্ষাশ্রমের পবিত্র সম্পর্কটুকুকে কোথাও ব্যাহত করেনি।

সেদিন জীবনও এমন জটিল ছিল না। বিদ্যাশ্রমের স্থলে বিদ্যা-দানের কল প্রতিষ্ঠিত হয়নি দেশের নগরে ও গ্রামে। সেদিন শিক্ষা-গুরুকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যেতো না। তারই ঐতিহ্য ত' এই সেদিনও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বুনো রামনাথের জীবনাদর্শে। সে জীবনাদর্শ দারিদ্র্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত; সেই মানুষটি সমস্ত মানুষের হয়ে অহংমণ্ডিত হয়েছিলেন, সে জ্ঞানময় অহংবোধ সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরম ঐশ্বর্য; এই অহংকারপটেই ত' বিশ্বকর্মা বিশ্ব-শিল্প সৃষ্টি করেন। শিক্ষককে যদি শিল্পী বলি, তবে এই অহংকার তাঁর ভূষণ। এই অহংকারই তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুস্যূত করে দেন। ছাত্রসমাজ অনুপ্রাণিত হয় নতুন মর্যাদাবোধের দ্বারা। ছাত্রজীবন হল বয়ঃসন্ধির কাল। এই কালটিতে তরুণ-প্রাণে আত্মমর্যাদাবোধের বীজ উপ্ত হয়। সামান্যতম স্নেহ ভালবাসার আবেদনে হৃদয়কে দুকুলপ্লাবী বন্যায় প্লাবিত করে দেয়। আবার সামান্যতম অবহেলায়ও দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। শিক্ষক এই সময়টিতে যদি ছাত্রের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করেন, ছাত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি যদি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেন, তবে তিনি অনায়াসে ছাত্রদের হৃদয়-রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হবেন। আর ভারতীয় ঐতিহ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটুকুকে এই আলোয় ভাস্বর করে দেখেছিল; কোথাও শিক্ষক আপনাকে শিক্ষার্থীর থেকে ভিন্ন করে রাখেন নি; তাঁরা একই জগতে বাস করেছেন, পরস্পরের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নায় শিক্ষক-ছাত্রের সমবায়ী জীবনে আলোছায়ার নিত্য খেলা চলত। গুরু সস্নেহে পরম শ্রদ্ধায় ছাত্রকে হাত ধরে আপনার পাশে বসিয়েছেন। তাই

ছোট-বড় গুরু-লঘুর প্রশ্নটা ওঠবারই অবকাশ পায়নি। তাই আমাদের দেশের চৌদ্দটির ভাষার কোনটিতেই 'To Teach' এই ক্রিয়াপদটির মূল প্রতিশব্দ নেই, আমরা 'শিক্ষা' শব্দটি থেকে কৃত্রিম উপায়ে নিজস্ব ক্রিয়া বানিয়ে নিয়েছি আমাদের সুবিধামত। কিন্তু মূল শব্দ যেটি ভারতীয় ভাষাগুলিতে পাই, সেটি হচ্ছে শিক্ষা।[১] আমরা শিখি, শেখাই না। ভারতীয় শিক্ষক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক'রে শেখেন, ছাত্র তাঁর অনুসরণে আত্মানুশীলন করে। তাই আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহে শিক্ষক ও ছাত্র স্ব স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত; এই শিক্ষাশ্রমে শিক্ষক বা গুরুর যেমন প্রয়োজন রয়েছে ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য, ঠিক তেমনিভাবে গুরুর পক্ষে আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য ছাত্রদেরও একান্ত প্রয়োজন। ছাত্রদের উপলক্ষ করেই ত' গুরুর জ্ঞানের তপস্যা অব্যাহত চলে। গুরু যে সাগ্নিক। তাঁর জ্ঞানের আলো ছাত্রদের মনের প্রদীপের শিখায় জ্বালিয়ে দিতে না পারলে ত' তাঁর জ্ঞানসাধনা সার্থক হ'ল না। তাই ত আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শে ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্পর্কটুকু মধুর হ'য়ে গড়ে উঠেছিল অতীত ভারতের ইতিহাসে। আজ তার বড়ই অভাব দেখা যাচ্ছে। বিকারগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে ছাত্র এবং শিক্ষককুলের চিন্তাধারা। তাঁরা লেন-দেনের দৃষ্টিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পবিত্র সম্পর্কটুকুকে দেখেছেন বলেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষক মনে করছেন না যে ছাত্রের চরিত্রগঠনে, তার মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে তাঁর কোন দায়িত্ব আছে। তিনি নিয়মমাফিফ বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, আসছেন, ক্লাস নিচ্ছেন ঘড়ি দেখে। কিন্তু হয়ত দায়িত্বটুকু পুরোপুরি নিচ্ছেন না। তাঁকেও দোষ দিই না। অর্থ নৈতিক অবস্থা আজ মধ্যবিত্ত সমাজকে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন করেছে— যার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, মন নামক পদার্থটির তিলে তিলে অপমৃত্যু ঘটছে। প্রাণ-মন যেখানে মুমূর্ষু, সেখানে জ্ঞানদান কর্মটি কখনই সুসম্পন্ন হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের

১। বিনোবাজীর গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ হয় না। তাহা পিতারই সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর[২]।”

শিক্ষক যেখানে জ্ঞানদানের পুণ্যব্রতে ব্রতী সেখানে সাত্ত্বিক গুণের সমারোহ। সেই আনন্দযজ্ঞে গুরু এবং ছাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ—পিতা-পুত্রের চিরায়ত সম্বন্ধটুকু গুরু-শিষ্যের সহজ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আজ যখন বিদ্যাগৃহে বণিকবৃত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখন এই সহজ সম্পর্কটুকুর প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হয়ে গেছে। টাকা-পয়সার লেনদেনর ওপর গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটুকু যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল এ যুগের বণিক সভ্যতার, তখন যা ছিল একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক তা-ই দুর্লভ হয়ে উঠল। ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে সেই ভালবাসাটুকু পেলো না, যা সে একান্তভাবে কামনা করেছিল। তার হতাশাও সীমাহীন। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে তার পরিচয়। জীবনের কুৎসিত রূপটাকে সে দেখেছে। সে ‘কিউ’তে দাঁড়িয়ে রেশনের চাল আর কেরোসিন এনেছে, বাড়ীতে তুচ্ছতম উপলক্ষে কুৎসিত পারিবারিক কলহ প্রত্যক্ষ করেছে। আধপেটা খেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়েছে তাকে, মাইনে বাকী পড়ার ফলে তার নাম কাটা গেছে, এই জীবননাট্যের সে অসহায় দর্শক মাত্র। দুঃখের আর বেদনার বোঝাটা যখন বড্ড ভারী হয়ে উঠেছে তখন সে নিজের কাজ থেকে পালিয়ে বাঁচবার পথ খুঁজতে চেয়েছে। তাই ত' শহরের সিনেমাঘরগুলোর নীচের শ্রেণীর টিকিটগুলো কিনছে আমাদের দেশের কিশোর এবং যুবকেরা। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। ছবিঘরগুলোয় মূলতঃ যৌনবৃত্তির কণ্ডূয়ন হয়; তাই তারা আস্তে আস্তে সর্বপ্রকার আদর্শবোধ হারিয়ে ফেলছে। তারা পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে যাচ্ছে, ভাই-বোনকে আর তেমন ক'রে ভালবাসছে না। শিক্ষকদের সঙ্গে কোন সাত্ত্বিক সম্পর্কের কথা তারা ভাবতেই পারছে না। যুগধর্ম এমনভাবে এই সব কিশোরমনকে কলুষিত ক'রে দিচ্ছে যে, তারা আর শিক্ষককে গুরুর মর্যাদা দিতে পারছে না এর জন্য আজকের সমাজের আদর্শভ্রষ্টতা, তার মূল্যবোধের বিকার পুরোপুরি দায়ী। জীবিকার্জন এবং জীবনধারণ এতো বড় হয়ে উঠেছে

২। রবীন্দ্রনাথের ‘শিক্ষা’ গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, আদর্শ জীবনবোধ আজ আর তার সঙ্গে পেরে উঠছে না। ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিন্ধ্যগিরিটা এতই বেড়ে উঠেছে যে আদর্শ জীবনবোধের আলো আজ আর তাকে অতিক্রম ক'রে নীচের মানুষগুলোকে প্রাণ দিতে পারছে না। জানি না কবে আবার অগস্ত্যের আবির্ভাব ঘটবে? আবার এই ব্যবহারিক জীবনবাদের চুড়োটাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে আদর্শ জীবনবোধের সূর্যটাকে আলো বিকীরণ করবার পথ দেবে। অবশ্য সে দিনটা খুব বেশীদূর নয় বলেই মনে হয়। কেননা ইতিহাসে এই সত্যের সন্ধান আমরা পাই যে, যখনই কোন প্রয়োজন গণমানসে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে তখনই তা মেটাবার জন্য চুপি চুপি প্রস্তুতি চলেছে সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে। হঠাৎ একদিন বিরাট ওলোট-পালটের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের ছদ্মবেশে প্রত্যাশিত পরিবর্তনটুকু এসেছে। অথবা সেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে চুপিসারে তিলে তিলে বিবর্তনের পথে। যে পথেই আসুক না কেন, সেই পরিবর্তন এসেছে। আজ যখন আমরা সকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন কামনা করছি—তখন তা আসবেই। তার জন্য সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন হবে, দরিদ্র অবহেলিত শিক্ষকের দারিদ্র্য ঘুচবে, সচ্ছল জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে তিনি আবার তাঁর আদর্শবাদকে আপনার জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ করবেন। শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে তখন সমাজ আর কার্পণ্য করবে না। আত্মপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক আবার আপনার চারপাশে একটা মর্যাদাবোধ বিকীর্ণ করবেন। শিক্ষকের মধ্যে অগ্নিদেবের মতই 'স্বাহা' এবং 'স্বধা'র সম্মিলন ঘটবে সেদিন। আত্মত্যাগ এবং আত্মকর্তৃত্ব, এই দুটি গুণের পূর্ণ বিকাশ শিক্ষকের মধ্যে না ঘটলে তিনি গুরুর আসনে বসবার অধিকারী হবেন না। ভারতবাসী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার-ভেদ মেনে নিয়েছে। গুরুর আসনে বসবার অধিকার যাঁরা অর্জন করবেন আপন জীবনচর্যা এবং জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে, তাঁদের হাতে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের গুরুভার ন্যস্ত হবে। তাঁরাই আবার ছাত্রদের দু' হাত বাড়িয়ে ডেকে নেবেন। ছাত্রেরাও আবার জড় হবে, ভীড় করবে এই সব ঋষিকল্প গুরুর চারপাশে। এঁরা আবার যীশুখ্রীষ্টের মত বলবেন—'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' খ্রীষ্টের মতই এই আদর্শ

শিক্ষকেরা শিশুদের, ছাত্রদের শ্রদ্ধা করবেন। কেননা শিশুদের মধ্যে, কিশোরদের মত পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা রয়েছে। এই অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ মনুষ্যশিশুর দল তাদের সব মালিন্য এবং হতাশা থেকে উত্তীর্ণ হবে এই আদর্শ গুরুর আহ্বানে। আবার তাদের মধ্যে সেই সাত্ত্বিক সম্পর্কটুকু প্রতিষ্ঠিত হবে ধীরে ধীরে—যেমন করে সূর্যকিরণের করস্পর্শে সূর্যমুখীর প্রস্ফুটন ঘটে। আজকের দিনে যে সমস্যাটি শিক্ষাজগতের অন্যতম প্রধান সমস্যা—তার সমাধান ঘটবে আদর্শ শিক্ষকের আবির্ভাবে। এদিকে দেশের বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা বহুল পরিমাণে দূর করবে। এই অর্থ স্বাচ্ছল্য আমাদের সামগ্রিক হতাশা কিছু পরিমাণে দূর করবে এবং তার অনুকূল প্রভাব ছাত্র-সমাজের মধ্যে দেখা যাবে। আমাদের শিক্ষানীতি বিভিন্ন শিল্প, কলা এবং কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছে। তার সুফলও ক্রমেই দেখা দেবে আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের ওপর। তারা আবার নিয়মানুগ পথে শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবনপথের পথিক হবে। তাদের দলপতি পথ দেখিয়ে চলবেন। এই দলপতি হলেন আগামী যুগের আদর্শ শিক্ষক, বানপ্রস্থ আশ্রমের সর্বত্যাগী গৃহস্থ।

চতুর্থ স্তবক ঃ শিল্পদর্শন

মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ

নন্দনতত্ত্বের প্রথম প্রশ্নটি হ'ল শিল্পমূল্যায়নের ও শিল্পবোধের প্রশ্ন। মানুষের আত্যন্তিক জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসাও ওতঃপ্রোত ভাবে যুক্ত। এই শিল্পজিজ্ঞাসা মানুষের মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। মূল্যবোধ হ'ল অনুশীলনের ফল। এই অনুশীলন-প্রবৃত্তিই মানুষের কৃষ্টিকে ধারণ এবং বহন করেছে। মানুষের সভ্যতার পরিশীলিত রূপ হ'ল এই কৃষ্টি। সভ্যতা অর্থে সাধনা; জাতি যখন সামগ্রিক ভাবে সাধনায় সিদ্ধ হয় তখন তাকে সভ্যজাতির আখ্যা দেওয়া হয়। সুসভ্যজাতি অর্থে আমরা সামগ্রিক সাধনায় সিদ্ধ একটি জাতির মানসচিত্রকে অবলোকন করি। এই সভ্যতারও কেন্দ্রবিন্দু হ'ল সেই মানদণ্ড বা মাপকাঠিটি, যা দিয়ে মানুষের কৃতিকে যাচাই করা যায়। তা হলে এমন কথা বোধহয় বলা চলে যে মানুষের মূল্যবোধই হ'ল তার শিল্প তার সভ্যতা তার কৃষ্টির নির্ণায়ক। উপমার ভাষায় বলা চলে যে মানুষের এই মূল্যবোধটুকু যেন নদীর বুকে জেগে থাকা চরভূমি। জীবনের সভ্যতার শিক্ষার প্রবাহে বয়ে আনা অসংখ্য অনুপরমাণুর তিল তিল সঞ্চয়ে এই চরটি গড়ে ওঠে। এটি হ'ল আমাদের মূল্যবোধ; বহু-দিনের, বহু বৎসরের আয়াসসাধ্য সাধনার ফলেই এটি রূপ নেয়; জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা বলে যে, এটি আবার বংশ পরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় উত্তরপুরুষদের মধ্যে। এই মূল্যবোধই হ'ল মানুষের 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'। বড়ঘরের ছেলে সংস্কৃতিবান রুচিবান পিতার পুত্র, তাঁরা নাকি সহজাত প্রবৃত্তি বশেই 'কালচারড্' হয় অর্থাৎ এদের মূল্যবোধটুকু সহজাত। এরা সহজেই 'কৃষ্টিবান' বলে সমাজে পরিচিত হন। এই ধরনের প্রচলিত বিশ্বাসের মর্মকথাটি এই হ'ল যে এদের মূল্যবোধটুকু মহাবীর কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতই সহজ ও স্বাভাবিক; জীবনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় এরা সহজেই

উত্তীর্ণ হয়ে যায় এই সহজাত মূল্যবোধটুকুর জন্যই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর কর্ণের সঙ্গে পাণ্ডব মাতা কুন্তীর সাক্ষাতকারের যে ইতিকথাটি আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করি তার মধ্যে পাই মানবতাবাদী কর্ণের কৃষ্টিসিদ্ধ মননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের যে মূল্যবোধ একদিন মৈত্রেয়ীকে বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম তেনাহং কিং কুর্য্যাম্!' তারই অনুরণন শুনি মহামতি কর্ণের উক্তিতে—

'মাতঃ, যে পক্ষের পরাজয়,
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো না আহ্বান।'

মৈত্রেয়ীর যে মূল্যবোধ জাগতিক সকল ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করে অপ্রমত্ত মনে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনসাধনায় তাকে ব্রতী করে সেই মূল্যবোধই মহামতি কর্ণকে রাজ্যলোভ জয় করতে প্রেরণা দিয়েছে। এতো আমরা প্রান্তিক উদাহরণের উল্লেখ করলাম। এগুলিকে কেন্দ্র ক'রে আমরা মানুষের নিত্যদিনের কর্মে যে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দেখি তার বিশ্লেষণ ও চরিত্র নিরূপণ কর্মে ব্রতী হতে পারি। এই মূল্যবোধই আমাদের চেনাশোনা জগতটার সব রূপ, সব রস, সব গন্ধ, সব সংগীত ও সকল ঐশ্বর্যের আধার। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপে, নদীর জলে ঢেউ ওঠে, আকাশে মেঘ ভেসে যায়, এ সবই হ'ল প্রাকৃতিক ঘটনা। সেই প্রকৃতিতে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা, তাকে আবিষ্কার করা, এ হ'ল মানুষের মূল্যবোধের কৃতি। আমি যখন গোলাপের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে তাকে 'সুন্দর' বল্লেম তখন এই সুন্দর বলার পিছনে আমার পরিশীলিত মূল্যবোধটি গোপনে গোপনে কাজ করেছে। পুরুষের মূল্যবোধই নারীকে সুন্দরী করেছে; আবার নারীর মূল্যবোধই পুরুষকে 'শাল পাংশু মহাভুজ' করেছে। আমাদের মূল্যবোধই কাল্পনিক রামায়ণের ইতিবৃত্তকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে মহত্তম সত্যের জয় তিলক তার কপালে এঁকে দিয়েছে। তাই ত দেবর্ষি নারদ মহাকবি বাল্মীকীকে বলতে পারেন—'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। মানুষের মূল্যবোধের মধ্যেই আমাদের জাগতিক সত্যাসত্যের ধারণা অনুস্যূত। এখানে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কোনো একটি মূল্যের আলোকে কাল্পনিক কাহিনী যখন ভাস্বর হয়ে ওঠে তখন তা ও মহাসত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে। অর্থাৎ সত্য শুধুমাত্র

ব্যক্তি নিরপেক্ষ বস্তু নির্ভর ঘটনা Existence নয়; সত্যের চারিত্র্য-ধর্মও নিরূপিত হয় মানুষের মূল্যবোধের আশ্রয়ে।

প্রধানতঃ মূল্য হ'ল ত্রিবিধ; সত্য, শিব এবং সুন্দর—এই ত্রিমূর্তিই হ'ল মানুষের মূল্যবোধের প্রতীক। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে যা আছে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই হ'ল সত্যকথা বলার নামান্তর। সত্যবাদী যিনি তিনি ক্যামেরার চোখের মতো হুবহু ছবিটি ধরে দেবেন, হরবোলার হুবহু নকল করবেন। যিনি তা না করবেন তিনি অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী। ক্ল্যাসিক উদাহরণ সর্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। তিনি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই উক্তি করে নিত্যকালের অনৃত-ভাষণের অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সমগ্র-জীবনব্যাপী সত্যসাধনা একটি ছোট বিপর্যয়ের মুখে ধাবিত হয়ে গেল। আমাদের চোখে পাণ্ডব প্রধানের সেই গগনচুম্বী, মহিমময় রূপটি খর্ব হয়ে গেল কেন-না, আমাদের সত্যাশ্রয়ী যে মূল্যবোধ তার সঙ্গে সংঘাত বাধল যুধিষ্ঠিরের ঐ 'অশ্বত্থামা হত ইতিগজ' উক্তিটির; আবার মজার কথা এই যে এই সত্যমূল্যবোধের প্রয়োগের মধ্যে ফাঁক থেকে গেলেও সাহিত্যকৃতির জগতে আমরা তাকে দোষের মনে করি নি। যেমন ধরা যাক মহাকবি সেক্ষপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকটির কথা; Witches বা প্রেতিনীদের 'ডানসিনান্স ফরেস্টের' সচল হয়ে বেড়ানো সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণীটি ম্যাকবেথের রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য হয়েছিল এবং পাঠক তার অসম্ভাব্যতার সম্বন্ধে যখন কোনো সন্দেহই পোষণ করে নি তখন চলমান 'ডানসিনান্স ফরেস্ট'কে প্রত্যক্ষ করে পাঠক অবিশ্বাস তো করেই নি বরং ম্যাকবেথের জীবনে আসন্ন বিপদপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে পাঠক সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও অসত্যকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ ক'রে যে শঙ্কা ও সংশয় ভোগ করে তা মূলতঃ নন্দনতাত্ত্বিক। অবশ্য মূল্যবোধের সমগ্র ইতিকথাটিই নন্দনতত্ত্ব আশ্রয়ী।

অসত্যকে সত্যরূপে গণ্য ক'রে পাঠক বা দর্শক যখন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সংশয়, বিস্ময় প্রমুখ অনুভূতির ঘূর্ণ্যাবর্তে আত্মহারা হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না। অসত্যকে

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-১৪

সত্যরূপে দেখা এবং বিচার করা শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজ কবি কীটস। রবীন্দ্রনাথই সত্যকে বললেন 'রূপের ট্রুথ'। দার্শনিক একে বললেন 'Coherence'। এই 'রূপের ট্রুথ' হ'ল Coherence এবং তার সূতিকাগার হ'ল রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের মনের 'সুমিতিবোধ'। শিল্পের ট্রুথকে রূপের ট্রুথ বলে যে মূল্য-ধারণাকে নির্দিষ্ট করার প্রয়াস আমরা পেয়েছিলাম তা কিন্তু অত সহজে সার্থক হবার নয়। এই রূপের ট্রুথ বা সুমিতিবোধ কথাটির কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতেরা বলবেন, কোনো কথারই সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এবং অর্থ হ'ল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি নির্ভর। এই তত্ত্বটির সত্যকে স্বীকার করলে আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তিভূমিটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জ্ঞাতা-নির্ভর বা Subjective যে রসবোধ তা হ'ল আমাদের সব রকম মূল্যায়নের মাপকাঠি।

তা হলে এ প্রশ্ন এখানে উঠবে যে রসবোধই যদি আমাদের সব রকমের মূল্যবোধের মাপকাঠি হয় তা হলে রসিক কে? কেন-না, যিনি রসিক হবেন তিনি এই ধরনের মূল্যায়নের যথার্থ অধিকারী। রসিকের স্বরূপ নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ভোজদেব তাঁর 'শৃঙ্গারশতক' গ্রন্থে বলছেন যে জীবন-শিল্পীরা হল সত্যিকারের শিল্পরসিক। অর্থাৎ জীবনের মূল্যমানের সঙ্গে শিল্পের মূল্যমানের কোন মৌল পার্থক্য নেই। অবশ্য ভোজদেবের এই মতটি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলেও পশ্চিম দেশীয় নন্দনতত্ত্বে তার প্রয়োগ সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্র কথিত 'চতুঃষষ্ঠিকলা' অথবা জৈনাগমে বর্ণিত দ্বিসপ্ততি কলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলে ভোজদেবের জীবনশিল্প ও চারুশিল্পের স্বাধীকরণতত্ত্ব গ্রহণ করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। জীবন এবং শিল্পের বিস্তার যদি একই হয় তবেই ভোজদেবের মতের সত্যতা সিদ্ধরূপে গৃহীত হবে।

পূর্বেই বলেছি আমাদের মূল্যবোধ হ'ল ত্রিমূর্তি। সত্য হ'ল তার অতি প্রকটরূপ অর্থাৎ সত্যমূল্যে মানুষের অধিকাংশ অভিজ্ঞতারই

মর্যাদা নিপাত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যমূল্যেই ধরিত্রীর কাছ থেকে মাটির একটি তিলক ললাটে পরতে চেয়েছিলেন। মনীষী রোমাঁ রলাঁ এই সত্য মুল্যেই শিল্পের যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শিল্প বা Art যদি মিথ্যার বেসাতি করে তা হলে সে শিল্পে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শিল্পসত্যের সঙ্গে জীবনসত্যের একটা মৌল প্রভেদ রয়ে গেছে। শিল্পসত্য জীবনসত্য না হয়েও আবার জীবনসত্যের মতই আমাদের সংবেদন এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে অসত্য বলে জানি তাকেই শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবন সত্যের সব মর্যাদাই দিই; সময় বিশেষে সেই মর্যাদাটুকু জীবন সত্যের প্রাপ্য মর্যাদাকেও অতিক্রম করে যায়। শিল্পসত্য যখন জীবন-সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত তখন একটি অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পাঠক ও দর্শক এই সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই অবহিত হন না। উদাহরণ দিলে হয়তো আমাদের বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে করা যাক আমরা সেক্ষপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখছি। শুভ্র-বসনা অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী ডেসডেমনা দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যার আশ্রয়ে ঘুমে অচেতন। মহাবীর ওথেলো সন্তর্পণে ডেসডেমনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন; মুরসেনাপতির সমগ্র মুখমণ্ডলে আহত প্রেমের, আহত দর্পের ছায়া পড়েছে; ক্রূর প্রতিহিংসাবৃত্তি সেনাপতির দুই চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি যখন সন্তর্পণে 'Put out the light and then put out the light' আবৃত্তি করতে করতে অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে ডেসডেমনার দিকে এগিয়ে যান তখন সমগ্র দর্শকসমাজ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই চরম নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে! মহিলা দর্শকরা অনেকেই হয়তো সংজ্ঞা হারায়। পুরুষ দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ মোছে। অথচ মজার কথা এই যে, দর্শকেরা সবাই জানে যে এটি হ'ল অভিনয়; নাট্যসত্যে জীবনসত্যের প্রলেপটুকুও নেই এবং এটি যে মিথ্যা দর্শকগণ সে সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল এই যে দর্শকেরা কেউই চোখের সামনে নরহত্যা সংঘটিত হতে দেখেও তা

নিবারণের কোনো রকমের চেষ্টা করে না। অভিনীত নাটক সম্বন্ধে দর্শকেরা যে তার একধরনের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে এটি তার প্রমাণ। অবশ্য এইটুকু বললেই নাট্যবস্তুর সত্যাসত্য সম্বন্ধে শেষ বিচার হ'ল না। কেন-না যাকে মিথ্যা বলে বুদ্ধি দিয়ে জানি এবং প্রান্তিক বিশ্লেষণে বুদ্ধি সহজেই যার অসত্যটুকুকে ধরে ফেলে, তাকে কিন্তু দর্শকমনের সর্ববিধ সংবেদন ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দর্শকেরা সত্য ব'লে গ্রহণ করে। ডেসডেমনার হত্যার দৃশ্যে যে বীভৎস এবং ভয়ানক রসের অবতারণা করা হয় তার প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট। কেউ বা কাঁদে, কেউ বা মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার কেউ-বা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। নাট্যের বিষয়বস্তুকে মিথ্যা জেনেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে কেমন করে সম্ভব হয় এটাই হ'ল বড় প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নটি আমাদের আত্যন্তিক শিল্পমূল্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে, নাট্যে উপস্থাপিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব কিন্তু উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করতে অপারগ। কেন-না দর্শক যদি নাট্যে উপস্থাপিত নিগৃহীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তা হলে তার প্রধান কর্তব্য হবে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা। একাত্ম না হয়ে দর্শক যদি 'সহমরমী' হয় তা হলেও ঐ নিগৃহীত চরিত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে ডেসডেমনাকে ওথেলোর হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তার। দর্শক কিন্তু সে দায়িত্ব গ্রহণ করে না। তার নাট্যবোধের পক্ষে এ দায়িত্বটুকু অপ্রাসঙ্গিক। সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠক বা দর্শক জানে যে তার সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে শিল্পরসিক হিসাবে তার দায়িত্বের অনেক প্রভেদ আছে। নাট্যরসিক নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব এহ বাহ্য। একাত্ম হয়ে যাওয়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রসবোধের পরিপন্থী বলেই গণ্য হয়। সহমর্মিতাবোধ সেই একাত্মতার পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ। সুতরাং সহমর্মিতাবোধও রসোপলব্ধির পথে বাধাস্বরূপ। কেন-না, মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব রসোপলব্ধির প্রধান সহায়ক। শিল্পরসিক যদি শিল্পের উপজীব্যের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে তা হলে নাট্যের কুশিলবদের মতই জাগতিক দুঃখ

ভোগ বা জাগতিক আনন্দ ভোগ করবে। শিল্পানন্দ, যাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলা হয়েছে তা কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞতাজাত আনন্দ থেকে একটু পৃথক ধরনের। উদাহরণ দিই নাট্যে বা কাব্যে উপস্থাপিত আনন্দঘন পরিবেশটুকু দর্শনে আমাদের মনে যে আনন্দ সঞ্জাত হয় তা হ'ল সাক্ষী হওয়ার আনন্দ। উপনিষদ কথিত সেই দুটি পক্ষীর কথা বলা যেতে পারে; যে পক্ষীটি ভোক্তা তার মধুফলভক্ষণে যে আনন্দ সে আনন্দের সঙ্গে দ্রষ্টা পক্ষীটির দর্শন জনিত আনন্দের একটু প্রভেদ আছে। দ্রষ্টা পক্ষীর আনন্দ থেকেই শিল্প জন্ম নেয়। ভোক্তা পক্ষীর আনন্দটুকু প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভোক্তা পক্ষীর ক্ষেত্রে ভোজ্য বিষয় থেকে আনন্দের উৎপত্তি হচ্ছে আর দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে এক আনন্দ থেকে আর এক আনন্দের জন্ম। এ কথা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে এই দর্শনজনিত আনন্দটুকু ভোক্তা পক্ষীর বিস্বাদময় দুঃখজনক অনুভূতি থেকেও জন্ম নিতে পারে। আর এই সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমাদের জাগতিক জীবনের দুঃখও শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। শুধু হতে পারে তাই নয় বস্তুতঃপক্ষে এমন মতও রয়েছে যে আমাদের জাগতিক চরমতম দুঃখ পরম নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের আকর—"Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts"; নাট্যরসের ক্ষেত্রে এই সত্যটিকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মঞ্চে যখন কোনো বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয় তখন তা থেকে গৌড়জন আনন্দে সুধা পান করে। নাটকীয় পরিস্থিতি যতই দুঃখজনক হোক না কেন তা থেকে আনন্দ পান সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী দর্শকের দল। এ সত্যটি একটু Paradoxical; কেমন করে রসিক সুজন এই দুঃখজনক বিয়োগান্ত নাটক থেকে রস আহরণ করে, তা হ'ল শিল্পালোকের দুর্গম রহস্যের কথা; কেমন করে এটি ঘটে তার ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। তাই বোধ হয় শিল্পকে 'মায়া' বলা হ'ল। প্রকৃতির সামগ্রিক জীবন ইতিহাস থেকে, রসনিঃস্বতা থেকে রস আহরণের দৃষ্টান্ত হয়তো মেলে। পাথুরে পাহাড়ের বুকে শেকড় চালিয়ে বটগাছকে বাঁচতে দেখেছি। কিন্তু সে যুক্তি তো শিল্পের জগতে প্রযোজ্য হবে না। এই কারণে হবে না যে উপমা তর্কবিধি নয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের

পরিপ্রেক্ষিতে বিয়োগান্ত নাট্যপরিস্থিতি থেকে সহৃদয় হৃদয়সংবাদীর আনন্দ লাভের তত্ত্বটুকু অব্যাখ্যাত থেকে যায়। এই দুর্জ্ঞেয়তা রয়েছে বলেই শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হ'ল যে শিল্পী কেমন করে জীবনসত্য থেকে শিল্পসত্য সৃষ্টি করেন সে তত্ত্বটুকু রহস্যাবৃত এবং সে রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। উপমাটি হ'ল, জীবনসত্য এবং শিল্পসত্য যেন দুটি গাছ। শিল্পী এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে বসলেন ; কিন্তু কেমন করে কোন পথে তিনি উড়ে গেলেন তার নিশানা কোথাও রইল না। বোধহয়, শিল্পের এই দুর্জ্ঞেয়তা শিল্পমূল্যায়নের রহস্যকে বেশী করে ঘনীভূত করেছে। শিল্প-মূল্যবোধ আমাদের একটি মৌল মূল্যবোধ। সে বোধ প্রয়োজনের কথা জেনেও প্রয়োজনকে অস্বীকার করেছে। তবে প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পমূল্যবোধের বিভেদ রেখাটি কোথায় কীভাবে টানা যায়, তা নিরূপণ করাও দুরূহ কর্ম। কেন-না, রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থটির কথা বলতে পারি। সেখানে কিন্তু এই প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পবোধের শুভদৃষ্টি ঘটেছে। তাদের মিলনও হয়েছে 'যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম' পর্যায়ের। সুন্দরের সঙ্গে এখানে শিল্পের সমীকরণ ঘটেছে। তাই বলতে পারি যে এই ধরনের ব্যতিক্রমে মানুষের প্রয়োজনবোধ এবং শিল্পবোধ একাত্ম হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের নজীর বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অতিমাত্রায় বিরল।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গে মানুষের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পের কী সম্পর্ক তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। মানুষের এই প্রয়োজনবোধকে কেন্দ্র করে মানুষের মূল্যজগতে 'শিবের' প্রতিষ্ঠা। মানুষের মূল্যায়নের যে ত্রিমূর্তির কথা পূর্বেই বলেছি তার মধ্য মূর্তিটি হ'ল শিব এবং এই শিব মানুষের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তার সামগ্রিক কল্যাণের মূর্তিটিকে গড়ে তুলেছে। এই শিবই আবার নীতিশাস্ত্রে 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নীতিশাস্ত্রে যে শিবকে আমরা আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে স্থাপিত করতে চেয়েছি সে শিব হ'ল নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে নিরূপিত। নীতিশাস্ত্রের নানান মতবাদিতায় তার রূপও বিভিন্ন ; কোথাও তা ব্যষ্টিকল্যাণকে আশ্রয় করেছে, আবার কোথাও

বা তা সমষ্টি কল্যাণের মধ্যে অন্তর্গূঢ় আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে অবলম্বন ক'রে মানুষের সমগ্র সমুন্নত মানবিক মহিমার চিত্রটি আঁকা হয়েছে। এই সামগ্রিক কল্যাণই মানুষের আরাধিতব্য এবং শ্রেয়ের নিশানা। এই মূল্যের মহত্তটুকু শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্রের সীমানায় আবদ্ধ নেই ; তার বিস্তার ঘটেছে মানুষের সর্ববিধ চিন্তায় ও কর্মে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বলেন, তাঁর সাধনায় তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি চান নি; যে মুক্তিটুকু তিনি চেয়েছেন তা সমস্ত মানুষের হয়ে, তখন মানুষের উচ্চতম কল্যাণের পরম সামগ্রিক রূপটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করি। স্বামী বিবেকানন্দ যখন নির্বিকল্প সমাধির অনাবিল আনন্দে নিত্য অবগাহন স্নান করতে চান তখন তাঁকে ব্যষ্টি-কল্যাণের মহত্তম চিত্র বলেই গ্রাহ্য করা যেতে পারে। সেই ব্যক্তি কল্যাণ কিন্তু মহত্তম মর্যাদায় ভূষিত নয় বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের অগণিত নরনারীর জন্য স্বামীজির নির্বিকল্প সমাধির নিত্যপ্রফুল্লতায় ধারাস্নান স্বার্থপরতার নামান্তর। অর্থাৎ ব্যক্তি-মুক্তি সমষ্টির মুক্তির চেয়ে ছোট বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করলেন ; অর্থাৎ, নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি কল্যাণ যে সমষ্টি-কল্যানঅপেক্ষা ন্যূন এ তত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল আর এক-বার। তূরীয় অধ্যাত্মলোকে যে তত্ত্ব সত্য নীতিশাস্ত্রের প্রচলিত মূল্যমানে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। Altruism ছেড়ে কোনো সুস্থ মানুষকেই Egoistic Hedonism-এর পক্ষে ওকালতি করতে দেখা যায় নি। কেন-না Altruism সমগ্র মানুষের বৃহত্তম কল্যাণকে আশ্রয় করে। এই সামগ্রিক কল্যাণবোধের সঙ্গে বৃহত্তম অর্থে নীতিবোধটুকুও সম্প্রসারী (co-extensive)। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র কল্যাণের ধারণাটুকু বৃহত্তম অর্থে এই নীতিবোধ থেকে আহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উপনিষদের 'ঋত' ধারণাটিকে, উপস্থাপিত করা চলে। যে বিশ্বব্যাপী নীতির ধারণা বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকে বিধৃত করে রেখেছে তাকেই উপনিষদে 'ঋত' বলা হয়েছে। উপনিষদ বিশ্বাস করে যে এই 'ঋতের' অস্তিত্ব ব্যক্তি অনির্ভর ও বিশ্বের অস্তিত্বে অন্তর্লীন। কোথাও কেউ 'ঋতের' শুচিতাকে বাধিত করলে 'ঋত' প্রত্যাঘাত ক'রে অপরাধীকে আত্মসচেতন করে দেয় ; অর্থাৎ

বিশ্বের অলিখিত নৈতিক বিধানকে ভঙ্গ করলে সে বিধান দোষীর শাস্তি ব্যবস্থা করে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি নির্ভর যে মানুষের কল্যাণবোধ তাই-ই বৃহত্তমরূপে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের রূপ নিয়েছে। মানুষের যে ব্যক্তি নির্ভর মূল্যবোধ তাই-ই কালক্রমে ব্যক্তি অনির্ভর স্বাধীন, সুস্থ, নৈতিক পরিমণ্ডলরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের এই মহত্তম পরিকল্পনা সুন্দরকেও অন্তর্ভূত করে রেখেছে! পরিশীলিত মানবতাবাদের বৃহত্তম ধারণা এই 'ঋত' ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত। তারই অঙ্কে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। অতএব নৈতিকমূল্য এবং সৌন্দর্য মূল্য এ দুয়ের মধ্যে বিভেদক রেখাটি টানা কঠিন হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রয়োজনকে অবলম্বন করেই এই দুই ধরনের মূল্যবোধকে পৃথক করা চলে। আবার এই প্রয়োজনবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্পের যে প্রয়োজন তার সঙ্গে নৈতিক প্রয়োজনের একটা খুব মৌল পার্থক্য নেই। নৈতিক হবার জন্যে মানুষের মনে যে প্রেরণা ও মহৎক্ষুধার সঞ্চার হয় তা কিন্তু সুন্দরকে সৃষ্টি করার প্রয়াসী হলেও হয়। এক কথায় বলা চলে যে শিল্প সৃষ্টি করা, সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আর নীতিশাস্ত্রোচিত কোনো মহৎকর্ম করা এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজন' বা মহাদার্শনিক কাণ্টের ভাষায় 'Purposiveness without a purpose' এই শৈল্পিক প্রয়োজনকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে না। বিশ্লেষণ-উপেক্ষিত যে সব শব্দ আমরা সৌন্দর্য দর্শনে ব্যবহার করেছি তা কিন্তু সমস্যার স্বচ্ছতা না এনে তাকে ক্রমেই জটিল এবং দুর্বোধ্য করে তুলেছে। যদি বলি মানুষের প্রেমের কল্পনায় প্রয়োজনটা এত বাহ্য তা হলে তো একেবারেই অনৃতভাষণ করা হবে। কেন-না সেক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনটাই তার মূল্যমান এবং অন্তিম আদর্শকে নিরূপণ করে। আবার যদি বলি সুন্দরের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা অপ্রাসঙ্গিক তা হলেও বোধহয় ঠিক বলা হবে না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে অভাবও নেই; যেখানে অভাব নেই সেখানে কর্মচাঞ্চল্যও নেই। শিল্প যে নিরন্তর সাধনা সেই সাধনাও তো কর্মসাধনার নামান্তর। সেই কর্মসাধনা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে। অতএব শিল্প হ'ল মানুষের সামগ্রিক

ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং যা শিল্প পদবাচ্য তার মধ্যে নীতিও অনুস্যূত। শিল্পকে তাই নৈতিক হতে হবে। এ কথা আমাদের কথা নয়। এ কথা সেদিন বললেন মহামতি ক্রোচে তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ 'My Philosophy'তে। মানুষের শৈল্পিক মূল্যবোধ অর্থাৎ সুন্দর সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা তার সঙ্গে তার শুভধারণার কোনো আত্যন্তিক বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে সুমিতিবোধ বললেন তাকে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ বা কল্যাণবোধ এ দুয়ের মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে। 'শিব' ও 'সুন্দর' এ দুয়ের পার্থক্য হ'ল পরিপ্রেক্ষিতগত; অথবা বলা চলে যে মূল্যের নির্ণায়ক মানুষের মনই স্থান এবং কাল বিশেষে এই মূল্যের মূর্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। একজন যাকে সুন্দর বলে, শিল্পোৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়, অন্য জনের কাছে আবার তার এই সৌন্দর্যরূপ আবৃত হয়ে গিয়ে তার কল্যাণরূপটুকুই প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দিই 'Malwida von Mysenberg' সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় দেখে তার নাট্যোৎকর্ষের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে তার কল্যাণ করার শক্তি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি এক পত্রে রোমাঁ রলাঁকে লিখলেন যে 'ওথেলো' নাটকের অভিনয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অতএব নাটকটি ভালো। এই ধরনের মূল্যায়ন তো হয়ে থাকে এবং এর সত্যতাকেও অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সার্ভেনতিসের লেখা 'Don Quixote De La Mancha' গ্রন্থটির কথা বলছি। Knight-errant-এর বীরত্ব, যখন নিপীড়িত ও অসহায় মানুষকে রক্ষা করে তখন তার নৈতিক ঐশ্বর্য সীমাহীন হয়ে পড়ে। ইয়োরোপে এই ধরনের বীরেরা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ; অবলা নারী, নিরীহ অসহায় মানুষের সহায়তা করাই তাদের ধর্ম। সে ধর্ম মানুষের শুভ বুদ্ধির কাছে চরম মর্যাদা পায়। সার্ভেনতিস যখন সেই নীতিকথার খেলনাগুলো পরপর সাজিয়ে অনবদ্য রূপ সৃষ্টি করেন তাঁর গ্রন্থটিতে তখন দেখি 'শিব' ও 'সুন্দর' একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের কল্যাণবোধ এবং মানুষের শিল্পবোধের সমীকরণ ঘটেছে। কবির কথায় বলতে পারি, নৈতিক ভাবের-তরণী সৌন্দর্যের পাল তুলে অসীমের দিকে যাত্রা করেছে Don Quixote-এর এই বীরত্ব গাথাতে।

মানুষের মনকে যদি Unity বলা হয় তাহলে সে মনের যে প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে সমগ্র মানসিকতার ছাপ পড়ে। মূল্যায়ন তা শুভসম্পর্কিতই হোক বা সুন্দর সম্পর্কিতই হোক বা সত্য সম্পর্কিতই হোক তা সামগ্রিক-ভাবে এই মানসিকতার লক্ষণাক্রান্ত। যে কাজকে কল্যাণকর বলি তার মধ্যে একধরনের পরিমিতি বোধ থাকে। এই পরিমিতিবোধের রূপটা কিন্তু পরিবেশ ভেদে পাল্টায়। সেখানে প্রয়োজনটা যে রূপে দেখা দেয় সেই ভাবেই ঐ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে শুভের বা কল্যাণের রূপটুকু ধার্য হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে শুভ বা কল্যাণটুকু হ'ল প্রয়োজন আনুপাতিক। এই প্রয়োজনটা আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিনির্ভর এই প্রয়োজনটুকু যদি শুভের বা কল্যাণের নিয়ামক হয় তা হলে দার্শনিক Collingwood-এর ভাষায় একে Subjective বলা যেতে পারে। Collingwood এই Subjectivity বা ব্যক্তিনির্ভরতাকে ব্যবহার করেছেন মানুষের শিল্পমূল্যায়নের প্রসঙ্গে। তাঁর মতে এই Subjectivity বা জ্ঞাতা-নির্ভরতা হ'ল শিল্পের বা সুন্দরের স্বরূপ লক্ষণ। এই জ্ঞাতা-নির্ভরতা ছাড়া শিল্পমূল্যায়নের অন্য কোন মাপকাঠি নেই। শিল্প সম্বন্ধে যেটা সত্য, শুভ বা কল্যাণ সম্বন্ধে তা সমভাবেই প্রযোজ্য। প্রয়োজনের ধারণাটিকে আমাদের 'শুভ' এবং 'সৌন্দর্যের' বিভেদক (Differentia) হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কেন-না শিল্পীর মনেও শিল্পসৃষ্টির জন্য একটা অভাববোধ আছে; একটা 'মহৎক্ষুধার' আবেশ তাকে পীড়ন করে। তা হলে এতদুভয়ের মধ্যে যখনই কোন শ্রেণীকরণের সীমারেখা টানা হবে তখন আমরা যে ভুল করব, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় যে অবভাস ঘটবে তা হ'ল, শঙ্করবিভজনজনিত অবভাস (Fallacy of Cross division)।

জ্ঞাতানির্ভরতা বা Subjectivity যদি আমাদের সৌন্দর্যবোধের এবং কল্যাণবোধের নিয়ামক হয় অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং শুভের পরিমাপকল্পে আমরা যদি জ্ঞাতানির্ভর মানদণ্ডের প্রয়োগ করি তা হলে উভয়ের মধ্যে যে গুণগত কোনো ভেদ থাকে না সে কথা বলাই বাহুল্য। এখন বিচার করে দেখা যাক যে সত্যমূল্যের মূল্যায়নে এই জ্ঞাতানির্ভরতা কতখানি সার্থক? আমরা বস্তুজগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার যথাযথ বিবরণ দেওয়াকেই 'সত্য' বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ অস্তিত্বের সঠিক বর্ণনই

হ'ল সত্য। সত্য বস্তুতে নেই, সত্য আছে আমাদের অবধারণে (Judgment) ও আমাদের মননে। সুতরাং যাঁরা সত্যকে বস্তুগত বলে ভাবেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। প্রচলিত ধারণা যে, সত্যকে বস্তুগত করে তুলতে পারলে তবেই তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। সামান্য বিশ্লেষণেই এই ধরনের বিচারে ভ্রান্তি চোখে পড়ে। 'আমার সামনে একটি টেবিল আছে'—এই উক্তিটি সঠিক ভাবে বর্ণনমূলক হলেই উক্তিটিকে সত্য বলা হবে। এখানে প্রশ্ন উঠবে আমার সামনে যে টেবিলটি আমি দেখছি তা কী পুরোপুরি প্রত্যক্ষজাত না কল্পনার সাহায্যে আমি টেবিলটিকে মনে মনে তৈরি করে নিচ্ছি? এই তৈরি করে নেওয়া বা Construction আমাদের মনের ধর্ম; মন যখনই দেখে তখনই সে তৈরি করে। আমার সামনের টেবিলটাও সে তৈরি করছে। আমি চোখ মেলে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে টেবিলের খানিকটা দেখি বাকিটা মনে মনে তৈরি করে নিয়ে টেবিলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিলের রূপ দিই। তা হলে এ কথা বলতে পারি যে তার অস্তিত্বের সত্যতাটুকু (Reality) আমারই সৃষ্টি। সুতরাং জ্ঞানতত্ত্বে Correspondenceবাদীদের মত গ্রহণ করলেও তার মধ্যে জ্ঞাতানির্ভরতা অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকবে। যদি আমি টেবিলটিকে মনে মনে তৈরি করে থাকি তা হলে সত্য বা Reality নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতানির্ভরতা বা Subjectivity-কে বাদ দেবার উপায় নেই। Correspondenceবাদীরা যে জ্ঞাতানির্ভর বস্তুগত সত্যের কথা বলেন তা অলীক কল্পনামাত্র। Reality সৃষ্টির ব্যাপারে Subjectivity বা জ্ঞাতানির্ভরতায় ভূমিকা অনস্বীকার্য। Correspondenceবাদীদেরও এই Subjectivity-কে স্বীকার করতে হবে। কেন-না, দৃশ্যমান জগতের মধ্যে, আমাদের চারপাশের পরিবেশের মধ্যে এই জ্ঞাতার অবদান সবার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুন্দরের বেলায়, কল্যাণের বেলায় যে জ্ঞাতানির্ভরতা বা Subjectivity সুন্দর এবং কল্যাণের পূর্ণ রূপটুকু সংযোজনের সহায়তা করেছিল তা আবার Reality বা সত্যের বেলাতেও সমান ভাবে কর্মতৎপর।

এই আলোচনার আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে Plato-র Republic, Ion ও Phaedrus গ্রন্থে কথিত অনুকৃতি তত্ত্ব সঠিকভাবে

কাব্য বা শিল্পের চারিত্র্য নির্ধারণ করে নি। অবশ্য আমরা জানি যে গ্রীক দার্শনিক জ্ঞাতা অনির্ভরতাকে (Objectivity) সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তাঁর দর্শনে। তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো তত্ত্বগতভাবে তাঁর মত সমর্থনযোগ্য। কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে আমরা এই জ্ঞাতা-নির্ভরতাকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছি। ফলে Epistemology-এর Correspondence তত্ত্ব অথবা নন্দনতত্ত্বের অনুকৃতিবাদ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেন-না যাকে অনুকরণ করছি তাও ত আমারই সৃষ্টি :

> 'আপন মনের মাধুরি মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা
> তুমি আমারই গো তুমি আমারই··· ।'

এ কথা শুধু কবির প্রেয়সী কল্পনার বেলাতেই সত্য নয় ; এ কথা সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের সর্ববিধ মূল্যায়নের ব্যাপারে। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের রূপ বা রস যদি দ্রষ্টার অবদান হয় তা হলে জ্ঞাতানির্ভরতা হ'ল একদিকে যেমন বস্তুজগত সৃষ্টির মন্ত্রগুপ্তি তেমনি আবার তা নিয়ন্ত্রণেরও নিয়ামক, এক কথায় সত্য, শিব, সুন্দর, এই ত্রিবিধ মূল্যের সূতিকাগৃহ।

এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। সেটি হ'ল শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের যোগটুকুর কথা। শিল্প যখন শিল্প হয়ে ওঠে তা কী সব সময়েই সুন্দরের পরিপূরক হয়? অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যাকে সুন্দর দেখি তা-ই কী কেবল শিল্পের উপজীব্য? যাকে আমরা কুৎসিত বলি তার স্থান কী শিল্পে নেই? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা Empirical Evidence বলে যে কুৎসিতও শিল্পের খাসদরবারে দরবারী। নোতর্-দামের সেই কুঁজো লোকটা, রামায়ণের কুঁজি মন্থরা—এরাও শিল্পলোকে ভাস্বর চরিত্র। প্রাকৃত জীবনে এদের সুন্দর বলি না। অথচ শিল্পলোকে এদের সে মর্যাদা দিতে তো আমাদের বাধে নি। এটা কেমন করে হ'ল? তবে কী প্রাকৃত সুন্দর ও শিল্প সুন্দর এরা এক নয়? অর্থাৎ এই দুয়ের মূল্যায়নের মাপকাঠি কী বিভিন্ন? বলা যেতে পারে যে প্রকৃতি যাকে কুৎসিত করে গড়েছে অর্থাৎ আমাদের চোখে যাকে

কুৎসিত মনে হয় তা কী প্রকৃতির কারিগরির নৈপুণ্যের অভাবের জন্য ? অর্থাৎ প্রকৃতি কী যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তা প্রকাশ করতে পারে নি ? এ কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির এই পারা না পারা এটা প্রতিভাত হচ্ছে দর্শকের চোখে। অর্থাৎ প্রকাশ বিফলতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে না ঘটে থাকলেও আমরা তা প্রকৃতির উপর আরোপ করে তার সৃষ্টি বিশেষকে কুৎসিত দেখি। এটা আমাদের দেখার ধর্ম ; প্রকৃতির সৃষ্টির ধর্ম নয়। প্রকৃতিতে যাকে কুৎসিত দেখলেম তাকে যখন প্রাকৃতিক সংলগ্নতা থেকে অসংলগ্ন করে তুলে এনে আমার কবিতায় বা ছবির ক্যানভাসে বসাই তখন তাকে এক নতুন ধরনের সংলগ্নতা বা Coherence দেবার চেষ্টা করি। যখন তা সার্থকভাবে দিতে পারি আমার কাব্যে বা ছবিতে তখন তা 'সুন্দর' হয়ে ওঠে। তাই পণ্ডিতেরা বলেছেন যে শিল্পলোকে প্রাকৃতিক অসুন্দরেরও স্থান আছে ; Ugly is not a non-value but a disvalue. কুৎসিত যদি Non-valueও হ'ত কোনো একজন দর্শকের চোখে বা কোনো এক রসবেত্তার মূল্যায়নে তা হলেও আর একজনার চোখে অন্য এক রসবেত্তার মূল্যায়নে তার value হয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ছিল না। কেন-না উপনিষদের সেই দ্রষ্টা পাখিটির কথা স্মরণ করুন। সে তো ভোক্তা পাখিটির দুঃখ এবং সুখ এ দুয়ের ব্যাপারেই সমান ভাবে উদাসীন : ভোক্তা পাখির ক্রন্দনেও সে আবশ্যিকভাবে কাতর হয় না অথবা তার উল্লাসেও সে উল্লসিত হয় না কোনো বাঁধাধরা নিয়মে। তার নিয়ম তার নিজের তৈরি। ভোক্তা পাখির সুখেও সে আনন্দিত হতে পারে আবার দুঃখেও সে আনন্দিত হতে পারে। যখনই সে পুলকিত হবে তখনই সেই আনন্দের সরোবরে শিল্পের জন্ম ঘটবে। শুধু শিল্প কেন সমগ্র সৃষ্টিই তো আনন্দ থেকে জন্ম নেয়। সত্য, শিব, সুন্দর—এদের জন্মও এই আনন্দেরই মৌল ভূমিতে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—

শিল্প ও সভ্যতা

অনেক অনেক দিন আগে আরস্তিতল বলেছিলেন সে শিল্পমূল্যের যথার্থ অনুধাবন করা সহজ হবে যদি আমরা শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করি। মানুষ আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শিল্পের মাধ্যমে বুদ্ধির সহায়তায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা তার বুদ্ধির পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। এই সভ্যতার পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে সভ্যতম মানুষ জীবন এবং শিল্পকে সার্থক করে তুলবে। সভ্যতার পথে অনগ্রসর হওয়ার অর্থ হল মানুষ তার দুর্বল প্রকৃতি ও অসংস্কৃত স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি; এখনো তারাই মানুষের কর্মকে ও জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি, আমাদের সমাজনীতির রূপ আজ বড়ই অসংস্কৃত ও আদিম। কুসংস্কার, ভ্রান্ত অনুমান, স্বার্থ বুদ্ধি এবং অহেতুক ভয়—বুঝি এরাই সমাজ জীবনে বুদ্ধির স্থানটুকু অধিকার করে বসেছে।

মানুষের ইতিহাসের প্রত্যূষ থেকেই তার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে তার পশুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাটুকুকে প্রশমিত করতে লাগল। শুরু হল বুদ্ধির সাহায্যে পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজ। শিল্প প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করল, তার স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করল। আদিম মানুষ তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ কর্মে আত্মনিয়োগ করল; তখন সে কাঠ কুঠুরি ভাঙতে লাগল বন থেকে, আগুন জ্বালাল, পশুপালন শুরু করল, কালক্রমে মাঠে বীজবপন করল, কুঁড়েঘর বানাল, গুহাখনন করল পরম আয়াসে। মানুষের রুজি রোজগারের জন্য, তার আশ্রয় তৈরী করার জন্য যে জীবন-শিল্পের একান্ত প্রয়োজন, সেই শিল্পের উদাহরণ আমরা উপরি-কথিত কাজগুলির মধ্যে পাই। ব্যাপক অর্থে সমবেত সঙ্গীত প্রেক্ষাগৃহে অথবা জাদুঘরে সে শিল্পের আমরা দেখা পাই না যার দেখা পাই শস্যক্ষেত্রে, গোচারণভূমিতে এবং কৃষিকর্মে। বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয় পরিবেশের মধ্যে প্রথম মানুষ নিরাপদ জীবন-ধারণের প্রণালীটুকু আয়ত্ত

করেছিল। সৌন্দর্য সৃষ্টি করা বা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে জীবন-যাপন করার অনেক আগে এটি তাকে শিখতে হয়েছিল। আদিম জীবন সম্বন্ধে যে সব নৃতত্ত্ববিদ বহুদিন যাবৎ গবেষণা করেছেন তাঁদের মত হল, জীবনে যা প্রয়োজনীয় তা যে সুন্দরের আগে এসেছে অথবা সার বস্তু সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যে অলংকরণের পূর্বে জন্ম নিয়েছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। করণীয় কর্তব্য সমাধা করতে করতে মানুষের অসীম কল্পনা তার অবকাশকে সুষমায় ভরে তুলেছে, এটুকু হল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন-জাত। পাত্র, ঝুড়ি প্রমুখ জিনিষের মধ্যে নানান রূপের আমদানি হল। আদিম মানুষ শুধু গুহানির্মাণই করল না, সে গুহাগাত্রে নানান ধরণের ছবিও আঁকল। রঙের রেখার মোহে মুগ্ধ হয়ে কারিগর মানুষ নিয়ে খেলতে বসল। আদিম মানুষের তৈরী বেতের ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি এই সব হাতের কাজ দেখলে বোধ হয় শিল্পী আর কারিগরে বিশেষ ভেদ করা যাবে না।

ইতিহাসের বিচারে চারুশিল্প না কারুশিল্প, কে কার পূর্বে এসেছিল, অথবা উভয়ের অভ্যুদয় একই সঙ্গে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও চারুশিল্পকে কারুশিল্প থেকে পৃথক করা হয়ে থাকে। সমকালীন সভ্যসমাজে এমন কতকগুলি শিল্প রয়েছে যেগুলির কারুকুশলতা ও প্রায়োজনিক লক্ষ্যসিদ্ধির প্রতি আগ্রহ অতিমাত্রায় প্রকট। শিল্প-উৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন প্রাচুর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে চারু-কলা সেই উৎপাদনের জগতে প্রতিষ্ঠা পায় না। যে উৎপাদন এই ধরনের কারুশিল্প থেকে জাত হয় তার লক্ষ্য থাকে প্রয়োজনের দিকে; সৌন্দর্যের প্রতি তা সাধারণতঃ বিমুখ হয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শিল্প চালিত হয় তা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক, আমাদের অভাব মোচনের অনুকূল। তা আমাদের বস্ত্রসমস্যার ও গৃহ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে, দ্রুত চলাচলের জন্য যন্ত্রযান, নদী পার হবার সেতু, সমুদ্র পারাপারের জন্য জাহাজ এ সবই এই যান্ত্রিক শিল্প থেকে পাই। সম্ভব হলে আমরা এগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলি। যে সভ্যতায় মানুষের চিন্তাশক্তির সক্রিয় হবার ব্যাপক অবকাশ থাকে সেখানে বাসগৃহকে সুষমা-মণ্ডিত ক'রে গড়ে তোলা হয়; অবশ্য রৌদ্রতাপ, ঝড়জল থেকে মানুষকে

পুরোপুরি রক্ষা করার ব্যবস্থাটুকুও থাকে। এ দুটি গুণ একই সঙ্গে এই প্রেক্ষাপটে বিরাজ করত। তেমনি ধারা পরিধেয় বস্ত্র একদিকে ঠাণ্ডার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করত আবার তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলত; জাহাজগুলো নীল আকাশের বুকে তীরের মতো সুন্দর দেখাত আবার তা বন্দরে বন্দরে জলপথে যাত্রার ব্যাপারেও আমাদের একান্ত আশ্রয়স্থল ছিল। আমাদের জীবনের অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাজারো কারণ লুকিয়ে রয়েছে যার জন্য আমাদের বাসগৃহগুলি সৌন্দর্যের আকর হয়ে ওঠেনি; তার জন্য অনেক নদীতেই সেতু বাঁধা হয়নি। উৎপাদন প্রাচুর্যই যেখানে আমাদের লক্ষ্য সেখানে এমনটি ঘটে; দ্বিতীয়তঃ একঘেয়ে যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্যও এটা ঘটতে পারে। তৃতীয়তঃ যান্ত্রিক শ্রমশিল্প-আশ্রয়ী সভ্যতায় আমরা সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনটির উপরে জোর দিই বলেও এমনটি ঘটতে পারে। উত্তর ইংলণ্ড ও আমেরিকার যন্ত্রশিল্পপ্রধান শহরগুলিতে আমরা এই ধরণের সভ্যতার অস্তিত্ব দেখেছি; সেখানে সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের ব্যবধানটা চিরকালই অব্যাহত।

চারুশিল্পের নমুনা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি এলগিন মর্মরে উৎকীর্ণ ঘোড়সওয়ার, সিসিলীয় সমুদ্রের তীরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভাস্বর গ্রীক উপাসনাগৃহ, শেলীর কবিতা অথবা শুবার্টের কোয়ার্টেট। এদের সুষমাকে, এদের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। এরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় না, রুটি সেঁকে দেয় না বটে কিন্তু এরা মনের এবং চোখের খিদে মেটায়। এরা ইন্দ্রিয়-বিচারকে ক্রিয়াশীল করে তোলে, কল্পনা সুখানুভূতির আবেগে আবিষ্ট হয়ে ওঠে, মন আনন্দরসে অবগাহন করে। এই সব শিল্পকর্মকে 'ভাল' বলা হয়েছে এরা কোন প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে বলে নয়, এরা ভাল কেননা এরা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এদের মূল্য এদের রঙে, এদের রূপে, এদের শব্দসংগতিতে এবং এদের ব্যঞ্জনায়।

যন্ত্রযুগের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির আঙ্গিকের প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকটী শিল্পকর্ম শিল্পীর সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে; হয়ত শিল্পী আপনার নাম জাহির করে, না কিন্তু শিল্পী আপন অদ্বিতীয় শিল্প প্রকৃতিটুকুর ছাপ,

তার অসামান্য সৃষ্টিগুণের ব্যঞ্জনাটুকু রেখে যান আপনার শিল্পকর্মে। আর এরই গুণে এক শিল্পীর শিল্পকর্ম অন্য এক শিল্পীর শিল্পকর্ম থেকে আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এরই গুণে চারুশিল্প কারুশিল্প থেকে পৃথক বলে স্বীকৃত হয়।

শ্রমশিল্পজাত ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের আশু প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়; তার ফল তাৎক্ষণিক, কিন্তু শিল্পকলায় আমাদের যে ধরণের অভিলাষ পূর্ণ হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। অলিভ পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে গ্রীক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে গিরগেন্টের যে সব উপাসনা-গৃহ বিরাজ করছে তার স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য-সুষমার অনুপম প্রশান্ত আবেদনটুকু রসিকচিত্তে যে আনন্দের সঞ্চার করে তা উপভোগ করতে হলে গ্রীক-ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই; গ্রীক দেবদেবীকে স্বীকার বা অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোজার্টের সোনাটা শুনে আমার কী ভাল হবে, এ প্রশ্ন কেউ করে না। শ্রোতা সঙ্গীতের রসধারায় স্নানাপান করে স্তব্ধীভূত হয়, ধন্য হয়।

শ্রমজাতশিল্প (Industrial Arts) সম্বন্ধে এ কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটুকু যথাযথভাবে পালন করেছে কিনা। যেমন, সেতু যখন নির্মাণ করা হয় তখন সেই সেতুর কাজ হল নদী পারাপারের নিরাপদ পথ করে দেওয়া; তেমনি জাহাজ তৈরী করা হয় বিঘ্ন-বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে সমুদ্র পারাপারের জন্য; কাপড়জামার প্রয়োজন শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পৃথিবীতে অবশ্য এমন এক সময় ছিল যখন সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের বিভেদটুকু খুব উগ্র হয়ে দেখা দেয়নি। আমাদের যুগে এমন ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি যে এই প্রভেদটুকু ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। সারা ইয়োরোপে আমরা অন্ততঃপক্ষে গোটা ছয়েক জাদুঘরের কথা জানি যেখানে প্রাচীন গ্রীকদের নিত্য ব্যবহার্য চামচ, চিরুণী, পাত্র আত্মরক্ষাচ্ছদ, ফুলদানি প্রভৃতি সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব বস্তু নির্মাণ করা হয়েছিল তৎকালীন মানুষের আশু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। কিন্তু আধুনিক মানুষের চোখে তাদের অলংকরণটুকু, শিল্পকর্মটুকুই মূল্যবান; তাদের প্রয়োজনীয়তাটুকু,

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-১৫

ব্যবহারিক মূল্যটুকু আধুনিকের চোখে 'এহ বাহ্য'। গ্রীকেরা যে সব সামগ্রীকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য, নিত্যদিন ব্যবহার করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন আমরা এই প্রসঙ্গে সেই সব সামগ্রীকে শুধুমাত্র 'সুন্দর' বলে গণ্য করেছি।

রেনেসাঁ যুগের যে সব প্রসিদ্ধ উপাসনাগৃহ, রাজপ্রাসাদ ও শাসনাধিকরণগৃহ একদিন জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল আজ আমরা তাকে শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করছি। মধ্য যুগে যে সব চার্চ বা উপাসনাগৃহ নির্মিত হয়েছিল তাদের শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য হলেও উপাসনাগৃহ হিসেবে তাদের ব্যবহারিক মূল্যকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই। Chartres-এর উপাসনাগৃহের রঙীন কাঁচের জানলার বর্ণসমারোহ ধর্মস্থানের ঐশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেছে বলে অনেকে মনে করেন; অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পকর্ম লাঞ্ছিত তোরণদ্বারে কত না কোমল শিল্প-ঐশ্বর্যের ব্যঞ্জনা। আধুনিক মানুষের চোখে এই মধ্যযুগীয় শিল্পকলা মহিমামণ্ডিত, তার কারণ এই সব শিল্পকর্মের মধ্যে সেই যুগের সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছে। আজকের ভবঘুরের চোখে যা রমণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে তা একসময়ে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছিল মাত্র। আজকের দিনের সংশয়বাদীর চোখে যা শিল্পোৎকর্ষের চরম নিদর্শন তা-ই একদিন বিশ্বাস-প্রবণ মধ্যযুগীয় মানুষের কাছে ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপকরণ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল মাত্র।

এই ধরণের শিল্প-নিদর্শন দেখে আমাদের এ কথা মনে হয় যে সুস্থ শিল্পের মধ্যে উপায় এবং উপেয়, সুন্দর এবং সৌন্দর্য সাধনার কৌশলটুকু একই সঙ্গে বিধৃত হয়ে থাকে। স্থাপত্য কলার মত শিল্পকর্মে কখনই বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যটুকু চরম ও পরম মূল্য হিসেবে গৃহীত হয় না। বাসগৃহ নির্মাণ ব্যয়বহুল; তাই বাসগৃহকে শুধুমাত্র অলংকরণ-সমৃদ্ধ স্তূপে পরিণত করা যায় না। মানুষের কোন না কোন প্রয়োজনে তাকে লাগানো হবে এবং এই প্রয়োজন সে যতটুকু সিদ্ধ করবে, তার সৌন্দর্য মূল্যও সেই অনুপাতে স্থিরীকৃত হবে। উপাসনাগৃহ, বন্দীশালা, বিদ্যামন্দির এ সবেরই আপন আপন রূপ অংশতঃ নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

আমাদের কালে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায়োজনিকের সঙ্গে সুন্দরের প্রভেদ করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' আন্দোলনকে আমরা এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গণ্য করতে পারি। শ্রমশিল্পকে কেন্দ্র করে যে সব শিল্পনগরী গড়ে উঠছিল, এবং যে বস্তুকেন্দ্রিক চিন্তাধারা জন্মগ্রহণ করছিল ধীরে ধীরে তা আমাদের জীবন এবং জগৎ থেকে অধ্যাত্মমূল্য ও তদ্‌জাত রঙ এবং ঐশ্বর্যকে নির্বাসন দিল। এর বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ রূপে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন যে শিল্পের নৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবহারগত কোন দায়িত্ব পালনেরই কথা নয়। সঙ্গীতে সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা পরিশীলিত রূপস্থষ্টির মধ্যস্থতায় সুখবাদী যে ক্ষণিক আনন্দটুকু লাভ করেন সে আনন্দ সকল প্রয়োজনের অতীত, সে আনন্দে উদ্দেশ্য-বিমুখতা অতিপ্রকট। যে জীবনে দায়িত্ব আছে অথচ আনন্দ নেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সুন্দরের দায়িত্বহীন উদ্দেশ্যবিমুখ সাধনার কথা ঘোষিত হল। শিল্পরূপ-স্থষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিমুক্ত আত্মা তার আপন চিত্তের প্রসন্নতাটুকু খুঁজে পেলো। যে সভ্যতার আওতায় সে বাস করে সেই বিকৃত সভ্যতা তাকে সেই প্রসন্নতাটুকু দিল না। সে যে বিশ্বজগতের অধিবাসী, সেই নিরর্থক জগতের মধ্যেও সেই প্রসন্নতাটুকুর একান্ত অভাব।

এই প্রায়োজনিক এবং শৈল্পিকের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তার পরিণতি অনুধাবন করা খুব শক্ত নয়। এর ফলে একদিকে ব্যবহারিক সভ্যতা জন্ম নেয়; এই সভ্যতায় থাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি বা কল্পনাজাত আনন্দের অভাব। এল্‌ পি জ্যাকস্‌ কথিত পুরাকাহিনীতে স্মোক ওভারের দেশের যে গল্প আছে তদ্রূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। অন্যদিকে আবার সৌন্দর্যবিলাসীর ছোট ছোট শিল্পকর্মকে ঘিরে ঘিরে নিরন্তর সৌন্দর্যবিলাস ও তজ্জনিত বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের আস্বাদনটুকু তার চারপাশের জীবন ও জগত থেকে একান্তরূপে বিচ্ছিন্ন। মহামনীষী তলস্তয় এই সব সৌখীন শিল্পরসিকদের তিরস্কার করেছেন তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'What is Art'-এর সবটুকু জুড়ে। অর্থবিহীন শব্দের

যোজনায় সংগতিহীন সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে বার বার ; উনবিংশ শতাব্দীতে গতানুগতিক, আপাতঃ-রোমান্টিক সূক্ষ্মানুভূতি নিয়ে শিল্পের যে রূপৈশ্বর্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন শিল্পীরা তা এক একটি ক্ষুদ্র শিল্পী গোষ্ঠীর স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস ব'লে ধরা যেতে পারে ; একটি সুস্থ সভ্যতার আন্তরিক প্রকাশ হিসেবে তাদের গণ্য করা যায় না।

সভ্যতার আদি প্রত্যূষকাল থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য রীতি পদ্ধতির বিকার হিসেবে শিল্পকে দেখা হয়েছে বলেই শিল্প সম্বন্ধে একটা নিন্দাসূচক মনোভাব দেখা গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। নীতিবাগিশের দল শিল্প সম্বন্ধে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করেছেন ; মনুষ্য-জীবনের বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্ট নিরাকরণের জন্য যাঁরা সদা সচেষ্ট তাঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা থেকে পলায়ন করার নামই বুঝি শিল্প ; তাঁদের চোখে শিল্পের কাজ হল আমাদের ইন্দ্রিয়-পথে চেতনায় প্রক্ষোভ সৃষ্টি করা। দার্শনিকদের মধ্যে কবিসুলভ মনন-সাধনার অগ্রচারী মহাদার্শনিক প্লেতো নৈতিক আদর্শগত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কবি তথা চিত্রী ও গায়কদের নিন্দা করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তা এবং কর্মের সর্বজনস্বীকৃত শৃঙ্খলাটুকুকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে এই চারুশিল্প। জীবনের বাস্তব সত্যটুকু থেকে কবির স্বপ্ন মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে পারে। এইসব অভিযোগ নীতিবাগিশদের মুখে আমরা শুনেছি প্লেতো-পরবর্তী যুগ থেকে। এঁরা আরো বললেন যে সঙ্গীতের নরম সুর শুনে শুনে মানুষের বীরত্বে, তার যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তিতে ভাঁটা পড়তে পারে। ছবিতে অনুকৃতির অভাবিত রূপ দেখে মানুষের মনকে বাস্তব সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সেণ্ট অগাস্টিন প্রমুখ অন্যান্য নীতিবাগিশের দল শিল্পের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিল্প মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তুলতে পারে। নন্দনতাত্ত্বিকদের মতই নীতিবাগিশের দলও শিল্পের ইন্দ্রিয়গত আবেদন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ; বস্তুর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপটুকু মানুষের মনোযোগ এবং কল্পনাশক্তিকে আকৃষ্ট করে। বিশ্বজগতে মানুষ তার পার্থিব পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। বিশ্বজগতের স্রষ্টার মহিমা মানুষ বিস্মৃত হতে বসে। এ কথা বললেন সেন্ট অগাস্টিন। ইন্দ্রিয়গোচরতা ও ইন্দ্রিয়ের বশ হওয়া এ দুটোর মধ্যে

খুব একটা পার্থক্য নেই। রঙ এবং রূপের জন্য আমাদের যে মোহ তা থেকে এই রঙ এবং রূপকে পৃথক করা খুব সহজসাধ্য নয়। সুন্দরের আবেদনে যখন মানুষের নিম্নতর সত্তা সাড়া দেয়, তখন মানুষ অসঙ্গ অচেতন সৌন্দর্য-বস্তুতে তার আগ্রহটুকু সীমাবদ্ধ করে না ও রাখতে পারে। মহাদার্শনিক প্লেতো, মনীষী তলস্তয়, এঁরা আশঙ্কা করেছেন যে ইন্দ্রিয় যখন একবার জাগ্রত হয় তখন তা মানুষকে অবনতির গভীরে যে কোন মুহূর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় দর্শন-বেত্তারা দর্শনকে ধর্মের অনুচারী বলে যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তাঁদের মতে শিল্পকলা শয়তানের সহচর বলে পরিগণিত হয়েছিল। যে সুন্দরের আবেদন ইন্দ্রিয়ের পথে আসে তা মানুষের আত্মার সর্বনাশ সাধন করে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে চারুশিল্পের যে নিন্দা করা হয় তার খানিকটা তবু বোধগম্য। মানুষের উত্তেজনাগ্রস্ত, সম্মোহিত ইন্দ্রিয়নিচয়ের শক্তি সম্বন্ধে নীতিবাগিশের দল যে স্তুতি গেয়েছেন তা একান্তই অনিচ্ছা-প্রসূত। মনঃসমীক্ষা যৌনশক্তির সর্বাত্মক আবেদনের সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অনেক আগে খ্রীস্টান নীতিবাগিশেরা অনুভব করেছিলেন কিভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের কাজে যৌন আকাঙ্খা আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে; ইন্দ্রিয়চেতনা ধীরে ধীরে যৌনচেতনার উজ্জীবন ঘটায়। নন্দন-তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার যে সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ আমাদের চোখ ধাঁধায় তার অনেকখানিই যৌনজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শিল্পের ডায়োনিজীয় রূপে যে উন্মাদনা, যে আবেগমুক্তির নিশানা, তার অনেকখানিই যৌন প্রকৃতিগত।

সুতরাং নীতিবাগিশেরা যে যে কারণে শিল্পের নিন্দা করেন তার অনেকগুলিই সম্ভাব্য এবং যথার্থ। কিন্তু তাঁরা এই থেকে যে সব সিদ্ধান্ত করেন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যাঁরা আপন আপন অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান এবং তার সকল সম্ভাব্যতা এই জীবনেই আস্বাদন করতে চান তাঁদের কাছে শিল্পের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ অর্থহীন বলে মনে হয়। শিল্পের ইন্দ্রিয়-গোচরতায় তার ইন্দ্রিয়গত আবেদনের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য খুব বেশী

জোরদার বলে অনুমিত হয় না। মেসফিল্ড স্থানান্তরে বলেছেন যে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, এই সত্যটুকু জানি। কী পেয়েছি এবং আমরা কী নষ্ট করেছি তা জানি না। ছবি ও গান আমাদের অন্তররূপসমৃদ্ধ বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের অধিকতর সচেতন করে। এর ফলে আমরা সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠি। যে সভ্যতায় শৃঙ্খলা রয়েছে তার প্রচেষ্টা যদি হয় আমাদের জীবনকে দীর্ঘায়িত করা, তা হলে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সেই সু-শৃঙ্খল সভ্যতার অন্যতম প্রচেষ্টা হবে জীবনকে বিচিত্রতর করে তোলা, জীবনের কুক্ষিটুকু প্রাণের গুণৈশ্বর্যে ভরে দেওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গত চেতনার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমগ্র সত্তার মৃত্যুও আসন্ন হয়ে ওঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনা স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র চেতন জীবনও স্তিমিত হয়ে পড়ে, আমাদের সমগ্র সত্তা নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অধ্যাত্ম চেতনার উন্মার্গ-গমন সেইসব মানুষের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে যাঁদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণ ও সতেজ ; তাঁদের চোখ শুধু রঙ দেখে না ; তাঁদের অধ্যাত্মচেতনার ঊর্ধ্ব-গমনেও বাধা পড়ে।

তলস্তয়ের লেখায় আমরা পড়েছি যে শিল্প শুধুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তিসমূহের কণ্ডূয়ন করে। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে, জোরদার ভঙ্গীতে, আপোষহীন কণ্ঠে এই অভিযোগ জানালেন। কিন্তু শিল্পের বিষয়বস্তু অংশত যৌনজীবনগত হওয়ার জন্য এবং তার আবেদন কিছু পরিমাণে যৌনজীবনাশ্রয়ী বলে তাকে ভয় করার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে এ যুগের মানুষেরা মনে করে না। আধুনিককালে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যৌনজিজ্ঞাসাকে সন্দেহের চোখে দেখে না। তাকে ভীতির কারণ বলেও গণ্য করে না। অধিকাংশ নীতি সংস্কার লক্ষ্য হল আমাদের আবেগ, মায়ামমতা ও আমাদের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ; এই বিশুদ্ধিকরণ-প্রক্রিয়া শুরু হয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথেই। আর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার শুদ্ধিটুকুই শিল্পকলার কাছে প্রাথমিক কাম্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

শিল্পের বিরুদ্ধে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আপত্তিও উত্থাপিত হয়েছে। গোঁড়া বিশুদ্ধবাদীর (Puritan) দল চিরাচরিত নৈতিক আদর্শের

ধুয়ো তুলেছে; রাষ্ট্রকর্ণধারেরা রাষ্ট্রনীতির খাতিরেও বিপদের আশংকা ক'রে শিল্পের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। রাষ্ট্রের কর্তারা সমাজে শৃঙ্খলা রাখতে চান, অন্ততঃপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে। শিল্পের অন্যতম ধর্ম হল শিল্প শিল্পরসিককে শেখায় জীবন এবং জগতকে সম্পূর্ণ নতুন অভাবিত রূপ-কল্পনার মধ্য দিয়ে দেখতে। গোঁড়া বিশুদ্ধবাদীরা এতে আপত্তি জানায় কেন না, এক্ষেত্রে আবেদনটুকু হল ইন্দ্রিয়গত আবেদন। রাষ্ট্রকর্তা আপত্তি করেন চারুশিল্পে কল্পনাশক্তির বিস্তার সাধিত হয় বলে। কবির কল্পনা এমন সব বস্তুর আবিষ্কার করেন যা কখনও জলে স্থলে কোথাও কেউ দেখে নি। বস্তুজগতে যাদের দেখা পাওয়া যায় তাদের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর এই কবি-কল্পনার জগত। কবি হলেন জন্ম থেকেই বিপ্লববাদী; মহাদার্শনিক প্লেতো এই মহাসত্যটুকুকে সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন। লণ্ডন শহরের বস্তির জীবন অথবা শহরের উপকণ্ঠে শহরতলীর মানুষের জীবনের সঙ্গে মহাকবি শেলী-কল্পিত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্যমণ্ডিত আলো ঝলমল জীবনপ্রবাহের কী তুলনা করা যায়? মহাকবি মিল্টন তাঁর বিখ্যাত কাব্যকথার প্রারম্ভে বললেন যে তিনি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বিচারশীলতার ন্যায়নিষ্ঠাটুকু সকলকে প্রত্যক্ষ করাবেন; কিন্তু উপসংহারে তিনি এমন সব জটিল প্রশ্নের অবতারণা করলেন যার ফলে আমাদের সহানুভূতি শয়তানের দিকে প্রধাবিত হল। শিল্পের আবার প্রচারের একটা দিক আছে; Uncle Tom's Cabin-এর মত সদ্‌গ্রন্থ একটি বেগবান আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে। হয়ত একটা পরাধীন জাতিকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তও করে দেয়। কী ভাবে কখন যে শিল্পী তার শিল্পকর্মের মাধ্যমে একটা জাতির আবেগকে কল্পনার স্পর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে, তার ভয়ে রাষ্ট্রকর্তা সদা সন্ত্রস্ত। কেন না এই উদ্দীপ্ত আবেগই চিরাচরিত অভ্যাসের সুদৃঢ় স্তম্ভগুলিকে ধূলিসাৎ করে দেয়, শুভ-বুদ্ধিজাত শৃঙ্খলাবোধ অথবা সুপ্রাচীন সংস্থাগুলির নীতি-শৃঙ্খলকে হঠাৎ শিথিল করে তোলে। রাষ্ট্রকর্তা তার আইনের বেড়া ভেঙ্গে যাবে বলে সঙ্গীতমুখর কবিকে, আবেগময় নাট্যকারকে বড় ভয় করেন। সভ্যতার ইতিহাসে এদের বারবার আবির্ভাব হয়েছে; শাসক এসেছে

নিষেধের দণ্ড তুলে শিল্পীকে শাসন করতে, কেননা শিল্প শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক নয়। তা থেকে রাষ্ট্রনৈতিক বিপদেরও সূচনা হতে পারে।

শিল্পী যখন শুধুমাত্র আপন গন্ধে বিহ্বল কস্তুরী মৃগ মাত্র নয়, তখন সে তার শিল্পকর্মের আত্যন্তিক নৈতিক শক্তিটুকুকে, তার কল্পনা-শক্তির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে না। প্লেতো শিল্পের এই শক্তিটুকুকে, এই কার্যকারিতাটুকুকে স্বীকার করেছিলেন বলে তিনি কেবল সেই কাহিনীগুলিই কবিদের বলতে বললেন, সেই গানগুলিই গায়কদের গাইতে বললেন, যা তাঁর পরিকল্পিত 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র' (Ideal Republic) স্থাপনের অনুকূল। কবি শেলী কাজের স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগমুখর ভাষায় বললেন যে কাব্য হল মনুষ্য-সমাজের আইন-প্রণেতা, যদিও সর্বজনস্বীকৃতির মর্যাদা সে পায় নি। কাব্য মানুষকে বিচলিত করে, তবুও কাব্যে নির্দেশ থাকে না; ন্যায় শাস্ত্রের পৌর্বাপর্য নেই সেখানে, বুদ্ধিজাত কঠোর শৃঙ্খলাবোধের অভাবও হয়ত সে লোকে পরিলক্ষিত হয়। তাকে রূপকথা, অলীক কল্পনা অথবা রূপকের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। যে চিত্তে মালিন্য অপগত হয়েছে সেই চিত্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের ছবি ফুটে ওঠেই তাকে; শিল্পে সত্য করে তুলতে হবে; চারুশিল্প যে সব ছবি, যে সব রূপক নিয়ে কাজ করে তা দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তিকে উদ্বেল করে তুলতে পারা যায়। তাদের কর্মশক্তি নতুন নতুন পথে উৎসারিত হয়ে ওঠে। কবিকল্পনা তাদের যে সব কর্মে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের বিচারশক্তি কখনই সে সব কাজ তাদের করতে বলে না। বিচারশক্তির অনপচয়তার প্রত্যন্ত সম্ভাবনায় শিল্পের নির্দেশনা সুস্পষ্টরূপে নৈতিক শিক্ষকদের ভূমিকা গ্রহণ করে; এই আপাতঃ-অসম্ভব সম্ভব হয় কেন না শিল্পের মধ্যে শিল্পীর কল্পনা শক্তিটুকু থাকার ফলেই শিল্পীর নৈতিক মর্যাদা এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়।

গোঁড়া বিশুদ্ধবাদী শিল্পের নিন্দা করেন কেন না শিল্পের আবেদন হল ইন্দ্রিয়জ; রাজনীতিবিদেরা বারবার শিল্পকলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন কেননা বল্গাছেড়া যে স্বপ্ন শিল্পীরা দেখেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর একটি খুব জোরালো অভিযোগ এসেছে সাধারণ

মানুষের তরফ থেকে; তাঁরা মনে করেন যে শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরস আস্বাদন এই উভয়বিধ কাজই হল নিষ্ফল অবকাশ যাপন মাত্র। কাজের মানুষ যাঁরা তাঁরা শিল্পচর্চাকে বাস্তবের কাছ থেকে পলায়ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। যাঁরা গোষ্ঠীপতি, যাঁরা শিল্পপতি, (Industralist), যাঁরা সংস্থার অধিকর্তা, এঁরা সকলেই শিল্পীকে সন্দেহের চোখে দেখেন, কেননা শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক; শিল্পরসিকও সন্দেহভাজন কেন না তিনি তাঁর আনন্দময় সংবেদনটুকু ছাড়া অন্য কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধুমাত্র গতানুগতিকভাবে কাজকর্মটুকু করলেও এই পৃথিবীতে এতো কাজ করার রয়েছে যে তা বলে শেষ করা যায় না; জীবনের এতো রকমের দাবী এবং এতো রকমের উদ্বেগ তার সঙ্গে জড়িত যে খুব কুশলী এবং শক্তিমান মানুষের প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হয়ে আসে জীবন সংগ্রামে। তাই শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পরস আস্বাদন, এই উভয়বিধ কর্মই অত্যন্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। একটি চতুর্দশপদী কবিতা লেখার চেয়ে একটি শিশুর তত্ত্বাবধান করা অনেক বেশী মূল্যবান বলে মনে হয়। শিল্পরস আস্বাদনের ব্যাপারেও বলা যায় যে জগতের অসংখ্য বাস্তব দৃশ্যাবলী অনেক বেশী সক্রিয় ও প্রাণবান; ক্যানভাসে আঁকা ছবির চেয়ে সে বাস্তব; শিল্পের পটভূমিতে ঘটনা-সন্নিবেশের চেয়ে জীবনের বাস্তব ঘটনার জটিলতা ও আবেগময়তা মানুষকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে। সাধারণ কাজের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য এবং সঙ্গীতে আমরা যা কিছু পাই তা হল বাস্তব জীবনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। উদ্বোধনী ভাষণে এঁরা সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্তুতি করলেও খুঁতখুঁতে এই কাজের মানুষগুলো মনে মনে জানে যে শিল্প হল এক দিক থেকে তুচ্ছ; সেখানে পৌরুষের অভাব রয়ে গেছে।

বিরুদ্ধবাদীদের এই ধরণের অভিযোগের সারমর্ম হল এই যে, চারুকলা আমাদের রুটি বানায় না। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে মানুষ কেবলমাত্র রুটি খেয়ে বাঁচে না। কাজের মানুষ অনুভব করেছেন যে শিল্প শুধুমাত্র একটা জাতির লীলার বহিঃপ্রকাশ। আমরা শিল্পানন্দের আস্বাদন করি সেই আনন্দটুকুই পাবার জন্য। অন্য কোন

উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা এর নেই। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত যে আনন্দ সেইটুকুই আমরা লাভ করি সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে। নীতিবাগিশ সামাজিক অন্যায়ের সংশোধন কর্মে সদাব্যাপৃত। যে সমাজের ব্যবহারে বিকার প্রবেশ করেছে তার নিরাকরণে তিনি সদাযত্নশীল। বাস্তব জগতের বস্তুসম্ভার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবনমানের উন্নয়নই হল কাজের মানুষের লক্ষ্য। তার মনের গহনে যে ছবিটি রয়েছে তাকে বাইরে মেলে ধরবার লীলায় শিল্পী মাতোয়ারা। শিল্প-রসিক তাঁর ইন্দ্রিয় ও কল্পনার সামনে যে বিষয়টুকু রয়েছে তা'তেই মগ্ন হয়ে আনন্দরসের আস্বাদন করেন।

কাজের মানুষের বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে চারুশিল্পের চেয়ে বেশী নিষ্ফল অন্য কিছুর কথা ভাবাই যায় না। বীটোফেনের সোনাটা রচনার সময় যন্ত্রশিল্পের জগতে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বিপ্লব ঘটে যায় নি। সোনাটা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তনও হয়নি। তাঁরা যে সমাজে বাস করেন তারও কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থান্তর ঘটেনি। শিল্পীর আকস্মিক শিল্পসৃষ্টি-কর্ম ঠিক ব্যবহারিক জীবনধারার কর্মকুশলতার মধ্যে আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে না। শিল্পরসিক যে সময়ে রসের আস্বাদন করেন, সেই সময়টুকুতে তিনি জগতের গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।

কিন্তু এই গুরুত্বের প্রশ্নে গোঁড়া বিশুদ্ধবাদী এবং কাজের মানুষের তর্কপন্থায় বোধ হয় কোন ভ্রান্তি ঘটেছে। কেন না বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্প-রসাস্বাদন কর্ম হল সেই নৈতিক জীবনধারারই প্রতীক, যে ভালো জীবনের প্রস্তুতির জন্য নীতিবিদ সদা ব্যগ্র; তার এই নীতি-আশ্রয়ী জীবনায়নই কাজের মানুষের ও সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

এ তত্ত্ব নিরন্তর প্রচার করা হয়েছে যে সমাজে ব্যক্তি মানুষ পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে সেখানে এসব কথার কচকচি অবাস্তর, অতিরিক্ত। পৃথিবী যদি স্বর্গ হতো যদি সেখানে চাইবার আগেই সব কিছু পাওয়া যেতো, তা হ'লে যন্ত্রশিল্প বা ব্যবহারিক জীবন-রীতির কোন প্রয়োজনই থাকত না। আমরা অশুভের মধ্যে, অমঙ্গলের

মধ্যে বাস করি বলেই মঙ্গলের দিকে, কল্যাণের দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আছে। আমরা ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি করি তার কারণ আমরা এমন একটা পরিবেশে জন্মাই যে পরিবেশটুকু ঠিক আমাদের জন্য সৃষ্টি হয়নি; আমরা এই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বড় হই। হোরেস এম্ ক্যালেন উপরোক্ত মতের অনুরূপ মত প্রচার করেছেন। যদি আমাদের জীবনের স্থূল দ্বন্দ্বগুলোর অনায়াস নিষ্পত্তি ঘটে, তা হলে জীবনের কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে? জীবনের স্থূল দ্বন্দ্বগুলোর মতই প্রয়োজনগুলোও যদি মিটিয়ে ফেলা যায়, তা হলে জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে কী? বিশৃঙ্খল-সমাজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের আত্মা কী করে আপনাকে ফিরে পাবে? যখন সে তার বস্তু-জীবনের সর্বগ্রাসী সংঘাত থেকে মুক্তি পায় তখন তার আত্মোপলব্ধির জন্য আত্মবিকাশের জন্য সে কী করবে? যেখানে অবকাশ আছে, সেখানে এই প্রশ্নের সমাধানও রয়েছে। মানুষ যে কাজকে যথার্থ মূল্যবান মনে করে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, তা সে তার এই অবকাশের মুহূর্তে সম্পাদন করতে ভালবাসে। সৎ আচরণ ও সৎ জীবন সম্বন্ধে নীতিবাগিশেরা এতো কথা বলেন অথচ সেগুলিকে কাজে ফুটিয়ে তুলতে তাদের কোন মাথাব্যথাই নেই। এই সৎ-জীবনের মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সকল সম্ভাবনাই বিধৃত। ইন্দ্রিয়জ সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি, আবেগের প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনসিদ্ধি এবং এতদুভয়ের সমন্বয়, মুক্ত চিন্তাক্রিয়াজাত আনন্দ, এ সবই হল ভাগ্যবান মানুষের পরম সাধনার বস্তু। তাঁর জীবনে এদের আবির্ভাব ঘটে এবং অতীতেও ঘটেছে। মানুষ তার সংবেদনশীল সত্তার সমগ্রতাটুকু মাত্র নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে আমরা কখন সক্রিয় আবার কখন বা নিষ্ক্রিয়। যেখানে কিছুই করার নেই সেখানে আমরা কিছু না কিছু করার চেষ্টা করি। তাঁরা তাঁদের শক্তি সামর্থ্যের সীমা লঙ্ঘন না ক'রে যা কিছুই করুন না কেন তার দ্বারা একধরণের শিল্প-সৃষ্টি হয়। তাঁদের কাছে যে কোন ধরনের বস্তুই থাকুক না কেন তারা তাঁদের কণ্ঠস্বর, তাঁদের হাত, তাঁদের মনকে সেই বস্তুগুলি নিয়ে খেলা করতে প্রেরণা দেবে। তার ফলে পিয়ানোবাদকের হাত পিয়ানো বাজিয়ে সুরসৃষ্টি

করবে। তাঁদের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, তাঁরা মুক্ত জীবনের অধিকারী হবেন। এই মুক্তি হল কোন প্রত্যন্ত উদ্দেশ্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ। আপন আপন জীবনে শৃঙ্খলাবোধটুকু আসবে আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

নন্দনতাত্ত্বিক রসের আস্বাদন এবং শিল্প-সৃষ্টিকর্ম এদের দুটিকে আমাদের সভ্যসমাজের কাঠামোর মধ্যে সৎ-জীবনের অগ্রচারী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। আমাদের সমকালীন মানুষদের যে ধরণের আনন্দের আস্বাদন করতে দেখা যায়, ঠিক সেই ধরণের আনন্দের অনুভূতি তাঁরা পান, যাঁরা আপন আপন কর্তব্য আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারেন। দান্তের মহাকাব্য লেখার সময় ভগবান এবং কল্যাণকর্মের মধ্যে কোন পার্থক্যই করেনি তাঁর কবি দৃষ্টি। এমন কি দেবদূতদেরও তিনি কোন কোন কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। যে সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজের কল্পনা তিনি করেছেন সেটা যাদুঘরে রাখা রসিক মানুষের সম্মিলন মাত্র নয়। সে সমাজে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টি কর্মে নিরন্তর আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক সভ্যতায় শিল্পের কাজ হল শিল্পদর্শককে বস্তু-জগতের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তিলাভে সহায়তা করা; শিল্পী আপনার সৃষ্টিকর্মে নিমগ্নচিত্ত হয়ে থাকে। যে সমাজে মানুষের বিচারশক্তিকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে, সেই সমাজের সকল কর্মেই শিল্পের ব্যঞ্জনাটুকু থেকে যায়। সেই সমাজের সকল আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যেই নন্দনতাত্ত্বিক রসের আস্বাদনের আভাস এসে লাগে।

শিল্পের ব্যবহারগত মূল্য নেই, তা একেবারেই অসংলগ্ন; এই ধরণের সব উক্তি একেবারেই অযৌক্তিক। কাজ এবং খেলার মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করে থাকি তা আমাদের অসংলগ্ন সমাজ-জীবনের দ্যোতক; আমাদের অপরিচ্ছন্ন চিন্তার ফল বলেও একে বলা যেতে পারে। বস্তুর শাশ্বত প্রকৃতির মধ্যে এই ধরণের কোন ভেদ করা যায় না। আমাদের সভ্য জীবনের কাজে-কর্মে আনন্দের যে কত অভাব রয়েছে তা সরবে ঘোষণা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক রসের আস্বাদনটুকু একান্তভাবেই অসংলগ্ন এবং তুচ্ছ। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের দুঃখের বোঝা যদিও অনেক বেশী দুঃসহ

ছিল তবুও কারিগরেরা আপন আপন রূপসৃষ্টি-কর্মের মধ্য দিয়ে পেয়েছে আনন্দের আস্বাদন। আজকের মতো যন্ত্রচালনারত সামান্য একটা সংখ্যায় তারা পর্যবসিত হয়নি। অতীতকালে গ্রীস দেশের মানুষেরা আনন্দের জন্যই আনন্দটুকু আহরণ করত; কোন ভবিষ্যতের ভরসায় বর্তমান জীবনের আনন্দকে উপেক্ষা করত না।

শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ, রসিকের শিল্পরসের আস্বানদজাত পুলকটুকু আমাদের সেই মহৎ সত্যটুকুর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছে যে সুস্থ এবং স্বস্থ সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরণের আনন্দরসের আস্বাদন সম্ভব হবে সমাজব্যবস্থার ক্রমোন্নতির জন্য। আজকে আমরা যাকে কাজ বলি, তার চেয়েও ব্যাপকতর অর্থে কাজকে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে তাকে চারু শিল্প আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে সব বস্তুর সৃষ্টিতে আনন্দ পাওয়া যায় সেই সৃষ্টিকর্মে একধরণের সৃজনী শক্তি বিরাজমান; এই সৃষ্টিশক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মনিয়োগের মাধ্যমে যে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তা প্রীতিপ্রদ, তা আনন্দদায়ক। এ ক্ষেত্রে খেলা এবং কাজের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির খেলাকে আর তুচ্ছ বলে ভাববার অবকাশটুকু থাকে না। সৌখীন শিল্পরসিকের নিরাসক্ত আনন্দানুভূতির ও পরিবর্তন ঘটে। কবিতা, ছবি এবং গানে আর শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সৌখীন শিল্পরসিকের অধিকারটুকু থাকবে না। দেশের বুদ্ধিজীবির চোখে বৃহত্তর জনসমাজের অধিকার সূক্ষ্ম শিল্পরসের আস্বাদন ব্যাপারে স্বীকৃত হবে। সভ্যতার মূল্যটুকু মাপা হবে চারুশিল্পের কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে; সভ্যজীবনের অঙ্গ হিসেবে যে সব কর্মপ্রচেষ্টাকে স্বীকার করা হয়ে থাকে তারা কী পরিমাণে নন্দনতাত্ত্বিক গুণৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান, তার উপরে সভ্যতার মূল্যায়নটুকু নির্ভর করবে। সভ্য মানুষের আনন্দে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দরসের প্রশান্তিটুকু যদি খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে সে সভ্যতার যে যথার্থ মূল্য আছে, এই সত্যটুকুকে স্বীকার করতে হবে। কালক্রমে শিল্পীর পরিশীলিত স্বাধীনতার ধারণাটুকুকে সর্বোচ্চ নীতি বলে স্বীকার করা হতে পারে। শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসের আস্বাদন পরম যৌক্তিক ও বুদ্ধি-আশ্রয়ী বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এটুকু যখন সম্ভব হবে তখন জীবনশিল্পকে

চারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে। এই ধরণের সমাজে রাষ্ট্রনীতিবিদেরা মুখ্য শিল্পীর সম্মান লাভ করতে পারে।

সভ্যতার পরিবর্ধনে শিল্পের কী কাজ, এটা আমাদের বুঝতে হবে। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতায় পরাতাত্ত্বিক কোন সত্য উদ্ঘাটিত হয় কী না, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। বস্তু-জগতের অন্তরে কোন সারবত্তা রয়েছে কী না, সত্য বলতে আমরা কী বুঝি, এই সব জিজ্ঞাসা নিয়ে দার্শনিকেরা মেতে রয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে। সত্যের অনুসন্ধান কার্যকে মানুষের অন্যতম মহৎ-কৃতি বলে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে ; মানুষ নিরাসক্ত চিত্তে সত্যানুসন্ধান কর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। এই সত্যানুসন্ধান কর্ম তর্কশাস্ত্র-অন্বিষ্ঠ। বস্তুজগতের অন্তরতম সত্তাটুকুর অনুষ্ঠান-কর্মকে নন্দনতাত্ত্বিক কৃতি বললেও বলা যায়। শিল্প সত্য কোন ঘটনার বিকৃতিমাত্র, আর ঘটনা হল সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ ইন্দ্রিয়োপাত্ত ; চারুশিল্প এই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে অনেক বেশী পরিষ্কার ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে পরিশ্রুত ক'রে তাকে রসিকজনের দরবারে হাজির করে ; এর ফলে এদের সত্তা মহত্তর মর্যাদায় ভূষিত হয়। আলস্য, স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব, এরাই এদের বস্তুর অন্তরের সত্যটুকুকে দেখার পরিপন্থী। আমরা যে জগতে বাস করি তার সব কিছুই অস্পষ্ট ; শিল্পী তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে, ছবির মধ্য দিয়ে, রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ কান খুলে দেন, আমাদের কল্পনাশক্তিকে উর্বর ক'রে তোলেন ; এই অস্পষ্ট বস্তুজগতে আমরা স্পষ্ট করে সত্যটুকুকে দেখতে পাই। খোলা চোখে আমরা বস্তুর অন্তরে যেটুকু সত্য দেখতে পাই, ছবির মধ্যে তার চেয়ে অনেক পরিষ্কারভাবে সত্যের রূপটুকু অবলোকন্ করে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে যে সব মানুষের সংস্পর্শে আসি, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ থেকে যাই, আর উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রকে অনেক সহজে বুঝি কেন না তা অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি-গ্রাহ্য। সত্যকে অনুধাবন করতে হলে পরাবিদ্যাগত কোন বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যে তাকে পাওয়া শক্ত ; শিল্প-কর্মের অবিসংবাদিত সত্তার মধ্যে সেই সত্যটুকুকে অন্বেষণ করতে হবে।

দার্শনিক বের্গসঁ এই সত্যটুকুকে জেনেছিলেন বলেই তিনি বলতে

পেরেছিলেন যে দার্শনিকের বিশ্লেষণের চেয়ে কবির স্বজ্ঞা অনেক সহজে সত্যের অন্তরে প্রবেশ ক'রে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে। ক্রোচে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বলতে পারলেন যে শিল্পের সমগ্র সৃষ্টি-কর্মটুকু একটি কথায় ব্যাখ্যা করা যায়; কথাটি হল Intuition বা স্বজ্ঞা। দার্শনিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় পাতার পর পাতা জুড়ে মানুষের অমৃতত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু তা ততটা বোধগম্য হবে না যতটা বোধগম্য হবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কয়েকটি চরণ পাঠ ক'রে অথবা প্লেতো-কথিত কোন রূপকথা শুনে। সিজানের আঁকা তুষারাবৃত একটি গাছের ছাল আমাদের সজাগ করে তুলবে গাছের সত্তা সম্বন্ধে। এর আগে এমন করে আমরা কখনও একটি গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতোখানি সচেতন হইনি। আমাদের জানাশোনা হাজারো মেয়ের চেয়ে বেশি পরিচিত মনে হয় আনা কারেনিনাকে। বস্তুকে তার ছায়া থেকে পৃথক করে রাখে যে অসামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু তার দেখা আমরা পাই শিল্পের অলৌকিক লোকে।

শিল্প ও মানব-অভিজ্ঞতা

জীবনের সত্যরূপটুকু যা-ই হোক্ না কেন, এ কথা বলা চলে যে জীবন বলতে সাধারণতঃ আমরা মানুষের অভিজ্ঞতাকে বুঝি। আবার এই অভিজ্ঞতার স্বরূপ যেমনই হোক্ না কেন, এ তত্ত্ব অসংশয়িত সত্য যে অভিজ্ঞতা হল কালাশ্রয়ী; অনন্তের বুকে এক নানা রঙের কাহিনী। মানব অভিজ্ঞতা দ্বিবিধ—সরল ও জটিল। শিশুর অভিজ্ঞতা, প্রাকৃত জনের অভিজ্ঞতায় সারল্যের দ্যোতনা, বিষয়ী মানুষের, কবি ও বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতায় অনন্ত জটিলতা। শিশুর অকারণ পুলকে উদ্দেশ্যবিহীন অঙ্গসঞ্চালন, তার ইতস্ততঃ দৃষ্টিবিক্ষেপ হল এই সরল অভিজ্ঞতার নিদর্শন। লক্ষ্যসন্ধানী গোলন্দাজদের সংহত দৃষ্টি ও সংযত দেহচালনা হচ্ছে জটিল অভিজ্ঞতার উদাহরণ। বস্তুর নিরীক্ষা ও পরীক্ষা থেকে শুরু করে আবিষ্কারের স্পৃহা ও চিন্তার সঙ্ঘবদ্ধতা—বাস্তব ও কল্পনা —সবকিছুর মধ্যেই এই অভিজ্ঞতার প্রসার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যে বিস্তার সে বিস্তারে পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনের অনন্ত বৈচিত্র্য; পরিবেশের নিরন্তর আহ্বান ও আমন্ত্রণ এসে পৌঁছুচ্ছে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে, মনের অন্দরমহলের সীমানায়। সে ডাকে সাড়া দেয় মানুষের ইন্দ্রিয় আর নিত্য চলমান মন। ব্যক্তিমানুষটি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে মনে চিন্তার জট বাঁধা হয়। কাজই হোক্ আর চিন্তাই হোক্ তা একদিকে যেমন অকারণ পুলকজাত, অন্যদিকে আবার তা উদ্দেশ্যসঞ্জাতও হতে পারে। অনেকেই আবার একে অভিজ্ঞতার অন্তরালবর্তী বা অভিজ্ঞতা থেকে সুদূর কোন অনুভূতির বিকাশ বা বিভ্রম বলে গণ্য করেছেন। কখন বা আবার এই সত্তার প্রকাশ ঘটে, সন্ধানী মন সন্ধান পায় এই মহা-সত্তার অভিজ্ঞতার চকিত আলোকে। আবার কেউ কেউ এই অভিজ্ঞতাকে বিভ্রান্তিকর বলেছেন; অভিজ্ঞতা হল মায়ামাত্র। একে স্বপ্ন, একে মায়া, একে মতিভ্রম বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রী

এবং কবিরা এমনিধারা অসংখ্য আখ্যায় মানব-অভিজ্ঞতাকে অভিহিত করেছেন।

মানুষের অভিজ্ঞতাকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক্ না কেন, এর সত্যটুকু অনস্বীকার্য; একে অস্বীকার করা যাবে না। অভিজ্ঞতাকে একাভিমুখী এবং কেন্দ্রীভূত ক'রে এর তীব্রতাকে সহজেই বাড়ানো যায়, আবার বিপরীত পন্থায় এর স্বাভাবিক আবেদনকে খর্বও করা সম্ভব। মানব অভিজ্ঞতা পাশবিক বিশৃঙ্খলতায় বিধৃত! অস্পষ্ট এবং শতধাবিভক্ত আবার কখন তা শৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ। তার বিস্তৃতি, তার গভীরতা, তার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা শিল্পের ক্ষেত্রে সম্যক্ পূর্ণতা পায়। শিল্পের জগতে বুদ্ধি মানুষের পরিবেশকে রূপায়িত করে, চেনা জগত নতুন রূপ পায়। শিল্পীর চেতনায় নতুন রূপলোকের সৃষ্টি হয়। মহাদার্শনিক অ্যারিস্ততল বলেছিলেন যে শিল্পে এবং রাজনীতিতে কোন ভেদ নেই; রাজনীতির মতই শিল্পেরও উপজীব্য হল মানুষের সবটুকু অভিজ্ঞতা, রাজনীতির মতই শিল্পেরও রঙ্গভূমি হল জীবনের সবটুকু বিস্তার।

শিল্পের এই সুবিস্তৃত সংজ্ঞার্থ রাজনীতিবিদের পক্ষে একান্তরূপে গ্রাহ্য এবং একে সত্য করে তোলাই তার পরম সাধনা। মানুষের পারিপার্শ্বিকের রূপান্তর সাধনই হল এই জীবনশিল্পায়নের মূল কথা। কিন্তু বাধা এই যে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে সম্যকরূপে জানি না। শিল্পীরাও একেবারে এর ব্যতিক্রম নন। যখন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণাটুকু অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তখন রূপান্তর ঘটাবার প্রয়াসটুকু সাফল্যমণ্ডিত হবে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। তাই জীবন-শিল্পায়ন তথাকথিত শিল্পীর কাজ নয়। গ্যয়টে ও নিউটনের মত সৃজনশীল প্রতিভা এবং আলেকজান্দারের মত মহাবীরের সমন্বয় যদি ঘটানো যায় একটি মানুষের মধ্যে তবেই সেই মহাশিল্পী জীবন-শিল্পায়ন করতে পারবেন, তিনিই পারবেন তাঁর পারিপার্শ্বিকের রূপান্তর সাধন করতে। জীবন শিল্পায়ন ইতিবৃত্ত বা ঘটনামাত্র নয়। তা হল সাধনা, তাকে ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর মতই ভাস্বর করে তোলা যায়।

বস্তুতঃপক্ষে শিল্পী জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকে তার শিল্পের উপজীব্য

রূপে গ্রহণ করে ; অবশ্য শিল্পে সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনাটুকু আভাসিত বা অনুস্যূত হওয়া অসম্ভব নয়। মানুষের অভিজ্ঞতাকে যদি তার বুদ্ধির গ্রন্থনা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, যদি জীবন শিল্প থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়, তা হলে মানুষের সকল অভিজ্ঞতা খেয়ালী মননের অল্পতায় ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তার অর্থ থাকে না। কেননা জগত থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকে না, সে তার লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে। যে শব্দ সঙ্গীত হতে পারত তা কেবলমাত্র অনভিপ্রেত অস্পষ্ট অসংলগ্ন ধ্বনিবিকারে পর্যবসিত হয়। যে আকার, যে রং রূপময় হতে পারত, আনন্দ দিতে পারত রসিকজনকে তা নিরানন্দময় রূপহীনে হয় রূপান্তরিত। যদি বাক্যে কর্মের ইঙ্গিত থাকে, নির্দেশ থাকে নির্দিষ্ট কর্মরূপকে ফুটিয়ে তোলার, তা হলে আংশিকভাবে জীবন তার আপন রূপটুকুকে ফিরে পায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার উপজীব্য হবে এই তত্ত্বকথা—মানবসভ্যতারও একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ রয়েছে। এই রূপসাধনায় আকস্মিকতা থাকলেও তা এর শিল্পমূল্যকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নি।

জীবন যেখানে আপনার রূপটুকু খুঁজে পায় সেখানে সে শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে। সভ্যতা যখন অসংগতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সুসংগত রূপ গ্রহণ করে তখনই তা হয় নন্দনতাত্ত্বিক মর্যাদায় ভাস্বর। যাকে আমরা প্রথা বলি, যাকে বলি আঙ্গিক, তা হল মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি। অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর ওপর আমাদের মননশক্তির কর্তৃত্ব যখন সম্পূর্ণ বজায় থাকে, যখন সে কর্তৃত্বে শৈথিল্য আসে না, তখনই আমাদের অভিজ্ঞতা শিল্পরূপ পায়। আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে আমরা যখন বল্গায়িত করি তখন তার যে সুসংহত রূপটুকু পাই, সে রূপের শিল্পমূল্যও অনস্বীকার্য। যেখানে সংহতি সেখানে রূপ, সেখানেই শিল্পলোক। একটা লাঠিকে ভেঙ্গে দু'খণ্ড করা, মাটির একটি কুঁড়েঘর তৈরী করা, আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়া, মন্দির প্রতিষ্ঠা করা, এসব যেমন শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে ঠিক তেমনি আবার আমরা শিল্পমূল্যকে খুঁজে পাব ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময়-কর্মে, মাঠে বীজবোনার ও শস্যকাটার কাজে, ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাদান কার্যে এবং দেশের ও দশের জন্য আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টায়।

যারা খনিতে কয়লা কাটে, যে তাঁতি তাঁত বোনে, এরা সকলেই শিল্পী বলে বিবেচিত হতে পারে। যাঁরা সুরকার অথবা যাঁরা ভাস্কর্যকর্মে দক্ষ তাঁদের চেয়ে ঐ মুটে-মজুর, ঐ পড়ুয়া শিক্ষকের দল কম বড় শিল্পী নন।

কেবলমাত্র ললিতকলাকেই যে শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়, এটা একেবারেই আকস্মিক কারণবশতঃ। অঙ্কনশিল্পে ও ভাস্কর্যকর্মে, সঙ্গীতে ও কাব্যে, শিল্পবস্তুকে (content) মন সুন্দরভাবে রূপ দেওয়া হয় যে শিল্পকর্মটি আনন্দের আকর হয়ে ওঠে। বুদ্ধির আলোয় শিল্পকর্ম নতুন অর্থে ও ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়, হয় সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী। তাইত এই শিল্পকর্মে রসিকসুজনের জন্যে নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদন ঘটে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই নির্দিষ্ট শিল্পরূপ ব্যতীত অন্য শিল্প-রূপেও রসিকসুজনের আনন্দের আস্বাদন ঘটতে পারে, তবে একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্পকর্ম কেবলমাত্র তখনই আনন্দ দেয় যখন শিল্প-বস্তুকে তার যথাযথ রূপটুকু দেওয়া হয়। যখন গতির একটা লক্ষ্য থাকে, জীবন যখন বুদ্ধি-আশ্রয়ী সংগতির মধ্যে বিধৃত হয়, যখন অসংগতির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও পাই শিল্পানন্দের আস্বাদন। যদি মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে শিল্পকে নির্বাসিত করি, যদি বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার না দিই, তা হলে অবশ্যই মানব-অভিজ্ঞতা তার অর্থ ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। তার মধ্যে কোন সংগতি ও শৃঙ্খলা থাকবে না। তার অন্তরে রূপ ও লক্ষ্যের অসদ্ভাব ঘটবে।

দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের মতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন হল কোলাহল-মুখরিত একটা বৃহৎ বিশৃঙ্খলার প্রকাশ মাত্র; চরম নিষ্ক্রিয়তায় জীবন যে কতখানি পঙ্গু হয়ে রয়েছে, সেটুকু বোঝার মত স্থৈর্যও আমাদের সকল সময়ে থাকে না। জীবনের অভিজ্ঞতাকে দিবাস্বপ্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও যে স্বচ্ছতা, যে পরিচ্ছন্নতা থাকে তার অভাব আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। অবশ্য স্বপ্নের মধ্যে যে অসংলগ্নতা, যে অহেতুক শঙ্কার দেখা আমরা মধ্যে মধ্যে পাই, তার অনেকখানিই আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে খুঁজে পেতে পারি। একটা বিরাট আলস্যের বোঝা মনে হয় জীবনটাকে।

আমাদের চোখ থাকতেও আমরা দেখতে পাই না, কান থাকতেও পাই না শুনতে। আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারে হাজারো আবেদন অপেক্ষমান কিন্তু আমরা দ্বার উন্মুক্ত করি না, ভুলেও সাড়া দিই না এই আহ্বানে। কখন কখন আমাদের মধ্যেকার পশুপ্রবৃত্তিগুলো সাড়া দিয়ে ওঠে পশুজীবনের আকস্মিক কোন ক্ষুধার তাড়নায়। আমরা প্রায় সকলেই এই ধরনের আচ্ছন্ন বুদ্ধি নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করি। সংগীতে যার অধিকার জন্মায়নি তার কাছে যেমন সংগীতের আবেদনটুকু দিবা-স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া স্নায়ুগত উত্তেজনা মাত্র, তেমনি আমাদের অধিকাংশের কাছেই জীবন হল, জীবনের অভিজ্ঞতা হল এই মগ্ন-চৈতন্যের মাঝে স্নায়বিক উত্তেজনার সাময়িক বুদ্‌বুদ্।

এখন এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কেমন করে কোন্ পথে আমাদের এই অভিপ্রেত উদ্দীপনাজাত অনিয়ন্ত্রিত প্রত্যুত্তরটুকুকে শিল্পে রূপান্তরিত করা যেতে পারে? শিল্পী কেমন করে অভিজ্ঞতার অন্তরে শান্তির সঞ্চার করে, স্থিতি ও স্থৈর্যের অনুস্যূতি ঘটায়? কেমন করে সে তার অভিজ্ঞতাকে একই সময়ে অতি-চেনার আবরণমণ্ডিত করে বহুবিচিত্রতার আলোয় রাঙিয়ে তোলে? কী সেই শিল্পীর জাদু যা আমাদের মন টানে, অতি পরিচিত জগতটাকে অতিবিচিত্র করে তোলে? আমরা রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে, স্নান-পান করে ধন্য হই?

সাধারণ অভিজ্ঞতাটুকু যা আমরা আমাদের ব্যবহারগত জীবনে নিত্য পেয়ে থাকি, আমাদের প্রবৃত্তিগত প্রত্যুত্তরটুকু যে অভিজ্ঞতার একমাত্র উপজীব্য, সেই সর্বজনগম্য অভিজ্ঞতা হল নিষ্প্রাণ, তার মধ্যে শান্তভাবের একান্ত অভাব। আমাদের স্বভাব এবং প্রবৃত্তির দাস্যটুকু আমরা এমন নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়েছি যে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য এবং প্রবৃত্তিসমূহের ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য যেটুকু দেখা বা শোনার প্রয়োজন, তার বাইরে আমরা এতটুকু দেখি না বা শুনি না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে আমরা এই ব্যবহারিক জীবনের তাগিদে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিরন্তর ধাবমান। আমাদের বাসনার পরিতৃপ্তি, আমাদের ব্যবহারগত জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তা নিয়েই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করি। বেড়াল দেখলেই যেমন তাকে তাড়া

করে যাওয়া রীতি, তেমনিধারা চেয়ার দেখলেই অফিসের বড়বাবু তার উপর উপবেশন করেন অভ্যাসবশেই। মাংস দেখে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় কুকুরেরা যেমন একইরকম ব্যবহার নিত্য করে, ঠিক তেমনি অভ্যাসের বশবর্তী হলে আমাদের ব্যবহারেও কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে না। আমরা নিত্যব্যবহার্য বস্তু-জগৎটাকে অন্য চোখে দেখতে শিখিনি। জলের-লহর যতই লীলাময় হোক না কেন, তৃষ্ণার্ত মানুষের সেদিকে কোন লক্ষ্য থাকে না। সে চায় গণ্ডূষ ভরে জলটুকু পান করতে। বিষয়ী মানুষ বৈষয়িক উন্নতির আশায় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হয়, বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণায় নব নব ফলাকাঙ্ক্ষা করেন, ক্ষুধার্ত এবং কামাতুর মানুষ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিত্য ছুটোছুটি করছেন। একটা ব্যাপার থেকে অন্য একটা ব্যাপারে কাল থেকে কালান্তরে এই তুচ্ছকে আশ্রয় ক'রে চলছে নিত্য গতায়াত। এঁদের অভিজ্ঞতা স্বল্প এবং ফল শূন্যতা। প্রবৃত্তির কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন পরিতৃপ্তি ছাড়া অন্য দিকে এদের লক্ষ্য নেই। এর বাইরেও যে জীবনের অর্থ ও ব্যঞ্জনা সুব্যাপ্ত, সে তত্ত্বটুকু একেবারেই অনাদৃত এঁদের চোখে। এরা ভুলে যান যে আশু প্রয়োজনের বাইরে যে জগৎ, তার দিকেও চোখ মেলে দেখার প্রয়োজন আছে।

শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য হল আমাদের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতাকে প্রাণময় করে তোলা; এই প্রাণের সঞ্চারটুকু ঘটাতে পারলেই আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী —তা তিনি চিত্রকরই হোন, কবিই হোন, ভাস্করই হোন অথবা স্থপতিই হোন, তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুতে এখন একটু জাদুর ছোঁয়া বুলিয়ে দিতে হয় যার ফলে রসিকসুজন গান শুনে আনন্দ পায়, বোদ্ধা মানুষ ছবি দেখে হয় পুলকিত। মন রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে আনন্দাভিষিক্ত হয়। সে আনন্দ হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ, সে আনন্দ আকস্মিকতার স্পর্শে উদ্বেল, অনিশ্চয়ের ব্যঞ্জনায় উৎসুক। সে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দে ব্যবহারিক জীবনের কোন স্পর্শ থাকে না। আরামকেদারায় শুধুমাত্র বসবার আমন্ত্রণটুকুই এসে পৌঁছয় না, গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে তার রূপ ও রং মনকে টানে; ছবিতে যখন সেই আরামকেদারার রূপটুকু বাঙ্ময়

হয়ে ফুটে ওঠে তখন রসিকসুজন তার মধ্যে প্রাণ প্রত্যক্ষ করেন, সে তখন আর শুধুমাত্র কাঠ আর বেতের সমষ্টিমাত্র নয়। তার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটছে শিল্পীর প্রতিভার জাদুতে। ঐ যে অপস্রিয়মান মানুষটি ওঁকে আমার গোষ্ঠীভুক্ত করতে হবে তা সে যে কোন উপায়েই হোক, অথবা তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে ওকে একেবারেই ভুলে যেতে হবে—এই ধরনের চিন্তা শিল্পীজনোচিত নয়। শিল্পী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিত্রীর অনুরাগ নিয়ে, সে একাগ্র দর্শনে উত্তেজনাও আছে, আর আছে সেই উত্তেজনার শান্তি। এই দেখা শুধুমাত্র ঘটন নয়, এই দেখা কর্মসিদ্ধির কৌশল মাত্র নয়। কাম বা ক্রোধের উদ্রেকও এই দেখায় নেই। এই দেখার মুহূর্তটি সীমাহীন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ও প্রাণময়, সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় বিধৃত। এ দেখা বিমূঢ় চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে থাকা নয়। এ দেখার অর্থ হল বিষয়কে জানা—একে শিল্পী জানছেন সুসম্বদ্ধ প্রাণময় বিষয়রূপে আর এইভাবে দেখছেন বলেই এ দেখায় আনন্দরসের ছোঁয়া এসে লাগে। শিল্পী সুন্দরকে অবলোকন করেন অতি-চেনা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে।

চিত্রীরা বলেন যে ছবিতে কখন কখন নিষ্প্রাণ অংশের দেখা পাওয়া যায়। চিত্রী যখন ঠিক রঙের ব্যবহারটুকু যথাস্থানে করতে পারেন না, তখন দর্শক চিত্রীর রঙের খেলায় আকৃষ্ট হয় না। আবার চিত্রীর চিত্ররূপটুকু যদি অসংলগ্ন হয় তা হলেও চিত্রশিল্পে এই নিষ্প্রাণ অংশের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়ও এই নিষ্প্রাণ অংশের ছড়াছড়ি। শিল্প জীবনের এই নিষ্প্রাণ অংশকে অপসারিত করে। স্থাবর জীবন শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, জীবনকে নতুন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে সামগ্রিক শিল্প (comprehensive art), তাকে নতুন রূপ দেয়; জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও শিল্প-উপজীব্য হয়ে নবতর ঐশ্বর্যে গুণান্বিত ও নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। অপরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটুকু সখ্যতা ও স্নেহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারটুকু এমন সঙ্গত ও সুন্দর করতে হবে যেন উদ্দীপক হিসাবে তা কেবলমাত্র সুন্দরতম প্রতি-ব্যবহারেরই পুরোধা হয়। শিল্পীর বা লেখকের কাছে যথাযথ উদ্দীপক

যেমন শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টিরই সহায়ক হয় তেমনি ধারা আমাদের ব্যবহারও যেন অপরের কাছে সদাচারের উদ্দীপকরূপে কাজ করে। প্রাত্যহিক জীবনে যাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, যাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বোঝা-পড়া করতে হয়, তাদের সঙ্গে এই যোগটুকুকে আমরা কবিতার সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে, চিত্রের সঙ্গে যে সাগ্রহ-সুন্দর যোগটুকু রক্ষা করতে সদা উৎসুক, তার স্বগোত্র মনে করব। যতিহীন শিল্প-সৃষ্টি করা, নিরলস সৌন্দর্য রস আস্বাদন করাই হল জীবনধারণের পরমার্থ। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু করি না কেন তাকেই শিল্পসৌকর্য দিতে হবে, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দরস-টুকুকে খুঁজে পেতে হবে। তবেই জীবনের ধারা হবে সুশৃঙ্খল, স্বতোৎ-সারিত, সুসমঞ্জস ও স্বাধীন।

জীবনের সুসীম গতিচ্ছন্দ যা জীবনকে শিল্প-মর্যাদায় ভাস্বর করে তোলে তা দার্শনিকের কল্পনা ও কবির স্বপ্নবিলাস মাত্র হয়ে রইল। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানিটুকুই বড় হয়ে দেখা দেয় আমাদের জীবনে; স্বাস্থ্যহানি, ক্লান্তি, অবসাদ, দারিদ্র্য, মধ্যবিত্ত-জীবনের দুঃসহ বোঝার ভার—এরা একসঙ্গে উদ্বৃত্ত শক্তিটুকুকে-গ্রাস করে। ক্লেদহীন নির্মল অধ্যাত্মশক্তি নিবীর্য নিশ্চল জড় বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। সূচ্যগ্র বুদ্ধি অপটু অক্ষম শরীরকে আশ্রয় করে থাকে। সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি এই স্থূল জগতটাকে নিয়ে কাজ করে। আমাদের অভিজ্ঞতা-পারাবারের এই নিস্প্রাণ অংশগুলিকে এড়িয়েও চলা যায় না। এই স্থূল, বিশৃঙ্খল জগতটাকে আশ্রয় ক'রে জীবনকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। তাই আমাদেরও এমন সব কাজ করতে হয় যা একান্তই আকস্মিক ও ব্যবহারগত লাভসন্ধানী। কাজের ফাকে ফাঁকে আমরা অবকাশ চাই, এই অবকাশটুকু পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টারও অন্ত নেই। শান্তির আশায় আমরা ছুটোছুটি করে বেড়াই। এর ফলে আমাদের প্রাণশক্তির হানি ঘটে, আমাদের যৌবনের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে। মূঢ় পার্শ্বচরের দল আলাপচারীকে নীরস কথাবার্তায় পর্যবসিত করে। নোংরা পথঘাট, অপরিচ্ছন্ন গৃহ-

পরিবেশ, ক্লান্তিহীন আনন্দ আস্বাদনের অন্তরায় হয়ে ওঠে। জীবনও যে আনন্দ-আকর—এ প্রত্যাশাটুকু স্বপ্নই থেকে যায়।

তাইত শিল্প ও শিল্পরসিক ললিতকলার জগতে পালিয়ে যান এবং এই কারণেই ললিতকলাকে 'জীবন-থেকে পলায়ন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা দুটি বিশেষ অর্থে এই পলায়নকে ব্যাখ্যা করতে পারি। ললিতকলার জগত শিল্পীকে এমন একটা লোকের সন্ধান দেয় যেখানে শিল্পীর যুক্তিগত বা শিল্পকলাকারের আঙ্গিকগত সমস্যা বা অসুবিধা হয়ত কিছু কিছু থাকে কিন্তু সেগুলির সমাধান করা দুঃসাধ্য নয়। গায়ক গণিতবিদের মতই জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করেন সত্য কিন্তু তাঁর শিল্পের জগত দুরধিগম্য নয়। এ জগত বিশাল, এ জগত পরাবিদ্যাগত। এ জগত মুক্তির আলোবাতাসে ভরপূর, এ জগতে গায়কের বুদ্ধি নির্বন্ধ, তাঁর সৃষ্টি শক্তি আপন লীলায় উচ্ছল।

এমন কথা প্রায়ই বলা হয় যে শিল্পীরা ব্যবহারগত জীবনে বড়ই অসহায়বোধ করে থাকেন। ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলিতে শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করবার মত কিছুই থাকে না। শিল্পী-মন এর দ্বারা প্রতিহত হয়। ব্যবহারিক জীবনের বিভ্রান্তিকর স্থূল বৈচিত্র্যে শিল্পীর শিল্পচেতনা দিশেহারা হয়ে পড়ে। শিল্পের সূক্ষ্ম জগতে শিল্পী আপনাকে খুঁজে পায়। ব্যবহারিক জগতে শিল্পকে যেমন অদ্ভুত মনে হয় তেমনি শিল্পীও ব্যবহারিক জগতটাকে নিতান্তই অর্থহীন মনে করেন। মহামূল্যবান শিল্পীমন একটু খুঁতখুঁতে হয়, তাই সে মনের কাছে ব্যবহারিক বস্তু-জগতের স্থূল বৈচিত্র্যটুকু অগ্রাহ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রগত বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে শিল্পীর মানস-সত্তা করবার মত কিছুই খুঁজে পায়না। শিল্পী-মনের কাছে বিভেদ হল অন্তরের দ্যোতক। কবিরা অনেকেই জড় জগতের ঘটনাবর্তকে এড়িয়ে গেছেন কেন না তাঁদের সংবেদনশীল কবিসত্তার সঙ্গে জগতের স্থূলতা ঠিক খাপ খায় নি, তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন, নির্বস্তু শিল্পলোকে রোমান্টিক শিল্পসৌধ রচনা করেছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রথম শ্রেণীর কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই দুচোখ মেলে দেখেছেন, সবটুকুকে গ্রহণ করেছেন নির্বিচারে। আঁদ্রে জিদ বলেছেন যে এরা যেন গুণে গুণে এক এক করে বিশাল

প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়েছেন। রেমব্রাণ্ড ও ডেগাসের মত ভিন্নধর্মী চিত্রীরা জগতকে এবং জীবনকে দেখেছেন তাদের সাক্ষাৎ বাস্তব রূপে, তাদের পীড়াদায়ক অস্তিত্বে। তাঁরা দেখেছেন ক্লান্ত শ্রমিককে, প্রৌঢ়া রমণীকে, তাদের নিরানন্দ অস্তিত্বকে এই ধরনের শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, উজ্জ্বল রঙে ও রেখায় উন্নীত করেন অপূর্ব প্রশান্তির পর্যায়ে। কিন্তু সব শিল্পীই এই অসাধ্য সাধনটুকু করতে পারেন না। এমন অনেক শিল্পী আছেন, যাঁদের সৃষ্টিশক্তির হয়ত ন্যূনতা নেই, কিন্তু সাহসের অভাব রয়ে গেছে তাঁদের মধ্যে। তাঁরা বাস্তব জগতের রূঢ়তাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁরা বস্তু জগত থেকে পালিয়ে গিয়ে রঙ রেখা আলো ও শব্দ দিয়ে গড়া শিল্পের সৌন্দর্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের মূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মহাকবি শেলী এক আদর্শলোকের সন্ধান করলেন। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে সে আদর্শলোক হল প্লেতোনিক এবং গাণিতিক অতিনির্দিষ্টতায় তা হল ক্লাসিক। বধিরতাক্লিষ্ট বীটোফেন নাইনথ্ সিমফনির সুরলহরী মুগ্ধ হয়ে শোনেন, জগতকে দেওয়া তাঁর শেষ সংগীত—যার মধ্যে পরম সৌহার্দ্য ও অসীম আনন্দের বার্তা মূর্ত।

চিত্তের যে ধরনের প্রবণতা থাকলে শিল্পী রোমান্টিক শিল্পী বলে আখ্যা পায়, ঠিক সেই ধরনের প্রবণতাই আবার রসিককে রোমান্টিক শিল্পের রসাস্বাদনে সহায়তা করে। মন্দ স্বাস্থ্য, আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও প্রেমঘটিত ব্যাপারে অনিয়শ্চতার জন্য অনেক রসিকসুজনই জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কাব্যের, সংগীতের ও চিত্রকলার আনন্দদায়ী পরিবেশে আত্মগোপন করে, নেশাখোরের নেশায় যে আনন্দ, রসিকজনের শিল্পানন্দের আস্বাদনেও বুঝি সেই একই ধরণের আনন্দ। দোকানের পসারিণী যে উপন্যাসটি পড়ছে, তার মধ্যেই তার মুক্তি, তার আনন্দ। সেই থেকেই সে পায় রাজকন্যা, জমিদারতনয়া ও চিত্রতারকাদের অমিত ঐশ্বর্যের গৌরবের অংশটুকু, তাদের মতই সৌন্দর্য, সম্পদ ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী তার কাঠের চৌপায়া ছেড়ে রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়ে পড়তে

পারে তার পাঠ্য রোমহর্ষক উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে অবগাহনের সঙ্গে সঙ্গে। সে তখন উপন্যাসের নায়কের মতই শক্তি, বল ও বীর্যের অধিকার পায়, তার দুঃসাহসিকতা তখন উপন্যাসের নায়কের মতই দুর্বার হয়ে পড়ে। মনোরথে তখন তার যাত্রা শুরু হয় দেশ থেকে দেশান্তরে।

আমাদের চারপাশের জগত থেকে পলায়ন করবার মাত্র একটি পথই নেই। উপন্যাস হল মানুষের পলায়নীবৃত্তির একটি সড়ক, এ ছাড়া অন্যান্য পথও রয়েছে। আমরা মনে মনে যে পথে যাবার কল্পনা করেছি অথচ যে পথে যেতে পারিনি সেই পথে আমরা যাত্রা করি কল্পনার রথে চ'ড়ে। যেসব দেশ আমরা দেখিনি, যেসব প্রাসাদের কোন বাস্তব অস্তিত্বও ছিল না, কল্পনায় আমরা সেই দেশভ্রমণে যাই, সেই সব প্রাসাদে অধিষ্ঠান করি। অন্যান্য শিল্পও এই ধরনের পলায়নের সূক্ষ্মতর পন্থা নির্দেশ করেছে। মহাদার্শনিক সোপেনহয়র অতীতে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ঔৎসুক্য হল বৈরাগ্যের নামান্তর; অবশ্য নন্দনতাত্ত্বিক ঔৎসুক্যকে যে ধরনের বৈরাগ্য বলে ভাবা হয় ঠিক সেই ধরনের বৈরাগ্য এ নয়। যে কোন একটি ছবির দিকে তাকালে সাময়িকভাবে আমরা যে আমাদের স্বভাবের হাত থেকে মুক্তি পাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য। সেই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃপক্ষে আমরা ছবিটা দেখি শুধুমাত্র ছবিটিকে দেখার জন্যই। ছবিটা দিয়ে কী কাজ হতে পারে, আমার ব্যবহারগত জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধির কতখানি সহায়তা হবে ছবিটা দিয়ে, এসব কথা ভাবি না। ছবিতে আঁকা আপেলের বর্ণ-সুষমার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি, দুচোখ ভরে তার রূপ দেখি, ক্ষুন্নিবৃত্তি করার কথাটা মনে আসে না। আমাদের ব্যবহারিক লোলুপ দৃষ্টিটার জায়গায় শান্তবৈরাগী নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টির আবির্ভাব ঘটে। দার্শনিক সোপেনহয়রের ভাষায় বলি, জ্ঞান ক্ষণিকের জন্য অবাধ ইচ্ছাটাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কীভাবে রোমান্টিক নৈরাশ্যবাদ ও রোমান্টিক নন্দনতাত্ত্বিকতা যুক্ত হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে। মানুষের লোলুপ ইচ্ছাশক্তি তার আপন পূর্ণতা পেলো না, শান্তি পেলো না তার চারপাশের জগতে। বিধাতা বোধ হয় তার পরিবেশকে এমনি ব্যর্থ করেই গড়েছিলেন।

খণ্ডিত জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পর অসম্পৃক্ত, তাদের কোন অর্থই বোধগম্য হয় না। এই জীবনের খণ্ড অংশগুলির মাঝে দাঁড়িয়ে হয়ত এমন একটু অবকাশ পাওয়া যায় যা আলো দিয়ে, রঙ দিয়ে গান দিয়ে ভরা। পেটার তাঁর The Renaissance-এর উপসংহারে এই ধরনের এক চিত্তহারী অবকাশের কথা বলেছেন। আমাদের বুদ্ধি যখন পরাস্ত হয়, অনুভূতি যখন তল পায় না তখন এপিকিউরীয় আনন্দলোকে আমরা আশ্রয় খুঁজি। আমরা যতক্ষণ নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে এই আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকতে পারি, ততক্ষণ জীবনটা কুসুমাস্তীর্ণ বলে প্রতীতি হয়, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাই। দ্বিতীয় রিচার্ডের মত অপ্রীতিকর অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সুরের জগতে আশ্রয় নিই। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করি তখনি যখন মর্মরে গাঁথা শিল্পরূপের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই, চিত্রীর সৃষ্টি একটি সুন্দর মুখকে নিরীক্ষণ করি অথবা দেওয়ালের গায়ে প্রলম্বিত অস্পষ্ট মায়াচ্ছন্ন ছায়াগুলোকে বসে বসে দেখি। সঙ্গীতে মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। আবার সাহিত্যে মানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হই, অনুভব করি তার মনোহারী স্পর্শের প্রভাব। দ্রষ্টার চোখে সুন্দর অপূর্বরূপে ঝলমল করে ওঠে, তার মনে শান্তভাবের সঞ্চার হয়। একটা নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের আবেগে সে তার পারিপার্শ্বিকের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। আমাদের ব্যবহারগত জীবনের জন্য বিশেষ কোন আকর্ষণ ললিতকলার নেই, তার লক্ষ্য হল বস্তুজগতের অন্তরশায়ী মৌল সত্তাটুকুকে সকলের সামনে মেলে ধরা। যে দ্রষ্টা শিল্পকর্মকে যথাযথ অবলোকন করেন তিনি তখনকার মত আত্মবিস্মৃত হন; আপনার চেতনা, মন এবং আত্মা সম্বন্ধেও তিনি পরম উদাসীন। তখন তিনি শিল্পলোককে আপনার আয়ত্তে পেয়েছেন। ভাবেই তাঁর পরম পরিতুষ্টি।

এই তত্ত্ব তাঁদের কাছে গ্রাহ্য যাঁরা মননধর্মের সঙ্গে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে একটা স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে যুক্ত করেছেন। সৌন্দর্যের পূজারীরা যেন বিষাদমগ্ন মন নিয়ে ধূসর, রহস্যময় বিলীয়মান এক জগতে অরূপের সন্ধানে সঞ্চরমান। এই জগতের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য নেই। ঈশ্বর-সন্ধানী ছুটে যান মরুভূমির নির্জনতায়, নন্দনতাত্ত্বিক আশ্রয় নেন

গজদন্ত-মিনারের সুউচ্চ চূড়ায়। এঁদের মূলমন্ত্র হচ্ছে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' তাই তাঁরা আপন মনের প্রশান্তিটুকু খুঁজে পান আপনার শিল্পরূপের মধ্যে যেমন করে ভক্ত আপনার মানসিক শান্তিটুকু ফিরে পান ভগবানের সান্নিধ্যে।

পলায়নের তত্ত্ব দিয়ে শিল্পরূপের এই যে ব্যাখ্যা এটি কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার সবটুকুকে প্রতিভাত করতে পারে না। শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্প-রস আস্বাদনের অনন্ত বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব বরঞ্চ ব্যঙ্গ বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যেমন;মানুষকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে তার অর্থনৈতিক সত্তায় শুধুমাত্র রূপান্তরিত করা হয়েছিল ঠিক তেমনি এই তত্ত্ব মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক সত্তাটুকুকে বিচ্ছিন্ন এবং একান্ত করে বিচার করেছে। আমরা সব সময়ে ত' আর শিল্পরূপে মগ্ন হয়ে থাকি না। শিল্পের সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা যখন ডুবে যাই তখন চেনা জগতটাকে, আমাদের ব্যক্তিসত্তাটাকে আমরা বিসর্জন দিয়ে বসি সাময়িকভাবে; শিল্প-রস আস্বাদনের সময় এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি অনিবার্য। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার, যে চোখ শিল্পরূপ দেখে তা হল একটি ব্যক্তিমানুষের চোখ—সে চোখের আলোয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে তার অনন্ত প্রত্যয় প্রতিফলিত; সীমাহীন ঔৎসুক্য এবং অন্তহীন অনুভূতির ছায়া তার মধ্যে নিত্যনিয়ত ভাসমান। যে কান সঙ্গীত শুনছে সে কানের শব্দানুষঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা আছে, শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে, সে কান সচেতন। অবশ্য অনেকের কাছেই শিল্প হল সৌন্দর্যলোকে, কল্পনার রূপলোকে পলায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। জাগতিক দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তা থেকে তারা মুক্তি পান শিল্প-স্বর্গের পরম প্রশান্তির মধ্যে।

গতানুগতিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ ক'রে আমরা শিল্পসম্বন্ধীয় এই পলায়নী তত্ত্বটুকুকে ব্যাখ্যা করতে পারি; 'The Birth of Tragedy' গ্রন্থে দার্শনিক নীৎসে গ্রীক ট্রাজেডি তথা সাধারণভাবে সকল ললিত-কলার আপাতঃবিরোধী উপাদানগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ্যাপোলোনিয় ও ডায়োনিজিয় এই দ্বিবিধ উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এ্যাপোলোনিয় উপাদানই গ্রীক ট্রাজেডির প্রাণশক্তির উৎস। চারু-

শিল্প শুধুমাত্র শান্তি আর স্থৈর্যের উৎসই নয়, চারুকলা অগ্নিস্রাবীও হয়ে উঠতে পারে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর নাগপাশে বাঁধা যে মন দ্বিধাগ্রস্ত ও নিরুৎসাহ, সেই মনই শিল্প-রসাস্বাদনের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে প্রজ্জ্বলিত উৎসাহে অগ্নিময় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক সুরস্রষ্টা ভাগনারের সঙ্গীতে দার্শনিক নীৎসে এই ডায়োনিজির উপাদানের আধিক্য লক্ষ্য করেছিলেন। ভাগনারের সঙ্গীতের এই উপাদানটুকু নীৎসকে সমধিক পরিমাণ আকৃষ্ট করেছিল। আনাতোল ফ্রাঁসের মতে সাহিত্য হল আধুনিক জগতের মানুষের কাছে অহিফেন মাত্র। অবশ্য এ কথা সঙ্গীতের সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য। যে কোন প্রেক্ষাগৃহে একতান সঙ্গীতের সময় সমবেত শ্রোতাদের মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তাদের অবরুদ্ধ অনুভূতি সঙ্গীত রসধারার মধ্যে যেন মুক্তি পায়। সঙ্গীতের ভাষায় যে কথা বলা হচ্ছে সে কথা যেন তাদের নিজেরই কথা, এ যেন সেই সব কথা যা তারা সাধারণ ব্যবহারিক ভাষায় জনসমাজে বলতে লজ্জা পেতো। ভাষার অপ্রকট অবরুদ্ধ ভাব সঙ্গীতকে আশ্রয় করে অন্তরে উদ্বেল হয়।

আমাদের প্রবৃত্তিগত উন্মাদনার প্রকাশই যে কেবল শিল্পে ঘটে তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের স্থূল দাবী নিরন্তর মেটাতে গিয়ে আমরা অনুভূতির সূক্ষ্ম তারতম্য লক্ষ্য করি না। মনোজগতের বহু সূক্ষ্মতর চিন্তন প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করি। এই সব সূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির কথা আবার আমাদের ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্থূল পরিবেশে এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চিন্তার স্থানও হয় না, তাই এরা শিল্পের জগতে আপনার স্থান করে নেয়। তাই দ্রষ্টার দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিল্পে জীবন থেকে একান্ত পলায়নটুকুই বুঝি বড়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প জীবনকে সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। শিল্প জীবনকে করে উজ্জীবিত।

প্রথমেই উজ্জীবনের কথা বলি, প্রাণিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় হল তার পরিবেশের অবদান। এই পারিপার্শ্বিক অনন্ত পরিবর্তনশীল ও বিপদসঙ্কুল। কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর

প্রাণীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই তত্ত্বটুকুই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে নিয়ত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে ধীরে ধীরে তার ইন্দ্রিয়গুলি পরিস্ফুট হয়েছে, সক্রিয় হয়েছে বিপদসঙ্কুল পরিবেশের তাড়নায়। আলোয় সংবেদনশীল রঞ্জিত নেত্র-বিন্দুই ক্রমে নেত্রযুগলের সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে জন্তু-জানোয়ারেরা দূরাশ্রিত বিপদকে এড়িয়ে গেছে, আবার লোভনীয় বস্তু-লাভ, অভিপ্রেত লক্ষ্য সিদ্ধির সহায়তা করেছে প্রাণীর এই নেত্রদুটি। তেমনিধারা প্রাণীর কর্মপদ্ধতিও বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বর্তমান রূপটুকু পেয়েছে। আদিতে জন্তুজানোয়ারেরা যে যন্ত্রটির সাহায্যে শুধুমাত্র বিপদের সংকেত ও লোভনীয় বস্তুর আমন্ত্রণটুকু বুঝতে পারত কালক্রমে তা-ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। পশুর আদিম স্থূল ঘ্রাণশক্তি আদিতে শুধুমাত্র বিপদের কথা, খাদ্যের গোপন অবস্থিতি, লোভনীয় বস্তুর ইশারাটুকুই বহন করত। স্বাদ কেবলমাত্র বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে প্রভেদটুকু করতে পারত। স্পর্শও প্রাণিজগতের ইতিহাসের আদিতে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও প্রজননের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এ-কথা বলা চলে যে সৃষ্টির আদিতে প্রাণীদের ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যবহারগত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত ছিল। নন্দনতাত্ত্বিক কোন মুল্য-বোধের প্রেরণায় এদের সৃষ্টি হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োজন ব্যবহারগত; এক ধরনের সৃষ্টিহীনতা স্বভাবতই আমাদের সকলকেই গ্রাস করেছে; এই অন্ধতা হল প্রবৃত্তিজাত; আমাদের শুধু প্রয়োজনটুকু মেটানো ছাড়া অন্য কোনদিকে আমাদের লক্ষ্য নেই।

শিল্পকর্মের শিল্পমুল্য অথবা শিল্পীর কৃতিত্ব আমরা তখনই স্বীকার করি যখন শিল্পকর্ম আপনার বিষয়বস্তুটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারবে। আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বাহী আবেদনে সাড়া দেবে। ষ্টিফেন ক্রেন একটি গল্প বলেছেন—বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হয়ে তিনটি লোক একটি ছোট নৌকায় ভেসে যাচ্ছে। তারা উপরের উন্মুক্ত দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশের রঙটুকুও দেখবার অবকাশ

পায়নি, তা দেখার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ তাদের ছিল না। আত্মরক্ষার তাগিদে তারা শুধু সম্ভাব্য ত্রাণকর্তাকেই খুঁজেছে।

শিল্পরস আস্বাদনের সময়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তুলি সাময়িকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে নিরুদ্ধ করে দিয়ে। আমরা পটে আঁকা ছবি দেখে, বেহালার মধুর তান অথবা সুরেলা কণ্ঠে গান শুনে আনন্দরসে ডুবে যাই। দর্শন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শপ্রমুখ অন্য তিনটি ইন্দ্রিয় নন্দনতাত্ত্বিক রস-আস্বাদনে আমাদের সাহায্য করে না, প্রাণধারণের ব্যাপারে তাদের উপযোগিতা সমধিক। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের জগতেই শিল্পকলার রস-আবেদনটুকু সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা বস্তুর রঙকে সব সময়েই উপেক্ষা করি; কিন্তু চিত্রীর কাছে সেই রঙের আবেদনটাই সবচেয়ে বড়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক জীবনে এবং ভাবের আদান-প্রদানে সঙ্গীতের স্বরসংগতি ও ছন্দোলয় না ব্যবহার-যোগ্য না বা মূল্যবান। গায়ক এবং গীত-রসিকের কাছে কিন্তু তা বহুমূল্য সামগ্রী, বহু সাধনার ধন। সেখানে ইন্দ্রিয়গত সংবেদন আর শুধুমাত্র কাজ করার নির্দেশটুকু দেয় না, সেই সংবেদন তখন অনন্ত আনন্দ রস আস্বাদনের সহায় হয়।

এইভাবে বিচার করলে বলা চলে যে শিল্পের প্রত্যন্ত আবেদন, শিল্পের মৌলভিত্তি হল সংবেদন-গত। বস্তুর বহিরঙ্গ রূপটুকু শিল্পে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়, তা হয় পরম সন্তোষের আকর। শিল্পীর আঁকা স্থিরচিত্তে স্থাবর বস্তুর রূপটুকু ফোটে তার অঙ্কনশক্তির প্রসাদগুণে; ছবিতে আঁকা ফলের ক্ষেত্রে নীলচে, সবুজ ও বেগুনির বর্ণবাহারই আমাদের আকর্ষণের প্রকৃত উৎস। আমরা ইন্দ্রিয় সংবেদনের আহ্বানে সাড়া দিই। যে সব নীতিবাগিশেরা উন্নাসিক হয়ে শিল্পকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভ্রান্তি' বলে পরিহাস করেছেন, তাঁরা কিন্তু নিন্দার আবরণে সত্যকেই ব্যক্ত করেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছকে বাঁধা মানুষ আপনার দৃষ্টিশক্তির সজীবতাটুকু, তীক্ষ্ণতাটুকু ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে; সেই হারানো সম্পদ আবার ফিরে আসে ছবির রঙ দেখতে দেখতে। গান শুনতে শুনতে কাণও তার লুপ্ত শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতাটুকু ফিরে পায়।

ছবিতে যে রঙ, যে রূপ শিল্পী অনুস্যূত করে দিয়েছে, গানে যে সুরবাহার ঝলমল করছে তা কেবল রসিকজনের চোখ দেখে নেয়, কাণ নির্দিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে। তারা শিল্প-সম্ভাবনাকে দেখে না। শিল্পকারকে প্রত্যক্ষ করে মাত্র।

আমাদের সংবেদনকে শুধুমাত্র তীব্রতর ও তীক্ষ্ণতর করাই শিল্পের কাজ নয়। তার কাজ আরো ব্যাপক। আমাদের জীবনের দৈনন্দিনতায় আমরা অনুরূপ পরিবেশের একই রকম অভিজ্ঞতা লাভ করি; আমাদের অনুভূতির প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়ে থাকে। এই পুনরাবৃত্তি আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিষ্প্রভ করে দেয়, আমাদের অনুভূতিকে ম্লান করে তোলে। উপন্যাস এবং নাটকের সুকৌশল শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের অনুভূতিগুলো আবার জেগে ওঠে। এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, জীবন-মৃত্যুর সংঘাত, প্রেমের অভিঘাত যে সংকট আনে তা যে কোন শিল্পের আবেদনের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, অনেক বেশী তীব্র। এ কথা সত্যি কিন্তু জীবনে এই ধরনের সংকটও সব সময়ে আসে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ধরনের অনুভূতির দেখা পাই তা ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যবর্জিত। অতি পরিচিত মানব অভিজ্ঞতায় যে ধরনের অনুভূতির প্রাধান্য দেখা যায় তার চেয়ে গভীরতর, স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা হ্যমলেটের মত ট্র্যাজেডির সংঘাতে অথবা আনা কারেনিনা প্রমুখ উপন্যাসের রসঘন কাহিনীতে লভ্য। অধিকাংশ মানুষ সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে যে তাদের আদিম অনুভূতি কোন্‌গুলো, তাদের প্রকৃতিই বা কী এ সম্বন্ধে জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তারা যা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করে সাহিত্য থেকে। আকারগত বিচারজ্ঞানের কাছে যে সব ভাব-অনুভাব ক্ষীণ এবং প্রাণহীন, তাকেই যখন কাব্য অথবা নাটকের উপজীব্য হিসেবে দেখি, তখন তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত বলে মনে হয়, অন্তরঙ্গতায় তা রঙীন হয়ে ওঠে। শেলীর রাজনৈতিক কবিতা প'ড়ে যাঁরা অগ্নিশিখার মত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন তাঁরাই হয়ত গড্‌উইনের Political Justice পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। অ্যারিস্ততল কথিত বন্ধুত্ব বন্ধনের সূত্রাবলী যাঁরা নিস্পৃহভাবে

পড়েন তাঁরাই হয়ত প্লেতোর সখ্যতা সম্পর্কিত পরম রমণীয় কথোপকথনগুলি পড়তে পড়তে অনুভূতির আবেগে হন উদ্দীপ্ত।

উপরে আমরা চারুকলার দ্বিতীয় যে কাজটির কথা বলেছি তা হল আমাদের অভিজ্ঞতাকে চারুকলা অনেক পরিষ্কার ক'রে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। এ কথা ইন্দ্রিয়গত পর্যায়ে যেমন সত্য তেমনি সত্য চিন্তা ও মননের জগতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে গতানুগতিক ছাঁচে ঢালাই করে দেয় একদিক থেকে আমাদের আবেগ-উত্তেজনা আর অন্যদিক থেকে আমাদের পরিবেশের গুরুভার। বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা স্বরূপে যে কী ছিল তা আমরা ভুলে যাই। টুকরো টুকরো রূপ আর রঙে গড়া হল আমাদের এই অভিজ্ঞতা, ক্ষণিক মুহূর্ত জুড়ে এর ব্যাপ্তি, তার পরেই ঘটনাপ্রবাহে হয় এর আত্মবিসর্জন। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের চেনা জগত এই অনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে রূপ দেয়। যদি কোন পূর্বনির্দিষ্ট ছক দিয়ে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণের রীতি অমাদের মধ্যে প্রচলিত না থাকত তাহলে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমাদের দেখা অস্পষ্ট রূপ ক্রমেক্রমে সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যে পরিণত হয়। আমাদের মনে যেসব ছাপ পড়ে তাদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু সংগতি এবং রূপের আভাস সকল সময়ই খুঁজে পাই। আমাদের স্বভাব এবং আমাদের প্রবৃত্তির পথ বেয়েই জীবনধারা প্রবাহিত হয়। আমাদের আচরণের শত অসংগতির মধ্যেও একধরনের সংগতি থেকে যায়। এমন কী নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বা অর্ধ-অচেতন অবস্থায়ও পূর্ণ বিশৃঙ্খলা সম্ভব নয়।

শিল্পকর্মে আমাদের সংবেদনগুলি একটি বিশেষ ধরনে, একটি বিশেষ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গভীরতর এবং সমৃদ্ধতর ব্যঞ্জনায় সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদের আবেগগুলিকে দৃঢ়তর পারম্পর্যে ও বৃহত্তর বিস্তৃতিতে বিধৃত করে। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণত এটি করা সম্ভব নয়। আমার সব সুখকর দিবাস্বপ্ন কল্পনার আকাশে পাখা মেলে ; এ সবই শিল্পের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়, এর মধ্যেই পায় একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য পারম্পর্যের বিকশিত রূপ।

উদাহরণের সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা করি। যাঁরা স্থির চিত্র

আঁকেন না, এমন অনেক চিত্রকরই ফলের ঝুড়িতে ফল সাজান দেখেছেন বহুবার। কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের টুকরো টুকরো অসংলগ্ন সংবেদনগুলিকে যুক্ত ক'রে একটি সুসম্বদ্ধ সংযত সুন্দর ছবি এঁকে ফেলা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে কাজটুকু কেবল পারেন সিজান বা ভারমিআরের মত শিল্পরা। প্রায় সকলেই আমরা অন্ধ অহংকারের প্রমত্ততা অনুভব করেছি কখন কখন; প্রেম-ভালবাসা আমাদের মধ্যে যে অধিকারের প্রবৃত্তিটুকু জাগায় তার অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। এই অহংকারের অন্ধ প্রমত্ততার বিষময় ফলটুকু পরিষ্কার ক'রে দেখানোর জন্য সোফোক্লিসের মত প্রতিভাধর নাট্যকারের ঈডিপাস নাটক লেখার প্রয়োজন হয়। আর প্রেমজাত অধিকার বোধের বিয়োগান্ত পরিণতিটুকু বোঝানোর জন্য সেক্ষপীয়রের মত অসীম প্রতিভাধর নাট্যকারকে 'ওথেলো' নাটক রচনা করতে হয়। জীবনে কখন না কখন মূঢ় অতি সাধারণ মানুষও জীবনের পরম বেদনাদায়ক নিষ্ফলতা নিয়ে চিন্তা করেন; কখন বা প্রকৃতির সুন্দর শুভ্র, কল্যাণময় রূপটুকুর কথাও ভাবেন। কিন্তু সংগতিপূর্ণ চিন্তাসূত্রে এই সব ভাবনা চিন্তাকে তাঁরা দৃঢ়নিবদ্ধ রূপ দেন না। কিন্তু লুক্রেলাটিয়সের মত কবি এই সব অনতিনির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবনা চিন্তাকে সুসমন্বিত অন্তর্দৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দান্তে আবার অপূর্ব ঐশ্বর্যময় জীবন ও অদৃষ্টের বৃহৎ পটভূমিতে এই সব বিচ্ছিন্ন মননকর্মকে নির্দিষ্ট শিল্পরূপ দিয়েছেন। নানাবর্ণের বহু বিচিত্র সংবেদন লহরী এইভাবে ধরা পড়ে রূপকল্পের অতিনির্দিষ্টতায়। যে ভাব অস্পষ্ট, অনুক্ত ছিল তা কাব্যের, নাটকের অথবা উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে নির্দিষ্ট রূপ পায়। যে স্বপ্নের মেঘ মনের আকাশে ভেসে বেড়ায় তাকেই সঙ্গীতে অথবা সাহিত্যের মধ্যে ধ'রে দিয়ে শিল্পী দেন অমরত্বের মহিমা।

তা হলে বলা যায় যে এক অর্থে শিল্প হল বস্তুর ভাবরূপ; বস্তুবাদী শিল্প বা রিয়ালিষ্টিক আর্ট সম্বন্ধেও একথা সত্যি। কেন না জীবনের কোন অভিজ্ঞতার মধ্যেই শিল্পকর্মে অনুসৃত কায়েমী শৃঙ্খলাটুকু, তার পরিকল্পনাটুকু, তার সুসমন্বিত রূপটুকু আমরা পাবো না। প্রকৃতির বিরাট সাজঘরে ক্ষণিকের দেখা ছকটি কখনই শিল্পীর আঁকা ছবির চিরায়তা লাভ করে না। জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার আকস্মিকতা কখনই নাটকের

সুপরিকল্পিত সুসন্নিবিষ্ট ঘটনার মর্যাদাটুকু পায় না। বস্তুর আদর্শায়িত ভাবরূপই হল শিল্প এবং এই শিল্প প্রকৃতির সামনে একটি মুকুর তুলে ধরে রাখে—সেই মুকুর যার মধ্যে বস্তুর রূপটুকু অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। সুকল্পিত কৌশলের সহায়তায় শিল্পী প্রকৃতির অন্তরশায়ী ঐশ্বর্যটুকু আমাদের দেখান, জীবনের অন্তর্গূঢ় ভাবটুকুর অনুভব সম্ভব করেন, মননকর্মের নিগূঢ় সূত্রটিকে আমাদের চিন্তায় বিধৃত ক'রে তোলেন।

জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। মনস্তাত্ত্বিক এবং তর্কশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বলে থাকেন যে সংবেদনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে অবধারণ ও অনুমান; আমরা বাঁধাকপি অথবা রাজামশাই এদের কাউকেই দেখি না। যে অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট সংবেদনটুকু পাই তার ব্যাখ্যা আমরা করে থাকি। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের স্বভাব এরাই একধরনের শিল্পী। বাইরের জগতের বস্তুগুলিকে শুধুমাত্র 'সংবেদন' ভাবার পথে এরাই পরিপন্থী, এরা বস্তুকে রূপ দেয়, অর্থ দেয়। আমাদের বুদ্ধি যে রীতিতে সংবেদন লহরীকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়, শিল্প জোর দেয় সেই রীতিটুকুর উপরেই। শিল্পীর ক্যান্‌ভাসের উপর ছড়িয়ে দেওয়া টুকরো টুকরো রঙের পোঁচ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ছবির মধ্যে বিধৃত হয়, তা হয়ত কোন একটি মুখের ছবি। সে মুখ হয়ত কোন নিবিড় অনুভূতিজাত ব্যর্থতায় করুণ। উপন্যাসে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে তা কোন একটি অভিজ্ঞতার কথা, কোন একটি মানুষের জীবন কাহিনী অথবা নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতির ফলশ্রুতি।

এইসব চারুকলাই জীবনের ব্যাখ্যা করে, কেউ বা বেশী, কেউ বা কম। চিত্রীর সুশৃঙ্খল কল্পনাশক্তির কাছে যে অর্থে ঐ ফলের ঝুড়িটা আবির্ভূত হয় ঠিক সেই অর্থটুকুই ছবিতে ফুটে ওঠে। শিল্পী সংবেদনগুলির অর্থ বলে দেয় তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার মানুষের অস্পষ্ট অনুভূতির ব্যাখ্যা এবং এইভাবে তাদের আবেগনিরুদ্ধমনের ভার লাঘব করা শিল্পের অন্যতম কর্ম। Hamlet, War and Peace প্রমুখ উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মে আমরা এই ধরনের ব্যাখ্যা পাই। সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্বটুকুর গূঢ়ার্থ মানুষের প্রকৃতি, তার প্রগতি এবং ভাগ্য, এ সবের

ব্যাখ্যা আমরা Divine Comedy বা গ্যয়টের Faust-এর মধ্যে পাই। ম্যাথু আর্নল্ড যখন কাব্যকে জীবনের সমালোচনারূপে ব্যাখ্যা করলেন তখন সেই ব্যাখ্যা সমগ্র শিল্পজগত সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারত। কেননা 'সমালোচনা' বলতে আমরা জীবনের যে কোন খণ্ডাংশ সম্বন্ধে যথাযথ মূল্যায়ন অথবা তার ব্যাখ্যাটুকু বুঝি; অবশ্য সাহিত্যে জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা থাকে। Rodin অথবা Michaelangelo-র গড়া মূর্তি Beethoven অথবা Debussy-র সৃষ্ট সঙ্গীত তার সামগ্রিক মৌল ধর্মে, তাদের যতি, তাদের গতি, তাদের প্রকৃতিগত আপন আপন মাধুর্যে মানব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করে। Beethoven-এর Fifth Symphony-তে আমরা শুধুমাত্র কতকগুলি শব্দের সমষ্টিকে পাই না, তদতিরিক্ত কিছু সেই সঙ্গীতের প্রাণ। একটি মহৎ প্রাণ জগতকে এই সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাও করেছেন। শিল্পী Rembrandt-এর আঁকা Old Rabbis-এর ছবিতে অথবা El Grece-র আঁকা ছবিতে আমরা খালি চোখে যা দেখতে পাই, তদতিরিক্ত কোন নিগূঢ় অর্থ এদের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইসব শিল্পকর্মের যাঁরা জনক তাঁরা তাঁদের জীবন-ধারণাকে, জীবনের নিহিতার্থটুকুকে আপন শিল্পকর্মে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁরা শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখেননি বা কান দিয়ে শোনেননি। এইসব শিল্পের ভাষা জীবনের গভীরতর অর্থটুকু বহন করে এনেছে রসিক মানুষের কাছে।

অভিজ্ঞতাকে উজ্জীবিত করে তোলা, তাকে উজ্জ্বল করে তোলা এবং তার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা—এই তিনটি হল শিল্পের কাজ। বিভিন্ন চারুশিল্প বিভিন্ন পর্যায়ে এই কাজটুকু করে থাকে; অনেকের কাছে শিল্প শুধুমাত্র স্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও তদ্‌জাত আনন্দই হল শিল্পানন্দ। অনেকের চোখে শিল্প হল সেই ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে মানুষের আত্মা জীবনের গূঢ়ার্থটুকু উপলব্ধি করে। আবার অনেকের মতে মানব অভিজ্ঞতার সামগ্রিক মহৎ রূপটুকু শিল্পের মাধ্যমেই বাহিত হয়। সেই বাহন আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, আবেগকে প্রাণবান করে। যে শিল্প খণ্ডশিল্প তা জীবনের লক্ষ্যকে নির্দেশ করে; মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই সেই লক্ষ্যাভিমুখী, বাইরের রূঢ় বাস্তবলোকও অন্তরের

বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত আবেগের জগতের মতই সেই লক্ষ্যানুসারী। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর শিল্পপ্রকরণ যেমন আনন্দ দেয় ঠিক তেমনি রসস্রাবী হল পূর্ণাঙ্গ শিল্প স্বষ্টিটুকু। আবার শিল্প কখন কখন আমাদের যে আনন্দের আস্বাদন দেয়, সেই আনন্দের স্বাদ মেলে প্লেতোদৃষ্ট দার্শনিকের আদর্শলোকের কল্পনায়। একটি শিম্‌ফণির স্থর-সংগতিতে ট্রাজেডির বিয়োগান্ত ক্রমপরিণতিতে, কাব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যপ্রবাহে আমরা একটা স্থশৃঙ্খল, স্থসম্বদ্ধ জগতের পূর্ণাভাস পাই। এই প্রসঙ্গে বলা চলে, শিল্প মানুষের বুদ্ধিজাত; মানুষের বুদ্ধির নামান্তরই হল শিল্পকর্ম। যে সমাজে শৃঙ্খলা স্থপ্রতিষ্ঠিত সেই সমাজে মানুষের বুদ্ধি তার সকল প্রয়াসকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে তার সকল প্রচেষ্টাকে। স্থন্দর শিল্পকর্মে এই বুদ্ধিই সক্রিয় আবার শিল্পানন্দ আস্বাদনেও এই বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল। এই প্রসঙ্গে আমরা মার্কিন শিল্পবেত্তা আরুইন এড্‌ম্যানের তত্ত্বানুসারী।।

সাহিত্য ও সাহিত্য মূল্যায়ন

সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন যে, সাহিত্যের ভেলাতে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সাহিতত্ব হল সাহিত্যের মূলে। আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সহিতত্ব কথাটির মনস্তাত্ত্বিক এবং পরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোচনা করা হবে।

শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টির কোনও এক দেবদুর্লভ মুহূর্তে অনুভূতির তথা আবেগের চিত্রটিকে ভাষার আরশিতে ধরে দিয়ে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তা উপস্থিত করতে চান; লেখা ছাপা হয়, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। উদাহরণ দিই, ক্লাসিক উদাহরণ।

মৈথুনক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হনন করল। দস্যু রত্নাকর আবেগউচ্চকিত এক নিবিড় মুহূর্তে সেই বিয়োগান্ত নাটক দর্শন করলেন: তাঁর মনে যে কারুণ্যারস সঞ্চারিত হল তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সহৃদয় সামাজিকের মনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে করলেন, কেমন করে করলেন? কবির মনের ভাব কেমন করে রসিকের মনে সঞ্চারিত হল তার পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সমালোচক এই তত্ত্বটিকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে বসেন কোনওরকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই। তাঁরা ধরে নেন যে পাঠক ত সহজেই কবির কথা বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হল: সত্যি সত্যিই পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের মনের অন্দরে প্রবেশ ক'রে তার আবেগ এবং অনুভূতির জগত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রতীতি সৃজন করতে পারে কি?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের থেকে 'মালিনীর' কয়েকটি কথা তুলে দিই।

> "রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
> বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই

জন্মাবধি চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ!
ওগো ছেড়ে দে মা—কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহারাণী সেই শুধু আমি।"

কবি এখন মালিনীতে রূপান্তরিতা; মালিনীর ভূমিকায় মহাকবি যে অনুভূতির কথা বললেন সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধু আমরা কেন মালিনীর মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই আবেগ অনুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই হেঁয়ালিপূর্ণ। মালিনীর মাতা রাজমহিষী, তাঁর গর্ভে মালিনীর জন্ম। তিনিও তাঁর বালিকা কন্যার এই অন্তহীন অনুভূতিলোকের কোনও সন্ধানই রাখেন না; হয়তো এই অনুভূতিলোকের দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত কবিগুরু দিতে চাইলেন তাঁর পাঠককে, তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বলালেন:

মহিষী॥ শুনিলে তো মহারাজ? একথা কাহার?
শুনিয়া বুঝিতে নারি। একি বালিকার!
এই কি তোমার কন্যা! আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে!"

রাজমহিষীর 'শুনিয়া বুঝিতে নারি'র স্বীকৃতি সমস্ত পাঠকের। আধুনিক সিমান্টিক্‌সে এই শব্দের অর্থের অনির্দিষ্ট তত্ত্বটিকে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মর্যাদায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কবি যে অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন সে অর্থটুকু দুরধিগম্য।

আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যথা-বেদনার কথা বলি, সেই ব্যথা বা বেদনার কথা, আমরা যে সাধারণ সুখ বা আনন্দের কথা বলি সেই সুখ বা আনন্দের কথা কি আমাদের একান্ত প্রিয়জনেরাও বুঝতে পারেন? সাহিত্যিকের উত্তুঙ্গ অনুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আরও উদাহরণ দিই (এই উদাহরণটি দিয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ):

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কণ্বমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন। তিনি তপোবন তরুদের ডাক দিয়ে বললেন:

'ওগো সন্নিহিত তপোবন তরুগণ,
তোমাদের জল না করি দান
যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু
স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু,
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে
যে জন মাতিত মহোৎসবে,
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়,
তোমরা সকলে দেহো বিদায়!'

জানি না তপোবনতরুউদ্দিষ্ট কণ্বের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের বোধগম্য হবে কি না? এ যুগের নগরবাসী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির হল অনাত্মবন্ধন। নাগরিক সভ্যতাপুষ্ট পাঠক বা সমালোচক মানুষ এবং প্রকৃতির কণ্বকথিত একাত্মতাটুকু অনুধাবন করতে পারবেন না বলেই মনে হয় আর তা না পারলে শকুন্তলা কাব্যের আবেদন বহুলাংশেই এ যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত মহামুনি কণ্বের সূক্ষ্ম বেদনাটুকুকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখান দৃশ্যে আসুন; সে অঙ্কের আরম্ভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে দেখিয়েছেন:

রাজপ্রেয়সী হংসপদিকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান করছেন:

'নবমধুলোভী ওগো মধুকর
চূতমঞ্জরি চুমি,
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছো
কেমনে ভুলিলে তুমি!'

এই গানের অন্তরস্থিত ভাবটি হল এই দৃশ্যটির মর্মকথা। এই প্রত্যাখ্যানের

বেদনা অধিকাংশ পাঠকপাঠিকার কাছেই অবোধ্য। প্রাচীন কাব্যরসিকের চোখে অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বললেও ভুল হয় না এমন রাজা দুষ্মন্তের অপরাধ এই যুগের পাঠক পাঠিকার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এ যুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় না। এ যুগের মেয়েরা বা ছেলেরা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে দ্বিতীয়বার কেন বহুবারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সেই প্রত্যাখ্যানকে, সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে স্বয়ম্ভর করে তুলে জীবনকে মরুভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব কাব্যে যখন অনুভূতির বা আবেগের কথা বলা হয় আর সে কথা না বললে কাব্য কাব্য হয়েই ওঠে না তখন আমরা বলব যে কবির অনুভূতির অনুকরণ করা পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক যুগের পরিবেশ অন্য যুগে অলভ্য; একই কালে একই পরিবেশে বাস ক'রে আবার দু'টি মানুষের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই সত্যটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন; 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। তাই আমরা কেউই একই জিনিষ দেখি না, একই জিনিষ বুঝি না, একই জিনিষ জানি না। অর্থাৎ অতি পরিচিত দেখার বস্তুটিকে আমরা সকলেই ভিন্ন ভাবে দেখি। আবার উদাহরণ দিই—আপনি আমি শিমুল, সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, শিমুল গাছে তুলো হয়, সজনে গাছ থেকে ডাঁটা পেড়ে খাই, বড়জোর সজনে গাছ শুঁয়োপোকার উপদ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক আছেন, শিমুল সজনে হয়তো তাঁদের আরও কিছু স্মৃতিচারণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে শিমুল সজনে কবি রবীন্দ্রনাথকে ঋণে আবদ্ধ করে, কোন এক অনাদিকালের মায়ায় কবিমনকে আচ্ছন্ন করে সে শিমুল সজনের কথা আমরা জানি না। গাছের এই অলোক সামান্য শক্তি, এই যে অমৃতময় রূপ, এইরূপ দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। হয়তো বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক ঋষিরা। সেই দেখা হল 'দর্শন করা', সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করা। রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখলেন কবির দৃষ্টিতে; সেই দেখার কথা তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে বললেন ঃ "এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দ রূপ, সে দেখা এখনও আমাদের দেখা

হয়নি মানুষের মুখে, সে তার অমৃতরূপ, সে দেখার এখনো অনেক বাকি —'আনন্দরূপমমৃতং' এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ, তাঁর 'দক্ষিণং মুখং', উপরের আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব: 'যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।'

অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয়। মন দেখে, মন শোনে, সেই মনই হল রূপকার; সেই মনই বক্তা আবার সেই মনই শ্রোতা; সে মনই রং লাগায়। সেই মনই আবার রং অবলোকন করে। অতএব একের দেখা একের শোনা চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে যায়। একথা কাব্য কথা নয়, এ সত্য মনস্তত্ত্বসম্মত। সাহিত্যের যথাযথ সমালোচনা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনায় সঞ্চালন (communication)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখা, সাহিত্যিকের শোনা পাঠকের 'দর্শনে' এবং 'শ্রবণে' রূপান্তরিত করতে পারব তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠবে। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ 'Emotions recollected in tranquility'-র কথা বলেন, সেই আবেগ অনুভূতির নিবিড়তা যদি চিরকালের জন্য অন্যজনার জানার বাইরে থেকে যায় তাহলে কেমন করে কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচনার সম্ভব হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সমালোচনার অর্থই তো হল সমালোচক বিচার করবেন কবি তাঁর অনুভূতির কথা, তাঁর ভাবাবেগের কথা, তাঁর হৃদয়উদ্বেলতার কথা যথা-যথ ভাবে পাঠককে জানাতে পেরেছেন কি না। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এই অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন, কবির জীবনাদর্শ, কবির জীবনবাদ এ সবের দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। এতএব কবির আবেগ-অনুভূতির যথার্থ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির মানসসত্তা তথা জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হল। কবির

অনুভূতিলোক সাহিত্যিকের অনুভবের জগৎ চিরকালের জন্য পাঠকের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজের মনোমত একটি রসের জগৎ সৃষ্টি ক'রে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হলেও পাঠক কখনই সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না; আর সে অনুপ্রবেশটুকু না ঘটলে সাহিত্যসমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্যরসের অনুভব, সাহিত্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব হলেও সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। এতএব বলা চলে, নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে 'সাহিত্য সমালোচনা' কথাটি সোনার পাথর বাটির মত যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিরোধিতা দীপ্যমান।

সাহিত্য ও জীবন ঃ নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ভারতীয় সংস্কৃতির ঋদ্ধিবান পুরুষ ভোজদেব জীবনও শিল্পকে সমার্থক বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে উভয়েই সৃষ্টি, উভয়েই নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। প্রকৃতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল ফলে। কিন্তু মনুষ্যজীবন প্রকৃতির বিধি অতিক্রান্ত। আধুনিক মনস্তত্ত্বে যে অভ্যাস (Habit) এবং সহজাত বৃত্তি (Instinct) এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা চলেছে, তাতে ক'রে এই সত্যটিকে সহজেই গ্রহণ করা যায় যে মনুষ্যজীবন প্রকৃতির বিধিবিধান অতিক্রান্ত। মানুষের জীবন যদি অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা প্রাকৃত বা প্রকৃতিনির্দিষ্ট জীবন ধারণা থেকে বিচ্যুত। আবার মনুষ্যজীবনকে যদি সহজাত প্রবৃত্তি বা Instinct-এর অধীন বলে গণ্য করা হয় তবে তা হল আমাদের পূর্বাপূর্ব পুরুষদের পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত অভ্যাসাবলীর দ্বারা অতি নির্দিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই এ সত্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে মানুষের জীবন প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা, আমাদের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে রচনা করি। কেমন করে বসব, কেমন করে কী পোষাক কখন পরব, কোন ধাঁচে বা অঙ্গসজ্জা হবে, এ সবই আমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মূলে আছে কল্পনা। কল্পনা নতুন নতুন গেস্টল্টের (Gestalt) সৃষ্টি করে। সেই গেস্টল্টের মধ্যে আমি, আপনি, অন্তর জগত, বহির্জগত, সবই বিধৃত। কবি-প্রিয়া যখন কবিকে বলেন ঃ

'আমায় তুমি আপনি রচে আপন কর—'

তখন কবি যেমন তাঁর প্রিয়তমার কুসুমপেলব ভাবমূর্তিটি রূপে-রসে সমৃদ্ধ করে রচনা করেন, ঠিক তেমনি করেই তিনি আবার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। তাই কবি বলেন ঃ

আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে ;
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হ'ল সে।

তাহ'লে প্রাকৃত জগত ত কবিই সৃষ্টি করলেন; আপনি, আমি, আমরা সবাই সেই কবিকৃতিটুকুর দাবী করতে পারি। আমরা সবাই প্রত্যূষে চোখ মেললেই আমাদের প্রত্যেকের চোখে এক একটি জগতের আলোর শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আমার জগতের সঙ্গে আপনার জগতের দুস্তর ব্যবধান। আপনার জগতের রূপ, রস, রং আমার জগত থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। কারণ আপনার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনার ব্যবধানটুকু যোজন বিস্তারি। আপনার কল্পনায় যে আলো লাল, সেই আলোই সবুজ হয়ে আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, আমার কল্পনা আমাকে চলার মন্ত্রে মাতাল করে তোলে। কবির কল্পনা প্রত্যক্ষ করল:

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরু-শ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

কবি-কল্পনায় সবুজ আলোর নিশানা। চলার ইঙ্গিত এই আলোয়—চরৈবেতি। আবার আপনার কল্পনায় এই আলো লাল হয়ে যখন দেখা দেয় তখন চলা যতির দ্বারে স্তিমিত, স্তব্ধ হয়ে পড়ে:

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে,
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে।'

অনেক ভোরইত কবির মত রক্ত আলোর মদে মাতাল; এ রক্ত-আভা 'লাল' নয়। 'লাল' হ'ল থেমে যাওয়ার নিশানা। আমরা সবাই থেমে থাকি; চলার পথে লাল দেখে থেমে থাকতেই অভ্যস্ত আমরা। কি জানি কি ক্ষতি হয়। পরিবর্তনকে বড় ভয় পাই আমরা। মার্কিন নব্য-দার্শনিক এরিক হফার তাঁর 'Ordeal of Change' গ্রন্থে এই থেমে থাকার প্রবণতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে চলা মানেই পরিবর্তনের নবীনতাকে বরণ করা। আমরা এই নতুন জীবনায়নকে বড় ভয় পাই; তাই পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চাই। কিন্তু দার্শনিক হফার এই প্রসঙ্গে একটু ভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন; Empirical evidence হফার সাহেবের

তত্ত্বদর্শনের পরিপন্থী। এখন জিজ্ঞাস্য, যদি আমরা পরিবর্তনকে এতই ভয় করব, তাহ'লে পৃথিবী জুড়ে এতো নতুনের আমদানি হচ্ছে কী করে ? পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, চিন্তায় ও কর্মে পরিবর্তনের বন্যা বয়ে চলেছে সবার অলক্ষ্যে। দেশের আখের টিকলি শহরের 'গোলাবী গাণ্ডারি'তে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কা আছে, মানি। কিন্তু সেই শঙ্কাটাই শেষ কথা নয়। তাকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের যে জীবন সাধনা, তা কল্পনার প্রসাদপুষ্ট। কল্পনা বিভ্রান্তিকর জীবন-পরিবেশে সমাধানের পথ দেখায়। আমরা নতুন আশায় বুক বেঁধে নতুন করে জীবনকে সৃষ্টি করার কাজে লেগে পড়ি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ জার্মান নাগরিকের কল্পনায় নতুন জার্মানী প্রথম গড়ে ওঠেছিল বলেই ক্রমে তাদের স্বতঃপ্রণোদিত শ্রম-অনুদানে সবার চোখে পরিদৃশ্যমান সুন্দর জার্মানী একটু একটু করে গড়ে উঠল। এ ব্যাপারে আমরা সবাই আর্কিমিডিস। প্রতিনিয়ত জীবনের বাধাকে জয় করে লাল আলোকে সবুজ আলোর নিশানায় রূপান্তরিত করার জন্য আমরা নিরন্তর চিন্তা করছি, কল্পনার আশ্রয় নিয়ে দৃশ্যমান পরিবেশটার ভাঙাগড়া করছি। যেই মনোমত সমাধান খুঁজে পাচ্ছি অমনি 'ইউরেকা' বলে আমার সমস্ত সত্তা উল্লসিত হয়ে উঠছে। আমি নতুন ক'রে জীবনকে এবং আমার জগতকে ঢেলে সাজাচ্ছি। এমনি করেই আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জগত সৃষ্টি হচ্ছে। দার্শনিক লাইবনিজের 'মনাড' (Monad) আমরা ; আমরা সকলেই অপ্রবেশ্য দুর্গবিশেষ কেউ কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না ; কারো সঙ্গে কেউ ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের জগতই আমাদের আপন সৃষ্টি। আমাদের জীবন সেই জগতের মধ্যে বিধৃত। তাহলে একথাটা বলা চলে যে জীবন অর্থে জীবনচর্যাকে গ্রহণ করা যায়। সেই জীবনচর্যা কল্পনা অনুসারী। আদর্শ আবার এই কল্পনাকে তার গঙ্গোত্রী বলে গ্রহণ করেছে। যা নেই তা হল আদর্শ ; 'Is' এবং 'ought'-এর বিভেদটুকু মনে রেখে আমরা উপরের ঐ ধরনের উক্তিটি করলেম। যা আছে তা প্রকৃত ; তা আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে না। আদর্শ বাস্তবায়িত হয়ে প্রাকৃত সত্যে পরিণত হয় না ; তা জীবন সত্য হয়ে উঠতে পারে। জীবন সত্য কল্পনার সৃষ্টি ; প্রাকৃত সত্য কিন্তু

তা নয়। তা কল্পনা নিরপেক্ষ। অথবা অনেকে হয়ত বলবেন যে প্রাকৃত সত্যও কল্পনা আশ্রয়ী। Law of gravitation বা মাধ্যাকর্ষণবিধি প্রথম নিউটনের কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল ; ঠিক এমনি করে আর্কিমিডিস তত্ত্ব, টলেমির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, কোপারনিকাসের তত্ত্ব, আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, এরা কেউ কেউ প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃত ; কেউ বা প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েও তা হারিয়েছে ; টলেমির সূর্য-গ্রহ প্রদক্ষিণ তত্ত্বের কথা বলছি। এটি এককালে প্রাকৃত সত্যের মর্যাদা পেয়েছিল ; মানুষের কল্পনায় (কেউ কেউ বলেন যুক্তি বুদ্ধির নিরিখে) এটি স্বীকৃতি পেলেও পরে সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য মূলতঃ দায়ী কোপারনিকাসের কল্পনায় প্রতিভাত আমাদের জ্ঞানের জগত, আমাদের আনন্দবেদনার জগত, আমাদের রূপ রসের জগত। অতএব এই সামগ্রিক জগতকে সৃষ্টি আখ্যা দিলে ভুল হবে না। এ জগত অনন্যপরতন্ত্রা।

সাহিত্য কি কল্পনার সৃষ্টি নয়? কর্ণের চরিত্র—রবীন্দ্রনাথের কর্ণই, বলুন, আর মহাভারতের কর্ণই বলুন, এরা ত' কল্পনারই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা করেন যে মহাবীর কর্ণ মাতা কুন্তিকে বলেছেন :

> 'মাতঃ যে পক্ষের পরাজয়,
> সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে
> ক'রো না আহ্বান।'

তখন কর্ণ-চরিত্রের যে মহিমাদ্যুতি আমাদের মুগ্ধ করে তা এসেছে কবি-কল্পনা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতাটুকু সম্বন্ধে অনেক বাদবিসম্বাদ থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আমাদের কাছে ধ্রুব সত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় অমর সাহিত্যধারার কেন্দ্রবিন্দু। গীতার শ্রীকৃষ্ণ কবি-কল্পনার অনন্য সৃষ্টি। কবি যা সৃষ্টি করেন তার সত্যতা অনস্বীকার্য :

> সেই সত্য যা রচিবে তুমি
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

কবির মনোভূমি হ'ল কবি-কল্পনার আশ্রয়স্থল। মহাকবি বাল্মীকিকে দেবর্ষি নারদ বললেন যে কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার

থেকেও অধিকতর সত্য। কবি-কল্পনায় যে সৃষ্টি সম্ভব হয় তার সর্বাঙ্গে অলৌকিক আলো :

'The light that never was on sea or land.' এই অদৃষ্টপূর্ব আলোয় ভাস্বর হল সাহিত্য। শিল্প ও সাহিত্য হ'ল অপূর্ব বস্তু। এর জোড়া পূর্বে ছিল না। এ সৃষ্টি অপরের অনুকরণ নয়। জীবনকে এ সৃষ্টি অনুকরণ করে না; প্রাকৃত সত্যকে ত অনুকরণ করার প্রশ্নটাই অবান্তর। তাই ত এ যুগের বিমূর্ত শিল্প নন্দনতত্ত্বের জগতে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করে কবি-কল্পনা; এই সৃজনশীল কল্পনাকে 'প্রতিভা' বলা হয়েছে। প্রতিভা হ'ল অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। কল্পনা সব সময়েই নতুনের পূজারী। তার সন্ধান হ'ল নতুনকে সৃষ্টি করার। প্রাচীনকে নির্মাণ করলে তা ত অনুকৃতি হয়ে পড়বে। অনুকরণ কবি-কল্পনার চোখে অনাস্বাদ্য। অনুকরণে ঊর্ধ্বে ওঠার স্বাধীনতা নেই; স্ববশ্যতাটুকু না থাকলে কোন কল্পনাই সৃষ্টিধর্মী হয়ে উঠতে পারে না। তা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূলে কাজ করতে পারে না। তাই রঁমা রেঁাল্যা বললেন যে সঙ্গীত রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু যদি না থাকে তবে সে সঙ্গীত হয় 'Sofa Music'; তার প্রাণপ্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে না। আধুনিক সেমান্টিকসের ভাষায় যাকে 'Referent' বলা হয়েছে তা রেঁালার 'Sofa Music' সৃষ্টি করে; তা যথার্থ সঙ্গীত সৃষ্টি করে না; তা কালজয়ী সাহিত্যের জননীর মর্যাদা পায় না। সে মর্যাদাটুকু পেতে হ'লে সাহিত্যকে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতিরিক্তের রসরাজত্বে প্রবেশ করতে হবে। এই অতিরিক্তের রসরাজত্বকে সার্ত্রে স্বীকার করেননি। তিনি তাঁর 'সাহিত্য কী' শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যকে উদ্দেশ্য-অন্বিত ব'লে ঘোষণা করলেন। সাহিত্য উদ্দেশ্য-অন্বিত হ'য়ে উঠলে তা হয়ত আর তেমন করে মুক্ত পক্ষ কল্পনাকে আশ্রয় করতে পারবে না। সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কল্পনার পক্ষ স্বাতন ক'রে দেবে। বিকল কল্পনা সৎ সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারে না। কল্পনা যেখানে খুঁড়িয়ে চলে সাহিত্যও সেখানে পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Personality' গ্রন্থে বললেন যে শিল্প ও সাহিত্য জন্ম নেয় যে কল্পলোকে তা হ'ল 'Region of

the Surplus'; সেখানে শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির কালিমা এসে শিল্পকে স্পর্শ করেন। এ কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই গ্লানির কালিমা বস্তুতঃ পক্ষে জীবনকেও স্পর্শ করে না। জীবন হ'ল আনন্দময় অমৃত রূপের দ্বারা উদ্ভাসিত: 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' জীবনের পাদপীঠেই ত জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা। তাই ত বলছিলাম যে জীবনের আরশিতে এই কালিমার আঁচড়টুকু একেবারেই লাগে না। আর তা লাগে না বলেই জীবন এতো সুন্দর:

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

তথাকথিত অসুন্দর, তথাকথিত দুঃখবেদনাও সাহিত্যে সুন্দর হ'য়ে ওঠে কারণ এরা জীবনের বৃহত্তর ধারণার মধ্যে কখনই সত্য হ'য়ে ওঠে না। আমরা সাহিত্যে এই যে বৃহত্তর জীবন-কল্পনা পাই সেই জীবনে দুঃখকে, বেদনাকে, হতাশাকে অমৃতময় বলে আস্বাদন করি। তাই ত কবি বললেন:

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thoughts.

সীতার বিরহে, যক্ষপ্রিয়ার বিরহে আমরা অশ্রুবিগলিত চোখে বারবার সে বিরহগাথা পাঠ করে আনন্দ পাই। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক হয়ত অপরের দুঃখে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটাকে 'Sadistic' বলে ব্যাখ্যাত করবেন। কিন্তু আমরা বলব যে দুঃখের সাত্ত্বিক রূপটি শিল্পে সৃষ্টি হয় বলেই তার আবেদন সর্বগ্রাহ্য; এর সঙ্গে মানব-মনের কোন অস্বাভাবিক প্রবণতার যোগ বা সম্বন্ধ নেই। আর এই সাত্ত্বিক রূপ সৃষ্টি হল জীবন-ধর্মকেন্দ্রিকও বটে। অতএব ভোজদেবের মতের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা চলে যে জীবন ও শিল্প যেখানে যথাক্রমে যথার্থ জীবন ও যথার্থ শিল্প হ'য়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানটা কেবলমাত্র নামাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। জীবন সাহিত্য-গন্ধী এবং সাহিত্যও জীবনায়নধর্মে চৈতন্যময় হ'য়ে ওঠে।

(দুই)

সাহিত্য সমালোচনা করার প্রকৃতি পর্যালোচনা করাটা যে খুব সহজ কাজ নয়, তার প্রমাণ রয়েছে সাহিত্য সমালোচনার উপরোক্ত অতি

বিস্তারে। ভরতমুনির কাল থেকে অ্যারিস্ততল, এমনকি তারও আগে থেকে সাহিত্য ও নাট্যের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, শিল্পের মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। তারপর যতদিন গেছে আমরাও দেখেছি সাহিত্যের ওপর আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে অভাবনীয় পথে। কেউ বললেন, সাহিত্য হল জীবন সমালোচনা, আবার কেউ বা নির্বিষয় সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। নির্বিষয় সাহিত্যের সঙ্গে নিরর্থক সাহিত্যও সৃষ্টি করে কেউ কেউ; আমরা জানি, কাব্য থেকে অর্থকে বাদ দেওয়ার জন্য নিরর্থক পদ বসিয়ে অনেকে কবিতা রচনা করলেন; এই ধরনের চেষ্টা মূলতঃ করেছেন রাশিয়ার ফিউচারিষ্টরা। বিমূর্ত শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টির কথা আমরা জানি। বিমূর্ত সাহিত্য শিল্প এক ধরনের configuration আশ্রয় করে। এই configuration জীবনের মাত্রা থেকে বিচ্যুত। বহির্জগতের গঠনটুকু (structure of the external world) সাহিত্যের উপজীব্য হবে কিনা এই নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা আলোচনা করেছি। আধুনিককালে একদল পণ্ডিত conceptual thonght-কে সাহিত্যের উপজীব্য করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অলঙ্কারবাদীরা বললেন. কাব্যে আমরা কোন কিছুই বলতে চাইনা; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে চাই। নীতিবাদীরা বললেন, কবির কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো নয় কবির আসল কাজ হল আনন্দস্রাবী পদসংঘটনা করা, স্টাইল সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ দেখানো। কুন্তক প্রভৃতি বক্রোক্তিবাদীরা বললেন, বক্রোক্তিই হল কাব্যের জীবাত্মা। রসবাদীরা বললেন, বিশেষ স্থায়ী ভাবকে বিভাজনী বিভাজ্য ভাবসংযোগে আস্বাদ্য করে তোলাই হল কবির কাজ। ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনার সাহায্যে বস্তু অলঙ্কার ও ভাবকে অভিব্যক্ত করাই কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বললেন। আবেগবাদীরা বললেন, সাহিত্যের কাজ হল বস্তু বা রূপ উপস্থাপনা করা নয়; বস্তু বা ভাবকে অবলম্বন ক'রে শিল্পীর আপন ভাবাবেগকে প্রকাশ ক'রে রসিকের ভাবাবেগকে চরিতার্থ করাই হল সাহিত্যের কাজ। আবার কল্পনাবাদীরা বললেন, রূপকথা সৃষ্টি ক'রে সাহিত্য পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে; সাহিত্য

অন্যান্য শিল্পকলার মতই রূপকল্পাশ্রয়ী; সাহিত্য রূপকল্পের ভাষাতেই মূর্তি গড়ে।

এমনি ধারা সাহিত্যের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, সাহিত্যের ধর্ম এবং প্রকৃতি নিয়ে যদি হাজারো মতবাদ প্রচলিত থাকে তবে সাহিত্যে সমালোচনার ধারাও হবে অজস্র। সাহিত্যকে ঘিরে যে সমালোচনা গড়ে উঠবে, সেই সমালোচনাতে সাহিত্যের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সাহিত্যের বিষয়-বস্তু, সাহিত্যের রূপকল্প, সাহিত্যের Gestalt বা Significaut Form, এইসবের আলোচনা করতে হবে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে এতো বাদবিতণ্ডা হয়েছে যে, আমরা বিভ্রান্ত হয়ে কখন কখন নির্বিশেষ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছি। শিল্পের অর্থ নিয়ে, কবিতার ব্যঞ্জনা নিয়ে এমন তুমুল বাদবিসম্বাদ লেগে গেছে যে আমরা শেষ পর্যন্ত verbal music অর্থাৎ বাচনিক সঙ্গীতের পথ নিয়েছি। শিল্পতত্ত্ববিদ্ ধাওয়া তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "The Heritage of Symbolism"-এ লিখলেন যে, শব্দার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ সবচেয়ে সুরেলা ও ভাবব্যঞ্জক কবিতা গীতিকারের সম্মানটুকু কেড়ে নেওয়ার আশা করতে পারে না। অর্থহীন শব্দের সমাবেশ করে যে সাহিত্য এবং কাব্য হবে না ধাওয়া সেই আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় শব্দের ও অর্থের সঙ্গতি এবং সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়ন করার প্রয়াস হয়েছে। শব্দকে কি অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে মহাভারত লিখতে হয়। কেননা শব্দের যে সামাজিক অর্থের কথা আমরা চিন্তা করি, সে অর্থ সমাজগত, সে অর্থ যুগগত, সে অর্থ শ্রেণীগত এবং সে অর্থ পরিবেশগত, এককথায় সে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল অসদর্থক (negativc)। শব্দার্থ হল একান্ত ব্যক্তিগত। উদাহরণ দিই:

My heart leaps up
When I behold a rainbow in the sky,—

এই যে হৃদয়ের উত্থান, এই উত্থান কি উল্লম্ফন? কি পরিমাণে কোন উচ্চতায় হৃদয় উল্লম্ফনে উন্নীত হচ্চে তা কে বলে দেবে? কবির হৃদয় হয়তো গগনচুম্বী উল্লম্ফনে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, তার খবর কে রাখে?

আমরা কি প্রকৃত পক্ষে কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোন শব্দে যথাযথ অর্থানুসন্ধান করতে পারি? যাঁরা বিমূর্ত শিল্পের বিরোধী, বাচনিক সঙ্গীতের বিরোধী, তাঁদের কাছে আমরা এই প্রশ্নটি রাখব যে সত্যি সত্যিই আমরা কি কখনও শব্দ ও অর্থের সম্মিলনে পুরোপুরি অপরের বোধগম্য একটি বাচনিক পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারি?

মালার্মে শব্দের ও অর্থের বিরোধটিকে সত্য বলে প্রতিপাদিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচকেরা অনেক মালার্মের সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে পারেন নি। নাট্যতত্ত্ববিদ্ হন গ্যাসনার এই ধরনের একজন সমালোচক; তিনি তাঁর 'Producing the Play' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মালার্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন সব উক্তি করলেন যা কোনক্রমেই তর্কশাস্ত্রের ও মনস্তত্ত্বের স্বীকৃত তর্কবিধি ও মননবিধি ধারণার মধ্যে বিধৃত নয়; তিনি লিখলেন, "words are limited by their meaning"। তিনি আরও লিখলেন, All discussions of abstract beauty always overlook the fact that dramatic art is not abstract, that its stories and ideas are concrete."

কোন সমালোচক যদি এমন কথা বলেন ('যখন Semantics ও Science of language আপন আপন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত') তখন আমরা তাঁর অজ্ঞতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাঁকে অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাব। শব্দের যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এইকথা আজ স্বীকৃত সত্য। সকলের বোধগম্য একটা অর্থ আছে, এমন একটা অবাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা শিল্প তথা সাহিত্যের communication-এর বাধাকে সুগম করতে চেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে অর্থের communication বা সঞ্চালন সম্ভব নয়। কেননা, এই ধরনের একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সুনির্দিষ্ট অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হ'য়ে নেই; একটা আবছা অর্থ শব্দের উপর প্রলম্বিত হ'য়ে আছে বলে আমরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে অর্থ শব্দের উপর অধ্যস্ত হয় এবং সেই অধ্যাসটুকু একান্তভাবে ব্যক্তিগত। রিচার্ড অগডেনের 'Referent' আছে তা আমরা স্বীকার করি কিন্তু সেই Referent-এর প্রকৃতি কি,

তা বোঝা সত্যি সত্যিই প্রায় অসম্ভব। আমি যখন 'টেবিল' কথাটি ব্যবহার করি তখন, প্রতিদিন আমার দেখা টেবিলটির কথা বলি। এই টেবিল স্থান কালাশ্রয়ী হলেও এটি আমার মনোগত। স্থান কালাশ্রয়ী এই টেবিল যখন আমার জানা, চোখ মেলে দেখার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে ওঠে তখন তা বিশেষ অর্থবহ হয়ে আমার টেবিলে পরিণত হয়। সেই টেবিলের স্বরূপ আমি ছাড়া কেউ জানে না। যখন সাহিত্য বা কাব্যে অনুভূতির কথা বলা হয়, বেদনার কথা বলা হয় তখন সেই অনুভূতি বা বেদনার communication পাঠকের মনে কেমন করে সম্ভব হবে? কবি যখন বলেন—

'I fall upon the thorns of life, I bleed'.

—তখন শব্দার্থ যুক্ত হয়ে যে বাচ্যার্থের সৃষ্টি করে সেই বেদনার কথাটা যদি পাঠক-মনে যথাযথরূপে অর্থবান হ'য়ে কবি যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সেইভাবে উপস্থিত না হয়, তাহলে পাঠক কবির কাব্যের জগত থেকে নির্বাসিত হবেন। তিনি Thorns of life-এর উপর পড়বেন না, তিনি ধপাস করে পড়বেন অবোধ্যতার নীরেট ভূমিতে; কবিতার অপমৃত্যু ঘটবে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এই নিয়েও বাদ-বিতণ্ডার অন্ত নেই। মহা-দার্শনিক কাণ্ট অনেক ভেবে চিন্তে 'সোনার পাথরবাটি'র তত্ত্ব প্রচার করলেন; তাঁর কথায় বলি শিল্পীর উদ্দেশ্য হল, 'purposivness without a purpose.' লক্ষ্যহীন লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য—এইসব কথার কি কোন বোধগম্য অর্থ আছে? আর যদি অর্থ থেকেও থাকে তবে সেই অর্থ কাণ্টের মনোগত; একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত। মেরিলিন পন্টি তাঁর গ্রন্থ 'The Phenomenology of Perception'-এ যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, সেই মত আমাদের বক্তব্যের কাছাকাছি আসে। তিনি বললেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় উদ্বেলতার সঙ্গে ভাবের ব্যঞ্জনা ও উত্তেজনা এসে যুক্ত হয়, অর্থাৎ শব্দের অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত উত্তেজনা-প্রবণতা ও ব্যঞ্জনা-কল্পনার দ্বারা বিধৃত। তাহলে পন্টি মনে করলেন যে, ভাষা হল মানুষের ব্যক্তিগত ভাষা (private language)। জাঁ পল সার্ত্রে কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী, তিনি ভাষাকে মনে করলেন ব্যক্তি-অনির্ভর।

ভাষার ব্যক্তি-অনির্ভর চারিত্র-ধর্মকে স্বীকার করলে হয়তো objective criticism-এর পক্ষে তা সহায়ক হয়ে উঠবে। কিন্তু সার্ত্র যখন ভাষাকে structure of the external world অথবা বাইরের জগতের গাঠনিক কাঠামো—এই আখ্যা দিলেন, তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল। মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা, শব্দার্থ ব্যঞ্জনার কথা সার্ত্র একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি শিল্প এবং সাহিত্যকে 'committed' আখ্যা দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হলেন না। কিন্তু প্রতিপক্ষ বললেন যদি সাহিত্য 'committed' হয় তাহলে শিল্পীর সৃজনী-স্বাধীনতাটুকু চলে যায়। শিল্প আর 'নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিত' থাকে না; শিল্প অনুকৃতি মাত্র হয়ে ওঠে; তাকে অনেকেই শিল্প বলতে রাজী হবেন না। অবশ্য আমরা জানি যে মহাদার্শনিক অ্যারিস্ততল এক ধরনের অনুকৃতিবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুকৃতির ধারণা ছিল Selection এবং Rejection-এর দ্বারা অন্বিত।

অ্যারিস্ততল এক বিশেষ ধরনের অনুকৃতির কথা বলতে গিয়ে 'aesthetic whole-এর কথা বললেন। আদি-মধ্য-অন্ত তত্ত্বে বিশ্বাসী অ্যারিস্ততল সাহিত্য-শিল্পের সামগ্রিক ধারণাটুকুকে আমদানি করলেন। কবি এজরা পাউণ্ড সাহিত্যের মূল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেলোপৈইয়া' ফেনোপৈইয়া এবং লোগোপৈইয়া—সাহিত্যের এই ত্রিবিধ মূল উপাদানের কথা বললেন। মেলোপৈইয়া হল ধ্বনি মাধুর্য, ফেনোপৈইয়া হল মনের আরশিতে রূপের প্রতিফলন, আর লোগোপৈইয়া হল মননের পথে আবেগের উজ্জীবন। অর্থাৎ কবিতা পড়ে প্রথমেই শব্দ-মাধুর্য বা ধ্বনি-মাধুর্যের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হব। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা-ছন্দ আমাদের চিত্ত-ভূমিকে দোলায়িত করবে। তারপরে কবি কথায় যে রূপটির বর্ণনা করা হয়েছে সেই রূপ আমাদের মনের পটে প্রতিভাত হবে। সবশেষে সেই মনের পটভূমিতে রূপের মননের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে আবেগের সঞ্চার হবে। এ সবটাই হয়তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে সাহিত্য এই কাজটুকু করতে পারল, সেই সাহিত্যকে আমরা সৎ সাহিত্য বলি। এই সৎ সাহিত্যের অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত। সেই অনুভবের প্রকাশ ঘটবে যে ভাষার মাধ্যমে,

সেই ভাষাও তাই একান্তভাবে ব্যক্তিগত ভাষা হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিগত ভাষার মাধ্যমেই হয় পাঠকের মনে আবেগের উপস্থাপনার সূচনা। অতএব শিল্প বা সাহিত্যের সব ব্যাপারটাই হল মননের মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে অনুভবগত অভিজ্ঞতার উজ্জীবন। তা না হলে সাহিত্য হয় না, শিল্প হয় না। সাহিত্যের সমালোচনায় আমরা এই উজ্জীবনটুকুকে বিচার করি। এই বিচার বৈষয়িক হয় না, হতে পারে না; এ বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার। আমি কর্তাভজা হতে পাঠককে অনুরোধ করছি না, কিন্তু একথাই বলতে চেষ্টা করছি যে, বিশ্লেষণ ক'রে সূক্ষ্ম নিক্তিতে বিচার করলে এই তত্ত্বটাই সত্য হয়ে উঠবে যে, সাহিত্য যখন একান্তভাবে ব্যক্তিগত তখন সাহিত্যবিচারও একান্তভাবে Subjective বা ব্যক্তিনির্ভর।

নাটক অভিনেতা ও দর্শক

(এক)

আমরা সাধারণতঃ সার্থক নাটক অভিনয় শেষে অভিনেতাকে অভিনন্দিত করি। তাঁরাও নাটকের যবনিকা পড়লে মঞ্চারূঢ় হয়ে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন সানন্দেও গর্বের সঙ্গে। প্রাকৃতজনের বিচারে রসিকজনের বিচারে এ অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য। এ সম্মান তাঁদের অর্জিত সম্মান। এক্ষেত্রে রসিকজন ও প্রাকৃতজনের বিচারে ভেদ নেই। কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক বোধসম্পন্ন সমালোচকের চোখে ব্যাপারটা অন্যভাবে ধরা পড়ে। তাঁর তির্যক দৃষ্টিতে এই সহজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দেখায়। সেই তির্যক দর্শনভঙ্গীর ফলশ্রুতি একটু বিশদভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস এই নিবন্ধের উপজীব্য। নাটক, অভিনেতা ও দর্শক এই ত্রয়ী পরিকল্পনার মূল্যায়ন নাট্যরসকে ঘনপিনদ্ধ কায়ায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে। এই প্রত্যয়ই এই প্রবন্ধের সূচনায়। নাট্যকার নাটকের পরিসরে যে-রসের সূচনা করেন তার সান্নিধ্য ঘটে দর্শকের মনে অভিনয়ের মাধ্যমে। দর্শকের মনোলোকে যে রসের জগত সৃষ্টি হয় তা নাটকের সৃষ্ট রসলোকের সামীপ্য লাভ করে হয়ত কিন্তু তারা কখনই একীভূত হতে পারে না। গ্রীক নাটকের Chorus অথবা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার—এঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা অভিনেতার যথাযোগ্য ভূমিকাটুকু সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। প্রাচীন গ্রীক নাটকে Thespian বা অভিনেতার আবির্ভাব ঘটল রঙ্গমঞ্চে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৪ সালে। তার আগে Chorusই ছিল গ্রীক নাটকের মধ্যমণি। অভিনেতার অভ্যুদয় তখনো হয়নি গ্রীক রঙ্গমঞ্চে। Chorus বা সূত্রধার বলে বলে চলেছেন:

> 'The king sits in Durnfernline town
> Drinking the blue-red wine;

O where will I get a skealy skipper
To sail this new ship o 'mine'.

যখনি রাজার উক্তিটুকু রাজকীয় গাম্ভীর্যে অপর একজন বললেন রঙ্গমঞ্চ থেকে সূত্রধার নীরব হয়ে গেলেন ক্ষণিকের জন্য। তখনি আধুনিক নাটকের বীজ উপ্ত হয়ে তা কালক্রমে আজকের মহীরুহে পরিণত হল। নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে 'নতুন জন্ম' নিল অভিনেতার অভিনয়-এ, Chorus ধীরে ধীরে আত্মগোপন করে বসল ; এই আত্মগোপনের পালা আজো চলছে। অভিনয় রীতিতে এই যে পরিবর্তন ঘটল, এ পরিবর্তন বৈপ্লবিক। নাট্য সমালোচক আর্নট এই রীতি পরিবর্তনকে ব্যাখ্যাও করলেন এইভাবে: Once the initial step of separating actor from Chorus had been taken, the rest followed easily. The introduction of a single actor made dramatic action possible and the addition of a second, ascribed to Aeschylus, increased it. Sophocles added a third in which he was followed by Aeschylus in his later plays and except perhaps for one dubious case, the Oedipus at colonus of Sophocles, this number was never exceeded. Although the number of actors was limited, there was no such limit to the number of parts they could play.[১]

একই অভিনেতাকে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করতে হত প্রাচীন গ্রীক নাটকে, অবশ্য এই রীতির উপযোগিতা আজও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। আধুনিক নাটকেও 'Double role' বা তারও বেশী ভূমিকায় একই অভিনেতার সঙ্গে অভিনেতার একাত্মীকরণ তত্ত্বটুকু গ্রাহ্য নয়। প্রাচীন গ্রীকনাটকে অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে আর্নট মন্তব্য করলেন: The actor's role was at first sub-ordinate to that of the Chorus, His function was that of interlocutor. In the 'suppliant women' of Aeschylus, not, as was once thought, the earliest complete play we have,

১। Peter D. Arnott প্রণীত An Introduction to the Greek Theatre' পৃঃ ২০ দ্রষ্টব্য।

but certainly modelled on early patterns, there are two actors, but they hardly address each other at all—the story is told by the interchanges between actor and Chorus. In time the actor's importance is increased.

অর্থাৎ ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে কালক্রমে অভিনেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আধুনিক নাটকের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে অভিনেতা যে গুরুত্ব এবং প্রাধান্য পেয়েছেন সেই গুরুত্বটুকু তার প্রাপ্য নয় নন্দনতাত্ত্বিক বিচারের মাপকাঠিতে। অভিনেতা ভাব-সঞ্চালনের উপায় বা পন্থা মাত্র। তাঁর প্রযুক্ত নাট্যরীতির তিনি ধারক ও বাহক। শুধু রীতিই বা বলি কেন সবিনয়ে একান্তে বলি, উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে অভিনেতার ভূমিকা বহুরূপীর ভূমিকা থেকে কোন ক্রমেই স্বতন্ত্র নয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে যখন মুখোস পরে অভিনয় রীতির প্রচলন ছিল, তখন একই অভিনেতা একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করার সময় মুখোস বদলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বদলও করে নিতেন। মুহূর্তের মধ্যে মনুষ্য চরিত্রের মৌল কাঠামোর বদল হয় না। বাইরের ছদ্মরূপ দ্রুত বদল করা চলে। অভিনেতা যখন অভিনীত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহণ করেন তখন সেটি হয় তাঁর ছদ্মরূপ। এই ছদ্মরূপই নাটপ্রবাহকে সচল করে রাখে। এই রূপের সঙ্গে অভিনেতার একীভূত হওয়ার প্রশ্নটাই অজ্ঞতাপ্রসূত। আর্নট বললেন গ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা প্রসঙ্গে : The actor changed his character with his mask, which could be done quickly; it was thus possible for one actor to take several parts without delay or loss of dramatic continuity.[২]

অতএব ক্রোচের ভাষায় অনুবর্তন করে বলা চলে যে অভিনেতার অভিনয় রীতি হল Technique of extenalisation তিনি মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে আপনাকে অদিপিউস ক'রে তুললেন মঞ্চের উপর, কিছুক্ষণ পরেই তার ভূমিকা বদল হল এবং তার মুখোস এবং সাজপোশাক ও মানব রীতি আশ্রয়ী অভিনেতার

২। Great Theatre, পৃ: ৫০ দ্রষ্টব্য।

অভিনয়ের সবটুকুই এই রীতি বা আঙ্গিক। এই ধরনের নাটক দেখে আমরা খুশি হই, হাসি, আবার কখন বা কাঁদি। এই যে অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন ঘটে আমাদের মনে, তার মুখ্য উপলক্ষ্য হল মঞ্চে আরূঢ় অভিনেতা ও তাঁর অভিনয়। অভিনেতাকে সত্য এবং বাস্তব বলে ভাবা, অভিনীত দৃশ্যাবলীর বাস্তবতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া, এ ধারণাগুলি সাধারণ দর্শকের ; সব রসিকজনও এর শরীক হন। উদাহরণ দিই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের পরে যে করুণদৃশ্যের অবতারণা হল রঙ্গমঞ্চে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেতা সত্তম শিশিরকুমার। তাঁর অনবদ্য অভিনয়, 'সীতা সীতা' করে তাঁর সেই কাঁদাও বিলক্ষণ এক অনবদ্য নাট্যরসে রসিকজনকে আপ্লুত করে তুলত। নাট্যাচার্য-সৃষ্ট মঞ্চের জগত কিন্তু রামায়ণের জগত থেকে স্বতন্ত্র। বাল্মীকি বর্ণিত জগত, কল্পলোকে তার অধিষ্ঠান। তাঁর দেখা কেউ পায়নি। তাই নাট্যাচার্য ব্যাখ্যাত রামায়ণ আর বাল্মীকি সৃষ্ট রামায়ণ, তারা এক নয়। নাট্যচার্যের রামায়ণী কথা হল অভিনয় আশ্রয়ী। সেই অভিনয়ের প্রেক্ষাপট হল নাটক-কথিত ঘটনা সন্নিবেশ। এই ঘটনাগুলি নাট্যপ্রবাহের গতিকে সূচিত করে বোদ্ধা দর্শকের কাছে। নাট্যকার যে বিশেষ পারম্পর্যে ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন তার একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। দর্শকের মনের স্থায়ীভাবকে উদ্দীপিত করে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব। তাদের সংযোগে দর্শকের মনে রসনিস্পত্তি হয়। অভিনেতার মনে ও রসের প্রস্রবণ উদ্ঘারিত হয় কী না সে প্রশ্নটা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। আমাদের মতে অভিনেতার মনে এই রসের উজ্জীবন ঘটে না। তিনি মিথ্যার বেসাতি করেন। এই মিথ্যাকে ক্ষণিকের জন্যও সত্য করে তোলার জন্য তিনি যে কলাকৌশল প্রয়োগ করেন তা হল তাঁর নাট্য-রীতি। সেই রীতির মাধ্যমে তিনি মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হন। কখন তার নিয়ন্তা হিসেবে আবার কখন বা নিয়ন্ত্রিত হিসেবে ; মঞ্চে প্রদর্শিত ঘটনা পারম্পর্যের নিষ্ঠুর চক্রতলে তিনি কখন বা পিষ্ট হন। প্রথম ক্ষেত্রে দর্শকের মনে ধীরোদাত্ত নায়কের চিত্রটি অঙ্কিত হয়, ধীর রসে আবার কখন বা রৌদ্ররসে দর্শকমন আপ্লুত হয়ে

ওঠে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শকের মনে করুণরসের সঞ্চার হয়, সমবেদনায় তাঁর মন ভরপুর হয়ে ওঠে। অ্যারিস্ততলের ট্রাজিক হিরোর দেখা পাই। টমাস হার্ডির Mayor of Casterbridge-এর মেয়রকে দেখে আমরা এই ধরনের সমবেদনা বোধ করেছি। নাটক যখন আমরা পড়ি তখন তার যে আবেদন, তার থেকে আবেদনটি তীব্রতর হয় যদি আমরা নাটকের অভিনয় দেখি। এটি কেন হয়? এর উত্তর খুঁজতে হলে আমরা অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি।

যে দর্শক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সচেতন, যার কল্পনা অতি তুচ্ছ নিশানা দেখে উদ্দাম হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে, তার পক্ষে নাটক না দেখাই ভালো। অনেক নাটকের অভিনয় দেখার তাঁর প্রয়োজন নেই। বরং নাটক দেখলে তাঁর কল্পনা মঞ্চ-উপস্থাপিত ঘটনা সংস্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হয়ে তার প্রসারকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উদাহরণ দিই। আমরা মঞ্চে নানান ধরণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট ব্যবহার করে সংস্কৃতিবান সহৃদয় সামাজিকের রসোপলব্ধিকে নানাভাবে ব্যাহত করে এসেছি অনেক কাল ধ'রে। তাই আধুনিক নাট্যদর্শনে এই ধরনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপটের ভূমিকা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। দর্শকের দৃষ্টিকে তথা কল্পনাকে যেমন প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত করতে পারে, ঠিক তেমনি করে অভিনেতার অভিনয় ও সময়ে সময়ে তাকে ক্ষুণ্ণ করে, পীড়িত করে। যে ক্ষেত্রে অভিনেতা দর্শকের মনে রসের প্রস্রবণকে উদ্বারিত করে দিতে সহায়ক হয়, সে ক্ষেত্রে অভিনেতা হাত-তালি পায়, তাকে আমরা সাধুবাদ দিই। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অভিনেতা কেমন করে, কোন অর্থে দর্শকের মনে রসের উজ্জীবন সহায়ক হয়? অভিনীত চরিত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কী অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রতীতি থাকা প্রয়োজন? অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞানটুকু অপরিহার্য। মনে করা যাক একজন বন্ধ্যা সন্তানহীন অভিনেত্রী এক সদ্য পুত্রহারা মাতার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত মায়েরা কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছেন তাঁর অভিনয় দেখে। অভিনেত্রী দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে প্রত্যাবর্তন ক'রে সহকর্মীদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতায় মেতে উঠলেন, হয়ত বা একটা সিগারেটই ধরিয়ে বসলেন।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শক মায়েরা তখনো আঁচল দিয়ে হয়ত চোখের জল মুচছেন। শুধু তাই নয়, অ্যারিস্ততলীয় ক্যাথারস্সিস্ তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত করুণ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলে মঞ্চে এই দৃশ্য সংস্থাপনার ক্ষণটুকু আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করবে, এই সত্যটুকুকে স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মালভিদা ফন্ মাইসেন বার্গের রোমাঁ রঁলাকে লেখা পত্রটির কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি রঁলাকে লিখেছিলেন যে ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে তিনি তাঁর আবেগ-গত জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। যে সব অভিনেতা তাঁদের অভিনয় আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ ক'রে এক ধরনের নাট্য-আশ্রয়ী ঘটনার Gestalt মঞ্চের ওপর গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যেই ছিল মালভিদার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। সেই সমাধান-টুকু খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব অভিনেতার ছিল না, সে কৃতিত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে মালভিদার। মালভিদা আপন কল্পনায় যে রোমান্টিক জগতের সৃষ্টি করেছিলেন তার উপাদান তিনি আহরণ করেছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, আপনার জীবনের পত্রপুট থেকে। আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে রূপের জগত সৃষ্টি করলেন সেই ট্রুথ থেকেই তিনি তাঁর আবেগবত জীবনের সমস্যার সমাধানটুকু উদ্ধার করলেন। মালভিদা আপন রোমান্টিক প্রেম-বিরহের জগতটুকু সৃষ্টি করেছিলেন বলেই তিনি সমাধানটুকু খুঁজে পেয়েছিলেন সেই আপন সৃষ্ট রসের জগত থেকে। এখানে মালভিদা হলেন স্বয়ং স্রষ্টা। দর্শকের মনে রসের সঞ্চার ব্যাপারে অভিনেতা উপায় মাত্র। মঞ্চ সজ্জা, বহিরঙ্গের উপকরণ, দর্শকের মানস প্রস্তুতি ও প্রবণতা—এরা যেমন দর্শক মনে রসের উদ্বারণে সহায় হয়, ঠিক তেমনি করে সহায় হয় অভিনেতা ও তাঁর অভিনয়।

পূর্বেই বলেছি অভিনেতা মিথ্যার বেসাতি করেন। যে অনুভব তাঁর নেই, তিনি সেই অনুভূতির আলেখ্য রচনা করেন। আগের দেওয়া বন্ধ্যা অভিনেত্রীটির উদাহরণে আবাব ফিরে আসা যাক। যে মেয়ে 'মা' হল না সে আর সন্তান হারানোর বেদনা অনুভব করে কী করে? অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে সে একটা 'এ্যাব্স্ট্রকট' বেদনার ছবিকে মঞ্চে সত্য

করে তুলছে কোন্ মন্ত্রবলে, এটি আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সহৃদয় সামাজিক যে বেদনা বোধ করছেন, সে বেদনা অভিনেতার নেই, অথচ তিনি অপরকে বেদনাটুকু অনুভব করানোর ব্যাপারে প্রধান উপায়। দর্শকমনে সন্তানহারা মায়ের বেদনাটুকু অসীম কারণ্যে সত্য হয়ে ওঠে দর্শকের কল্পনার প্রসাদ গুণে। দর্শকের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তোলে অভিনতার অভিনয় নৈপুণ্য। সেই অভিনয় নৈপুণ্যই হল দর্শকমনে সৃষ্টিকর্ম উজ্জীবনের stimulus বা উদ্দীপক। রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ড যেমন প্রচণ্ড বলীবর্দের পক্ষে উদ্দীপক মাত্র, তেমনিধারা অভিনেতার অভিনয়ও দর্শকের মনে রসের প্রস্রবণের উদ্দীপক। লাল কাপড়ের দায়িত্ব কতটুকু থাকে প্রমত্ত ষণ্ডের সংহারলীলায় তার গাণিতিক হার নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ঠিক ঐ ভাবেই সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদীর সৃষ্টিকর্মে অভিনেতার অবদানটুকুর অকিঞ্চিৎকর পরিমাণ নির্ণয় সাপেক্ষ। একমাত্র পুত্রকে পিতা হত্যা করছেন, আপন পুত্রকে চিনতে না পেরে, এই মর্মান্তিক দৃশ্য সোহরাব রোস্তম নাট্য-আখ্যানের climax ; এই দৃশ্যে সোহরাব ও রোস্তম প্রবৃদ্ধ মহাযোদ্ধা ও তরুণ-উদীয়মান বীরের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁদের সাজ-পোষাক, ঢাল-তলোয়ার, যোদ্ধবেশ, সর্বোপরি তাঁদের অস্ত্রচালনার কৌশল, বীরত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপ ও গতি,—এরা যুক্ত হয়ে পিতাকে পুত্রহত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে—আর এই সমগ্র দৃশ্যটি দর্শকের মনে করুণরসের প্রস্রবণকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। নাটকের পরিণতিও সোহরাবের মৃত্যু, এই করুণ ঘটনাটি একটি ব্যঞ্জনাময় সংকেত। এই সংকেতটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই 'দর্শক মনে' অভিনীত ঘটনা পারম্পর্যের climax-টুকু দেখা দেয়। 'দর্শক-মনে' কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম কেননা নাটকের climax অনেক সময়েই অমনোযোগী দর্শকের মনে কোন রেখাপাত করে না। ওথেলো যখন নিদ্রাগতা ডেসডিমোনাকে হত্যা করতে অগ্রসর হচ্ছেন—তাঁর সেই ভীষণ-সুন্দর 'সলিলকি'—"Put out the light and then put out the light" হয়ত আপনার পাশের দর্শককে একেবারেই প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে সময়টা দেখলেন, নাটক শেষ হতে তখন কত দেরী? তাই বলছি, প্রতিটি মনোযোগী দর্শকের মনে নাটকটি অভিনীত হয়,

আর এক রীতিতে, আর এক ঢঙে ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। ঘটনাবলী যেভাবে সংস্থাপন ক'রে নাট্যকার রসিকজনকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন, তার বহু বিচ্যুতি ঘটে মঞ্চে ঘটনাবলীর সংস্থাপনায়, অভিনেতার সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় আঙ্গিকের প্রসাদে। দর্শক যখন তাকে গ্রহণ করেন তখন আবার তিনি মঞ্চে অধিষ্ঠিত ঘটনা প্রবাহকে, অনুভূতির তরঙ্গকে 'আপন' করে নিতে আর একভাবে তাকে আস্বাদন করেন। সুতরাং দর্শক আপন নাট্যজগৎ সৃষ্টি করেন একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সে জগতের সঙ্গে মঞ্চের জগতের কোন মিল নেই, মঞ্চটা সংকেত মাত্র। নাট্যকার কথিত 'জীবন্ত জগত' মঞ্চের জগতের মধ্য দিয়ে অভিনেতার অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সংঘটনকে আশ্রয় করে দর্শকের মনে আর এক জীবন্ত জগতের সৃষ্টি করে। এই দুই জীবন্ত জগতে কোথাও কোন আত্যন্তিক মিল নেই। মনে করা যাক রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্যমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণের রামের রাজ্য অভিষেকের কল্পনা সেই কাল ও দেশের দ্বারা নির্দিষ্ট। তাও কল্পনার বস্তু। মঞ্চে তার যে অক্ষম পরিকল্পনা করা হল তার সঙ্গে রামের রাজ্য অভিষেকের (যদি তা কোনদিন বাস্তবে হয়েও থাকে) কোন সাদৃশ্যই থাকতে পারে না। আবার এ যুগের কোন একজন দর্শক হয়ত প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই রাজ্য-অভিষেক দৃশ্যটি দেখছেন, তিনি হয়ত রানী এলিজাবেথের রাজ্য-অভিষেক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁর সেই রাজ ঐশ্বর্য দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তখন আপনার মনে সেই বিদেশের রত্নখচিত রাজসভা থেকে কিছু কিছু ঐশ্বর্য চয়ন ক'রে রামের রাজ্য অভিষেক ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন করবেন আপন মনের কল্পনাসমৃদ্ধ রাজসভায়। অবশ্য একথা এখানে বলে রাখা ভালো যে সাংকেতিক নাটকে, এ্যাবসার্ড নাটকে দর্শকের কল্পনা সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। সাধারণ তথাকথিত বাস্তবধর্মী নাটকে দর্শকের কল্পনা খুঁটিনাটি বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য সত্যিকারের সহৃদয় সামাজিক এইসব ছোটখাটো বাধা অতিক্রম ক'রে কল্পনার ঘোড়ায় চ'ড়ে সাত সমুদ্দর তেরো নদী পার হয়ে যান অনায়াসে। তিনিই আমাদের রসশাস্ত্রে কথিত রসিক সুজন, সহৃদয় হৃদয় সংবাদী।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নাটকে প্রধান ভূমিকা নাট্যকারের নয়, অভিনেতারও নয়, তা হল দর্শকের। রবীন্দ্রনাথ বললেন:

একাকী গায়কের নহে ত' গান, গাহিতে হ'বে দুইজনে,
একজন গাবে খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।

নাটকে যিনি মনে মনে নাট্য রচনা করছেন তিনিই প্রধান। যিনি অভিনয় করছেন তিনি রেলের লেবেল ক্রসিং-এর সিগন্যালম্যানের ভূমিকাধারী। তিনি নানান আঙ্গিকে সংকেত করেছেন, আর প্রেক্ষাগৃহ-ভর্তি দর্শকদের অধিকাংশই সেই সংকেতে সাড়া দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহে যদি হাজার দর্শক ব'সে রামায়ণে বর্ণিত রামের রাজ্যঅভিষেক দৃশ্যটি দেখেন, তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁরা সবাই অনুরূপ দৃশ্য থেকে রসসম্ভোগ করছেন না। মঞ্চে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটি সংকেতমাত্র। হাজার মনে সেই সংকেত হাজার ছবির সৃষ্টি করেছে সহস্র প্রকারের রঙে ও রেখায়; ঐশ্বর্যে ও ঋদ্ধিতে এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তাই সব দর্শকের রসসম্ভোগ একই কোটির হয় না। প্রত্যেকের রসসম্ভোগ হ'ল ভিন্ন কোটির।

(দুই)

আমরা সাধারণভাবে 'নাটুকেপনা' কথাটিকে নিকৃষ্ট অর্থে গ্রহণ করি। জীবনের সঙ্গে সহজ যোগটুকু জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সামীপ্যটুকু হারিয়ে ফেললে, আমরা মানুষের ব্যবহারে এই নাটুকেপনা লক্ষ্য করি। অর্থাৎ কেউ যদি বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গেও 'আজ্ঞে', 'আপনি' করে কথা বলেন একটা করুণ বিনয়ের ভঙ্গী ক'রে তবে তাকে 'নাটুকেপনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অথবা কেউ যদি ঘরে স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে মাইকেলী অমিত্র ছন্দে 'কী কহিলি বাসন্তি' ঢঙে কথাবার্তা বলেন তবে তাকেও নাটুকেপনা বলা যেতে পারে। এককথায়, অস্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক আলোচনা অনেক সময়ে নাটুকেপনা বলে নিন্দিত হয়। আলোচনার সূত্রপাতে আমরা এইকথাটি বলতে চাই যে জীবন নাটক নয়। অবশ্য পরম সংস্কৃতিবান ভোজদেব

বলেছিলেন যে জীবনও শিল্প সমার্থক। জীবন রসের সঙ্গে শিল্প রসের কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তথা জৈন সাহিত্যে যেভাবে চতুঃষষ্ঠি ও দ্বিসপ্ততি কলার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে জীবন ও শিল্পের নৈকট্য নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য জীবন এবং কলাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করবেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রমুখ গ্রন্থে কলার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জৈন সাহিত্যের সমবায়াঙ্গ নায়াধামকহ্, বাজপ্রণীয় ঔপপাতিক, নন্দীসূত্র প্রমুখ আগম গ্রন্থে আমরা বিভিন্ন কলার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্ব্যতীত কল্পসূত্র সুবোধিকা টীকা কল্পসূত্র সন্দেহ বিষৌষধি টীকা, কল্পসূত্রার্থ প্রবোধিনী টীকা, জম্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি টীকাও আবশ্যক নিযুক্তি টীকায় এই সব কলার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্য বাহাত্তরটি কলা ও মেয়েদের জন্য চৌষট্টিটি কলার নির্দেশ আছে এই জৈন শিল্পশাস্ত্রে। জীবন ও শিল্পের একধরণের সমীকরণকে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রীদের কেউ কেউ সমীচীন বলে মনে করেছেন।

কিন্তু এই ধরণের সিদ্ধান্ত বোধহয় যুক্তি সঙ্গত নয়। শিল্প বিভিন্ন রসের যোগান্ দেয় জীবনে বিভিন্ন সময়ে। হাস্যরসের কথাই ধরা যাক। জীবনের অসঙ্গতিই হ'ল হাস্যরসের উপজীব্য। অসঙ্গতি জীবন নয়। আবার অসঙ্গতি শিল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, সুমিতিবোধই হ'ল শিল্প। তবে হাস্যরসের মধ্যে সঙ্গতির স্থান কোথায়? অসঙ্গতি হাস্যরসের প্রাণ হলেও, পরিবেশিত শিল্পরূপের মধ্যে সঙ্গতি থাকা খুবই দরকার। জীবনে দুটি ঘটনা পারম্পর্যের বা ভাব পারম্পর্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলেও তা ক্রমিক হয়ে ওঠে। কিন্তু বুদ্ধির বা আবেগ অনুভূতির কাছে তাকে উপস্থিত করার সময় তাকে সুসঙ্গতির সাজ পোষাক পরিয়ে হাজির করতে হয়। সেটা হল আর্টের Form-এরদিক, রূপের দিক। আর যে অসঙ্গতিকে আশ্রয় ক'রে হাস্যরস উদ্বারিত হয়ে উঠে তা হল জীবনের অসঙ্গতি, জীবন সত্যের অসঙ্গতি। এটা হল content-এর দিক। অবশ্য রূপের ট্রুথটাই যে শিল্পের এবং কাব্যের সবটুকু সে কথা কবি কীটস্ বলেছেন। এই রূপের কথাটাই হল নাটকের উপজীব্য। অবশ্য

নাট্য সত্যকে বোঝার জন্য বোধহয় জীবন সত্যের প্রয়োজন হয়। জীবন সত্যের পটভূমিকায় স্থাপিত করে তবেই আমরা নাট্য সত্যকে স্বরূপে বোঝার চেষ্টা করি। নাট্যরসের উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নাট্য সত্যকে স্বীকার করে নিই। জীবনের সঙ্গে কোথায় যে গরমিল হল সেটাও কিন্তু আমাদের অবচেতন মনে ধরা পড়ে; হয়ত সজ্ঞানে জ্ঞানাত্মিকা প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা জীবনসত্য ও নাট্যসত্যের মধ্যেকার বিভেদের চুলচেরা বিচার করতে বসি না। কিন্তু আমাদের নির্জ্ঞান মন, আমাদের অবচেতন মন সেই প্রভেদটুকু সম্বন্ধে সবসময়েই সচেতন থাকে। জীবন সত্যের মধ্যে দ্রষ্টাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য একটা আহ্বান আছে। সেই আহ্বানে সাড়া না দিলে মনে হয় কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে। এটা অনেকটা দার্শনিক কাণ্টের Categorical Imperative-এর মত। কোন কিছু আমরা করা উচিত এটুকু জানতে পারলে আমি তা না করে থাকতে পারি না, অন্ততঃ তা করতে না পারলে মনে মনে অশান্তি ভোগ করি। একেই আমি বলব জীবন সত্যের চ্যালেঞ্জ। এটি জীবনে আছে শিল্পে নেই। বাড়ীর সামনের রাস্তায় মানুষ খুন হচ্ছে দেখলে, আমি চুপ করে বসে সেই হত্যাদৃশ্য উপভোগ করি না। হয় নিজে ছুটে যাই আততায়ীর হাত থেকে মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে বাঁচাবার জন্য, না হয় পুলিশে খবর দিই অথবা লোকটির প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য কিছু করি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ওথেলোর হাত থেকে ডেসডিমোনাকে বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না। রঙ্গমঞ্চের সত্য আমাকে উদ্বোধিত করে, আমাকে কাঁদায়-হাসায়। কিন্তু মনস্তত্ত্বে stimulus বা উদ্দীপনের যে ভূমিকা, সে ভূমিকা নাট্যসত্যের নয়। তখুনি আমাকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে না নাট্য সত্য। শান্ত সমাহিত হয়ে (একে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় Psychical distance বলা হয়েছে,) আমরা নাট্য সত্যকে উপলব্ধি করি। জীবন-সত্যের সঙ্গে তার যোগ এবং বিয়োগ, দুটোই হয়ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝি। কিন্তু ডেসডিমোনাকে বাঁচানোর জন্য আমি রঙ্গমঞ্চের দিকে ছুটে যাই না। মনে মনে অস্পষ্টভাবে জানি নাট্য সত্য জীবন সত্য নয়। জীবনের কোন একটা খণ্ড সত্যকে নাটক ফলবান করে তোলে। এই ফলবানতাই নাটকীয়ত্ব। মেঘনাদ যেখানে সাধারণ জীবন সত্যে আপনাকে সত্য করে তুলেছিল

তার কথা আমরা জানি না। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে কি ঘটেছিল তা 'ত' আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সবটুকুই শিল্প সত্য, সবটুকু নাট্য সত্য। মেঘনাদের জীবন সত্য (যদি তা থেকে থাকে) শ্রীরামচন্দ্রের মতই অপরিজ্ঞাত, তাদের নাট্য সত্যই হল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপের ট্রুথ। তাকে অস্বীকার করা যায় না। আর তাকে অস্বীকার করলে শ্রীরামচন্দ্র ও মেঘনাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হবে। ঠিক এই কারণেই আদি কবি বাল্মীকিকে নারদ মুনি বললেন, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। বোধহয় এই অর্থেই ভোজদেব জীবন সত্য ও কাব্য সত্যকে সমার্থক বলেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এইকথা সত্য হয়ে উঠলেও এটি সার্বিক সত্য নয়। অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে বলা চলে না যে জীবন সত্য ও নাট্য সত্য একই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ভরত মুনি প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রীরা নাট্যরস ও কাব্যরসকে যেমন একাত্ম ক'রে বুঝেছেন তেমনি শিল্পরসকেও বুঝেছেন ওদের সঙ্গে সংযোগে।

প্রেক্ষাগৃহে বসে আমি যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাট্য সত্যের অনুধাবন করছি, তখন সেই নাট্য সত্যকে 'অনির্বচনীয়' বলে বুঝেছি। অবশ্য এ বোঝাটা অবচেতন মনের প্রক্ষেপ। আমি মেঘনাদ-প্রেয়সী প্রমীলার তেজোদৃপ্ত ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মনে মনে জানি যে সবটাই মিথ্যে। আবার ঐ একই সঙ্গে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখছি। অথচ লক্ষ্মণকে মেঘনাদ বধ থেকে বিরত করার জন্য কোন কিছুই করছি না। নাটকের নাটকীয়ত্বের দিকে তাঁর দুর্বার পরিণামের দিকে, তার গতিপথের দিকে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাকি। 'কর্মহীন' একটা আবেগ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে রাখি। নাটকের নাটকীয়ত্ব আমাকে সেই ভাবের কারাগারে শৃংখলিত করে রাখে। কর্মের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবাধ অধিকার দর্শকের নেই। নাট্যালোকে কর্মের অধিকার শুধু কুশীলবের। দর্শকের নিস্পৃহ, কর্মহীন ভূমিকা নাট্যালোকের দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের সঙ্গে নাটকের প্রভেদ। জীবন প্রতিনিয়ত যুদ্ধের আহ্বান জানায়। নাটকে সেই আহ্বান নেই। উপনিষদের দ্রষ্টা পাখীর ভোক্তা পাখীর জন্য চোখের জল ফেলে না। সে জগতে অনুভূতি

নেই। নাট্য জগতে দর্শক চোখের জল ফেলে, হাঁসে, কাঁদে। কিন্তু দ্রষ্টা পাখীর মত সে জানে যে নাট্য জগৎ সত্য নয়, যে অর্থে জীবন সত্য সেই অর্থে।

তথাকথিত দার্শনিক মিথ্যাত্ব নিয়ে বেসাতি করে বলেই নাট্যসত্য পরিবেশিত হয় বহুক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। কী করে কেমন করে দর্শক মানুষকে আকর্ষণ করা যায় নাট্যলোকের মিথ্যার জগতে, সেটা নাট্য প্রয়োজক এবং নাট্যকারদের একটা বড় ভাবনার কথা। তাই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন শিল্প পাশাপাশি বিবর্ধিত হতে লাগল ক্রমবর্ধমান নাট্য শিল্পের সঙ্গে। নাট্য আন্দোলন ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়ল।

এই শতকের ইংরাজী নাটকের চারিত্র্য ধর্মের উপর টীকা লিখতে বসে প্রথমেই এই অসংশয়িত সত্যটি অতি ভাস্বর হয়ে পড়ে যে গ্রেট বৃটেনে রঙ্গমঞ্চ ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়লো এই শতাব্দিতেই, এর ফলশ্রুতি হলো ইংলণ্ডের দিকে দিকে Repertory Play House-এর প্রতিষ্ঠা। এটি হলো একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টার অঙ্গ বিশেষ, এই প্রচেষ্টার পিছনে যাঁদের প্রেরণা কাজ করলো তাঁদের মধ্যে Annie Horniman-এর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ডাব্লিন-এর Abbey থিয়েটার (১৯০৩) এবং ম্যানচেষ্টারের Gaiety থিয়েটারে হর্নিম্যানের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। তাঁর একক-প্রচেষ্টায় অবশ্য বৃটিশ রঙ্গমঞ্চের সম্যক উন্নতি সম্ভব হয়নি। আরও যাঁরা ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণতর শিল্প-মানে সন্নত করার জন্য প্রাণঢালা পরিশ্রম করলেন, ব্রিটিশ নাট্য দর্শনকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়াসী হলেন, তাঁদের মধ্যে Nugent Monck, Sir Bary Jackson'ও রয়েছেন। এই শতাব্দীর ইংরেজদের নাট্য প্রচেষ্টাকে একধরণের জীবন দর্শন প্রভাবিত করেছিল; তা হল নাট্যের কুশীলবেরা যে ধরণের চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে রূপদান করেছিলেন তাদের মধ্যে নাটক নির্দেশিত সম্বন্ধটুকু অর্থাৎ নাট্যে যে সব চরিত্র উপস্থিত হলো তাদের চারিত্র্য ধর্ম যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকুর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এই সত্যটুকুকে ইংরেজ নাট্যকারেরা স্বীকার করলেন। মানুষের পরিচয় তার একক, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে নয়। বিচ্ছিন্নতা এ যুগের অভিশাপ। এ যুগেই বা বলি কেন, বিচ্ছিন্নতা হল সর্বকালের সামাজিক

সত্য এবং মানুষের আত্মবিকাশের ও আত্মসম্প্রসারণের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। Existentialist (অস্তিবাদী) দর্শনে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা হল সে বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বার বার জেহাদ ঘোষণা করলেন সেই বিচ্ছিন্নতার বিপরীতগামী হলো এই শতকের ব্রিটিশ নাট্য আন্দোলন; তাই তাদের নাট্য দর্শনে এর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

ব্রিটিশ নাট্যদর্শনের এই বিশেষত্বটুকু বহুদিনের বহুমানুষের একান্ত সাধনার ফলশ্রুতি। জার্মান দার্শনিক হেগেল একদিন বলেছিলেন: "Man is not a moral Melchizedeck; he must live, move and have his being in a society." মানুষের জীবনদর্শনে হেগেল কথিত এই মৌল সত্যটি ব্রিটিশ নাট্যদর্শনে অনুসৃত হয়ে গিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে। Relation বা সম্বন্ধ সম্পর্কে ব্রাডলির সাংকেতিক ভাষায় হিংটিং ছটের পূর্ণ উল্লেখ না করেও একথা বলা চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন আদানপ্রদান ব্যক্তি চারিত্র্যকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। ব্রিটিশ নাটকে এই পরম সত্যটি আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন চরিত্রের সত্যধর্মটুকু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; নাটকীয় চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংঘাত ও সহঅবস্থানকে আশ্রয় ক'রে দোসর জনার মিলন বিরহের পরিপূর্ণতা পরস্পরকে পরিপূর্ণ করে তোলে আর সেই পরিপূর্ণতাই তাদের চারিত্র্যসত্তার অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ জন মেসফিল্ড লিখিত The Tragedy of Nan (১৯০৮) নাটকটির কথা বলি ।Nan-এর জীবনের Tragedy করুণ রসের প্রস্রবণকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে দর্শকের মনে। যে দুঃখ, যে বেদনা যে হতাশা Nan-এর চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে তাদের সৃষ্টির আদিতে রয়েছে Nan-এর সঙ্গে তার পিতৃদেবের জন্মসূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনটুকুতে। Nan-এর পিতা হলেন এক দাগী চোর, ভেড়া চুরির অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। এই দাগী চোরের সঙ্গে Nan-এর যে অচ্ছেদ্য পিতাপুত্রীর সম্বন্ধের বন্ধন সেই বন্ধনই Nan-এর চারিত্র্য ঐশ্বর্যের উৎসারকে ব্যাহত করল। Nan-এর জীবনর-সাধনা তার পিতৃদেবের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধটুকুর বাইরে যেতে পারলো না। তার চরিত্রের মূল্যায়ন হলো একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রে। সে সম্পর্ক হল পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক এবং তা Nan-কে অন্তেবাসী করে

রাখল। এই অন্তেবাসী চণ্ডালিকার দুঃখের বোঝা বেড়েই চললো। আবার সেই মনুষ্য সম্পর্কের নির্দেশনা। ইন্দ্রিয়পরায়ণ আত্মসর্বস্ব Dick Gurvil নান-এর জীবনে এলো; নান তাকে ভালোবাসলো। গুরভিলের ভালোবাসায় নানের চরিত্রের একটি দিক অবারিত হল দর্শকের চোখে; খুল্লতাত Pargetter দুর্বল চরিত্র এবং তাঁর পত্নী Mrs. Pargetter কঠোর চরিত্র এবং দয়ামায়াহীন রমণী। এঁদের দুজনের সৌহার্দ্য এবং সৌহার্দ্যর অভাবের অভিঘাতে Nan-এর চরিত্রের নতুন নতুন দিক্দর্শন ঘটেছে সাধারণ দর্শকের চোখেও। ফাঁসিকাঠে নিহত পিতৃদেব, অপদার্থ পুরুষ প্রণয়ী, দুর্বল চরিত্র খুল্লতাত, স্নেহহীন খুল্লতাত পত্নী এরা সকলে Nan-এর চরিত্রকে বিয়োগান্ত পরিণতি দান করেছে। যে পরিণতি হলো Severn Bore-এর জলে Nan-এর সলিল সমাধি।

প্রসঙ্গত জার্মান ভাষায় লিখিত আর একটি নাটকের কথা বলি; Franz Kafka প্রণীত The Trial নাটকটি যে সব চরিত্রের অবতারণা করেছে, তাদের মধ্যমণি হল Joshephk, সুদর্শন, সদালাপী মার্জিত-রুচি মধ্যবিত্ত সমাজের কৃষ্টিবান পুরুষ। জীবনের কাছ থেকে আনন্দের উপচার গ্রহণ করতে এবং প্রতিদানে সমাজকে বৃহত্তর এবং মহত্তর আনন্দের সন্ধান দিতে Joshephk ছিলেন সদা উন্মুখ। তারপর নাটকের ঘটনা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাত্ যে সব চরিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত হল তারা হলেন পুলিশের Inspector এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা, Frau Groubech, Frauline Purstner, Elssa ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার, Joshephk-এর খুল্লতাত, তার বান্ধব Joshephk-এর আইনজীবি Dr. Hold, লাস্যময়ী তরুণী Leni, শিল্পী Titorelli এদের সবার চারিত্র্য-শক্তি, অন্ধলোভ, ঈর্ষ্যা, অলস নিষ্ক্রিয়তা ও গতানুগতিকতার স্রোতে সব ভাসিয়ে দিয়ে আলস্যভরা উপভোগ প্রবণতা K চরিত্রকে এরা মর্মান্তিক পরিণতি দিয়েছিল। এইসব ভিন্ন ধর্মী চরিত্রের অভিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অচলায়তন সমাজের অচলতা। যে সমাজ ন্যায় অন্যায়ের বিচারকে উপেক্ষা করে ভালো মন্দের জ্ঞানটুকুকে বিসর্জন দিয়ে অলস আয়াসে গা ঢেলে দেয়; তার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বন্যায় মানবতার যে পরিণতি ঘটে তার সাক্ষ্য আছে 'The Trial' নাটকটির সর্বাঙ্গে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

যে অচলায়তনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অচলায়তনকে দেখেছিলেন Frank Kafka; মনস্বী পাঠক যতই নাটকটির গভীরে প্রবেশ করবেন ততই তার মনে এক ধরণের প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে; সামাজিক অবস্থার চাপে Joshephk চূড়ান্তভাবে যে সমাজ ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করলো পাঠকের সমগ্র সত্তা জুড়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠল। Joshephk তাঁর পরিচিত এবং আধা পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষদের চারিত্র্য অভিঘাতে এবং অলস নিষ্করুণ সমাজের অব্যবস্থায় এক মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতিতে উপস্থিত হল। Joshephk জীবনাহুতি দিয়ে শান্ত ভাবে তার প্রতিবাদটুকু জানালেন। কিন্তু পাঠকের মনে তা সরব প্রতিবাদে বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল। এই শতকের বৃটিশ নাটকের মধ্যেও আমরা Kafka'র অদৃশ্য সামাজিক শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি। নাটকীয় চরিত্রের আবর্তন লক্ষ্য করা গেছে একদিকে যেমন অন্যান্য পাত্র পাত্রীদের চারিত্র্য অভিঘাতের মধ্য দিয়ে তেমনি আবার সামাজিক বিধি ব্যবস্থাও নাটককে গতিশীল করেছে, নাটকের চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত ক'রে তাদের সুনির্দিষ্টতা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা Galsworthy-র কথা বলতে পারি। তার নাটকগুলির মধ্যে Strife, Justice, The Pigeon, The Eldest son, The Fugitive এবং The Mob সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। Strife নাটকটিতে, আমরা নাটকীয় চরিত্রে বীর্যবত্তা অথবা দুর্বলতার চেয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিবদমান দুটি তত্ত্বের বিরোধ। পুঁজিবাদী সমাজ দর্শনের সঙ্গে পুঁজি-বাদী বিরুদ্ধ মতবাদিতার সংগ্রাম। কোম্পানীর প্রধান Antony সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়েছিল কোম্পানীর সমগ্র কর্ম-নৈপুণ্যে। সেই দূর বিস্তৃত অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন শ্রমিকনেতা Roberts; ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমতান্ত্রিক মানুষের জেহাদ ঘোষণায় সমাজের সবতলাতেই বিপ্লব শুরু হয়। সেই বিপ্লবের পরিণতি নাটকীয় চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ ধরণের পরিণতি দিয়েছে। এই পরিণতি হল যুযুধান সামাজিক শক্তির দেওয়া এক ধরণের সুনির্দিষ্টতা। এর হাত থেকে নাটকের কোন চরিত্রের

রেহাই নেই। ব্যক্তিগত চরিত্রের বীর্যবত্তা এই সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিণতিকে কোথাও এতটুকু ব্যাহত করতে পারে না। Galsworthy-র অন্যান্য নাটকেও আমরা এই সামাজিক শক্তির একচ্ছত্র প্রতাপ লক্ষ্য করেছি। Justice নাটকে, The Mob নাটকে সেই একই তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি। কোথাও মানুষের অসামাজিক জীবনযাপন-প্রবণতা, কোথাও তার নৈতিক শিথিলতা, কোথাও বা সমাজের স্ত্রীলোকের উপভোগ্য স্বাধীনতার তত্ত্বটুকু নাটকের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা একথা না বলে পারি না যে Galsworthy ও সমসাময়িক বৃটিশ নাট্যকারদের নাট্যদর্শন এথেনীয় ও এলিজাবেথীয় ঐতিহ্যবাহকতা ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। শুধু মাত্র অর্থনৈতিক এবং বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদীদের ধ্যানধারণা, বিশ্বাস কোন বিয়োগান্ত নাটকের মর্মস্পর্শী পরিণতিটুকু দান করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নাট্যকারের এক দিগন্তস্পর্শী সুবিরাট দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ভাবানুষঙ্গ। নাট্যকারের এই ধরণের পরাদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ উত্তীর্ণ এক দার্শনিক দৃষ্টি মহাবলয়ে আব্রহ্মস্তম্ভ-বিলম্বিত মানুষের সমগ্র জীবনবোধটুকু প্রতিফলিত হয়। সমালোচক এই সম্যক্‌দর্শন করার ভঙ্গিটুকুকে নাম দিয়েছেন Metaphysical vision ; এই দার্শনিক দৃষ্টি হল সার্থক নাট্যকারের অন্তর্দৃষ্টি। ক্রোচীয় পরিভাষায় একেই আমরা স্বজ্ঞা বা Intuition-এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এর মধ্যে একধরণের সমগ্রতা বিধৃত যার সন্ধান বস্তুতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ক্ষুদ্র পরিসরে অলভ্য। এই সমগ্রতা নাট্য-শিল্পীর জীবনায়নেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সার্থক অভিনেতা, গুণী নাট্যকার, এঁরা কিন্তু আপন আপন জীবনবেদেও এই সমগ্রতাটুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধদর্শনে যে সম্যগ্‌ দৃষ্টি, উপনিষদে যে ভূমাবন্দনার কথা আমরা পাই, তার প্রয়োগ ব্যতিক্রম নাট্যবেদে নেই। জার্মান রঙ্গমঞ্চের জনক কনরাড একহপের কথাই বলি। একহপ তাঁর শ্রেণীর সঙ্গে, তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার সমাজের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে বেঁচে-ছিলেন। তাঁর শিল্পচেষ্টায় কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বৃহত্তর সমাজ। তাঁর

বিশ্বাস ছিল বৃহত্তর মানবাত্মা এই বৃহত্তর সমাজকে অবলম্বন করে থাকে। তাইত কবি গ্যয়েটে এক মরণোত্তর প্রশস্তি গেয়ে লিখলেন :

"তোমরা শোন
তোমাদের জন্য তিনি শিল্পকলার সৃষ্টি করেছিলেন,
তোমাদের শ্রেণীকে করেছিলেন মহত্তর
তোমাদের নাটকের তিনি ছিলেন দৈববাণী
তোমাদের প্রথার তিনি ছিলেন প্রতিভূ।"

দার্শনিক লেসিংগ তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হামবুর্গিশে ড্রামাটরেজি' গ্রন্থটি লিখলেন একহফের অভিনয় থেকে প্রেরণা পেয়ে। নাট্যবেদ ও জীবন-বেদ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের গভীরে একাত্ম হয়ে গেছে সে কথা লেসিংগ ঘোষণা করলেন, যেমনটি করেছিলেন ভারতীয় রসশাস্ত্রী ভোজদেব। আধুনিক বৃটিশ রঙ্গমঞ্চে যে ধারা বহমান, তা একদিকে যেমন জার্মানীর নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে, অন্যদিকে আবার তা ভারতীয় ভাবেরও বিরোধী নয়। সর্বগ-ভাব-ভাবনা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে নানাদেশের রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় ক'রে। কোন বিশেষ ভাব কোন দেশ-বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই।

রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্র শিল্পদর্শন

আমরা জানি যে ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়া আর সেই ছবি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও মানদণ্ডের প্রয়োগে তার সঠিক মুল্যায়ন করা যে এক কথা নয়, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত। তাই নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে যখন কোন শিল্পীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখন আমরা যে তার দার্শনিক রূপটুকুর সন্ধান করি, একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ আমরা তাঁর শিল্প-দর্শনের অনুসন্ধান করি। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-দর্শনের গভীরে যাওয়া আয়াসসাধ্য কর্ম। শিল্পী মন স্বঃতই স্বজ্ঞা বা Intuition-কে আশ্রয় ক'রে 'দৃষ্ট সিদ্ধান্তে' উপনীত হয়েছে এবং শিল্পী সে সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেছেন কল্পনাপ্রবণ রূপকের সমন্বয়ে। তাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

পারিবারিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন খুড়ো এবং ভাইপো। উভয়েরই প্রতিভা ছিল বহুমুখী। লেখা এবং আঁকা—এ দুয়েতে দুজনেরই দখল ছিল অসাধারণ। অভিনয় নৈপুণ্যে, কারো কারো মতে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উঁচুতে। সে যাই হোক্ উভয়ের লেখায় এমন একটা প্রসাদ গুণ ছিল যা অনন্যসাধারণ। প্রতিভার জাদু স্পর্শে উভয়ের লেখাতেই এসে লেগেছিল—'উড়ে চলার ভাও'। প্রতিভাকে বলা হয়েছে 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'—সে হ'ল স্থষ্টির পরশ পাথর। সেই পাথর দিয়ে যাকেই স্পর্শ করা যায়, তা অমিত দ্যুতিতে দ্যুতিমান হ'য়ে ওঠে অচিরেই। কিন্তু গোয়ালার গলিতে পড়ে থাকা মরা বেড়ালের চোখে ও আকাশে কনে দেখা আলোর রং যে এসে লাগে, তা এই প্রতিভার দাক্ষিণ্যেই সম্ভব হয়। গ্রামের অতিসাধারণ মেয়ে কমলা কাব্যলোকের ক্যামেলিয়ার রূপ মাধুর্যে ভরপুর হ'য়ে ওঠে। এই প্রতিভা বাসা বেঁধেছিল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের অন্তরে। তাই অবনীন্দ্রনাথ মস্ত পটুয়া হ'য়েও অনন্যসাধারণ লেখক।

তাই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মতই বড়। আবার গল্পকার অবনীন্দ্রনাথও প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথের মতই শ্রদ্ধেয়। যাঁরা তাঁর 'বুড়ো আংলা' 'রাজকাহিনী' পড়েছেন এবং মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করেছেন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ ও ভারত-শিল্পে মূর্তি গ্রন্থের ব্যক্তব্য, তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা বলবেন যে গল্পকার ও প্রবন্ধকার হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'Personality', 'Religion of Man', 'শান্তিনিকেতন' প্রমুখ সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক নানান্ লেখায় আপনার নন্দনতাত্ত্বিক বক্তব্যটুকু বিবৃত করেছেন, তেমনি ধারা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' 'ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ' ও 'ভারত-শিল্পে মূর্তি' গ্রন্থে আপনার শিল্প দর্শনটুকু ব্যাখ্যাত করেছেন।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্প ও শিল্পদর্শন এক নয়। যিনি বলবেন শিল্পের সার্থকতা তার রসাস্বাদনে, তিনি সত্য কথাই বলছেন। কিন্তু রসাস্বাদন করা 'ত' আর রসের তত্ত্ব বিচার নয়। আগেই বলেছি সুন্দরকে উপভোগ করা আর সুন্দরের চারিত্র্য-ধর্ম বিশ্লেষণ করা এক কথা নয়। অবশ্য সুন্দরকে উপভোগের মধ্যে হয়ত তার চারিত্র্য-ধর্মের সহজ মৌল বিশ্লেষণটুকু অনুস্যূত হ'য়ে থাকে। বুদ্ধির পরিশীলন বিবর্জিত যে উপভোগ সে উপভোগ পশুপক্ষীর ইন্দ্রিয় উপভোগের সমতুল্য। সে উপভোগ নিশ্চয়ই কবির বা শিল্পর যোগ্য নয়। অনুক্ত বিশ্লেষণটুকু; অপ্রকট আন্তর অনুশীলনটুকু শিল্পর বা শিল্পরসিকের উপভোগকে উচ্চগ্রামে বেঁধে দেয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে ভেদটুকু রয়েছে তা সৃষ্টি করেছে এই বুদ্ধির কারুকর্ম। সেই কারুকর্মটুকু নিঃশব্দে অগোচরে শিল্পর বা শিল্পরসিকের রসের উপভোগটুকুকে বাড়িয়ে তোলে। অন্ধ আবেগের বেগশীলতাকে বুদ্ধির হাল দিয়ে সংযত ক'রে রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় আমাদের বলেছেন যে নদীবক্ষে বোটের নিভৃত কক্ষে বসে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বেলে তিনি যখন কাগজ-কলম নিয়ে সৌন্দর্যের তত্ত্ব বিচার করবার চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুতেই তার স্বরূপটুকু নির্ধারণ করতে পারছিলেন না, তখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন।

যেই না আলো নিভিয়ে দেওয়া অমনি জানালার বাইরে অপেক্ষমান চাঁদের আলো কবির বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে ও বুকে লুটিয়ে পড়ল; তিনি পুলকিত হলেন। এ পুলক কিন্তু রসবিচারের পুলক নয়, এ হ'ল রসোপলব্ধির আনন্দ। এ আনন্দে শিল্প মেতে ওঠেন; শিল্প-রসিকও আত্মহারা হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তত্ত্বটি পরিবেশন করলেন তাতে আমাদের মতে এই প্রসঙ্গে সত্যের সবটুকু পরিষ্কার ক'রে বলা হয়নি। এমন ধারণা পাঠক হয়ত করতে পারেন যে কবি এই কবিতাটিতে কাব্যরসিকের সৌন্দর্যের রস বিচারে নিষ্কামতার তত্ত্বটুকু জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। শুধু রসসম্ভোগের পথেই বুঝি সুন্দরের চারিত্র্য-ধর্মটুকু উদ্বারিত হ'য়ে ওঠে। আমরা এই প্রসঙ্গে শুধু বলব যে কবির সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণের আপাতঃ নিরর্থক প্রয়াসটাই তার সৌন্দর্য-উপলব্ধির সহায়তা করেছে। ঐ যে অনেক রাত অবধি সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রয়াসটুকু নিস্ফল হ'ল বলে মনে হ'ল, তা কিন্তু বস্তুতঃ নিস্ফল হয়নি। ঐ প্রয়াসটুকুর আপাতঃ নিস্ফলতা কবির মনে যে অভাববোধ সৃষ্টি করল, সুন্দরকে ধরার জন্য যে সাময়িক আকুতি সৃষ্টি করল তা কবিকে চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ দ্যুতিতে 'অপর'কে প্রত্যক্ষায়িত করার অবকাশ দিল। কবি অঞ্জলি ভ'রে সেই সুন্দরের দানটুকুকে গ্রহণ করলেন এবং তা অমর হ'য়ে রইল কবির ঐ কবিতাটিতে। সে দান হ'ল আনন্দের সাগরে অবগাহন স্নান। ভরতমুনিকে অনুসরণ ক'রে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের অনুসারী হয়ে এই আনন্দকেই এঁরা উভয়ে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই বললেন যে শিল্পানন্দই ব্রহ্মানন্দ, এরা উভয়ে একই কোটির।

শিল্প সৃজনে অথবা শিল্পের রসোপভোগে শিল্পী যেমন শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়েও মরমিয়া সাধকের মতই কোন এক অনির্দেশ্য মন্ত্রগুপ্তির সুড়ঙ্গপথে আপনার শিল্পীসত্তাটুকুকে নিত্য উজ্জীবিত ক'রে রাখেন সবার উর্ধ্বে, ঠিক তেমনি ভক্তিমতি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণ করেও আপনার নিগূঢ় সার্বিক সত্তাটিকে নিত্য সত্য করে রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরসের আস্বাদন করার জন্য। সে রস হ'ল আনন্দরস;

সেই ব্যক্তি-আস্বাদন-সাপেক্ষ আনন্দরসই হ'ল ভক্তিরস। ভক্ত সেই রসে অবগাহন স্নান করেন। তাইত কবির আত্মস্বাতন্ত্র্যের মতই শিল্পীর শিল্পী-স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এটুকু না করলে আমাদের আস্বাদন সম্ভব হয় না—না ভক্তের, না শিল্পীর। এই আনন্দেই সকল সৃষ্টি স্বপ্রতিষ্ঠ।

এই আনন্দই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রেরণা। শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন রসিকসুজনকে এই আনন্দটুকু দেবার জন্যে। একেই বলা হয়েছে রস। রবীন্দ্রনাথ এই রসের আধারকে নির্দিষ্ট করেছিলেন 'সুমিতিবোধের' দ্বারা চিহ্নিত ক'রে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পকর্মই শিল্পীর সুমিতিবোধের দ্বারা চিহ্নিত। অবশ্য একথা মানতে হবে যে এই 'সুমিতিবোধের' কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। কথাটা এই অর্থে বুঝতে হ'বে যে অর্থে দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন: "All determination is negation"; সুমিতিবোধের অর্থটুকু সুনির্দিষ্ট ক'রে দিলে সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করা হয়। যদি বলা হয় শেলীর 'Skylark' কবিতাটি 'সুমিতিবোধের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তখনই প্রশ্ন হবে কীটসের ঐ একই শিরোনামের কবিতাটিতে কী এই সুমিতিবোধের অবভাস ঘটেছে? অর্থাৎ শেলীর স্কাইলার্কে 'সুমিতিবোধ' নামক দুর্লভ বস্তুটির সদ্ভাব ঘটলে কীটসের ঐ নামের কবিতায় কী তার অসদ্ভাব ঘটেছে? অবশ্য সমালোচক বলবেন যে সব রসোত্তীর্ণ কাব্যেই কবির সুমিতিবোধটুকু অনুস্যূত হ'য়ে হ'য়ে যায়। তা না হলে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না। এ কথা বললে 'সুমিতিবোধ' তার সুনির্দিষ্ট অর্থটুকু হারিয়ে ফেলে। আমরা 'সুমিতি-বোধে' বহু বিচিত্র এই অর্থের অধ্যাসটুকুকে সম্ভব করার জন্যই বলেছি যে শিল্প প্রসঙ্গে এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। 'সুমিতি' কথাটির অর্থ সর্বকালেই পরিপূরক। অর্থাৎ শিল্পীর 'সুমিতিবোধ'টুকু দর্শকের রস-বোধের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হ'য়ে সব সময়েই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। অবশ্য কিভাবে কোন পথে আমাদের এই চেনা জগৎটার অভিজ্ঞতা 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে, তা বলা খুবই শক্ত; আর তা বেশ শক্ত বলেই রবীন্দ্রনাথ বললেন 'Art is Maya'; অবনীন্দ্রনাথ বললেন তন্ত্রকে অনুসরণ করে: 'এ যেন পাখীর এক গাছ

থেকে আর এক গাছে উড়ে চলা'. অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর 'Poetry Monads & Society' গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা ক'রে শিল্পের প্রকৃতি নিরূপক সংজ্ঞা দেওয়া অথবা তার ব্যাখ্যা করা যে কী দুরূহ তা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। শিল্পকে ব্রহ্মালাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করেছেন এমন সমালোচকের অভাব নেই; আবার উৎপীড়িত মানুষের বিদ্রোহী সত্তার জাগরণটুকুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য শিল্পকে অহিফেন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এমন অভিযোগও আমরা শুনেছি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ চিন্তা-নায়কদের কাছ থেকে। আপাতঃদৃষ্টিতে এ দুটি মতই গুরুত্বপূর্ণ। সুদীর্ঘ বিশ্লেষণান্তে এই দুই ভিন্নধর্মী মতের মূল্য যাচাই সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের ধর্মবিচারের প্রসঙ্গে বললেন তন্ত্রকে অনুসরণ ক'রে: 'এ যেন পাখীর একগাছ থকে আর এক গাছে উড়ে চলা,' আকাশপথে তার চিহ্ন রহিল না কোথাও।'

আনন্দের সন্ধান হল শিল্পীর সাধনার বস্তু। সেই আনন্দের সন্ধানকেই এঁরা উভয়েই রূপের সন্ধান বলে গ্রহণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে শিল্পী যখন জানলার পাশে চুপ করে বসে আছেন বাইরের দিকে চোখ মেলে তখন তিনি মোটেই নিষ্ক্রিয় নন। তাঁর অন্তরে তখন রূপের সন্ধান চলেছে। সেই সার্থক রূপ সৃষ্টিতে রূপের সত্যতা নিহিত থাকে, একথা উভয়েই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে বললেন রূপের Truth; অর্থাৎ শিল্পবস্তুর সত্যতা, বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। আমরা যখন রামায়ণ পাঠ করি তখন সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, উর্মিলার ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে তত্ত্বালোচনা করি না। রসের আস্বাদনেই রামায়ণের সত্যতা। যুগ যুগ ধরে যে আনন্দে রসিকচিত্ত স্নান পান ক'রে ধন্য হয়েছে; সেই আনন্দই হল শিল্পসত্যের পরিমাপের মাপকাঠি। সেই মানদণ্ডেই শিল্পউৎকর্ষের পরিমাপ হয়ে, আবার সেই মাপকাঠিতেই শিল্প-সত্যেরও বিচার হয়। তাই 'ত' রবীন্দ্রনাথ বললেন: সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পসত্য ও শিল্পরূপ সমার্থক। অবনীন্দ্রনাথও এই মতের পোষকতা করেছেন।

এই ধরণের অভিমত পোষণ করার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়ের চোখেই শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে ছবি আঁকার আইন-কানুন শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য, শিল্পীর জন্য নয়; শিল্পীর শিল্প হবে সব নিয়মের ঊর্দ্ধে; শিল্প হবে 'নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত'। শিল্পের জগতে প্রকৃতির কোন নিয়মেরই অন্ধ পুনরাবৃত্তি সঙ্ঘটন করানো বাঞ্ছনীয় নয়। আঁকা ছবির চাঁদটাও যদি রোহিণী ভরণী কৃত্তিকা সবিতা আকাশের চন্দ্রদেবের মতোই দেখতে হয় তবে আর লোকে ছবির চাঁদটার দিকে দেখবে কেন? বিশ্ববিধাতা যে উপকরণেই চাঁদটাকে গ'ড়ে থাকুন না কেন, ঐ উপকরণের স্থূল বাধাটা বিশ্ববিধাতার কল্পনা ব্যাহত করেছে। দার্শনিক হেগেলের ভাষায় শিল্প হ'ল 'Sensuous persentation of the Absolute' অর্থাৎ নির্বিশেষ মহাসত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষিত রূপটুকুই হ'ল শিল্প। এই রূপটুকু পার্থিব জড়জগতের জড় উপাদানে হয়ত ঠিকমত প্রকট হয়ে ওঠে না। তাই ত' শিল্পীর কল্পনায় তার তুলি-রঙের, তার কথা ও কাব্যের প্রয়োজন হয় এই নির্বিশেষ মহৎ রূপটুকুকে বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য। হেগেলের মতে এইখানেই শিল্প-সার্থকতা। আমাদের শিল্পশাস্ত্রেও মনুষ্যশিল্প ও দেবশিল্পের সাযুজ্যের কথা ঘোষিত হয়েছে। সেই সাযুজ্য এই অর্থে। প্রকৃতির রূপকে যদি 'দেবশিল্প' বলি তা হ'লে বলব যে সে রূপ বর্ধিত রূপ। শিল্পীর হাতে প্রকৃতির যে নবতর রূপায়ণ ঘটে সে রূপ নির্বাধ, বাধাহীন। ছবির পাখীটা ঠিক ঐ গাছে বসা পাখীটার মত নাও হ'তে পারে। আর তা হয়নি বলেই তাকে একেবারে নাকচ করা চলবে না। চিত্র প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রকৃতির নকলনবিশ হরবোলাকে খোঁজেন তাঁরা শিল্পের রস থেকে বঞ্চিত হন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাদৃশ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন যে প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সাদৃশ্য হবে ভাব-সাদৃশ্য। এই ভাব সাদৃশ্যের তত্ত্বটুকু শিল্পকে প্রকৃতির অনুলিপি বা প্রতিরূপ হতে বলে না। রবীন্দ্রনাথও শিল্পে অনুকৃতি তত্ত্বের বিরোধী। এঁরা উভয়েই এই প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্তুতলের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে প্রকৃতির এই অনুকৃতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বললেন তেমনি ধারা অবনীন্দ্রনাথও সেই কথাই বললেন তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে। শিল্প যদি অনুকৃতি মাত্র হ'ত তাহলে ফোটোগ্রাফি এবং হরবোলার বুলি সব থেকে বড় শিল্প

ব'লে পরিগণিত হত। তবে তা ত' কোথাও শিল্পশাস্ত্রের বিচারে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বার বার ক'রে বললেন আমরা যেন শিল্পকে প্রয়োজনের বেড়াজালে না বাঁধি। শিল্প হয়েছে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে, দার্শনিক কাণ্টের ভাষায় শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল 'purposiveness without purpose', অর্থাৎ শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল সর্ববাধাহীন এবং সকলপ্রকার জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত। শিল্পের বিচারে শিল্পের প্রকৃতি বহির্ভূত কোন নিমিত্তকারণ অথবা উপাদান কারণের সার্বভৌম স্বীকৃতি প্রকৃত রসিক সুজনেরা কখনই দেন না। যদি শিল্পীর শিল্পেত্তর কোন প্রয়োজন শিল্প-জননীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তবে তা শিল্পের স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব করে। একদিকে যেমন এর ফলে শিল্প-চারিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, অন্যদিকে আবার তা শিল্পীর স্বাধীনতাকেও ক্ষুণ্ণ করে। হেমলিনের বংশীবাদক কোন মহৎ সঙ্গীত সৃষ্টি করেনি কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাল হরণ ক'রে হেমলিনের অসাধু পৌর পিতাদের শাস্তি দেওয়া। সেখানে সঙ্গীতের চেয়ে শাস্তিটাই বড় হয়ে উঠেছে। যেখানে এটা ঘটে, সেখানে শিল্পটা গৌণ হ'য়ে পড়ে; শিল্পেত্তর উদ্দেশ্যটা বিন্ধ্যপর্বতের মত মাথা তুলে শিল্পানন্দের সূর্যালোকের পথটাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। তখন আর রবীন্দ্রনাথের কথায় শুধু 'অকারণ পুলকে' কবি-মন আর ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গেয়ে ওঠে না। কবি কল্পনা প্রয়োজনের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে তার উড়ে চলার ছন্দটুকু হারিয়ে ফেলে। অবশ্য এই প্রয়োজনের কথাপ্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজনেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। শিল্পের প্রসঙ্গে প্রয়োজনকে আমরা আন্তর প্রয়োজন ও বহিপ্রয়োজন এই দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। বাইরের জীবনের ও জগতের প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় না। শিল্প জন্ম নেয় শিল্পীর আন্তর প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজনের তাগিদটুকু হ'ল সর্বনাশা; সেই তাগিদে সৃষ্টিশীল হয়ে শিল্পী 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' মেতে ওঠেন। কিন্তু এই আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে ওঠার পূর্ব অবস্থাটুকু আন্তর প্রয়োজনের উন্মাদনার দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের ঘাত প্রতিঘাত শিল্পী-মনের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে উদ্দীপ্ত করে তোলে; সে প্রয়োজন হ'ল সৃষ্টি করার প্রয়োজন। সৃষ্টি করার কাজটুকু সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত

শিল্পী শান্তি পান না। শিল্পীর এই অশান্ত মনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' শীর্ষক কবিতায়। ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির শোকাবহ মৃত্যুতে মর্মান্তিকভাবে বিচলিত হয়েছেন মহাকবি বাল্মীকি; সমবেদনার অশ্রু উথাল পাথাল করছে তাঁর সবটুকু অন্তর জুড়ে। অব্যক্ত বেদনা প্রকাশের জন্য মাথা কুটে মরছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে; এই প্রকাশের প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আন্তর প্রয়োজন। সেই আন্তর প্রয়োজনের তড়িতাহত হয়ে মহাকবি বাল্মীকি তমশা নদীর তীরে উদ্‌-ভ্রান্তের মত পায়চারি করছেন। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি বাল্মীকির সৃষ্টি-উন্মুখর সেই ছবিটি আঁকলেন: "রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত, মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত, তারে লয়ে কি করিবে ভাবে মুনি, কি তার উদ্দেশ?" যে আন্তর প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় সে প্রয়োজনটুকু হল শিল্পীর আত্মার আত্মীয়। শিল্পী কল্পনার প্রসাদগুণে, সামীপ্য এবং সাজুয্য বোধের সঞ্জীবতায় যে কোন প্রয়োজনকেই আপন আন্তর প্রয়োজনের রূপটুকু দিতে পারেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থের কবিতা গুচ্ছ আমাদের এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাইরের প্রয়োজনের এবং অনুরোধের তাগিদে এই কবিতাগুলির জন্ম হলেও এদের অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। বাইরের জীবনের প্রয়োজনটুকু কবি আন্তর প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, আর সেই নিষ্ঠাই কবি কল্পনায় মন্ত্রশক্তির কাজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে আন্তর প্রয়োজন ও বহিপ্র্রয়োজন, এই দুয়ের ভেদটুকু ঘুচে গেছে। যেখানে এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের ভেদ ঘুচে যায়, সেখানে শিল্প এক বৃহত্তর অর্থে 'নৈতিক' হ'য়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে শিল্প জীবনের Response হিসেবে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বটুকু তার বাস্তব বিস্তার ও সম্ভাব্য প্রসারটুকুকেও ব্যঞ্জিত করে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তি-মানস আবার সমকালীন সমাজের দ্বার উজ্জীবিত ও প্রাণিত হয়। তাই দার্শনিকপ্রবর ক্রোচে তাঁর শেষ জীবনের লেখায় শিল্পের এই নৈতিক রূপটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন। শিল্পী বা শিল্পসমালোচক নীতিবাগিশ না হ'লেও, আধুনিক নন্দনতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে তার 'নৈতিক'

র দি /দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-২০

হ'তে কোন বাধা নেই। নব্যতন্ত্রী কেমব্রিজ সমালোচনার ধারার বাহক F.R. Leavis এর কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ফ্রেজার (G. S. Fraser) লিয়েভিস প্রসঙ্গে বললেন যে তাঁর মধ্যে নীতিপ্রবণ যে সমালোচকপ্রবর রয়েছেন তার উপস্থিতি আধুনিক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অর্থাৎ লিয়েভিস্ যেভাবে শিল্পের চৌহদ্দিতে নীতি-প্রবণতাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মৌল শিল্প দর্শনের অনুসারী। সেখানে এঁরা উভয়েই তাঁদের সমকাল ও পরবর্ত্তী যুগকে প্রতিফলিত করেছেন আপন আপন শিল্পচিন্তায় ও শিল্পদর্শনে, একথা বললে অত্যুক্তি হ'বে না।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তায় যখনই তিনি অন্তর্গূঢ় ভাবনার প্রবর্তনা করেছেন তখনই দেখি তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধৃত ক'রে নিজের সূক্ষ্ম ভাবনাটিকে বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিল্পসৃষ্টির কথায় আসি। খোলা চোখে দেখাটা যে দর্শন-কার্যের সবটুকু নয়, এ সত্যটির দিকে তিনি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

রমাঁ রলাঁর শিল্পদর্শন

শিল্পদর্শনের ইতিহাসে যে কয়জন মনীষির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়েছে সুউচ্চ চিন্তায় এবং সুগভীর ব্যঞ্জনায়, তাঁদের মধ্যে রমাঁ রলাঁকে আমরা অগ্রণী ব'লে ভাবতে পারি। তাঁর শিল্প ধারণা একদিকে যেমন শিল্পীর স্বাধীনতার ধারণাকে আশ্রয় করেছে অন্যদিকে তেমনি তার সত্যের ধারণা থেকেও বিচ্যুত নয়। শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পী সর্ববন্ধন বিমুক্ত হবে; এই বন্ধন বিমুক্তির মধ্যে কিন্তু সত্যের নির্দেশনা ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এটা ভাববার কথা যে শিল্পে শিল্পীর সার্বভৌম স্বাধীনতার মধ্যে কিভাবে আমরা সত্যের নির্দেশনাগুলিকে স্থান দিতে পারি। সত্যনিষ্ঠ হয়েও শিল্প কী আপন সার্বভৌম স্বাধীনতাটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে? এই প্রশ্নটা হ'ল নন্দনতত্ত্বের অন্যতম দুরূহ প্রশ্ন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, শিল্পের স্বাধীনতা হ'ল হৃদয়ের স্বাধীনতা, অনুভূতির স্বাধীনতা, অনুভবের স্বাধীনতা; তারই সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে চিন্তার স্বাধীনতাকে; তা হল বুদ্ধিগত। সত্যের ধারণা এই বুদ্ধিগত স্বাধীনতার উপজীব্য, বুদ্ধিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে সত্যের ধারণা। উদাহরণ দিই: আমি বলতে পারি না যে টেবিলের পাঁচটা পা আছে। আমার কল্পনা এখানে আমার বুদ্ধিগত ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। এই যে বস্তুগত সত্যের ধারণা একে আমরা প্রাকৃত সত্য বলে জানি। এই সত্য কাব্যসত্য নয়। প্রথম জীবনে রলাঁ ভেবেছিলেন যে এই প্রাকৃত সত্যকে শিল্পে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। তিনি বলেছিলেন, 'If art has to dabble with falsity, I say good bye to all arts' অর্থাৎ শিল্পী যদি মিথ্যার বেসাতি করে তবে সেই শিল্প তার কাছে সর্বথা পরিত্যজ্য। এই বুদ্ধিগত সত্যের ধারণা এবং হৃদয়গত সত্যের ধারণা—এই দুয়ের সমন্বয় রলাঁ ঘটাতে

চেয়েছেন শিল্পবৃত্তে। শিল্প বলয়ে বুদ্ধিগত সত্য বলতে আমরা বস্তুগত বা প্রাকৃত সত্যকে বুঝি একথা আগেই বলেছি। আর হৃদয়গত ব্যাপার। এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন রমাঁ রলাঁ শিল্পের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। এই সময়ের রলাঁ উত্তরকালের পরিণত রলাঁ। প্রথম জীবনে তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রলাঁকে আমরা দেখি, এ রলাঁ সে রলাঁ নয়। প্রথম জীবনে রলাঁর কাছে, তরুণ চিন্তাবিদ রলাঁর কাছে বস্তুগত সত্যটাই, প্রাকৃত সত্যটাই বড় হয়ে উঠেছিল। তিনি তখন সামাজিক কল্যাণকে তাঁর নন্দনতত্ত্বে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন। তখন তাঁর মত ছিল, যে শিল্প সমাজের কল্যাণ সাধন করে না, তা 'শিল্প' পদবাচ্য নয়। মানুষের কল্যাণসাধনই হবে শিল্পের লক্ষ্য। সেই কল্যাণ হ'ল বস্তুগত কল্যাণ। সেই কল্যাণ প্রাকৃত সত্যকে তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্বীকার করে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: 'I dream of nothing more than to do a little good to men and draw them away from the nothingness that kills them' জীবনের এই শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে পারে একমাত্র আমাদের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠাই হল প্রথম পর্যায়ের রমাঁ রলাঁর নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিভূমি। অবশ্য পরিণত রলাঁর চোখে এই সত্যের ধারণার রূপ বদল ঘটেছিল। এবার সে কথা বলি।

শিল্পের ক্ষেত্রে Apollonian ও Dionysian এই দ্বিবিধ মুখ্য ধারণাকে তিনি স্বীকার করেছেন। শিল্পে বুদ্ধিগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে রলাঁ Apollonian বলেছেন এবং শিল্পের হৃদয়গত উপাদানকে Dionysian আখ্যা দিয়েছেন। নীট্‌শের 'Origin of Tragedy' গ্রন্থ থেকে রলাঁ এই দুটি শব্দ চয়ন করেছিলেন ; তাঁর ওপর নীট্‌শের প্রভাবও কম নয়। রলাঁ নীট্‌শের উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমরা তার পুনরুক্তি করছি—'In this book Nietzsche has delineated two types; Apollonian and Dionysian. The former are the disciples of Apollo and stand for pure intellectualism. The latter are the disciples of Dionysius and stand for unbridled emotionalism. The outlook of each on life is sound up to a point. The correct view of life should aim

it harmonization of these two attitudes. Apollonian ও Dionysian উপাদানের সমন্বয়ই হ'ল শিল্পসত্তা, একথা রলাঁ বললেন অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয়েই যে নিত্য রূপসৃষ্টি ঘটে সেই রূপই হল শিল্প সত্য। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে রূপের truth আখ্যা দিয়েছেন। এই 'রূপের truth' বলতে প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে কল্পনার যে সমন্বয়টুকু বুঝি তা কিন্তু রলাঁর মতে সজ্ঞান মনের ক্রিয়া নয়, চেতন মননের স্বাক্ষর তার উপর পড়ে না। রলাঁ বললেন "Such harmonization is always unconscious'—শিল্পাশ্রিত কল্যাণ হ'ল তার স্বাধীনতার প্রতীক। অর্থাৎ তার সত্যনিষ্ঠা হ'ল প্রাকৃত সত্যের অনুশাসন মেনে চলা, বস্তুগত সত্যের নির্দেশ মেনে চলা। অবশ্য আমরা যখন এ দুয়ের সমন্বয়কে শিল্প বলি তখন শিল্প কতখানি Dionysian উপাদান এবং কতখানি Apollonian উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এ দুয়ের সমন্বয়ে যে রূপ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রাকৃত সত্যের আভাস পাওয়া গেলেও তার সুনির্দিষ্ট রূপটুকু শিল্প সত্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আবার আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রাকৃত সত্যের সুনির্দিষ্ট রূপটুকু শিল্পসত্তার মধ্যে তেমন করে প্রতিষ্ঠা না পেলেও তা যে একেবারে বোঝা যায় না এমন কথাও বলা চলে না। কবি বললেন বটে, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'—কিন্তু এই সত্য কল্পনা-সর্বস্ব নয়। তার মধ্যে কোথাও একটা প্রাকৃত সত্যের নির্দেশনা থাকে। তাই রলাঁ বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়কে শিল্প আখ্যা দিলেন। সেখানে একদিকে যেমন কল্পনার প্রাধান্য নেই অন্যদিকে তা আবার একেবারে বুদ্ধিগত ব্যায়াম-কৌশলেও পরিণত হয় নি। তাঁর কথায় বলি, 'If artists thus indulge in intellectual acrobatics in the name of art, I am sure, art will die a natural death'. শুধুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধির উল্লম্ফনে যে শিল্পসৃষ্টি হয় না সেকথা রলাঁ বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন। যদি শিল্প শুধুমাত্র বুদ্ধিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় তা হলে তা সর্বত্রগামী হবে না। রলাঁর কথায় 'It will live for the coterie of a vain group —অতএব শিল্পকে তার এই সীমিত অতি পরিশীলিত সমঝদার গোষ্ঠীর

হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রলাঁ যথার্থ শিল্পরসিকদের আহ্বান করেছেন; 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' মানুষেরা এই বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিকে সমন্বিত ক'রে শিল্পের রসটুকু গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য রলাঁর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি মাইকেল এঞ্জেলো কৃত 'Last Judgment' নামক বিখ্যাত ছবিটির যে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পীর বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়ে যে শিল্পের সৃষ্টি হয় তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন যে অতি সুকঠিন কাজ তা রলাঁ সবিনয়ে স্বীকার করেছেন: "It is dangerous to attempt to describe the last Judgment, it is indeed impossible. Analysis and commentaries have been multiplied, but they kill the spirit by taking it in detail. We must face the vision squarely and lose ourselves in the abyss of the spirit." অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং চিত্র-সত্যে তার আরোপ, এ সব শিল্পের পক্ষে 'এহ বাহ্য'। বস্তুসত্য চিত্রসত্তার যে রূপসৃষ্টি করেছে তার সীমাহীন আত্মার মধ্যে অবগাহন করাই হল শিল্পের যথার্থ রসাস্বাদন। অর্থাৎ রলাঁ একথা বলতে চাইলেন যে বস্তুসত্য ও প্রাকৃত সত্য এবং শিল্পীর কল্পনা, এরা মিলে যে শিল্পসত্তা সৃষ্টি করে তা প্রাকৃত সত্য থেকেও এক দিকে যেমন ভিন্ন অন্যদিকে তেমনি আবার তা একান্তভাবে শিল্পীর কল্পিত সত্যও নয়।" ভাষান্তরে বলা যায়, রলাঁর মতে শিল্পের সত্তা হল প্রাকৃত সত্য থেকে উত্তীর্ণ শিল্পীর কল্পনায় অনির্ভর। আরেক ধরনের সত্তা, এই ধরনের সত্তা শুধুমাত্র শিল্পীর কল্পনা প্রসূত নয়। এই সত্তা আবার জীবনের প্রাকৃত সত্তাতেই নেই। শিল্পসত্তার মধ্যে কল্পনার লীলা রয়েছে, একথা রলাঁ স্বীকার করেছেন, সহৃদয় সামাজিকের রুচির বিভিন্নতাকে স্বীকার করে রলাঁ প্রকৃতপক্ষে শিল্পে কল্পনার কার্য-কারিতাকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। এই রলাঁ হল পরবর্তীযুগের রলাঁ। তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রলাঁ পিপ্‌লস থিয়েটারের কল্পনা করে-ছিলেন, এ রলাঁ সে রলাঁ নয়। প্রথম যুগের রলাঁ শিল্পের সত্যকে, শিল্পের সত্তাকে 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। জনগণের কল্যাণকামী রলাঁ জনগণের স্বার্থের বেদীমূলে শিল্পের উৎকর্ষকে উৎসর্গীকৃত

করতেও দ্বিধান্বিত হন নি। তাঁর শিল্প তখন শুধু জীবনের দিশারী। সেক্ষপীয়র ও হ্বাগ্নারকে তাঁর মানসলোক থেকে নির্বাসন দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করেন নি এই যুগে। এই তরুণ রলাঁর চোখে সামাজিক কল্যাণ অর্থাৎ জীবনের প্রাকৃত সত্যটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বললেন, 'People's theatre should represent the fundamental problems of life in simple and intelligent manner'. অর্থাৎ জীবনের সমস্যাসংকুল প্রাকৃত সত্যটা রলাঁর চোখে বড় হয়ে উঠল। এই রলাঁ অপরিণত রলাঁ। তিনি তাঁর 'পিপলস থিয়েটার' শীর্ষক গ্রন্থে লিখলেন, What profit can the people derive from the abnormal sentimental complication of Wagner the excessive eroticism, the metaphysics of valhalla, Tristian's death scented love, the mystico carnal torment of the Knight of the holygrail." শিল্পীর উদাত্ত কল্পনায় যে সব মহতী শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর শিল্প এবং সাহিত্যের অঙ্গন জুড়ে, তাঁদের যে মূল্যায়ন তরুণ রলাঁর হাতে ঘটল সেই মূল্যায়ন প্রবৃদ্ধ রলাঁ, প্রাজ্ঞ রলাঁ উত্তরকালে বরদাস্ত করেন নি। শিল্পীকে, শিল্পরসিককে তরুণ রলাঁ যেভাবে সাধারণ মানুষের কলাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে বললেন এবং যে অর্থে তিনি শিল্পকে সমাজ কল্যাণের দাসত্ব করার নির্দেশ দিলেন সেই অর্থটুকু কিন্তু রলাঁর নন্দনতত্ত্বে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠা পায় নি। উত্তরকালের রলাঁ, পরিণত মানসিকতার উত্তরাধিকারী রলাঁ শিল্পীদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন যে তাদের 'Nepoleons of public taste' হতে হবে। অর্থাৎ জনতার রুচি সৃষ্টি করার ভার তাদের গ্রহণ করতে হবে। জনতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিল্পকে জনতার রুচির অনুগামী হতে যে নির্দেশ তরুণ রলাঁ দিয়েছিলেন, একথা কিন্তু তার বিপরীত ধর্মী। তিনি বললেন, The people should follow and try to understand the artist. It was the artist's business to lead the public but not the public the artist.' অর্থাৎ শিল্পী সাধারণ মানুষের প্রাকৃত প্রয়োজনকে একদিকে যেমন স্বীকার করছে না, অন্যদিকে আবার তা জীবনের প্রাকৃত সত্যকে অস্বীকার করছে। রলাঁ বললেন যে, রেনাসাঁস যুগের চিত্রকরদের মত শিল্পীকে শুধু-

মাত্র প্রকাশধর্মী হতে হবে। ছবি আঁকা, গান বাঁধা—এ সব প্রকাশকর্ম ; শিল্পীর আবেগকে প্রকাশ করাই হ'ল যথার্থ শিল্প সাধনা। প্রাকৃত সত্যের অনুকৃতি সাধন অথবা সামাজিক 'বহুর' কল্যাণ চেষ্টা, এই দুয়ের কোনটাই শিল্পের কাজ নয়, শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যও নয়। প্রথম জীবনে যে রলাঁ বলেছিলেন শিল্পীর ধারণা তাঁর সুন্দরের ধারণা যেন তাঁর সমকালীন মানুষদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রাখে, সেই ধারণার কথা কিন্তু পরিণত রলাঁর মুখে আর শুনি নি।

শিল্পে কল্পনার স্থানকে আপন সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেও রলাঁ এক অর্থে বের্গসঁ কথিত Elan vital অর্থাৎ 'প্রাণবন্যার' ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাঁর শিল্পধারণার ভিত্তিভূমিতে। জীবনের প্রেক্ষাপটে নৈতিক, আত্মিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনার প্রকাশে তিনি এই অস্থির সর্বগ্রাসী প্রাণবন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছুর অনুধ্যান করি তার মধ্যে এই প্রাণবন্যার সঞ্জীবনী শক্তি কাজ করবে এই প্রত্যাশা রমাঁর ছিল। এই প্রত্যাশাই তাঁর চোখে শিল্পকে চলমানতা এবং গতি সমন্বিত করে তুলেছিল ; শিল্পে এই চলমানতার ধারণা শিল্পঐতিহ্যের পরিপন্থী। সৃষ্টির নতুন নতুন ক্ষেত্রে, এক অঙ্গন থেকে আরেক আঙ্গিনায় শিল্পীকে নিরন্তর বিচরণ করতেই হবে, তবেই না নিত্য নতুন সৃষ্টির ফুল ফুটবে শিল্পের নন্দন কাননে। যে শিল্পীর মধ্যে এই চলমানতা নেই রলাঁর চোখে সেই শিল্পী রুগ্ন, অশক্ত। এই অশক্ত শিল্পীর শিল্পকর্মে শিল্পের আনন্দটুকুর অসদ্ভাব ঘটে। যেখানে প্রাণশক্তির অভাব সেই লোক থেকে আনন্দ নিত্য নির্বাসিত। তাইতো রলাঁ Goethe-এর কথা উদ্ধৃত করে বললেন, If the poet is ill, let him first of all cure himself ; when he is cured let him write"। শিল্পে এই ধারণা হয়ত অনেকের কাছে সম্যক্ রূপে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারে। মানুষের অসুস্থ মানসিকতা বা morbidity-কে আশ্রয় করেও সার্থক শিল্প সৃষ্টি হতে পারে। ফ্লবেয়ারের 'মাদম বোভারি' এমনি একটি শিল্পকর্ম যার মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। অম্লরোগে জীর্ণ সুইফ্‌ট, ক্ষয় রোগাক্রান্ত কীটস অসুস্থ মানসিকতার প্রতিমূর্তি স্টিণ্ডবার্গ—এঁরা সবাই রলাঁকথিত শিল্পে

প্রজীবতাতত্ত্বের প্রমূর্ত প্রতিবাদবিগ্রহ। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রলাঁর শিল্পে প্রাণবন্যাতত্ত্বের সমালোচনা করা সম্ভবপর হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্পে এই প্রাণবন্যাতত্ত্ব (Elan vital)কে গ্রহণ করলে আমরা সহজেই শিল্পের বিচিত্রধর্মী বহুমুখী প্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে পারি। রলাঁ এই ধরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংগীতের উল্লেখ করেছেন। দেশে দেশে সংগীতের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী রলাঁকে মোহিত করেছে। স্বগত আনন্দের এই বহু বিচিত্র প্রকাশের ব্যাখ্য প্রসঙ্গে রলাঁ বললেন, "In every country music passes through several stages. The differences observed at any particular time may possibly be due to a difference, to a particular stage of difference. Music has its childhood, growth and decay. The first song of emotion finds expression through a form which is scarcely adequate. Then comes a perfet harmony between emotion and external form and finally a certain formalisation, a sterotyping and decay. If life continues, a new overflow and a new cycle begins again". রলাঁ সংগীতের মত নিরাবয়বী অমূর্ত শিল্পরূপের মধ্যেও সেই প্রাণবন্যার লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রাণবন্যা, স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রাচুর্য শিল্পকে উজ্জীবিত করতে থাকে। শিল্প হ'ল নিরাময়তার প্রতীক। শিল্প প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং মনুষ্যত্বের, মানবতা-বোধের দিকে শিল্প মানুষকে নিয়ে যায়। তাঁর মতে এই স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করে। শিল্প মানুষের সম্যক্ জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছায়া ; একটি জীবনের সম্পূর্ণতা তাই শিল্পে বিধৃত হয়। এই সামগ্রিকতার মধ্যে জীবনের দুর্বারতা, তার রুক্ষ উত্থান, পতন, তার আনন্দ-বেদনার প্রাকৃত সমারোহ, এসবই রয়েছে। রলাঁর কথায় 'The wholeness of life includes its rough visibility ; and art reflecting this wholeness necessarily reflects the seamy side of life as well'. অর্থাৎ জীবনের রুক্ষ বন্ধুরতা, জীবনের পেলব কোমলতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে শিল্পে স্থান পায়, শিল্প

গতিময় হয়ে ওঠে। এই শিল্পের গতিময়তা রলাঁর চোখে শিল্পীর প্রাণ-প্রাচুর্যরূপে প্রতিভাত হয় এবং রলাঁ কথিত শিল্পের এই প্রাণ প্রাচুর্যও বের্গসঁ কথিত Elan vital এর সমধর্মী।

শিল্প বৈচিত্র্যের সঙ্গে রসিকের আনন্দ উপলব্ধির যে একটা আত্যন্তিক সম্পর্ক রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস তাঁর 'ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ' তত্ত্বে। এই তত্ত্ব আমাদের আধুনিক মনস্তত্ত্বে লভ্য তথ্য ও তত্ত্বসম্মত। আমরা যখন শিল্পবস্তুকে দেখি, গান শুনি, কবিতা পড়ি, ছবি দেখি তখন তাকে নিজের মনের মুকুরে গড়ে নিই। এই যে শিল্পসৃষ্টি এ একেবারে ব্যক্তি নির্ভর হয়ে ওঠে, এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পের সঙ্গে সহৃদয় সামাজিকের সম্বন্ধ নির্ণয় করাটা কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি ধারা অন্যদিকে শিল্পের সার্বিকতাকে ব্যাখ্যা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষ সামাজিক জীব। তাই আমার সৃষ্টির সঙ্গে রাম, শ্যাম, যদু, মধুর সৃষ্টির একটা যোগ থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা যদি না থাকে তাহলে রাম, শ্যাম, যদু, মধুর শিল্পকার্যকে শিল্প হিসাবে আমিও বুঝে উঠতে পারব না। আর তা যদি না বুঝি তাহলে শিল্প সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। শিল্প বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হবে না। রলাঁ বললেন যে শিল্পজীবনের সামগ্রিকতাকে প্রতিফলিত করে। তাই শিল্পের মধ্যে আলোর দিকটা যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনি ধারা অন্ধকারের ছায়াপাতও ঘটে শিল্পের মুকুরে। আনন্দে উদ্বেল উত্তাল হৃদয়-সমুদ্রের ও তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিনতম, কঠোরতম দুঃখের অতলান্ত সমুদ্রতলের স্পর্শ এসে লাগে শিল্পের রূপে ও রঙে। তবে চলমান জীবনের ক্ষণিকতা যখন শিল্পের উপজীব্য হয়ে ওঠে তখন তা ক্ষণিক এবং নশ্বর হয়ে থাকে না। শিল্পের একটা কালজয়ী সার্বিক সত্তা আছে, একথা রলাঁ বললেন আর সেই সত্তার জন্যই হয়তো হোমার, কালিদাস, পিকাসো মৃত্যুকে জয় করেছেন। কালিদাসের সমকালীন জীবনের ছবি সমাজ থেকে মুছে গেলেও শিল্পে তা অবিনশ্বর হয়ে রইল। সমকালীন জীবনের ছবি, জগতের ছবি, কালের চিত্রপট থেকে মুছে গেলেও শিল্পীর চিত্রপটে আজও গৌড়জনকে আনন্দ দান করছে। রলাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: The highest art, the only art which

is worthy of the name, is above the temporary loss; it is a comet sweeping through the infinite. It may be that it is apparently useless and dangerous in the existing order of the work a day world; for it is false, it is movement and fire, it is the lightning darted from heaven: and that for very reason, it is sacred, for that very reason is beneficient.

(John Christopher, vol. IV p. 365).

'জাঁ ক্রিস্তফে' রলাঁ সেই সর্বোত্তম শিল্পের কথা বললেন যে শিল্পে সাময়িক এবং সমকালীন রীতি পদ্ধতি, আইন কানুন প্রযুক্ত হয় নি। রলাঁর এই ধরনের বিশ্বাস ছিল বলেই রলাঁ ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রের ভাষ্যকার শ্রীদিলীপকুমার রায়কে পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি দিলীপ বাবুকে বলেছিলেন, ভাষার বাধা ভারতীয় সংগীতের রসোপলব্ধির পথে পাশ্চাত্ত্য দেশের শ্রোতাদের কাছে কোনো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। দুঃখের কথা স্থান কালের বাধা শিল্পলোকে বাধা বলে গণ্য হয়। শিল্পের এই সার্বিক উপাদানের কথা স্মরণ করে রলাঁ বারবার বলেছিলেন যে শিল্পের প্রগতিকে সম্ভব করতে হলে আমরা আমাদের শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করব; অর্থাৎ রলাঁ প্রাচীন শিল্পকে নব্য শিল্পের দিশারীরূপে গণ্য করেছেন। রলাঁর এক ধরনের প্রাচীন শিল্পে গভীর আস্থা ছিল বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, শিল্পসৃষ্টির ও রসোপলব্ধির উপযোগী মানসবলয় সৃষ্টির জন্য শিল্পীর পক্ষে শিল্প বৈরাগ্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে বলেছিলেন যে, ইতালির বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে তিনি যেসব শিল্প-কর্ম দেখেছেন তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের তৈরি শিল্পকর্মে তিনি এই শিল্প বৈরাগ্যটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের শিল্প বৈরাগ্যের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রলাঁ বললেন; 'Lately Floreintines have been looking back to their ancestors. This is probably the secret of florence being a great artistic centre'. অর্থাৎ রলাঁ

একথা আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে শিল্পসৃষ্টির ও শিল্পে রসসম্ভোগের উপযোগী মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা হলে আমাদের শিল্প ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে। অবশ্য রলাঁর এই উক্তিটি এই একই প্রসঙ্গে, পূর্ব-কৃত উক্তিকে খণ্ডন করেছে। রলাঁ পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে ক্লাসিকস্ জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; ক্লাসিক্সের অচলায়তন শিল্পের প্রগতিকে ব্যাহত করে। শিল্পে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির প্রেরণা ক্লাসিক্সের অচলায়তনে ধাক্কা খায়, ব্যাহত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে; আবার কোথাও কোথাও বা তা থেমে যায়। এমনি ক'রে ক্লাসিক্সের প্রতিবন্ধকতায় শিল্পের প্রেরণা কোথাও কোথাও বা স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে রলাঁ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বলেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে রলাঁর শিল্পদর্শনের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে। পূর্ব যুগের রলাঁ, তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট রলাঁ এবং পরবর্তী যুগের তলস্তয়ের প্রভাবমুক্ত রলাঁ—এ দুয়ের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পের ধারাবাহিক ঐতিহ্য বা ক্লাসিসিজম্—এই প্রসঙ্গেও রলাঁর বক্তব্য দ্বিধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য এই দুটি ভিন্নমুখী ধারায় রলাঁর বক্তব্য বিভক্ত হলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে রলাঁ ক্লাসিকস্‌কে আশ্রয় করার দিকেই শেষ পর্যন্ত ঝুঁকেছেন। তাঁর রায়টা সেদিকেই গেছে। ক্লাসিক্স বা মহাকাব্যের বিরাট ক্যানভাসে ধর্ম, দর্শন, নীতি ও শিল্পৈশ্বর্যের প্রস্রবণ উৎসারিত হয়। তাইতো মহাকাব্যের রসধারায় সকলেই স্নান ও পান করে ধন্য হয়। এই যে, মানুষের সার্বিক রসপরিতৃপ্তির একটা সম্ভাবনা মহাকাব্যের পরিসরের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে, এর ফলে রলাঁ ক্লাসিক্সকে গ্রহণ করেছিলেন চারুশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে। তাঁর কথায়: "But a great creation in earth must contain in its rich granery elements enough, where with to satisfy the spiritual hunger of all—why should you have a great artist suffer, dream and caeate for just a few initiates." শিল্পে এইঅর্থে সার্বিকতাকে স্বীকার করলেন রলাঁ; এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিকে—তাঁর নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। তাইতো

শিল্প ও সমাজের মধ্যে তিনি এক ধরনের ঐকান্তিক সম্পর্ক স্বীকার করেছেন।

শিল্পীর কাছে সমাজ অবশ্য স্বীকার্য। এই তত্ত্বের অবতারণা ক'রে শিল্পীকে কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা ও মূল্য স্বীকার করার জন্য রলাঁ শিল্পীদের আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্পী অলস হবে, কায়িক পরিশ্রম করবে না, একথা রলাঁ ভাবতেই পারেন না। তিনি তলস্তয়কে একটা বিখ্যাত পত্র লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে; তার উত্তরে তলস্তয় তাঁকে লিখলেন, 'True sceince and true art have always existed and will always exist just as other form of human activities and it is impossible and needless either to doubt or to prove.' অর্থাৎ তলস্তয় বলেছেন যে, অন্যান্য কাজকর্মের মতই শিল্পকর্ম ও কর্মরূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ যিনি শিল্পী তিনি অন্য কোন কাজ করবেন না, একথা রলাঁর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে তলস্তয়, রলাঁ এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমানধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি: 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' রলাঁকথিত তত্ত্বকেই সমর্থন জানাচ্ছে। যে শিল্পী, সে জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করবে না এমন কথা বললে মিথ্যা শিল্প-আদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। শিল্পের সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের এই ঐকান্তিক সম্পর্কটুকু স্বীকার করে রলাঁ বলেছিলেন যে, শিল্পীর কাজ হবে সমাজের কল্যাণসাধন করা। এই কল্যাণের মধ্যে রলাঁর সর্ব মানবিকতাবাদের প্রেমের ধারণাটুকু অনুসৃত। এই সর্ব মানবিক প্রেমের ধারণা রলাঁ গ্রহণ করেছিলেন তলস্তয়ের কাছ থেকে। তিনি বললেন যে সামাজিক ঐক্যই হ'ল কল্যাণের চরম প্রকাশ; আর সেই কল্যাণকেই তিনি সুন্দর আখ্যা দিয়েছেন। তিনি যখন 'পিপ্‌ল্‌স থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন, তখনই নন্দনতত্ত্বে তিনি সামাজিক ঐক্য, সামাজিক কল্যাণ এবং সুন্দরকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অনৈক্যই হ'ল কুৎসিত, অনৈক্যই অকল্যাণ; রলাঁর এই ঐক্যের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথের 'সুমিতি' বোধ ও 'ছন্দের' ধারণার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি। শিল্প দর্শনের coherence theory বা সমন্বয়বাদকে রলাঁকথিত ঐক্যের পটভূমিতে বোঝবার চেষ্টা

করতে পারি। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না, রলাঁ তাঁর শিল্প-দর্শনে coherence theory বা শিল্পের সমন্বয়ের রূপটুকুকেই সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন।

শিল্প যখন সমগ্রতাকে আপনার প্রকাশের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করে তখন আমরা শিল্পকে নৈতিক, শিল্পকে কল্পনাপ্রসূতও বলতে পারি; রলাঁ তা বলেছেন। শিল্পের এই সার্বিক সামাজিক রূপকে যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করতে হলে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। রলাঁ সেই ধরনের বিচার করেছেন। রলাঁর মতে শিল্পের সার্থক প্রকাশ আনন্দের মাধ্যমে হলেও দুঃখ এবং আনন্দের মধ্যে খুব বড় একটা প্রভেদ তিনি লক্ষ্য করেন নি। দুঃখের অশ্রু থেকে আনন্দাশ্রুর ভেদটা তাঁর চোখে কোথাও বড় হয়ে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বিটোফেনের গভীর দুঃখবোধের কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি বিটোফেনের মধ্যে এক ধরনের জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সংগ্রাম চলেছিল বিটোফেনের অহমিকা বোধের সঙ্গে তাঁর বাইরের জগতের। একে অপরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, একে অপরের ওপর জয়কে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছে। রলাঁর মতে এই ছোট 'আমি' ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যে যুদ্ধ নিরন্তর চলেছিল বিটোফেনের অন্তরে, সেই সংগ্রাম হ'ল আত্মোপলব্ধির সাধনা। রলাঁ বিটোফেনের উপর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর নূতন গ্রন্থে বললেন যে, বিটোফেনের সংগীতসাধনা যোগসাধনার নামান্তর। যোগসাধনায় মানুষ তার ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে তার বৃহৎ আমিটাতে স্থিতিটুকু চায়। তার বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। এই বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যেই তার চিত্তের স্বাধীনতাটুকু লুকিয়ে রাখে। এই অলিম্পীয় উচ্চতায় উঠতে পারলে তবেই মানুষ শিল্পীজনোচিত শিল্পবৈরাগ্যটুকু শিল্পরূপ যোগসাধনার মাধ্যমে পায়। শিল্পসাধনা এবং যোগসাধনা আমাদের মনের অভিসারকে একই লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। তিনি বললেন যে, সাহিত্যে আত্মানুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করাই যদি শিল্প হয়, তাহলে এই আত্মবিচ্যুতিই (self-detachment) হ'ল যোগের গোড়ার কথা; একে যোগজ নৈর্ব্যক্তিকতা বলা হয়েছে। আমরা যখন যোগমার্গের সাধনায় এই

নৈর্ব্যক্তিকতাকে অর্জন করি তখন তাকে বৈরাগ্য আখ্যা দেওয়া হয়। যোগের নিম্নভূমির যে বৈরাগ্য তাকে অপরা বৈরাগ্য বলা হয়। এই বৈরাগ্যের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের বা Aesthetic detachment-তুলনীয়। রলাঁ আমাদের এই প্রসঙ্গে বলতে চাইলেন যে উপনিষদে যে যোগের কথা বলা হয়েছে সেই যোগের মধ্যে আত্মবিচ্যুতি বা আত্ম-স্বতন্ত্রীকরণের ব্যঞ্জনা নাই। তাই উপনিষদকথিত যোগ এবং যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের তুলনা অসমীচীন হ'বে। আমরা সাংখ্য-যোগদর্শনে যে যোগ সাধনার কথা পাই, সেই যোগসাধনার মধ্যে যে আত্ম-বিচ্যুতি ও বৈরাগ্যের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে রলাঁকথিত নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের তুলনা করা হ'লে তা হয়ত তথ্য আশ্রিত হ'বে। তবে এই প্রসঙ্গে রলাঁ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, শিল্পীর যে বৈরাগ্যকে আমরা যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করছি সেই বৈরাগ্য হ'ল মহাশিল্পীর বৈরাগ্য; যাঁরা মহতী শিল্পের সৃষ্টি করেছেন তারাই এই বৈরাগ্যের আস্বাদন করেছেন। রলাঁ একথা বলতে চাইলেন যে, আমরা যেন এই যোগজ বৈরাগ্যের সমতুল্য নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যকে শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ না করি: "Thus the yogic disunion or detachment is somewhat akin to the artistic disunion of the feeling from the subject. But the deep concentration for the yogic practice is not common place and if we try to generalise it as a condition precedent for all artistic creation we will misunderstand Rolland". (S. K. Nandi Aesthetics of Romain Rolland, p. 60)

বিবেকানন্দের রাজযোগের উল্লেখ করে রলাঁ শিল্পসাধনার সঙ্গে যোগজ সাধনার সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Life of Vibekananda and the Universal Gospel"-এ তিনি বললেন যে, যোগ সাধনার পথে স্বামীজি যেমন যৌগিক ভিত্তিভূমি থেকে অকস্মাৎ তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হতেন ঠিক তেমনি করে বিটোফেন এই প্রাকৃত জগতের চেতনা থেকে মহাশিল্পীর চেতনার জগতে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে উঠতেন। এই যে উত্তরণের শক্তি,

তা যোগীর বা শিল্পীর যারই হোক না কেন তা হল সেই আত্যন্তিক সৃষ্টিশক্তির রূপভেদ মাত্র। রলাঁ এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন একদিকে যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অন্যদিকে আবার তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিটোফেনের মধ্যেও। বিটোফেন রাজযোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত না হয়েও রাজযোগের অনুরূপ যোগ সাধনা করেছিলেন—একথা রমাঁ রলাঁ বললেন। বিটোফেনের যে বধিরতা, এই বধিরতাকে তিনি রাজযোগের বিধিবহির্ভূত অনুশীলনের ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করেছেন। রাজযোগের প্রকরণ পরিপাট্য সম্যকরূপে না জেনেও তিনি এক ধরনের 'সহানুভূতির' মাধ্যমে এই যোগপদ্ধতির উপযোগিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধি হ'ল মিষ্টিক বা মরমিয়া সাধকদের অনুভূতির সমগোত্রীয়। এই মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই উত্তরকালে রলাঁর পক্ষে সমন্বয়বাদী হওয়া একান্তরূপে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অতএব বলা চলে যে, রলাঁ ভারতীয় Mysticism-এর রসধারায় পুষ্ট না হয়েও ভারতীয় Mysticদের সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নন্দনতত্ত্বের এই ইস্‌থেটিক দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল সমন্বয়বাদী, সমন্বয়ধর্মী ও সঙ্গতিভিত্তিক।

(১) আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্ব

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মনীষা বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন, তা মুখ্যত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে এবং কবি ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল। ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হ'য়ে মহাকবির এই দার্শনিক বন্দনা দেশে বিদেশে বহুখ্যাত হ'য়েছিল।

"Pilgrim, the highest peaks of knowledge, hard to climb you have scaled,
These or imagination's canvas in diverse paints and colours
Is painted the invitation of Eternal Beauty ;
The radiance white from there, garland of glory that is
The Goddess of wisdom's caressing hand plays round your noble brow.

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। কবি ক্রান্তদর্শী; তাই ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পাই সম্যক্ দর্শনের জন্য সাধনা। একে ব্রজেন্দ্রনাথ Synoptic view of things আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রখ্যাত দীর্ঘপদী কাব্য 'Quest Eternal', যে জগতের সন্ধান দিয়েছে সেই জগতও দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের এই 'Synoptic view of things' এর সাক্ষ্য বহন করছে।

সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কাব্যের বিচার হবে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত জীবন দর্শন পরিকল্পনার কষ্টি পাথরে। বিশ্ব-

সংসারকে দেখার একান্তরূপে ব্যক্তি আশ্রিত যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টি-কোণ থেকেই কাব্যের বিচার করতে হবে। শিল্পগুণ নির্ণয়ের এই যে মানদণ্ড, এই মানদণ্ডই হ'ল জীবন সমালোচনার মাপকাঠি; একে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন 'criticism of life'। এই জীবন হ'ল সমগ্রজীবন, উপনিষদের ভূমা আশ্রিত মহাজীবন। এই পূর্ণ সমগ্রতার ধারণা ব্রজেন্দ্র-নাথকে একদিকে যেমন শিল্প সাধনায় উৎসাহিত করেছে, তাঁকে Quest Eternal-এর সার্থক কবি করেছে, তেমনি তাঁর শিল্প সমালোচনায়ও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই ভূমা-ধারণার মধ্যে আরিস্ততলীয় প্রারম্ভ মধ্য সমাপ্তি তত্ত্বকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন। এই সমগ্রতাটুকুই হ'ল অনন্য ব্যক্তিত্ব আশ্রিত মানুষের জীবন পরিকল্পনা বা 'Individual Scheme of life'।

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, নান্দনিক এবং নৈতিক সকল প্রকার নৈতিক নির্মিতি কর্মে মানুষের আবেগ এবং অনুভূতি নিত্য ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে; এই অনুভূতি এবং আবেগ ছাড়াও মানুষের ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও সহজ সংস্কার সমান-ভাবে কাজ করে। কিন্তু শিল্প বিচারের মানদণ্ডে এদের প্রবেশ নাই। অনুভূতি ও কল্পনা—এরা কেউই শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সহায় হয়ে উঠে না। "No doubt, all emotions are proper plastic stuff for constructions in aesthetics as well as ethics, but as building material, experience in all its forms is intrinsically valuable ideation, imagination, instinct, no less than emotion. But none of these enter into the norm. What does enter into the norm and test of poetry is not emotional exaltation, imaginative transfiguration or disinterested criticism but in and through them all the recreation of personality with an individual scheme of life; an individual outlook on the universe." সমালোচক ব্রজেন্দ্র-নাথ শিল্প সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অনন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা বললেন। এই অনন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সকল শিল্পেরই উপজীব্য। এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ একদিকে যেমন শিল্প কর্মের উপর প্রতি-

ফলিত হয় ঠিক তেমনি আবার তা পড়ে সার্থক শিল্প সমালোচনার ওপর। মানুষের অনন্য স্বাতন্ত্র্যের প্রতি একটা জন্মগত মোহ আছে; এই মোহটুকু মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণময় করে তোলে। মানব ব্যক্তিত্বের এই বিচিত্রতা শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়ে শিল্পকেও বহু বিচিত্র করে তোলে। এই বহু বৈচিত্র্যই হল একদিকে শিল্পের চরিত্রের স্বরূপ লক্ষণ, তেমনি আবার তা শিল্পসৃষ্টি বা শিল্প কর্মেরও স্বরূপ লক্ষণ; অনন্য ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত শিল্পী 'নির্মাণ করে'। এই নির্মিতি শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রতিভা: একে সমালোচক বলেছেন, 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'। এই অপূর্বতা না থাকলে শিল্প, 'শিল্প' পদবাচ্য হয় না। তাই বহুশ্রুত, বহুখ্যাত মহাভারতকার পরিকল্পিত কর্ণ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় যে রূপ পেল সেই রূপ বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচকের কাছে অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কবির অনন্য ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে আর এক ধরনের নতুন ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে নতুন করে জন্ম নিল কবি-কল্পনায়; মহাভারতকারের কর্ণ চরিত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্বের ও সৃষ্টির যে অনন্যতার কথা বললেন, সেই অনন্যতাটুকুই শিল্প মূল্যায়নের প্রধানতম মানদণ্ড রূপে গৃহীত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প দর্শনে। শিল্পকর্মের এই অনন্যতা-টুকুকে ভারতীয় রসশাস্ত্রে "অপূর্ব বস্তু" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমা-লোচক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও এই অনন্যতাটুকুর জয়গান করেছেন: The light that never was on sea or land'—আকাশ-পাতাল, স্বর্গ, নরক, দ্যুলোক, ভূলোক কোথাও সেই কনে দেখার আলোটুকু আমরা দেখিনি যেমনটা দেখেছি সার্থক শিল্পীর আঁকা ছবিতে অথবা তাঁর লেখা কবিতায়। পূর্বে যদি সেই আলোকে দেখে থাকি তবে সেই আলো কিন্তু সার্থক শিল্পকে আর উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ সেই আলোকের আধারে শিল্পকৃতি সৃষ্টির মর্যাদা পাবে না। এই আলোই ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প নির্মিতির অনন্যতা। এই আলো আমরা দেখেছি শেলীর "Skylark" কবিতার, কীট্‌সের "Naughty Boy" কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে, বোতিচেলির ও "Leonardo da vinci'র ছবিতে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প দর্শন প্রসঙ্গে যে সম্যক্ দর্শনের কথা আমরা বলেছি, সেই সম্যক দর্শনের ফলশ্রুতি হল তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের একধরনের সম্যক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটিও ঐক্য ও সামান্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় রয়েছে ইতিহাস; মানব অভিজ্ঞতাকে স্থানকালের মধ্যে সীমিত করে দেখাই হল ইতিহাসের ধর্ম; কাল পারম্পর্যকে ইতিহাস শ্রদ্ধা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিজ্ঞান এবং দর্শন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্য হল স্থান কাল নিরপেক্ষ। বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে চংক্রমণ হল বিজ্ঞানের ধর্ম; বিজ্ঞান সামান্যকে বিশেষের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চায়; দর্শনের চংক্রমণ হল সামান্য থেকে বিশেষে যাওয়া; এই বিশেষকে দার্শনিক যখন সামান্যের প্রতিভূ হিসেবে দেখেন তখন বিশেষের মধ্যে সামান্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বিশেষ এবং সামান্য একাকার হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, আমরা পাই শিল্প এবং ধর্মকে; শিল্পে আমাদের রসোপলব্ধি ঘটে; সেই রস হল আনন্দ স্বরূপ। ধর্মে আমাদের পরমানন্দ লাভ ঘটে; সেই আনন্দের পথ হল মরমীয়া সাধনার পথ। শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হল এই আনন্দটুকু। ব্রজেন্দ্রনাথ এই পথেই কারুকলা এবং চারুকলার বিভিন্নতা নির্দেশ করলেন। তাঁর মতে কারুকলায় আনন্দ নেই এবং আনন্দের ছোঁয়া লাগে চারুকলার সমগ্র অস্তিত্বে। আমরা যখন ছবি দেখি বা গান শুনি অথবা কবিতা পড়ি তখন আমাদের সমগ্র সত্তা অকারণে পুলকিত হয়ে উঠে। রসবাদীর মত ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন রস হল শিল্প প্রাণ। শিল্পীর হাজারো রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একটি ব্যাপারে তাদের সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু লক্ষণীয়; সেটি হল এই আনন্দ কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। রূপ-রঙ-রেখার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শিল্প রূপ শিল্পীরা যুগে যুগে, কালে কালে সৃষ্টি করেছেন। ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রণ, সঙ্গীত, কাব্য ও নাটকের অনন্ত রূপ ভেদ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিল্প ইতিহাসের সেই প্রথম পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত। এই অনন্ত রূপভেদের ধর্মে আমরা যে অপরিবর্তনীয় অবিচলিত শিল্প লক্ষণটুকু লক্ষ্য করেছি তা হল এই আনন্দ। এই শিল্পানন্দকে প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ

অর্থাৎ ব্রহ্মের আস্বাদ জনিত আনন্দের পরমাত্মীয় রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

রস যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে, সেই মাধ্যম শিল্পের বিশিষ্ট রূপকে নিরূপিত করে একথা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন। ভাস্কর, স্থপতি, চিত্রী—এদের বাচন ভঙ্গী বিভিন্ন, এদের ভাষায় অনন্ত রূপভেদ। আকার আশ্রয়ী তিনটি প্রধান শিল্পের ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করলেন—স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অঙ্কন শিল্প; এদের মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপজীব্য হল ঘনক্ষেত্র বা Three Dimensions। চিত্র ক্ষেত্র Two Dimensions কে আশ্রয় করে। স্থাপত্য শিল্পকর্মে এই ঘনক্ষেত্রের বিস্তার স্থান এবং কালের দ্বারা অতি সীমিত। চিত্রকলা-ক্ষেত্র Two Dimensions কে আশ্রয় ক'রে ব্যঞ্জনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য পরিপ্রেক্ষিত বা perspective-এর সাহায্য নেয়। ডাঃ শীলের কথা উদ্ধৃত ক'রে দিই: "The three plastic arts—Architecture, Sculpture and Painting are distinguished from one another by the number of Dimensions of the medium in which they work. Architecture works in all the three Dimensions fully and freely so as to form an all sided representation of any given situation, sculpture works in three dimensons but with a limited and circumscribed space and line in each diretion, painting works in two dimensions and achieves its purpose with the help of perspective when so derived." ব্রজেন্দ্রনাথের মতে এই ত্রিবিধ শিল্প কর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হল সঙ্গীত। সঙ্গীতে জীবন সত্যের কোন প্রতিফলন নেই; জ্ঞাতা-অনির্ভর যে বস্তু জগত, সেই অতিবাস্তব জগতের অধিবাসীদের প্রবেশ সঙ্গীতের স্বর্গীয় লাবণ্যের জগতে নিষিদ্ধ। সঙ্গীত সংকেতের স্থূলতাকেও বর্জন করেছে। বাতাসের আন্দোলন ছন্দের অর্জনের মূল সেই ছন্দই হল সঙ্গীতের বস্তু নির্ভর মাধ্যমটুকু। সঙ্গীতের উপজীব্য হল স্বর মাধুর্য বা Melody's Harmony বা সুর সমন্বয় অথবা গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা; এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে শিল্পীর সুমিতিবোধটুকু প্রকট হয়ে উঠে। এই সুমিতি বোধই

হল শিল্পী মনের অনন্য আশ্রয়। এই সুমিতি বোধ থেকেই জন্ম নেয় Melody, Harmoy এবং গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শূণ্যে যে মহাসঙ্গীত প্রতিনিয়ত চলছে, সেই শূণ্যের মহাসঙ্গীতে (Music of the spheres) তিনি এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতাকে কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অঙ্কন এবং সঙ্গীত এ সবই ব্রজেন্দ্র নাথের কাছে 'এহ বাহ্য'। তিনি আজীবন পূর্ণ রূপের পূর্ণ সত্যের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাই তিনি কাব্যকে এই পূর্ণ রূপ এবং পূর্ণ সত্যের প্রতিভূ হিসাবে সর্বোত্তম শিল্প কলার মর্যাদা দিলেন। কাব্যে প্রত্যক্ষ ভাবে ভাষার মাধ্যমে রসের উদ্বর্তন ঘটে। কাব্যের এই ভাবা কল্পনাকে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তোলে। বাচিক বা Vocal শিল্প এবং আকারগত বা Plastic শিল্পের সুষমা এবং মাধুর্য ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যে এবং শিল্পে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

হিন্দু শিল্পে আত্মাকে চিত্রে রূপায়িত করে—Hindu painting paints the soul—এই ধরনের অতিশয়োক্তিকে ব্রজেন্দ্রনাথ মূল্য দেন নি। প্রাচীন শিল্প থেকে আধুনিক শিল্পকে তিনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর নন্দনতত্ত্বে। চৈনিক, জাপানী এবং হিন্দু অর্থে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে তিনি পৃথক করে দেখেছিলেন; নব্য যুগের Cubism, Dadism, Scintinism, Imagism প্রমুখ শিল্প আন্দোলন থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে অনুকৃতিবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বললেন, শিল্পে বস্তুর রূপান্তর ঘটে শিল্পীর ধ্যানে; সেই ধ্যানাশ্রিত শিল্প বিষয় তার জগত-আশ্রিত বাস্তব রূপটুকুকে শিল্পীর কল্পনার জারক রসে জারিত হয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। এই কল্পনার গর্ভে জাত এই অনন্য শিল্প রূপটুকুই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকার নেয়। ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রে শিল্প মূর্তি গঠনের যে নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনা যে সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টির প্রতিকূল, এই ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল ছিল। তবে এই নির্দেশনার বন্ধনকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেছেন, সেকথা বলা চলে না। অনুকৃতিবাদের বিরুদ্ধাচারী হয়েও তিনি এমন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন, যে ক্ষেত্রে শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশিত পথে তথাকথিত বন্ধন-শাসনের মধ্যেও শিল্পী আপন সৃষ্টির

স্বকীয়তাটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, প্রতিভাধর শিল্পীরা শাস্ত্র নির্দেশিত অনুশাসন মেনেও সার্থক রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য দেবমন্দিরে এই ধরনের সার্থক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কর্মের নিদর্শন ছড়ানো আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিতে গিয়ে একথা বলা চলে যে তিনি শিল্পে ত্রিতত্ত্বকে স্বীকার করেছিলেন। প্রথম তত্ত্বটি হল শিল্প-বোধের তত্ত্ব। শিল্পে আমরা ক্ষণিক আনন্দের অংশভাগী হই। এই পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্প মূল্যের ক্ষণিকতাবৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য বলতে পারি :

'ক্ষণিকের গান গা রে, আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে'

রবীন্দ্রকাব্যে এই যে ক্ষণিকের জয়গান করা হল, এই ক্ষণিকতাকে আশ্রয় করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পতত্ত্বের প্রথম সূত্রটিতে। দ্বিতীয় সূত্রটিতে তিনি ক্ষণিক আনন্দ উপলব্ধিকে সীমাহীনের মধ্যে, অসীমের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চেয়েছেন। এই অসীম হল কালাতীত। ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের দ্বিতীয় সূত্রটিতে আমরা ভারতীয় রসশাস্ত্রের রস চর্বনা বৃত্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহটুকু দেখতে পাই। দ্বিতীয় সূত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পকর্মের অনন্য ধর্মের কথা বললেন এবং শিল্পের এই অনন্য ধর্মটুকু 'কালাতীত ক্ষণিকের' পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিচার করেছিলেন।

ভারতীয় রসশাস্ত্রে আছে শিল্পরসের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বারূপ্য ঘোষণা করা হয়েছে ; সেই ঘোষিত স্বারূপ্যই ব্রজেন্দ্রনাথের তৃতীয় সূত্রটির প্রধান উপজীব্য। ব্রহ্মের আস্বাদজনিত আনন্দের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ক'রে ব্রজেন্দ্রনাথের মতে শিল্পানন্দ তাঁর অনন্য ধর্মটুকু লাভ করে। ব্রহ্ম হলেন রস স্বরূপ। ব্রহ্ম যদি অসংজ্ঞেয় অনন্ত হন তাহলে শিল্পীও অসংজ্ঞেয়। ডাঃ শীলের কথা উদ্ধৃত করি :

(1) The aesthetic values or satisfactions are finite values viewing Reality as temporal experience which cannot testify to any ultimate end,

(2) That aesthetic values or satisfactions (Rasa) emergent, being manifestations of one ideal ground which is infinite and timeless (or eternal).

(3) That aesthetic satisfactions (or Rasa) testify to a unique Reality which may be termed 'the momentary infinitum' a 'sat' of exaltation in which the experience of a moment is transfigured so as to make an infinite value.

শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তা একদিকে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথও সেই অসংজ্ঞেয়তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিল্পকে 'মায়া' আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। শিল্পে এই মায়াতত্ত্বের সঙ্গে শিল্পের অনন্য চারিত্র ধর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। ব্রজেন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথিত মায়া ধারণার গুণভেদ নেই। শিল্প লক্ষণ হল শিল্পের অসংজ্ঞেয়তা। শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তায় বিশ্বাসী হযে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের অনন্য বাস্তবতা বা Unique Realism-এ বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছেন; এর মধ্যে কোন না কোন সূত্রে জাতির প্রসারিত মানসিকতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ একে বলেছেন, গণচেতনা বা 'Mass consciousness', আত্মজাতি চেতনা বা 'Race consciousness'। কথ্য বা লিখিত ভাষা যেমন একটা সমগ্র জাতির বিবর্তন ধারাকে আশ্রয় ক'রে উদ্বর্তিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করে শিল্পের ভাষাও তার পরিপূর্ণ রূপটুকু খুঁজে পায় এই প্রজাতি মানসিকতার পরিপূর্তিতে। কথ্য বা লিখিত ভাষায় শব্দের প্রথম স্তর (primary) ও দ্বিতীয় স্তর (secondary) আশ্রিত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শিল্পের ভাষায় এই দু'য়ের অতিক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক অর্থকে অতিক্রম ক'রে শিল্পের ভাষা ব্যঞ্জনার অত্যুচ্চলোকে উড্ডীন হয়ে পড়ে। সেই ভাষা শিল্প সৃষ্টির ভাষা। সেই ভাষা রসোপলব্ধির ভাষা। শিল্পে সংকেত নির্দেশিত যে অনন্ত রূপের জগতের সন্ধান শিল্প আমাদের দেয় সেই জগতের ইঙ্গিত করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ; তাঁর মতে শিল্প সেই পূর্ণ রূপের জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে

আমরা আধুনিক ফ্রয়েডীয় পণ্ডিত Erric Frome-এর পূর্বসূরী বলে ব্রজেন্দ্রনাথকে গণ্য করিতে পারি। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের অন্যতম পুরোধা ভর্তৃহরির অখণ্ড পক্ষ তত্ত্বের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষা Gestalt-এর ধারণার নৈকট্যটুকুও লক্ষণীয়।

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদে ব্যঞ্জনার যে প্রাধান্য সেই ব্যঞ্জনা শব্দার্থের সীমাকে অতিক্রম ক'রে শব্দার্থের পশ্চাদ্বর্তী যে সাংস্কৃতিক-সামাজিক জগত আছে সেই জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। জাতির সামগ্রিক চেতনায় যে সমকালীন মানুষের 'গণচেতনা' ও কালচেতনা সমন্বিত হয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। শিল্পীর কল্পনায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন, জীবন সত্য, প্রকাশ মাধ্যম এবং ভাব-ভাবনা সমন্বিত হয়ে এক অপরূপ শিল্পরূপে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যে যে আত্মজাতি চেতনার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দ কথিত 'Nation Soul' ধারণার। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথা উদ্ধৃত করে দিই :

"The primal law and purpose of a society, community or Nation is to seek its own self fulfilment; it strived rightly to find itself, to become aware within itself of the law and power of it's own being and to fulfil it as perfectly as possible to realise all its potentialities to live its own self-revealing life."

শ্রীঅরবিন্দ কথিত Nation Consciousness, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কথিত Race Consciousness-এর অনুরূপ; শিল্পের সর্বজনবোধগম্যতা বা Communication-কে নিয়ে যে ধরনের সমস্যার সূত্রপাত, তার সমাধান এই স্বজাতি-চেতনার মধ্যে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পইতিহাসের যথাযথ অনুধাবন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ New Essays in Criticism-এ সাহিত্যে Romantic আন্দোলনের মূল্যবিচারে হেগেলীয় শিল্প বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন; Keats এর "Mind and Art"-এর মূল্যায়ন অনুরূপ হেগেলীয় পদ্ধতিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পন্ন করেছিলেন।

পরবর্তী যুগে "New Romantic movement in literature"-এ তিনি হেগেলীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি। শিল্প ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা যথার্থ শিল্পরসিকের কাজ। অতীতে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা অনুকৃতি মাত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ যে অনুকৃতিবাদী ছিলেন না এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি Wagner এর মতই বললেন, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার অর্থ ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করা। ঐতিহ্যকে শিল্প যখন আবার আপন প্রতিভার জারক রসে জারিত ক'রে নব নব রূপ কল্পনার মধ্যে স্থাপনা করেন তা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে Syncrete বলতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতার এই সমন্বয় বৃত্তি তাঁকে হেগেলীয় প্রভাব অতিক্রমে প্রভূত সাহায্য করেছিল। হেগেলীয় রৈখিক বিবর্তনের ধারণা (Linear Evolution) দীর্ঘদিন ব্রজেন্দ্রনাথকে তুষ্ট রাখতে পারে নি। তিনি কালক্রমে বহুরৈখিক বিবর্তনে বিশ্বাস করেছেন। মানুষের সংস্কৃতি ইতিহাসের ধারা পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতায় বহুরৈখিক বিবর্তন (Multilinear Evolution) রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি যখন শেষ জীবনে তাঁর "Autobiography" লিখেছেন তখন তিনি বহুরৈখিক সংস্কৃতি-ইতিবৃত্ত তত্ত্বে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। অতি সামান্য থেকে সামান্যে, সামান্য থেকে বিশেষে, বিমূর্তাধিক্য থেকে বিমূর্তি ন্যূনতায় ডাঃ শীল-এর মানস চংক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই Autobiography গ্রন্থে। দার্শনিক ক্রোচে যেমন তাঁর শেষ গ্রন্থ "My Philosophy"তে তাঁর পূর্ব নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তন করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁর 'Autobiology' গ্রন্থে নানান নতুন তত্ত্বের প্রবর্তনা করলেন। তাঁর বহুরৈখিক বিবর্তনের ধারণা তাঁর পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। গণিত, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও মনোবিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্প—এই ক্রমানুক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ মানুষের চিন্তাবিকলনের ধারাকে, মানুষের মনোবিকলন ও চিন্তাভাবনার বিবর্তনকে সাজিয়েছিলেন। অতি বিমূর্তি থেকে বিমূর্তির ন্যূনতায়, সরল থেকে জটিলে অথবা বিপরীতমুখী জটিলাল্পতা থেকে জটিলাধিক্যে ও ডাঃ শীল-এর ভাবনা ও চিন্তা প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ধারাবাহ গণিতের বা Fluxional

Mathematics-এর রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন আমাদের ভাব ভাবনার পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে। এমন কি শিল্পের জগতে ও সাহিত্যের জগতেও তিনি এই ধারাবাহ গণিতের প্রয়োগ রীতির যোজনা করে সাহিত্য ও শিল্পের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'New Romantic Movement in Literature' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন:

"It here may be noted en passant, that the forms and symbols of Fluxional Mathematics, completely and systematically applied to the Logic of development (or phenomenally speaking to the law of Evolution) will render it possible to treat mathematically of history, which is the material for applied logic of development. ......It will be then possible, to represent, not only the entire movement of history, but also the history of particular movement, as for example, the history of literary art."

ইতিহাস শিল্পকলা ও সাহিত্য

Fluxional Mathematics বা ধারাবাহিক গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের যে স্থির নিশ্চয় ব্যাখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদান করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি হল ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিণতির যথাক্রম ভবিষ্যৎ বর্ণন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করা সম্ভব নয়; কেন না ঐতিহাসিকের জ্ঞান পুরোপুরি বিষয়-নির্ভর নয়। ইতিহাসের পরিণতি সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে ভবিষ্যৎবাণী করতে হয় তা হলে, ডঃ শীল বললেন, ঐতিহাসিককে কতগুলি বিশেষ ধরনের দার্শনিক ভিত্তিভূমির উপর আপন ঐতিহাসিকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ঐতিহাসিক ইতিহাসের গতিপথের পূর্ব নির্দিষ্টতা তত্ত্বকে গ্রহণ করলে তাকে উদ্বর্তনমুখী নব নব মূল্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হবে। তবেই ঐতিহাসিক এমন কথা বলতে পারবেন যে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি বারবার ঘটে। কার্যকারণ ফলাফলে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক কখনই ঘটনা পারম্পর্যের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি হিসাবে কোন একটি বিশেষ ধরনের পরিণতির কথা ভাবতে পারবেন না; যে দার্শনিক তত্ত্বের ওপর এই ঐতিহাসিকতার ধারণা নির্ভরশীল হবে সেই দার্শনিকতার সূত্রাবলীও অনির্দিষ্ট ও অনির্ণেয়। অতএব ইতিহাসের চরিত্র সঠিক নির্ধারণ, তার পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা—এসবই হল এক ধরনের কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ Autobiography'তে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে, জীবন সমালোচনা হল শিল্প; শিল্প-ইতিহাসের ধারা, মহা মহা শিল্পী এবং শিল্পবেত্তাদের নিয়ে তিনি অলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। শিল্পে এক ধরনের প্রান্তিকতার কথাও তিনি ভেবেছেন। শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা ক'রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, এই সম্পর্ক দ্বিবিধ। (১) শিল্পকে জীবনের

অনুকৃতি না বলে তিনি শিল্পকে বলেছেন জীবনের প্রতিরূপ রচনা (Representation and not presentation of life) তাই শিল্প হবে জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতিরূপ। একে জীবনের ভাব ব্যাখ্যাও বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ আপন প্রতিচ্ছায়াবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে নানান ধরনের শিল্পতত্ত্বের পর্যালোচনা ক'রে একথা আমাদের বলতে চাইলেন যে, জীবনের সমালোচনা করতে গিয়ে কোন একটি বিশেষ শিল্প হয়তো তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সমালোচনাকে সার্বিক জীবন সমালোচনার মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কাব্য-উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সাহিত্য—এসবেরই নিজস্ব আঙ্গিকগত দৃষ্টিকোণ আছে। জীবনের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যঞ্জনার রূপায়ণ এই সব বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। জীবনের অনুরূপ বা অনুকৃতি শিল্প নয়, একথা ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার বললেন।

জীবন এবং শিল্প উভয়েই সমব্যাপক হবে। কিন্তু গ্রীক শিল্পে এই তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটেছে। শিল্প জীবনকে অনুসরণ করেছে; এমন কি গ্রীসিয় শিল্পকলায় যে Hercules এবং Psyche'র কল্পনা করা হয়েছে, তাঁরাও এসেছেন জীবন প্রবাহের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে। প্রাকৃতিক সাংকেতিক প্রতিনিধি হলেন এই গ্রীক দেবতারা। তাঁরা একদিকে যেমন প্রকৃতিতে আছেন তেমনি আবার তারা প্রকৃতি অতিক্রান্ত (Supernatural) হয়ে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে গ্রীসিয় সংস্কৃতিজাত শিল্পধারা ঈজিপসীয় ব্যবলনীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতিক ধারা থেকে পৃথক। ঈজিপসীয় শিল্পে Sphinx অর্থাৎ মানব আর পশুর বিরাট বিরাট কল্পিত মূর্তি, সূর্য দেবতার মূর্তি এসবই হল নৈসর্গ বস্তুর মানবকৃত 'বিকার'। এই বিকারের মধ্যে শিল্পের আঙ্গিকের মহত্ত্ব আছে, শিল্পীর কল্পনার উদার সঞ্চরণ আছে; তার ফলেই শিল্পরূপ ভয়াবহ অদ্ভুত এবং কিম্ভূত হয়ে পড়েছে কখন কখন। ব্যাবিলনীয় শিল্পের বিশালতায় যে সুমিতিবোধের আপাতঃ অভাব আছে, তার মধ্যে অপ্রাকৃত শিল্পলক্ষণ ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যাবিলনীয় শিল্প তথা সাহিত্য কিয়ৎপরিমাণে সত্য এবং বিচারসহ।

ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে দেবত্বের সংকেত মূল্য-

টুকু দেখেছিলেন। দেবদেবীর মূর্তির রূপ সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা ধ্যানের মাধ্যমে লাভ করতেন। এই ধ্যানাশ্রিত মূর্তি লাভ বহু শিল্পীর অভিজ্ঞতায় ঘটেছিল। নটরাজের মূর্তি, বুদ্ধের মূর্তি, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী-মূর্তি, সরস্বতীর মূর্তি—এঁদের রূপ কল্পনার উৎস হল শিল্পীর ধ্যান। মডেল থেকে ছবি আঁকার রীতি পশ্চিমদেশে প্রচলিত থাকলেও পূর্বদেশে এর চল ছিল না। অনুকৃতি যদি শিল্প বলে পরিগণিত হত তাহলে মডেল থেকে ছবি আঁকার রীতি হয়ত ক্রমশঃ স্বীকৃত হত। কিন্তু তা হয়নি। তা হয়নি বলেই ভারতীয় শিল্প, ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, আঙ্গিক-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। নিগ্রো প্রজাতির বিশেষ ধরনের শিল্পকলা তাদের প্রথাগত সঙ্গীত এবং নৃত্য-গীতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। গ্রীকেতর কল্পনায় মানুষের যে রূপ কল্পনা করা হয়েছিল তাকে অস্বীকার করলে আমরা শিল্প বিবর্তনের ধারাটিকে বোধহয় যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে গ্রীক শিল্পে আমরা যে ধরনের কলা-কৌশলের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করেছি তার এক ভগ্নাংশও আমরা ঈজিপসীয় ও ব্যাবিলনীয় শিল্পে প্রত্যক্ষ করিনি। ডঃ শীল গ্রীক ভাস্কর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং গ্রীক ভাস্কর্যের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু চিত্রকলা এবং চৈনিক স্থাপত্য বিদ্যারও প্রশংসা করেছেন। গ্রীক শিল্প চেতনায় অ-গ্রীসিয় শিল্পকলা- সঙ্গতিবিহীন বলে প্রতিপন্ন হত, একথা ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। গ্রীক শিল্প ছাড়া অন্যত্র সুন্দর রূপের মাধ্যমে সুন্দর কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এই ধরনের অলস কল্পনার নিন্দা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। কেন না, তাঁর মতে শিল্পের মূল্যায়ন ও জাতীয়করণে প্রাত্যন্তিকতা বা finality নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কুৎসিত, অসুন্দর এবং অতি সাধারণ এদেরও শিল্পলোকে যথাযথ স্থান আছে।

ডঃ শীলের উপরোক্ত শিল্প ধারণা হেগেলীয় শিল্প ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত। ১৯০৫ সালে এবং তৎপরবর্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে হেগেলীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কবি কীট্সের শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ শীল সূর্য এবং চন্দ্র আশ্রিত রূপকথার সাহায্য নিয়েছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যে ইন্দ্রজাল (The magic of Nature)

কাজ করে সেই ইন্দ্রজালের ছোঁয়া এসে লাগে শিল্পীর তুলির টানে, কবির কথা ও ছন্দে। মহাকবি মিলটন Paradise Lost কাব্যে শয়তানকে (Satan) মুখ্য ভূমিকা দিয়ে একটা ঐতিহ্যের সূত্রপাত করেছিলেন; তারই অনুসরণ করল Hyperion কাব্য। কীট্স যে রূপকথার আশ্রয় নিলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যে সেই রূপকথার মৌলিকতা স্বীকার করার প্রশ্ন না থাকলেও যেভাবে যে রূপে এই রূপকথার বিষয়টুকুকে পরিবেশন করা হয়েছে তা সর্বাংশে মৌলিক ও অনন্য। নন্দনতাত্ত্বিক Winckelman এর সময় থেকে যে সমালোচনার ধারা জার্মানীতে চলে আসছিল সেই ধারাও কীট্সের কল্পনার মৌলিকতাকে স্বীকার করেছিল। কাব্যের মধ্যে রূপকথার দার্শনিকতা অনুস্যূত করে দিয়ে কীট্স কাব্যজগতে নূতন পথের দিশারী হলেন, একথা বললেন ডঃ শীল। সত্য এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণ সমন্বয় করার প্রেরণা ভারতীয়রা পেয়েছিল একধরনের সুপ্রাচীন আদর্শবাদ থেকে; সেই আদর্শবাদই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যশক্তিকে উদ্দীপিত করেছিল।

ডঃ শীল বললেন, সত্যের মুখাবরণ অপসৃত করার জন্যই Hyperion কাব্য গ্রন্থে Oceanes-এর বক্তৃতার সংযোজন করা হয়েছে। Oceanes হল এক ধরণের ঐতিহাসিক চরিত্র; এর ঐতিহাসিকতা জ্ঞাতা অনির্ভর। এই কাব্য কথিত দেবদেবীর সৌন্দর্য এবং কাব্যে সংযোজিত আবর্তন-মূলক বা Evolutionary। মানব চেতনা বিষয়-নির্ভরতা থেকে ব্যক্তি-নির্ভরতা অভিমুখে যখন অগ্রসর হয় তখনই তার বিবর্তন ঘটে। প্রকৃতির নিসর্গশোভা থেকে শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক মহিমার দিকে তার নিত্য চংক্রমণ।

হেগেলীয় শিল্প-শ্রেণীবিন্যাস : ডঃ শীলের সমালোচনা

পরিণত মানসিকতার অধিকারী হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্পশ্রেণীকরণের বিরোধিতা করলেন। শিল্প ধারণার ক্রমবর্ধমানতার পদক্ষেপ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, Oriental এবং Neo-oriental, Classical এবং Neo-classical, Romantic এবং Neo-romantic শিল্পশ্রেণীভেদের কথা। শিল্প ভাব বা Art idea দ্বান্দ্বিক ক্রমবিবর্তনের এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে। এই তত্ত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে শিল্পের এই ক্রমবর্ধমানতার তত্ত্ব পথে ভারতীয় চৈনিক, জাপানী এবং ইউরোপীয় শিল্প ক্রমশঃ আপন আপন পরিণতি ও সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল Oriental, Classical এবং Romantic। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং রূপভিত্তিক বা Formal। হেগেল কেবলমাত্র ইউরোপীয় শিল্পকলার নিদর্শন থেকেই শ্রেণীকরণ করেছিলেন ; এই সংকীর্ণ সত্যটুকু ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। হেগেলীয় শ্রেণীকরণ তর্কবিদ্যা কথিত Cross Division বা শঙ্কর বিভাজন দোষে দুষ্ট এবং এ কথা বলা চলে যে, হেগেলীয় শিল্প ধারণার oriental শিল্পকে, classical অথবা রোমান্টিক আখ্যায় আখ্যাত করা যেতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, হেগেলীয় নন্দনতত্ত্বে বহু পরিচিত এবং নির্দিষ্ট অর্থশালী শব্দসম্ভার বহুজন অবজ্ঞাত নানান্ শব্দের মতন করে অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরফলে নানান্ ধরণের অর্থ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ শীল মনে করতেন যে, সাহিত্যের ইতিহাস তথা শিল্পের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল এমিল জোলা, ইব্‌সেন এবং তলস্তয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পের সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য এবং শুভ সাধনের শক্তি যে শিল্প চারিত্র্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও নির্দিষ্ট করে, এই সত্যটুকু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখন গ্রহণ করলেন, তখন

অনেকেই ভেবেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তার উপর তলস্তয়ের চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেল সম্বন্ধে যে একদেশদর্শিতার অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন হেগেলের বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ করলেন তখন আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না। কেননা, আমরা জানি যে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে হেগেলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত সামান্য। তাই তিনি ভারতীয় শিল্পকে 'Grotesque', 'Bizarr'e প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ যদি হেগেলীয় শিল্প ধারণায় একদেশদর্শিতাকে আবিষ্কার করে থাকেন তবে আমরা সেক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথকে সমর্থন না করে পারি না। অবশ্য হেগেলীয় শিল্পবিচারে আমরা যে ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখি তার আভাস পাই ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারেও। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যের বিচার করেছেন তখন এই ধরনের বিচার প্রহসন ঘটেছে বলে আমরা মনে করি। সেকথার উল্লেখ এবং আলোচনা আমরা যথা প্রসঙ্গে উত্থাপন করব।

শিল্পের ত্রিসত্তা—শিল্পের The idea অর্থাৎ শিল্পভাব, শিল্পবস্তু বা Symbol এবং শিল্পপ্রকাশ অর্থাৎ Reflection ; এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল, শিল্পের প্রকাশটুকু। এই প্রকাশের ধর্ম অনুসারে শিল্পের ধর্ম নিরূপিত হয়। শিল্পের ভাব এবং শিল্পবিষয়ের বারবার রূপভেদ ঘটতে পারে। হেগেলীয় শিষ্য তরুণ দার্শনিক Taine-র মতকে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন। Taine-র সঙ্গে এক মত হয়ে হেগেলীয় শিল্পদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, শিল্পের মূল উৎস নির্ধারণ এবং শিল্পের শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সর্ববিধ আলোচনার মৌল ভিত্তি-ভূমিটুকু আমরা হেগেলীয় শিল্পদর্শন থেকে গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য শিল্পধারণার যে ত্রিতত্ত্বের কথা আমরা পূর্বে বলেছি সেই ত্রিতত্ত্বের উপকরণ হ'ল শিল্প প্রকাশ। কাব্য, চিত্র প্রমুখ বিভিন্ন বিচ্ছেদরূপে সহজেই ক্লাসিক্যাল বা রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে ; শিল্পে এই প্রকাশের প্রাধান্য থাকার ফলে রোমান্টিক শিল্পের উদাহরণ হিসেবে ডঃ শীল দান্তের নরকের বর্ণনার কথা বলেছেন। আবার যখন মহা-

কবি মিলটন কথিত সীমাহীন পাতালপুরীর কথা তিনি বললেন তখন। বিষয়বস্তু ভিন্ন জাতের হলেও এই চিন্তাটিকে রোমান্টিক বলতে কোন বাধা থাকে না; শিল্প ভাব বা Idea সম্বন্ধেও সেই একই কথা (হেগেলীয় শিল্প দর্শনে রোমান্টিক আর্টকে যে চরম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে রোমান্টিক আর্ট সেই ধরনের মর্যাদা লাভের যোগ্য নয়। তিনি বললেন যে, শিল্প বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে হেগেলীয় রোমান্টিক আর্ট ধারণা থেকে যে ধর্ম এবং ধর্ম থেকে দর্শনের উৎপত্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সে তত্ত্ব ভ্রান্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক Taine-র অনুসরণে বললেন যে ধর্ম এবং দর্শনের পাশাপাশি শিল্পধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; শিল্পধারার কালক্রমে দর্শনধারায় রূপান্তরের তত্ত্ব ডঃ শীল গ্রহণ করেননি। হেগেলীয় শিল্পদর্শনের যে সমালোচনা আমরা ডঃ শীলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তা অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা Schelling প্রমুখ দার্শনিকের শিল্প আলোচনায়ও পেয়েছি। এঁদের মতে প্রকৃতির ক্রমবর্ধমানতার ইতিহাস আমরা হেগেল কথিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যেমন পাই না, ঠিক তেমনি করে শিল্পের প্রগতির ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব অপ্রযোজ্য। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে নূতন সত্য আবিষ্কারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নয় এই সত্যটুকু হেগেলের কাছে ধরা পড়েনি। পরিণত মানসিকতায় ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আমরা যা পেতে পারি তা হ'ল Codification, Systematization and Rational Explanation; ইতিহাসের বিবর্তন পথে কোন বিশেষ সত্যের উদ্বর্তন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেবার শক্তি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা Dialectics-এর নেই। অবশ্য এই সত্যটুকু তরুণ Taine-র চোখেও ধরা পড়েনি। ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পূর্ণতা তত্ত্বের অনুধ্যান করেছেন। Rounded perfection বা পূর্ণায়ত জীবনদর্শনের অন্বেষণ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই অনুসন্ধানবশেই তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পরিমিত প্রয়োগ সুবিধার সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

শিল্প ও নীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ "Moral teaching by Aesthetic culture-এর কথা বললেন। মানুষের আবেগগত জীবনের সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে নৈতিক

অভ্যাস এবং ব্যবহার বিধি গঠন করা যায়, এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেছেন। ডাঃ শীলের মতে মানুষের নৈতিক জীবন তার সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে; প্রান্তিক সত্তা সম্পর্কিত ধারণা (Belief in Ultimate Realities) সাধারণতঃ আসে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নৈতিক বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমতঃ তাঁর মতে সামাজিক কল্যাণ এবং অভ্যাস এবং আচরণগত ব্যবহারবিধি বর্ণনাই হল নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; এই পথে মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ডঃ শীল নন্দনতাত্ত্বিক কৃষ্টি বলতে আবেগগত জীবনের অনুশীলন ও পরিণতিকে বুঝেছেন। ধর্মীয় তত্ত্বের উদ্বর্তনকে তিনি তেমন প্রাধান্য দেন নি। বরং মানুষের সংস্কারগত সহজ প্রতিক্রিয়াকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তিনি মানুষের কৃষ্টি জীবনের একটি জ্ঞাতা অনির্ভর বা objective চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার পরে নীতিশিক্ষা প্রদান করা হল এক ধরনের Hysteron Proteron-এর দৃষ্টান্ত। ডঃ শীল সংস্কৃত নাট্যকারদের শিল্প প্রকৃতিতে এই নৈতিক আদর্শের প্রাধান্যটুকু লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি বললেন, "Sanskrit Dramatist has a sense of propriety and moral equilibrium which is offended by the final triumph of vice over virtue, of an unmoral fate over the human demand for equity and justice." নাটকের আখ্যান ভাগে পাপ যদি পুণ্যের উপর জয়ী হয় তবে সেই নাটকদর্শনে মানুষের মনে নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাটুকু কমে যাবে: এই আশংকা সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রকারদের মনে যথার্থই ছিল। তাই এই ধরনের নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রী ধর্মকে জয়ী করেছিলেন। ডঃ শীলের মতে এই বিরোধটা যথার্থ ন্যায়সংগত হয়েছিল, কেননা মানুষের মনের নন্দনতাত্ত্বিক প্রবণতার চেয়ে নৈতিক প্রবণতাটুকু গভীরতর। নৈতিক ভারসাম্যটুকু একদিকে যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে কাম্য ঠিক তেমনি ধারা এই নৈতিক ভারসাম্যটুকু রক্ষা করা হল শিল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য; আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের অনুগামী। Poetic Justice বা কাব্যগত ন্যায়পরায়ণতা—এটি

কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বলে জনসনের মতই ব্রজেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেছেন। মহাকবি মিলটন এই চিন্তাধারা অনুসরণ করেই কাব্যগত ন্যায়পরায়ণতাকে রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতার অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন।

কবি কীটসের কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় ডঃ শীল চেতনা এবং আত্মচেতনা এই দুটি মানসিক স্তরের মুখোমুখি সংস্থাপনকে কাব্য সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে আমরা হেগেলীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছি। কবি যখন জগত সম্বন্ধে সচেতন হন না, সেই মানস অবস্থা হল Thesis পর্যায়ের; হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে Thesis এর পরে আসে Anti-thesis। অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ Anti-thesis হিসেবে আত্মসচেতনতা বা self conscious-এর সংস্থাপন করলেন। আত্মচিন্তা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি আপন মনোবিকলন করেন. আপন মনের দুঃখবোধ নিয়ে তাঁর সমীক্ষার অন্ত থাকে না। কবি ক্রমে ক্রমে আপন জীবনের ট্র্যাজেডির মূল সত্যটুকুর সন্ধান পান। এতো গেল মনোবিকলনের একদিক, অপরদিকে কবির আত্মসচেতনতা তাঁর মানসিক প্রশান্তিকে বিনষ্ট করে; মনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ততাটুকু হারিয়ে যায়। অবশ্য ডঃ শীলের মতে এই স্বতঃস্ফূর্ততার বিনষ্টি মহৎ শিল্পের উদ্ভব সম্ভব করে। ডঃ শীল মনের এই অবস্থাকে "Sense of the Luxurious" আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পী মনের এই দ্বন্দ্ব মুখর অবস্থাকে উনি "Melody" নামে অভিহিত করেছেন। ডঃ শীলের মতে কবি মনের এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব মনের সহজ আবেগকে এক ধরনের আত্মনিপীড়ন জাত বিষাদে পরিণত করে তোলে। এই মানসিক অশান্তিকে ডঃ শীল 'Impersonal Quality' বলেছেন। কবি যখন আপন দুঃখকে, আপন আনন্দ-বেদনাকে ব্যক্তি সত্তা থেকে বিচ্যুত দেখেন তখন এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক গুণ বা Impersonal Quality শিল্পীর মনে উদ্ভব হয়। এই নৈর্ব্যক্তিকতা ডঃ শীলকে ক্রোচে এবং জেন্টিলের মত নব্য হেগেলীয় দার্শনিকদের সমধর্মী করে তুলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে যদিও কাব্য মূলতঃ কবির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ তবুও কবির ভূমা দর্শনের প্রসাদ গুণে একধরনের বৈরাগ্য এই ব্যক্তিগত অনুভূতিটিকে চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা দান করে। কবি কীটসের

আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শীল বারবার এই Impersonal Quality বা নৈর্ব্যক্তিক প্রসাদ গুণের উল্লেখ করেছেন। ডঃ শীলের মতে কীট্‌সের 'Endymion' কাব্য গ্রন্থে কবি যে সৌন্দর্যের উপাসনার কথা বলেছেন, সেই সৌন্দর্যের উপাসনায় ইন্দ্রিয়গত সুখবোধের স্থান নেই। স্নায়বিক সুখকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যের উপাসনায় কবি একধরনের ইন্দ্রিয় সুখের সন্ধান পেয়েছেন। এই সুখ এলো কবি মনের কল্পনাশ্রিত আদর্শ সুখের মূর্তিতে। এই আদর্শায়িত সুখকে আমরা আনন্দ বলতে পারি। এই আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে এক অবিমিশ্র অবিচ্ছিন্ন সত্তারূপে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতাকে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রেমের সোপানরূপে ব্যবহার করেছেন। প্রেম ও আত্মরতি, এই স্বার্থ বুদ্ধি প্রণোদিত মানস প্রবণতাকে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বে সহজেই অতিক্রম করলেন। তাঁর এই নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রকৃতির সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে একাত্মতাটুকু তা তিনি আবিষ্কার করেন; সেই একাত্মতাটুকু এলো সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে; এর ফলে যে অবিচ্ছিন্নতা বোধটুকু মানুষের মনে সঞ্জাত হয় তাকে আশ্রয় করে এই সার্বিক সুন্দরের প্রভাব সর্বত্রগ হয়। এই যে সৌন্দর্যের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, সেটুকু সামগ্রিকভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ডঃ শীলের অপ্রকাশিত Autobiology গ্রন্থে আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা পাই তাতে তিনি একথা স্পষ্ট করে বললেন যে, সুন্দরের সার্বিকতাটুকু আমরা সঙ্গীতে পাই না। কেন না, সঙ্গীত হল শিক্ষাসাপেক্ষ। শিল্পে অধিকারভেদতত্ত্বকে ব্রজেন্দ্রনাথ এইভাবে শিক্ষাসাপেক্ষ ক'রে রায় দিলেন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দুসঙ্গীতের উল্লেখ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হল, দীক্ষা এবং শিক্ষা ব্যতীত হিন্দু সঙ্গীতের মর্ম মূলে প্রবেশ সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শাস্ত্রীরা হিন্দু সঙ্গীতে "Harmony"র সন্ধান নাকি পান নি। ডঃ শীল এই অভিমতের বিরোধিতা করলেন। তিনি তাঁর 'Positive Sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থে বললেন:

"This Harmony as evidenced in music and other forms of plastic art was a phenomenon not only of the Aesthetic world but of the phenomenal world as well." ডঃ শীলের Harmony বা সুরসঙ্গতির ধারণা শুধুমাত্র যে শিল্প এবং কাব্যলোকেই প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়, তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের ব্যবহারিক জগতেও। তাঁর এই চিন্তাধারাটুকু মনে হয় প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক ভোজদেব বলেছিলেন যে জীবন সত্য ও শিল্পসত্য সমার্থক। ডঃ শীল এই ধরনের সার্বিক সমন্বয়ে বিশ্বাস না করলেও জীবন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি একধরনের সঙ্গীতমুখর সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেটা আমরা তাঁর উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই দেখতে পাই। শিল্পক্ষেত্রে Harmonyকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করার ফলশ্রুতি হল ডঃ শীলের দর্শনে প্রেমতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই যে আত্যন্তিক ভালবাসাটুকু নিত্য সত্য সেই ভালবাসাই হল শিল্পরসিকের পক্ষে শিল্পীর শিল্পকৃতি বিচারের একমাত্র পথ। এই ভালবাসার পথে শিল্পী এবং সমালোচক সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ করে। তাই ডঃ শীলের শিল্পদর্শনে Problem of communication বা সমালোচকের পক্ষে কবিকে বোঝার পথে কোন বাধা নেই। যে সঙ্গীতকে ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই আবার তিনি দেখেছেন জীবনে। তাই সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন এবং শিল্পের অভিন্নতা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কাব্য-সাহিত্যকে তাই তিনি Criticism of life বা জীবন-বীক্ষণ (জিজ্ঞাসা) বলে আখ্যাত করেছিলেন। যেখানে এই জীবন-বীক্ষণ বা criticism of life নেই সেই শিল্পে সেই কাব্যে রসের প্রসাদ গুণের ন্যূনতা ঘটে। সে ক্ষেত্রে কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আপন আবয়বিক রূপ গৌরবে উদ্ধত; সেখানে কাব্যকে ব্রজেন্দ্রনাথ 'Formal' আখ্যা দিয়ে তাকে কাব্যের পূর্ণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে কাব্যের আবয়বিক প্রসাদগুণ বা Formal quality-র প্রশংসা তিনি করতে পারেন নি। তাই আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সুহৃদ হয়েও তিনি সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ (His methodology)

ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক তুলনামূলক প্রকরণ তাঁকে নানান বিভিন্নধর্মী বাদানুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আপন মতবাদের গৌরবটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। তিনি যখনই ভারতীয় শিল্পের বা সত্যের ধারণার কথা বলেছেন তখনই আমরা দেখেছি তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটুকু আলোচ্য বিষয়ের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে একটি সার্বজনীন পশ্চাদ্‌পটকে আশ্রয় করেছে। অনুরূপতা হল ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ আলোচনা কোথায় কবে সংযোজিত হয়েছে, সেই তত্ত্ব আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনায় পাই। শিল্প আলোচনা তিনি কখনও এককভাবে অনন্যভাবে করেন নি। ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের ভূরি ভূরি নজীর উদ্ধার করেছেন ; চৈনিক এবং জাপানী শিল্পের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। এইভাবে প্রাচীন এবং সমকালীন ঐতিহাসিক নজীর উল্লেখ করে তার পটভূমিতে তিনি শিল্পের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এই মূল্যায়ন ব্যাপারে অনুরূপ পদ্ধতি আমরা চিন্তাশীল নব্য নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে পেয়েছি। Yvor Winters এই ধরনের ঐতিহাসিক-সমালোচনাশ্রিত পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। Winters-এর কথার উল্লেখ করি ; তাঁর মতে সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে থাকবে : (১) To state relevant historical and biographical material (২) To analyse the writer's relevant theories (৩) To make a rational criticism of paraphrasable content (৪) To make a rational criticism of feeling, style, language and technique (৫) To make a final act of judgement. Yvor Winters যে দৃষ্টিকোণের কথা বললেন, তা হ'ল সম্যক্ দর্শনের দৃষ্টিকোণ। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার করেছেন তখন তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে পূর্ণায়ত রূপের অসীম

সৌন্দর্যটুকু আকণ্ঠ পান করেছেন, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম জীবনে যখন তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক হেগেলকে অনুসরণ করেছেন অন্ধভাবে তখন তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের এই সার্বিক প্রসাদগুণটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতা ব্রজেন্দ্রনাথকে রসকে তার স্ব-স্বরূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয় নি। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলের প্রভাব মুক্ত হয়ে যখন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করলেন তখন তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সুষমাটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। প্রথম জীবনে রবীন্দ্র-কাব্যকে তিনি জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখেছিলেন। তাই তা জীবন পর্যালোচনা বা Criticism of life নয় বলে তাকে সার্থক কাব্যের গৌরবটুকু দান করেন নি। এই সার্বিকতার দৃষ্টিকোণ হল ভূমার স্পর্শজাত আদর্শ; এ দেখা হ'ল sub specie aeternitatis ঔপনিষদিক জীবন দর্শনের আদর্শে; এই আদর্শ আশ্রিত ভূমার ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথকে সম্যক্ দর্শনের অধিকার দিয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের পূর্ণতার ধারণা এবং সেই ধারণার নিত্য উপাসনা তাঁকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পূজারী করে তুলেছিল। রমাঁ রলাঁর মতই তিনি কালাশ্রিত closed system-এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর এই পূর্ণতার ধারণার মধ্যেই তিনি যে synthetic philosophy বা সমন্বয়ী-দর্শনের কথা বলেছেন, সেই দর্শনের উপর এই পূর্ণতার প্রভাব বহুলাংশে পড়েছে। এই পূর্ণতার দেখা ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে পান নি। তাই যখন গীতাঞ্জলির কবি বিশ্ববন্দিত হয়েছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কবিকে এক পত্রে লিখলেন যে, এই কাব্য গ্রন্থের মধ্যে কবির প্রতিভার সম্যক্ স্ফূর্তি ঘটে নি। এমন কি পাশ্চাত্ত্য দেশের সমালোচকেরা যখন কবিকে Mystic আখ্যায় আখ্যাত করেছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেছেন। কেন না তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে যে পরিপূর্ণতার প্রসাদগুণটুকু অনুস্যূত ছিল তার যথার্থ বর্ণনা এই Mystic শব্দটির দ্বারা করা যায় না। তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ যখন শিল্পকে কেবলমাত্র জীবনের পর্যালোচনা বা Criticism of life রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন তখন তিনি শিল্পের বৌদ্ধিক রূপটুকুর উপরই জোর দিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য

ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন তাঁর পরিণত বয়সে। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্বের পর্যালোচনা করে বললেন, "The role of art as criticism of life aught to be subservient to something which have a greater appeal to imagination. অতএব বলা চলে যে, শিল্পকে জীবনের পর্যালোচনা রূপে প্রত্যক্ষ করার কাহিনী হল অপরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্পবিচারের ইতিবৃত্ত।

পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন সম্যক্ দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তখন তিনি প্রথম যুগে ব্যবহৃত Historico-Comparative Method বা ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতিকে ত্যাগ করে Genetic Method প্রবর্তন করেছেন শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে। তাঁর অপ্রকাশিত Autobiography গ্রন্থে তিনি শিল্প-ইতিহাসের যে পর্যালোচনা করেছেন তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে Helenic Art, Renaissance Art, The Buddhist and Hindu Art—এই ক্রম পর্যায়কে আশ্রয় ক'রে। শিল্প আলোচনার এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের কালক্রম তিনি শিল্প জগত এবং জীবজগতের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর Neo-romantic Art ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি মৌল সত্যের কথা বললেন, (১) The ideal content of consciousness (২) The Mythopaeic process (৩) The crowning transfiiguration of the birth of a new emotion, as of a new tone or harmony, transfiguring the imaginative material ; অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে শিল্পীর কল্পনা শক্তি এবং আবেগের মুখ্যতাকে স্বীকার করলেন। কল্পনা ও আবেগের মুখ্যতা তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই কাব্যগ্রন্থ দুটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ Neo-romanitc Lyric আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যক্তি নির্ভর অনুভূতির প্রবল স্রোত কবি এবং পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' মধ্যে তিনি জীবনের পর্যালোচনা বা criticism of life এর দর্শনীয় রূপটুকু খুঁজে পান নি, আর পান নি Mythopoeia-কে। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের মতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র চেয়ে 'প্রভাতসঙ্গীত' উচ্চতর

মানের কাব্যগ্রন্থ। কেন না 'প্রভাতসঙ্গী'তে জীবনের পর্যালোচনা অর্থাৎ criticism of life কে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপ-সংহারে এই জীবন-পর্যালোচনা তত্ত্বের অতিক্রমণ বা transcendence যে উচ্চতর মানের, একথা ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন উদাহরণ সহযোগে তাঁর কাব্য গ্রন্থে, 'The Quest Eternalএ। ব্রজেন্দ্রনাথ একধরনের Mysticism-এর প্রয়োগ করেছেন। এই ধরনের Mystjcism-এর অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি আত্যন্তিকভাবে সক্রিয় হয়; কবি ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এই বুদ্ধিগত Mysticism প্রত্যক্ষ করেছি; এই ধরণের Mysticism-এর দেখা পেয়েছিলাম আমরা পশ্চিমী মহাকবি টেনিসনের মধ্যে। কাব্য বা শিল্পে যখন এই ধরনের Mysticism এর ছোঁয়া লাগে তখন সেই কাব্যের 'অনন্যতা' বহু গুণে বর্ধিত হয়। কাব্যের অনন্যতা বিচার তখন আর শুধুমাত্র রসিকের ব্যক্তিগত রূপ অরূপের ধারণার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তখন তার যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণ-মানসিকতা বা Mass consciousness এবং কালমানসিকতা বা Age consciousness এর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ ডঃ শীল একথাই বলতে চেয়েছেন যে 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' যে মানদণ্ডটি দিয়ে শিল্পীর শিল্পের মূল্যায়ন করেন সেই মানদণ্ডটি গঠিত হয় সমকালীন মানুষের ভাব ভাবনার প্রভাবে। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ-কৃত রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়নের কথা একটু বিশদভাবে বলি।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে যে অসদর্থক জীবনসমালোচনার সাক্ষাত আমরা পাই তারই পরিণত রূপ 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' দেখেছি। সমকালীন নাটকগুলির মধ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, আধুনিক যুগের মহাকাব্যগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহার' এবং 'দশমহাবিদ্যার' যে স্থান তারই অনুরূপ স্থান হ'ল 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' আধুনিক নাটকের ক্রমবিবর্তনধারার। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি ডঃ শীলের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। তাই দেখি যে, যখন তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে Paracelsus-এর সঙ্গে তুলিত করেন এবং Paracelsus-

এর সাহিত্যিক মূল্যের অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা বলেন তখন আমরা ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারকে একদেশদর্শী না বলে পারি না। ডঃ শীল যখন বলেন: 'A moment's comparison between the Paracelsus and the Prakritir pratisodha' makes the immense superiority of the former manifest in point of profound speculative insight, dramatic range and complexity of life, a sense of the social problem and human perfectibility and a masterly comprehension of the many sided forces and tendencies which go to make up the stream of existence'. 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' ডঃ শীল প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যক্তি মননের সত্য-অন্বীক্ষার সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসার দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ ভূমার স্পর্শ নেই, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত প্রেমের ব্যঞ্জনা নেই। ডঃ শীল কবির এই নাট্যকাব্যটিতে এক ধরনের যান্ত্রিক বন্ধনকে প্রত্যক্ষ করেছেন; এই যান্ত্রিক বন্ধনের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা কখনই ক্ষুন্ন হয় না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে যদি আমরা নাট্যকাব্যের মর্যাদা দিই, সার্থক সৃষ্টি বলে গ্রহণ করি, তবে একথা স্বীকার করতেই হয় এখানে কবির স্বাধীনতার অপলাপ ঘটেনি। ডঃ শীল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং প্রভাতসঙ্গীতের' আলোচনা প্রসঙ্গে যে জীবনবীক্ষণতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। নব্য রোমান্টিক লিরিক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ডঃশীল রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাতসঙ্গীত'কে গণ্য করেছেন। কাব্য সুষমার জনয়িত্রী হ'ল কবির একান্তভাবে Subjective বা বস্তু অনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী; জীবনের এবং জগতের দুঃখ-বেদনার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে কবি মন জয়ী হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে 'প্রভাতসঙ্গীতের' মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ যতটা জীবনবীক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক ততটা তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে খুঁজে পান নি।

রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী কবিতায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাথমিক আবেগের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে কবি যে ধরনের চিত্রকল্প তাঁর

গীতিধর্মী কবিতায় ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশতেই খুব পরিণত মানসিকতার নিদর্শন নেই। অর্থাৎ কবি কর্তৃক সহজ সরল চিত্রকল্পের ব্যবহারকে ডঃ শীল কবি মানসের অপরিণত অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন। আমাদের মতে সহজ ও সরল আঙ্গিক অথবা চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির অপরিণত মানসিকতার লক্ষণ নেই। বরং একথা আমরা বলব যে সরল আঙ্গিক হ'ল পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। বাইবেল ধর্মগ্রন্থের লেখ্য আঙ্গিক অত্যন্ত সরল। তাই বলে বাইবেলের বক্তব্যকে কোন সমালোচকই অপরিণত মানসিকতার ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করবেন না। 'ভানুসিংহের পদাবলীর' সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শীলের বক্তব্য অনুধাবন করলে আমরা আবার পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রতি ডঃ শীলের পক্ষপাতিত্বটুকু প্রত্যক্ষ করি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ডঃ শীল রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে Historical comparative বা ঐতিহাসিক তুলনাগত পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। 'ভানুসিংহের পদাবলীর' উৎকর্ষ অনুধাবন করতে গিয়ে ডঃ শীল প্রাচীন ইতালীয় প্রেমকাহিনীর যে পুনরাবৃত্তি কবি কীট্‌স্‌ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা করে 'ভানুসিংহের পদাবলীর' মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন ডঃ শীল। এই ধরনের তুলনামূলক বিচার আমাদের মতে বহুক্ষেত্রে মূল্য বিচারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে। কাব্যকে তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তাটুকু এ যুগের প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। কাব্য তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। ব্রজেন্দ্রনাথের 'Quest Eternal'কে বুঝতে হ'লে কবির ভারতীয় মানসিকতাকে প্রথমে যথাযথ অনুধাবন করতে হবে। তারপর তার সঙ্গে বিশ্বমানবিকতার যোগটুকু উপলব্ধি করতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের 'Quest Eternal' বুঝতে গিয়ে আমরা যদি দান্তে অথবা মিলটনের মানসলোকের পরিপ্রেক্ষিতে 'Quest Eternal'কে স্থাপন করি তবে আমাদের কাব্য বিচার ভ্রান্ত হবে। ডঃ শীল কৃত রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলীর' বিচারের মধ্যেও এই ধরনের ভ্রান্তি অনুসৃত হয়ে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনাকে তিনি Age consciousness বলেছেন। আমরা এই বিশ্বমানব

তত্ত্বকে গ্রহণ করি। আমরা এই তত্ত্বকে স্বীকার করি, কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে Man is not a moral Medchizedeck. এই কাল-মানসিকতা এবং প্রজাতি মানসিকতা স্বীকার না করলে আমরা কাব্য ও শিল্পের ব্যঞ্জনাতত্ত্বটিকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। শব্দের অর্থ অভিধানিক হ'লেও তার ব্যঞ্জনা সঞ্চিত হয়ে থাকে যুগ মানসে এবং জাতি মানসে। যক্ষের বিরহ কাহিনী মেঘদূতের দৌত্য অথবা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম-বিরহ-মিলন কথার মর্মমূলে কেবলমাত্র 'মেঘদূত' বা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তার শাব্দিক বা বাচিক অর্থটুকু অনুধাবন করলেই প্রবেশ করা যাবে না; ভারতীয় ঐতিহ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে তবেই এই দু'টি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের যথার্থ রসোপলব্ধি ঘটবে। ঠিক এইভাবেই আমরা রামায়ণ, মহাভারত প্রমুখ মহাকাব্য দুটির কথাও বলতে পারি। মহাভারতের বা রামায়ণের কাহিনীর অন্তরে প্রবেশ করতে হলে ভারতীয় ঐতিহ্যে অবগাহন স্নান ক'রে উঠে তবেই ভারতীয় মহাকাব্য দু'টির রসের জগতে প্রবেশ করা যেতে পারে। মহাভারত পাঠ করার সময় সমগ্র প্রজাতি মানস যুগ মানসকে আশ্রয় ক'রে পাঠকের মনে অধিষ্ঠিত হয়। তবেই আমরা মহাকাব্যের রসের জগতে প্রবেশ লাভ করি। মহারথী ভীষ্মদেব যখন অস্ত্র ত্যাগ ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেন

"শীঘ্র এসো কৃষ্ণ কর আমারে সংহার,
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার"

তখন ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে অকথিত আনন্দের এই প্রসঙ্গে ডঃ শীল যে ব্যক্তি মানস ও সামগ্রিক মানসের স্পর্শটুকু ব্যাখ্যা করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তিনি ব্যক্তি মানসের সঙ্গে গণমানসিকতার যোগের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তি মন প্রথমে সমষ্টি মনের মধ্য দিয়ে কাজ করে। এই সমষ্টি মন হ'ল Mass conciousness ; এই সমষ্টি মন জনগণের মনের সমষ্টি মাত্র। তারপরে তিনি বললেন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত চেতনা। একে তিনি Community consciousness বলেছেন। গোষ্ঠী চেতনা একই বিষয়ের দ্বারা সূত্রাবদ্ধ। তারপরের

স্তর হ'ল যুগচেতনা বা Age conciousness : এই যুগচেতনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মানুষ রসের আস্বাদন করে। চতুর্থ স্তর হ'ল মানবজাতি মানসিকতা বা Race consciousness ; এই স্তরে ডঃ শীল যে সামগ্রিক মানবচেতনার কথা বলেছেন তা কোন্ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ শ্বেত পীত বা কৃষ্ণ জাতির মানসিকতা নয় তা হ'ল সমগ্র মানবজাতির চেতনা। এই পর্যায়ে বিশ্বচেতনা এক নবতর শিল্পচেতনার উদ্ভব ঘটায়। Dr. Seal এর কথায় বলি তাঁর Autobiography গ্রন্থ থেকে :

(1) *The Mass eonsciousness or mass mind working in and through the aggregate of individual minds.* This is not organised or expressed through any particular organ or vehicle but is recognised as the conscious working through the proletariate."

(2) *The Community eonsciousness or commnity mind.* The community is held together by bond of a common tradition and practice is a more organised expression of the consciousness than the mass mind.

(3) *The Age consciousness or the true age mind.* This is a living force and develops from age to age.

(4) *The Race consciousness or Raee Mind.* By race consciousness is meant the human race in general and not any particular race or people. By race consciousness accordingly is meant the stage of human evolution which has been attained by man at that particular turn of human history.

ডঃ শীল একথা বলতে চাইলেন যে, শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ যাচাই হবে সমষ্টি মননের দ্বারা। যে সমষ্টি মনন প্রথম পর্যায়ে বিশৃঙ্খলভাবে কিছু লোকের সমষ্টিগত অভিমতের দ্বারা প্রকট হয়, তার মধ্যে যৌক্তিক শৃঙ্খলার অভাব লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমষ্টি মননের পিছনে

থাকে ঐতিহ্যগত বন্ধন ঃ এক্ষেত্রে সমষ্টি মনন পূর্বের থেকে সুসংহত। ব্যক্তি মনের যোগ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো সুসংহত সমষ্টি মননের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্প বিচারে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে এই সমষ্টি মনন আবার যুগ ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়ে আরো নির্দিষ্ট চরিত্র এবং ধর্ম অর্জন করে। এই যুগ মানসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তি মানস শিল্প-রস-চর্বণায় অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শন করে। শেষ পর্যায়টি হ'ল বিশ্ব মানসিকতা ; বিশ্বের সকল মানুষের সার্বিক মনন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির মানসিকতা যুক্ত হয় ঃ একে ব্রজেন্দ্রনাথ Race mind আখ্যা দিয়েছেন ; এই পর্যায়ে ব্যক্তিমন বিশ্বমানবতার শরীক হয়। শিল্পরস তখন আর ব্যক্তিমনের আধারে বিধৃত থাকে না। তা বিশ্ব-মানসকে আশ্রয় করে। ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যে এই পর্যায়ের রসনিঃস্পন্দন প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি Quest Eternal এ যখন বিশ্বমানবতার কথা বলেন, তাঁর সেই পংক্তি-গুলি উদ্ধার করি—

> "Thee nothing human doth displease,
> For thou has not disdained to wear the
> human face !
> Thy Muses, Graces, charities
> Are human mysteries ;
> Thou fastest of the cup from which
> Thou freely saw'st man's race.

মহাভারত পাঠ কালে পাঠকের বাস্তবতাবোধআশ্রিত কূটবুদ্ধি একবারও এ প্রশ্ন করে না যে মহাধনুর্ধর ভীষ্মদেব এতো বড় সুযোগ পেয়েও অর্জুনকে তথা দেহী শ্রীকৃষ্ণকে মর্মান্তিকভাবে শরাহত করলেন না কেন ? এই কেন'র উত্তর সঞ্চিত হয়ে আছে প্রজাতি-চেতনায়। যে ভক্তিরস যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষের মনের মাটিতে উর্বরতা সংযোজিত করেছে, সেই ভক্তিই আধুনিক মনকেও এই ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্য করে তুলেছে। এই সত্যটুকু হয়ত পাঠক নিজেও জানতে পারেন নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে এই যে প্রজাতি মানসিকতা ও যুগ-

মানসিকতার কথা বলা হ'ল, এই ব্যাখ্যায় আমরা একটা সমগ্র জাতির শিল্পবোধের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের সন্ধান পাই। এই ঐক্য আশ্রিত শিল্পবোধই শিল্প-ঐতিহ্য বা শিল্প জাতীয়তার সূচনা করে। তাই ব্রজেন্দ্র নাথ যখন জাপানী চৈনিক ও ভারতীয় শিল্পের, ব্যাবিলনীয়, গ্রীসিয় ও মিশরীয় শিল্পের ঐতিহ্যের বারংবার উল্লেখ করেন তখন আমরা তাঁর নন্দনতত্ত্বে ব্যাখ্যাত শিল্পতত্ত্বের যুক্তিযুক্ততাটুকু লক্ষ্য করি।

পঞ্চম স্তবক : রাষ্ট্রদর্শন

এশীয় রাষ্ট্র-দর্শনে হেগেলীয়-মার্কসীয় প্রভাব

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রদর্শনে হেগেলীয় মার্কসীয় প্রভাব

এশীয়ার নব জাগরণ

এশীয় রাষ্ট্র-দর্শনে হেগেলীয়-মার্কসীয় প্রভাব

সুদূর জার্মানীর মহানভে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল তার রশ্মিচ্ছটা আজও আকীর্ণ হয়ে রয়েছে দিগ্বিদিকে। আমরা George Wilhelm Friedrich Hegel-এর কথা বলছি। মার্কস হলেন হেগেলীয় শিষ্য। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মার্কসের হাতে যে অমোঘ অস্ত্র দিল তা যুগান্তকারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল নানান্ জাতির ইতিহাসে। অনেক রক্তক্ষয় হ'ল, রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ইতিহাসের গতিপথে যে নিশানা রেখে গেলেন হেগেল এবং মার্কস তা হ'ল অগণিত মানুষের পথের দিশারী। হেগেলীয় ভাববাদ এবং মার্কসীয় জড়বাদ একই পন্থাকে আশ্রয় করল। দ্বন্দ্ববাদের ত্রিপদী গতি বিরোধের পথে, সংঘাতের পথে সৃষ্টির নতুন ব্যাখ্যা করল। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ কালাতীত, মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ কালাশ্রয়ী, মার্কসের জড়বাদী পটভূমিতে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ অসমীচীনতা দোষে দুষ্ট হয়েছে এমন কথা পণ্ডিতজনা বলেন। প্রয়োগ-আপত্তিটুকুর সারবত্তা স্বীকার করেও এ কথা বলা যায় যে হেগেল এবং মার্কস উত্তর কালের রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। পশ্চিমদেশে এঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্বদেশেও এতদুভয়ের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। কখন তা সাক্ষাৎভাবে কোন এক রাষ্ট্রের দর্শনকে আচ্ছন্ন করছে আবার কখন বা অন্তর্গূঢ় বিরোধের পথে প্রভাবিত করেছে অন্যান্য দেশের অগ্রনায়কদের চিন্তাধারাকে। যাঁরা সযত্নে মার্কস বা হেগেলীয় রাষ্ট্র-দর্শনকে পরিহার করতে চেয়েছেন তাঁদের সজ্ঞান চিন্তায় নেতিমূলক হেগেলীয়-মার্কসীয় প্রভাব সুপরিস্ফুট। আর যাঁরা সাগ্রহে এঁদের রাষ্ট্র-দর্শনকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা হেগেল-মার্কসের অনুপন্থী। নব্য এশীয় রাষ্ট্র-দর্শনচিন্তায় এই উভয়বিধ প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। নব্য মহাচীনে মার্কসীয় প্রত্যক্ষ প্রভাব অতি গোচর।* নব্য ভারতীয় চিন্তায় এই প্রভাব অন্তরশায়ী।

* অতি সম্প্রতি চীনা রাষ্ট্রনায়কেরা মার্ক্সকে অস্বীকার করেছেন।

আলোচ্য নিবন্ধে এই দুই রাষ্ট্র-দর্শনের উপর হেগেলীয়-মার্কসীয় প্রভাব বিশেষভাবে আমাদের বিচার্য।

রুশিয়া ব্যতীত মার্কসীয় দর্শন ব্যবহারিক রাষ্ট্র-দর্শন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে মহাচীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খণ্ডাংশে এবং পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোতে।[১] আমাদের শাসনতন্ত্র-লক্ষীভূত যে সমাজবাদ তার সঙ্গে মার্কসবাদের বহুল পার্থক্য। আমরা শ্রেণী-সংগ্রাম এবং হিংসা-নীতির বিরোধী। আমাদের সমাজবাদ অর্থশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীর হাতে অর্থনীতিক শক্তি আসুক, এটা ভারতবর্ষীয় সমাজবাদের মুখপাত্রেরা চেয়েছেন। আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিকতা থেকে আমাদের সমাজবাদ রস আহরণ করছে, শক্তি সঞ্চয় করেছে। ভারতীয় সমাজবাদের অন্যতম ভাষ্যকার ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন যে আমরা আমলাতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। কার্ল মার্কসকে চাই না। আমরা সর্বার্থসাধক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, ব্যক্তি-চারিত্রের পরিণতি এবং বিকাশ হোক সহজ স্বাভাবিক পথে, এটা আমাদের কাম্য। আমরা বিবর্তনবাদী। আমরা বৃহদায়তন কোন সংস্থা সৃষ্টির অপক্ষপাতী। আমরা সহজ, সম্প্রদায়গত নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী।[২] দাক্ষিণাত্যে চাষীদের যৌথ প্রচেষ্টায় যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হচ্ছে তাকে আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলি। এই ধরনের ছোট ছোট চাষীদের মালিকানা স্বত্বশালী প্রতিষ্ঠান-গুলো ব্যক্তিপ্রচেষ্টাকে পরিণতি দেয় এবং মানুষের সৃষ্টি-প্রয়াসকে খর্ব করে না বলেই এই ধরনের ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষের আত্মিক-মুক্তি সম্ভব হয়। এই আত্মিক-মুক্তির কথা জড়বাদী মার্কসবাদ বিস্মৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা আমরা কামনা করি তার ভিত্তিভূমি হ'ল অধ্যাত্মবাদ। যে ধন-সাম্যবাদ আমাদের লক্ষ্য তার মূলে রয়েছে মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার একরূপতা। ডক্টর রাও-এর কথায়

১। পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলোর উপর মার্কসীয় প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র-দর্শনে হেগেলীয়-মার্কসীয় প্রভাব' শীর্ষক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

২। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে UNESCO-তে প্রদত্ত ডক্টর রাও-এর বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

বলি : "Our socialist movement is built on spiritual, not materialistic foundation. It seeks economic justice, equality and regard for human values.

আমাদের অধ্যাত্মবাদী সমাজবাদে ন্যায়সঙ্গত ধনসাম্য এবং মানুষের আত্যন্তিক মূল্যবোধের সুনিশ্চিত স্বীকৃতি রয়েছে।

ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে ও মার্কসবাদের অস্ত্যর্থক প্রভাব খুব প্রকট নয়। ওদেশীয় মানুষের জীবনে 'Getong Rojong' বা পারস্পরিক সহায়তার মূলমন্ত্র বৃহৎ শিল্পতন্ত্রে ইন্দোনেশিয়াকে দীক্ষা গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র রয়েছে গ্রামে। আমাদের দেশের মতই ওদেশের গ্রামীন সংস্কৃতি। আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনের মতই সমবায়ী প্রচেষ্টা ওদেশে অনেকদিন আগেই দেখা গেছে। একটা কেন্দ্রীভূত সর্বগ্রাসী অর্থনীতি-ব্যবস্থায় ইন্দোনেশিয়া আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। ওদেশের মানুষ ছোট ছোট সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে দেশ-গঠনের কাজে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় এবং নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে। সারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় দশ সহস্র সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কুটীর-শিল্প অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই সব সমবায়ী প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে। ইন্দোনেশিয়ায় সর্বত্র আজ সুলভ হয়েছে গ্রাম-শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার। রবার চাষ এবং চালের কল পরিচালনা করা হচ্ছে এই যৌথ প্রচেষ্টার ভিত্তিতে। আট কোটি নরনারী অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা চান যে অর্থনীতিক ক্ষমতা 'পরিবারগোষ্ঠী এবং' জাতীয় গোষ্ঠীর' হাতে থাকুক। সর্বহারার একনায়কত্বে এঁরা বিশ্বাসী নন। ইন্দোনেশিয়া মার্কস কথিত কম্যুনিজম্ বা ক্যাপিটলিজমে বিশ্বাসী নয়। এঁরা স্ববশ মানুষের অবাধ্যতামূলক পারস্পরিক সহায়তার নীতিতে বিশ্বাসী।

ব্রহ্মদেশের সমাজবাদ বৌদ্ধ অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত। মার্কসীয় কম্যুনিজম্ বিদ্বেষ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-ভিত্তিক। শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বৌদ্ধদের কাছে অর্থহীন, কেননা বৌদ্ধ সমাজ শ্রেণী-ভিত্তিক নয়। কল মানুষই সমান—ধনী, দরিদ্র, চাষী, জমিদার, নিরক্ষর, পণ্ডিত—এঁদের মধ্যে কোন আত্যন্তিক পার্থক্য বৌদ্ধজীবনবাদ স্বীকার করে না।

মার্কসীয় সমাজ-বাদকে যেমন অন্য মতাবলম্বীরা সন্দেহ, ভয় এবং উদ্বেগের চোখে দেখে ঠিক সেইভাবে বৌদ্ধসমাজবাদকে বিচার করবার অবকাশ অপরিসর। ব্রহ্মদেশীয় সমাজবাদীরা আত্মসম্প্রসারণের জন্য উদ্বিগ্ন নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের কূট-কলা-কৌশল দুর্বল রাষ্ট্রের ভীতির কারণ হয়ে ওঠেনি, কেননা এঁদের রাষ্ট্র-দর্শন মার্কসীয় হিংসা-নীতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি। ব্রহ্মদেশের মানুষের জীবনে ধর্মের বনিয়াদটুকু অক্ষত থাকাতে মার্কসীয় সমাজবাদ সেদেশে প্রতিহত হয়েছে। যে ধর্মচিন্তা ব্রহ্মদেশীয় সমাজবাদকে মার্কসীয় সমাজবাদ থেকে স্বতন্ত্র করেছে তা-ই আবার সিংহলের নব রাষ্ট্র আন্দোলনকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সিংহলী রাষ্ট্রনীতিবিদরাও প্রচার করেন যে তাঁদের জীবন-দর্শন এবং রাষ্ট্র-দর্শনকে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন ভগবান তথাগতের অহিংসা মন্ত্রের অমৃত বাণী এঁদের চোখে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের মতই হিংসামূলক চিন্তাও পাপ; অপর মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সমানভাবে নিন্দনীয়, কেননা এটা হ'ল হিংসারই রূপভেদ। কাজে কাজেই শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বাসী মার্কসীয় দর্শন সিংহলীদের কাছে অগ্রাহ্য। হেগেল-স্বীকৃত গুণগত বর্ণ বৈষম্যও এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশগুলোর কাছে অর্থহীন মনে হয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরম পরিণাম বর্ণনায় মার্কসীয় মতবাদ গোঁড়ামির পরিচয় দেননি। বিদগ্ধ জনোচিত মুক্ত মানসিকতার পরিচয় সেখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু হেগেলীয় রাষ্ট্র-দর্শন প্রয়োজনের তাগিদে এ ব্যাপারে যে মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তা দূর প্রসারী হেগেলীয় পাণ্ডিত্য খ্যাতির সঙ্গে একেবারেই অসংলগ্ন। প্রখ্যাত সমাজ-দার্শনিক সিড্‌নি হুকের কথায় বলি[১]—

"Marxism is a philosophically primitive system, but it never identified the social system of the future with the end or process of history itself in the way in which Hegel identified the Absolute Idea or the way of God with the Prussian State. Because communism is a disease of

১। 'The Import of ideological diversity'. প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, (Problems of Communism, Nov-Dec., 1957).

idealism if only it does ont harden into Fanaticism which makes a fetish of the instrument—the instrument of the communist party—it may prove to be susceptible to the virus of political liberalism.

সিড্‌নি হুক যে রাজনৈতিক উদার মতবাদিতার সম্ভাবনা কম্যুনিজমের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন তার ছোঁয়াচ আছে চীনদেশীয় কম্যুনিজমে। পরমত সহিষ্ণুতা যে-কোন রাষ্ট্র-দর্শনের আবশ্যিক গুণ হিসেবে নিত্যস্বীকৃত। এর চরম অসদ্ভাব রুশিয়া-প্রবর্তিত কম্যুনিজমে দেখা গেলেও নব্য চীনের কম্যুনিজমের অন্যতম প্রবর্তক মাও সে তুং ঘোষণা করলেন—

"Let the hundred flowers bloom;
Let the hundred schools of thought contend".

বাঁধা-ধরা পথে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিবর্তনকে মার্কসবাদী সমাজবাদ যতখানি অপরিবর্তনীয় ভেবেছিল, এ যুগের উদারনীতিক স্বচ্ছ-দৃষ্টি বুদ্ধিজীবির কাছে তা ঠিক ততখানি অনমনীয় (rigid) বলে মনে হয়নি। সমাজ-বাদের বন্ধনীর মধ্যেও যে অনেকখানি স্বাধীন চিন্তার অবকাশ আছে তারই ইঙ্গিত দিলেন মাও সে তুং নব্য চীনের রাষ্ট্র দর্শনেও এর স্বীকৃতি রয়েছে।[১] কনফুশীয় দর্শনের উত্তরাধিকার নব্য চীনের জীবন-দর্শনকে আচ্ছন্ন না-করলেও তাকে প্রভাবিত করে রেখেছে আজও, এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। কনফুশিয়াসের সমাজ সচেতনতার ধারণা এবং সামাজিক বন্ধনের মূল নীতিগত এবং আদর্শগত যে ঐক্যবোধের কথা মহা ঋষি বলেছিলেন নব্য চীনের সংগঠক ডক্টর সান ইয়াত সেন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন। এই নীতি-মহিমা অলঙ্কৃত পশ্চাদ্‌ভূমি হল চীনের মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি। ডক্টর সানের 'ত্রি-নীতি' জাতীয়তা-আশ্রয়ী। তাঁর মতে বিপ্লব ঘটবে তিনটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে। প্রাথমিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নব নব মতবাদের উদ্গাতারা ক্ষমতাহীন হবেন, তারপর আসবে দেশের মানুষের শিক্ষানবিশীর কাল এবং সর্বশেষ পর্যায়ে ঘটবে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের (constitutional democracy)

১। New Trends in Maoism প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (Problem of Communism, (July-Aug., 1957)—লেখক Benjamin Schwartz.

প্রতিষ্ঠা। ডক্টর সান সমাজবাদের মার্কসীয় লেনিনীয় ভাষ্যে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি; তিনি অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামকেও অস্বীকার করেছেন। মানুষের সহজাত শক্তি এবং বুদ্ধিগত যে শ্রেণীবিভাগ, তাকে স্বাভাবিক সত্য বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা বুদ্ধি এবং বিদ্যায় অগ্রণী, সেই বুদ্ধিজীবী অভিজাতেরা শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করবেন। ডক্টর সান সর্বহারাদের একনায়কত্বে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর কাছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কবল থেকে চীনকে মুক্ত করাই ছিল সবচেয়ে বড় কাজ। এই সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের পরে তিনি গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন নি কেন না তিনি শ্রেণী-সংগ্রামে আস্থাবান ছিলেন না। তবে ডক্টর সান সামাজিক প্রগতির নিশ্চয়তায় গভীরভাবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন; তিনি জীবন এবং জগতের পরিবর্তনকে দ্বন্দ্ববাদীদের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এবং এই দ্বন্দ্ববাদকে তিনি সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই তাঁর গণতন্ত্রবাদের প্রত্যাশা। গণতন্ত্র ডক্টর সানের কাছে রাষ্ট্রীয় দর্শনের চরমোন্নত অবস্থা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল। মার্কসীয় সমাজবাদ থেকে চৈনিক নব্য গণতন্ত্রের বিচ্যুতি অসংশয়িত। তাই লেনিন একে 'Subjective Socialism' আখ্যা দিলেন।[১] মাও সে তুং মহাচীনের বিপ্লবের গণতান্ত্রিক রূপটুকুকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বললেন যে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই সমাজবাদী বিপ্লবকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এর পূর্বভাগে রয়েছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর উত্তর ভাগে ঘটবে সমাজবাদী বিপ্লব। মহাচীনের শাসনতন্ত্রের হেতুবাদে (Preamble) এ কথার উল্লেখ রয়েছে:

"From the Founding of the People's Republic of China to the attainment of a socialist society is a period of transition. During the transition the Fundamental task of the State is, step by step, to bring about the socialist industrialization of the country and step by step, to accomplish the socialist transformation of agriculture, handicrafts and capitalist industry and commerce.

১। Karl Wittfogel কৃত 'Sun Yat Sane' দ্রষ্টব্য।

এ সত্যটুকু লক্ষ্য করবার বিষয় যে মহাচীনের রিপাব্লিকের কর্ণধারেরা সমাজবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রবর্তনে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তন-পন্থার পোষকতা করেছেন। ধীরে ধীরে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজ-বাদকে অনুসৃ্যত করে দিচ্ছেন এঁরা। দেশের কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম প্রমুখ সমস্ত জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেই সাম্যবাদী নীতির প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রনায়কদের কাম্য হলেও তার ক্রমান্বিত প্রতিষ্ঠা তাঁরা চাইলেন। এইভাবে দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের স্বপ্নের সংযোগ ঘটল, সমন্বয় সাধিত হ'ল। এঁরা এ কথা বললেন না যে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটবে। শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র সর্বোদয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে এ কথা এঁরা বললেন। তবে এই সর্বোদয় রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে ডক্টর সান এবং মাও সে তুং-এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ডক্টর সান আশা করেছিলেন যে চীনের এই নব্য গণতন্ত্র কনফুশিয়াস কল্পিত স্বর্গ-রাজ্যে মানুষকে পৌঁছে দেবে। সেখানে মানুষের জীবন রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনমুক্ত এবং আদর্শ-নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মাও সে তুং-এর মতে চীনের নব্য গণতন্ত্র শ্রেণীহীন নৈরাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সোপানমাত্র। এই সোপান অবলম্বন ক'রেই নৈরাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মহাতীর্থ পথে অগণিত চৈনিক নরনারী যাত্রা করছে, এ কথা মাও বিশ্বাস করেন।

এবার ভারতবর্ষের কথা বলি। নব্য ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্রের চিন্ময় অস্তিত্ব-ভাস্বর। এঁদের কথা অনালোচিত থাকলে এই নিবন্ধের মূল্যহানি ঘটবে। শ্রীঅরবিন্দের কথা দিয়ে শুরু করি। হেগেলের মতে অরবিন্দ প্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারাকে প্রত্যক্ষ করলেন গতির চক্রবৃত্ত পথে। এই বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দুটি সদা প্রাগ্রসর। এই গতি কখনও পশ্চাদ্‌গামী হয় না। এই চক্রগতির আবর্তনের ফলে অতীত আপনার নামগোত্র পরিহার করে, অতীতের যে ধর্ম, অতীতের যে শক্তি সে অনবক্ষয়ী। বর্তমানের রূপবৈচিত্র্যে তার প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যতের মধ্যে রয়েছে অতীতের ইতিসাধনের নিশানা এবং নতুন উপলব্ধির স্তরে সে সংগ্রামের রূপ হ'ল ব্যক্তিবাদের সঙ্গে গোষ্ঠীবাদের সংঘর্ষ। যখন চিন্তা (thought) জীবনের মর্মমূলে বাসা বাঁধে, কাজ করে

জীবনের আধারে, তখন প্রগতি প্রত্যক্ষ হয়। কখন কখন এই চিন্তাধর্ম জীবন-পাত্রের তলায় তলিয়ে যায়, আবার কখন কখন সে ভেসে উঠে উপরের তলায়, প্রত্যক্ষগোচরতায়। যখন চিন্তা প্রচ্ছন্ন হয়, তলিয়ে যায় নীচের তলায় তখন মানবেতিহাসে অন্ধযুগ নামে। আবার মানুষের অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে ঊর্ধ্বগমন ঘটে এবং যখন জীবন সৌধের উপর তলায় সে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মানবচিত্ত উদ্ভাসিত চৈতন্য হয়ে ওঠে। সে চৈতন্য মানব সমাজের বিবর্তন সঙ্ঘটিত করে, তা সমাজ-চৈতন্যরূপে প্রকট হয়। অরবিন্দের মতে চৈতন্যময় আত্মবিবর্তনই হ'ল মানুষের ধর্ম।[১] তিনি এই ধর্মে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছেন। এই ধর্মই ভারতবর্ষের আত্মাকে বহু বিপর্যয়ের মধ্যে রক্ষা ক'রে এসেছে। ঋষি অরবিন্দ এই চৈতন্যময় বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ ক'রে ঘোষণা করলেন দর্শন-গত নৈরাজ্যবাদের কথা। এই নৈরাজ্যবাদ মার্কসীয় শ্রেণীহীন সমাজের নৈরাজ্যবাদ থেকে পৃথক। অরবিন্দের নৈরাজ্যবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তিম-অবস্থাকে উত্তরণ ক'রে আবির্ভূত হয় না। তাঁর নৈরাজ্যবাদ মানুষের অন্তরশায়ী দিব্যধর্মে সুপ্রতিষ্ঠ ; এই দিব্য ধর্মে সমগ্র মানব সমাজের মিলন ঘটে। এই সার্বিক সম্মিলন ঘটানো দুরূহ কর্ম ; এই কর্মটি সম্পন্ন করা সমাজবাদের সাধ্যাতীত। সমাজবাদের মধ্যে শ্রেণীচিন্তা, শ্রেণীবিদ্বেষ অনুস্যূত। এ ছাড়া সমাজবাদ যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থাবান তার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির পরিপূর্ণ মিলন ঘটে না। অরবিন্দ মার্কসীয় সমাজবাদের বিরোধিতা করলেও হেগেলের মতই আমাদের বললেন যে রাষ্ট্র হ'ল প্রজ্ঞার (Reason) প্রকাশ, রাষ্ট্রের মধ্যে প্রজ্ঞা আপনাকে উপলব্ধি করে ; আবার তিনি এ কথাও বললেন যে মানব সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে প্রজ্ঞা অক্ষম।

রুশিয়ায় মার্কসীয় লেনিনীয় দর্শনের ব্যবহারগত সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছিল।[২] যে দেশ ভারতবর্ষের মতই অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে যুগ যুগ ধরে পঙ্গু হয়েছিল নব্য সমাজ-ব্যবস্থায় তার বিস্ময়কর অগ্রগতি

১। শ্রীঅরবিন্দের ' Thoughts and Glimpses' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
২। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ, পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য।

কবিকে বিস্মিত করেছিল। শিক্ষার যে সর্বব্যাপী-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল নব্য রুশিয়ায় তা দেখে কবি আশ্বস্ত হলেন, অনুপ্রাণিত হলেন নতুন ক'রে আপনার জীবনাদর্শে। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষের অশিক্ষার বিরাট সমস্যারও সমাধান হ'তে পারে। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার যে আয়োজন করেছিলেন, দেখলেন ওদেশে সেই ধরনের শিক্ষার আয়োজন চলছে সারা দেশ জুড়ে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীর কোন বাধা নেই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। রুশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ধনসাম্যের অনুমোদন করলেও রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তি-সম্পত্তি জবর দখলের অনুমোদন করতে পারেন নি। রুশীয় সমবায় নীতিকে তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন এবং এই সমবায়ী যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে দেশের সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হবে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন। যেখানে ব্যষ্টির লোভকে সংযত করা হ'ল সমষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য সে রাষ্ট্রে ভগবানের আশীর্বাদ শ্রাবণের ধারার মতই অবারিত হবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সোভিয়েট রুশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ।[১] সেই জেদের জন্যই এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর ক'রে অবরুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই যে ব্যক্তির স্বমত-প্রকাশে, স্বাধীন চিন্তায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, এটা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। কাজ উদ্ধারের দোহাই দিয়ে রুশীয় রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা মারধোর ক'রে মানবীয় উপাদানকে স্ব-মতে এবং স্ববশে আনবার যে পন্থা আবিষ্কার করলেন তা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পেল না; তিনি বললেন যে কোন কিছু স্থায়ী সৃষ্টি করতে হলে সৃষ্টির উপাদানের আভ্যন্তরীণ ধর্মটুকুকে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে। সেই স্বীকৃতির উপরেই নতুন সৃষ্টির ইমারত গড়ে উঠবে। মার্কসীয় অর্থনীতিতে এবং সমাজ-দর্শনে এই উপাদানের বিরোধাত্মক স্বভাবকে স্বীকার করা হয়েছে, তবে তার রূপ বদল ঘটেছে রুশিয়ায় এই রাষ্ট্র-দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে মানুষের মধ্যে দুটো দিক আছে—একটা দিক হ'ল তার আত্ম-কেন্দ্রিকতার, আত্মসর্বস্বতার দিক, আর অন্য দিকটা হ'ল অপরের সঙ্গে

১। 'রাশিয়ার চিঠি', পৃষ্ঠা ১০৭।

যুক্ত হওয়ার দিক। জারের আমলে রুশিয়ায় ঐ আত্মসর্বস্বতার মন্ত্রটি গৃহীত হয়েছিল, আর হাল আমলের রুশিয়ায় অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মন্ত্রটি বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হ'ল। ব্যষ্টিজীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা এবং অবহেলা ক'রে শুধুমাত্র সমষ্টিগত জীবনের প্রস্তাব ঘটাতে চাইলে তা' কখনই মানুষের কল্যাণ করবে না, একথা রবীন্দ্রনাথ বললেন। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করলেন যে নব্য রুশিয়ায় এটা ঘটেছে একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে। এ হ'ল পূর্ব যুগের প্রতিবাদমাত্র। কালক্রমে এই ব্যষ্টিস্বার্থ এবং সমষ্টি-স্বার্থের সমন্বয় ঘটবে, মানুষ আবার শুধুমাত্র প্রতিবাদের মোহ এড়িয়ে সুস্থ এবং সবল হয়ে উঠবে। কবির এ প্রত্যাশা নব্য রুশিয়ার মানুষের জীবনে যে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে, এ কথা ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন না। হেগেলের মত রবীন্দ্রনাথ সার্বভৌম ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি। অরবিন্দের মত তিনি মানুষের ঐক্যবোধকে, ঐক্যধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হেগেলের মত তিনি বিশেষ জাতির সহজাত উৎকর্ষে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর জাতীয়তার ধারণা হেগেলীয় ধারণার পরিপন্থী। সর্ব মানুষের অন্তরশায়ী একাত্মতায় তিনি বিশ্বাস করেছেন ব'লেই রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি এমন ঐকান্তিকতার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলতে পেরেছেন। উদগ্র জাতীয়তাবাদ তাঁর আন্তরধর্মের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেগেলের জীবন এবং রাষ্ট্র-দর্শনে মূলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ হেগেলের মতই বিশ্বাস করেছিলেন যে আমেরিকায় নতুন সভ্যতার, নতুন প্রগতির পদধ্বনি শোনা যাবে। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের আশা এবং হেগেলীয় প্রত্যাশা দুই ভিন্ন আকাশের রঙে রঙীন।

হেগেলীয় সার্বভৌম ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্ব গান্ধীজির সর্ব মানবে প্রেমতত্ত্বের পরিপন্থী। গান্ধীজির রাষ্ট্রীয় মতবাদ জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদকে অতিক্রম ক'রে সর্ব মানবে প্রেমকে আশ্রয় করেছিল।[১] তাই তাঁর দর্শনে হিংসার, দ্বন্দ্বের স্থান নেই। বিশ্ব-সংসারে যে শুদ্ধসত্তা নিত্য প্রকাশমান তাঁকে গান্ধীজি প্রতিনিয়ত উপলব্ধি

১। ডক্টর নারায়ণী বসু কৃত 'Philosophy after Hegel and Marx' গ্রন্থের পৃঃ ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

করেছেন এই পরিদৃশ্যমান লাভ-ক্ষতি-সমাকীর্ণ সংসারের মধ্যে। হিংসা-দ্বেষকে সত্য ব'লে স্বীকার করেন নি তিনি। মানুষকে পরিশ্রম ক'রে তার জীবিকা অর্জন করতে হবে, এ কথা গান্ধীজি আমাদের বারংবার বলেছেন। প্রেমের মর্যাদা গান্ধী-দর্শনে নিত্যস্বীকৃত। তবে তার উৎসমুখ মার্কসীয় দর্শন নয়। মার্কস কথিত তত্ত্ব সম্বন্ধে গান্ধীজির যে খুব একটা আগ্রহ ছিল তা-ও নয়। বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার বলেছিলেন যে Das Capital গ্রন্থখানি পড়বার অবকাশ পান নি। কায়িক শ্রমের মূল্য-সচেতনতার জন্য তিনি তলস্তয়ের কাছে কিয়ৎ পরিমাণে ঋণী। গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের ধারণা আহরণ করেছিলেন রাস্কিনের কাছ থেকে। গান্ধীজি যে আদর্শ গণতন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন সেখানে প্রত্যেক মানুষকে খেটে খেতে হবে, পরিশ্রমের মহৎ মূল্য সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। এই শ্রমের ভিত্তিতেই নাগরিকের ভোটাধিকার থাকবে। প্রত্যক্ষবাদীদের মত বা প্রয়োজনবাদীদের মত গান্ধীজি সংখ্যাগরিষ্ঠের মহত্তম কল্যাণ কামনা করেন নি। তাঁর সর্বোদয়ের ধারণার মধ্যেই স্বরাজের ধারণা বিধৃত। গান্ধীজির স্বরাজ হ'ল নৈরাজ্যবাদ। গান্ধীজি কল্পিত স্বরাজে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থ-নৈতিক সামর্থ্যের বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে। গ্রামীন শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রাম এক মহাসামুদ্রিক বৃত্তের মধ্যে বিধৃত হবে আর কেন্দ্রে থাকবে কেন্দ্রীয় শাসকেরা। উপর তলার নীচের তলার মানুষের দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিচ্ছেদ সমাজ থেকে অন্তর্হিত হবে, গান্ধীজি এ স্বপ্ন দেখলেন।[১] গান্ধীজির আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা মার্কসের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আদর্শ সমাজের সমগোত্রীয়, গান্ধীজির সাম্যধর্ম অহিংসার পথে আপনাকে মানুষের নিত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। কর্মের মধ্য দিয়ে সত্য-আত্মীয়তা অর্জনই গান্ধীজির রাষ্ট্রীয় দর্শনের লক্ষ্য। মার্কসীয় সাম্যবাদে তিনি বিশ্বাস করেন নি, কিন্তু মার্কসীয় সাম্যবাদ হিংসাকে আশ্রয় করেছে। গান্ধীজির সমাজ-বিপ্লবের ধারণা তাঁর আত্যন্তিক নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নীতিবাদী গান্ধীজি অহিংসা-

১। হরিজন পত্রিকা (২৪-এ জুলাই, ১৯৪৬) দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রকে তাঁর জীবনসাধনার ধ্রুবতারা হিসেবে গণ্য করেছেন। যেখানে হিংসা সেখানে অন্যায়, অসত্য এবং পাপের বেসাতি। এ কথা আমরা জানি যে অহিংসার তত্ত্ব গান্ধীজির কাছে শুধুমাত্র নীতি-চাতুর্য (policy) নয়, এ হ'ল তাঁর সমগ্র জীবনের ধর্মবিশ্বাস। এই অহিংসার ধারণার মধ্যেই গান্ধীজির সমগ্র ব্যবহারিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন বিধৃত। তিনি অহিংসা-নীতির জন্য সমগ্র জাতির মুক্তিকেও তুচ্ছ করেছিলেন, একথা ইতিহাস-সম্মত সত্য।[১] সাম্প্রত কালের অহিংসা-মন্ত্রের মন্ত্রগুরু যে মার্কসীয় এবং হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে স্বীকার করতে পারেন নি, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। হেগেল এবং মার্কসের মতে বিরোধ এবং সংঘাতের পথে নবতর সৃষ্টির সূচনা, গান্ধীজির মতে প্রেমের পথে, সৌভ্রাত্রের পথে, মৈত্রীর পথেই সৃষ্টির লীলাকমল আপনার দলগুলি বিকশিত করে। সুতরাং এ তত্ত্ব সহজবোধ্য যে গান্ধীজির পথ হেগেল-মার্কসীয় চিন্তাপথকে সর্বতোভাবে পরিহার করেছে।

হেগেলীয় দর্শনের দূরচারী প্রভাব সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র হেগেলীয় চৈতন্যসত্তায় বিশ্বাস করেছেন। হেগেলের মতে প্রজ্ঞা (Reason) হ'ল সত্তার (Existence) অন্তরশায়ী সত্য এবং সৃষ্টি হ'ল এই প্রজ্ঞার বন্ধনমুক্তির ক্রমউদ্বর্তন। সুভাষচন্দ্রের মতে এই প্রজ্ঞার অন্তরশায়ী সত্য হ'ল প্রেম। সৃষ্টিতে এই প্রেমের প্রকাশ। প্রেম প্রকট হয় সৃষ্টির অন্তরশায়ী নিত্যদ্বন্দ্বে এবং তাদের সুষ্ঠু সমাধানে। সর্ব মানবের মিলন ঘটবে এই প্রেমের পথে, একথা সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন।[২] দ্বন্দ্ববাদে আস্থা থাকলেও সুভাষচন্দ্র হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যাও করেন নি। তাঁর মূল্যায়ন আশ্রয় করল জড়বাদী এবং ভাববাদী জীবনের সমন্বয়কে। হেগেল বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র হ'ল সমাজ-বিবর্তনের চরম লক্ষ্য। সার্বিক কল্যাণ রাষ্ট্র-ধারণার মধ্যে অনুস্যূত। মার্কস এবং

১। মৌলানা আজাদে'র 'India wins Freedom' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে কংগ্রেস যুদ্ধে যোগদানের সর্ত হিসেবে দেশের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে। গান্ধীজি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে হিংসাত্মক পথে দেশের মুক্তিও তাঁর কাছে কাম্য নয়।

২। তাঁর 'Autobiography' পৃঃ ১৪৪ দ্রষ্টব্য।

অরবিন্দ উত্তর যুগে এই ধরনের রাষ্ট্রপূজা অচল[1] হ'লেও সুভাষচন্দ্র হেগেলের মতই রাষ্ট্রকে সমাজ-বিবর্তন পথের প্রত্যন্ত সীমায় অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি। জাতীয় স্বার্থে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সংস্কার-সাধনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে। তবে হেগেলকে কখন কখন স্বীকার ক'রে নিলেও হেগেলকে উত্তীর্ণ হবার দিকে সুভাষচন্দ্রের প্রবৃত্তি। একদিকে হেগেলকে যেমন তিনি উত্তীর্ণ হলেন জড়বাদকে আপন দর্শনে স্থান দিয়ে অন্যদিকে আবার তিনি মার্কসকেও অতিক্রম করলেন ভাববাদী-দর্শনের যথাযথ মূল্য দিয়ে। তাঁর ধর্মীয় এবং মনীষাগত প্রবণতা তাঁকে পুরোপুরি মার্কসপন্থী করে নি। সমাজ-বাদের অর্থনীতিতত্ত্বে বিশ্বাস করলেও এদেশের মানুষ যে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করবে না এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র অবহিত ছিলেন।[2] সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তা-বাদী ; মার্কসন্থীদের মত তিনি জাতীয়তাবাদকে বুর্জোয়া ভাবালুতা বলে অশ্রদ্ধা করেননি। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে তিনি পূর্ণ সত্যের মর্যাদা কখনও দেননি। সৎ কখন কোন একটা বাঁধা-ধরা নির্দিষ্টপথে নিত্য-কাল চলে না। তবে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ সৎ-অন্বিত, এ কথা তিনি বলেছেন। ইতিহাসের গতিপথ দ্বন্দ্বময়। এইজন্যই দক্ষিণপন্থী গান্ধী-বাদের বিরোধী অবস্থা হিসেবে বামপন্থী রাজনীতির আবশ্যিকতা তাঁর কাছে নিত্যস্বীকৃত। বামপন্থী রাজনীতির প্রথম পর্যায় হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং শেষ পাদ হল সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। এইখানে মার্কাসপন্থী মাও সে তুঙ্ এবং সুভাষচন্দ্রের সহমতবাদিতা লক্ষণীয়। এখানে উভয়েই লেনিন-মতানুসারী। সুভাষচন্দ্র মার্কসপন্থীদের মত শ্রেণীসংগ্রাম এবং সমাজবাদে বিশ্বাস করেছেন। তিনি গতানুগতিক অর্থে গণতন্ত্রী ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্ববাদ তাঁকে কম্যুনিজম্ এবং ফ্যাসিবাদের মূলনীতিগুলোর একটা আপোষ করতে সহায়তা করেছিল। এই সমন্বয়ীকরণের ফলে জন্ম নিল এক নতুন রাষ্ট্র-দর্শন ; এ হল সুভাষ-চন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদ। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ফ্যাসিবাদ এবং কম্যুনিজম্ সমন্বিত হয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করবে তা হল এই সাম্যবাদ। এ যুগের রাষ্ট্র-দর্শনে এই সাম্যবাদ হল নব্য ভারতবর্ষের অবদান।

১। Falckenberg-এর 'History of Philosophy' গ্রন্থের পৃঃ ৫০১ দ্রষ্টব্য ;
২। Indian Struggle, Vel 1, পৃঃ ৪৩২ দ্রষ্টব্য।

ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র-দর্শনে হেগেলীয়-মার্ক্সীয় প্রভাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে হেগেল জন্মগ্রহণ করেন এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত জার্মান পরিবারে। ছাত্রজীবনে তীক্ষ্ণ-মেধার পরিচয় বা উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রত্যাশা তাঁর জীবনে ছিল না। শেলিং ছিলেন খ্যাতিমান ছাত্র হিসেবে। উত্তর জীবনে হেগেল তাঁর কৈশোর-যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে অনেকখানি পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন, এ কথা সব দর্শনশাস্ত্রীরাই বলেন। হেগেলীয় নৈর্ব্যক্তিক অধিকারবাদ এবং ব্যক্তি-নির্ভর নীতি-ধারণার সমন্বয়ীকরণ ঘটে সমাজ-নীতি-দর্শন-ধারণায়। এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে আপনাকে বিস্তৃত করে পরিবারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে। হেগেলীয় রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর রাষ্ট্র ধারণায় এমন এক সমাজের ইঙ্গিত রয়েছে যেখানে ব্যক্তি-সম্পত্তির সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধন অনায়াসসাধ্য।* কম্যুনিজম অথবা সমাজবাদ-কথিত ব্যক্তি-সম্পত্তি অবলুপ্তির ধারণা হেগেলের কাছে অগ্রাহ্য। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মানুষের স্বাধিকারবোধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিত্য স্বীকৃত। পূর্ণতাপন্ন রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীনতার আত্মোপলব্ধ রূপ। বিশ্ব ইতিহাস ধারার লক্ষ্য হল আপন বিবর্তন পথে এই পূর্ণতাপন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়সাধন। বিশ্বভাব আপনাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে করতে চলে ইতিহাসের গতিপথে; নানান্ জাতির পতন-অভ্যুদয় এবং নানান্ ঐতিহাসিক বৃহৎ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে এই বিশ্বভাব (Universal spirit); এই দিব্য বিবর্তন ধারায় প্রত্যেক মহৎ কর্ম নিত্য স্বীকৃত? সেই স্বীকৃতির মানদণ্ড হল সামগ্রিক উন্নতি। ইতিহাসের গতিপথে যখন এক জাতির পতন হয় এবং আর এক নতুন জাতি বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা স্বীকৃত হয় তখন এ তত্ত্বই প্রকট হয়ে ওঠে যে পরাভূত রাষ্ট্রের দর্শন যুগোপযোগী নয়। নবাগত রাষ্ট্রের দর্শন-শ্রেষ্ঠতা হেগেলের কাছে

* William Kelly Wright-এর 'A History of Modern Philosophy, পৃ. ৩৪০ দ্রষ্টব্য।

অনস্বীকার্য। এইভাবে হেগেলীয় রাষ্ট্র-দর্শনে পশুবল নৈতিক শক্তির সম্মান পেল।* মানুষের আপন অধিকারটুকু স্বীকার করলেও হেগেল রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অধিকারের উপরে স্থান দিয়ে বললেন যে রাষ্ট্রের জন্য নাগরিককে আত্মস্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হবে। তবে এই আত্ম-অধিকার পরিবর্জন এবং সমাজ-স্বার্থ-সাধন, এ সবই বিচার্য প্রজ্ঞার আলোকে। হেগেলের মতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই হল সর্বোন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা।† রাজা হবেন বিভিন্ন বিভাগীয় শাসনের নিয়ন্তা। তাঁর নির্দেশে শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে একই নীতি অনুসৃত হবে। রাজার মন্ত্রী পরিষদ তাঁকে পরামর্শ দেবেন। হেগেলীয় রাজতন্ত্র অবাধ স্বেচ্ছাচারের অবকাশকে সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে এই মন্ত্রী পরিষদের প্রবর্তন ক'রে। হেগেলীয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এ যুগীয় ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের সমগোত্রীয়। তবে সার্বজনীন ভোটাধিকারে হেগেল বিশ্বাস করেননি। রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে দেশের অশিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত জনগণের রুচি এবং ইচ্ছাকে যদি প্রাধান্য দেওয়া যায় তবে দেশের এবং দশের কল্যাণ সাধিত হবে না। জনগণের সাময়িক প্রবৃত্তির তাড়নাকে প্রজ্ঞাবাদী হেগেল স্বীকার করতে পারলেন না রাষ্ট্রতন্ত্রের নিয়ামক হিসেবে। হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিবাদী উভয়বিধ মতবাদীরাই আপন আপন অভীপ্সিত দর্শনের সমর্থন খুঁজে পেল। প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় আমলাতন্ত্র হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে হেগেলীয় দর্শন অনুপ্রাণিত করল উদার মতবাদী বোসাংকে ও গ্রীণকে। এমনি ধারায় নানান্ দেশে নানান্ রাষ্ট্রদর্শনকে হেগেলীয় চিন্তা প্রেরণা জুগিয়েছিল। কোথাও হেগেল ভাববাদী চিন্তার অধিনেতা বলে স্বীকৃতি পেলেন আবার কেউবা তাঁকে উন্মাদ আশ্রমে রাখারও প্রস্তাব করেছেন‡ তাঁর দার্শনিক চিন্তার অস্বচ্ছতা এবং জটিলতার জন্য। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে হেগেলোত্তর যুগে হেগেলীয় প্রভাব দেশে দেশে অনুভূত

* Frank Thilly লিখিত 'A Histroy of Philosophy' গ্রন্থের পৃ. ৪৩১-৪৩২ দ্রষ্টব্য।

† 'The perfect form of the state is constitutional monarchy, its establishment the goal of history, which Hegel, like Kant, considers chiefly from the political standpoint. [R. Falckenberg কৃত 'History of Modern Philosophy, পৃ. ৫১৯]

‡ Caird- এর Hegel (Blackwood Philosophical Classics), পৃ. ৫-৮ দ্রষ্টব্য।

হয়েছে। হেগেলীয় ভাববাদ মার্কসীয় জড়বাদকে দ্বন্দ্বপন্থায় সুপ্রতিষ্ঠ করল আপন আত্যন্তিক স্বাতন্ত্রে। মার্কস হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে আশ্রয় ক'রে তাঁর সমাজ বিপ্লবের প্রত্যন্ত প্রদেশটুকু আবিষ্কার করলেন। যে দ্বন্দ্ববাদ হেগেলীয় চিন্তামার্গে ভাব-আশ্রয়ী তাকে মার্কস নিয়োগ করলেন তাঁর আপন জড় সাম্রাজ্যে। দুই বিরোধাত্মক ভাবের বিরোধিতা এবং দুই বাস্তব বিপরীত সংস্থার বিরোধিতা সমার্থক কী না এ সম্পর্কে পণ্ডিতজন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাই মার্কসীয় জড়ভূমিতে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ প্রযোজ্য কী না এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। দার্শনিক ম্যাকট্যাগার্ট বললেন যে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ বাধ প্রতিষেধ বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবরাজ্যের বাধ প্রতিষেধ বাস্তবরাজ্যে অলভ্য। কাজে কাজেই জড়জগতে দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ ঔচিত্য সন্দেহাতীত নয়। মার্কসীয় দর্শনচিন্তায় হেগেলীয় বাস্তব ধারণা অসংলগ্ন। হেগেলীয় পরাভাব এই দ্বন্দ্ববাদী ভাববিন্যাস (তথা বস্তুবিন্যাসের) পথেই আপনাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, তার পরম প্রকাশও ঘটে এই পন্থায়। এই পরাভাব আপনাকে প্রতিষ্ঠা করে চারুকলায়, নীতিকথায়, ধর্মে এবং দর্শনে। এই বিভিন্ন স্তর বিন্যাসের পথেই সামান্য এবং বিশেষের সম্মিলন ঘটে। পরাভাব আপনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটায় রাষ্ট্রের মধ্যে, একথা হেগেলীয় টীকাকারেরা বলেন।* এই হেগেলীয় রাষ্ট্র ধারণার মধ্যে অনির্দেশ্যতা এবং অতি নির্দিষ্টতার সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয়টুকুতে রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা।† ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় রাষ্ট্রের চতুঃসীমানার মধ্যে।

হেগেলীয় চিন্তাবীর ফায়র বাক্ হেগেলীয় চিন্তা বিশ্লেষণান্তে তিনটি প্রধান সূত্র মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের হাতে তুলে দিলেন: (ক) মানুষের ব্যবহারিক জীবনের দুরূহ সমস্যাসমূহের উত্তরণ-পথ হ'ল দর্শন। (খ) মানুষকে তার নৈর্ব্যক্তিক ভাব-সত্তায় বিচারের অসমীচীনতা, ইতিহাস ঐতিহ্যবাহী মানুষ তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। (গ) ঐতিহাসিক ধর্ম এবং রাষ্ট্র ধারণাকে বিভিন্ন যুগের মানব সমাজের অন্ধ কর্মাবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করা। এই তিনটি সূত্র মার্কসকে প্রভাবিত

* Dr. N. Basu কৃত 'Political Philosophy after Hegel and Marx' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† হেগেল প্রণীত 'Philosophy of History', পৃ. ৪১ দ্রষ্টব্য।

করেছে অনন্যরূপে। মার্কসীয় দর্শন আবার বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র-দর্শনকে প্রভাবিত করল। যারা অনুগামী তারা মার্কসকে অনুসরণ করল। যারা মার্কসের অনুগমন করল না তাদের সদাজাগ্রত বুদ্ধি মার্কসীয় দর্শনকে এড়িয়ে চলার কাজে সক্রিয় রইল। যেদিক দিয়েই বিচার করি না কেন মার্কসীয় দর্শন সদর্থক অথবা অসদর্থক-প্রভাবে আপন প্রভাব-পরিমণ্ডলকে পরিব্যপ্ত করে দিল দিগ্বিদিকে।

সামাজিক মুক্তি মার্কসের চোখে প্রধান। অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং শ্রেণীসংগ্রামের পটভূমিকায় ভাবাশ্রয়ী হেগলীয় দ্বন্দ্ববাদকে আবির্ভূত হ'তে হ'ল মার্কসের অধিনায়কতায়। মানুষের বিচারেয় বিষয় হ'ল সমাজবদ্ধ মানুষ। পারস্পরিক সম্বন্ধ সামাজিক মানুষের স্বরূপ নির্ণয় করে। ফায়ার বাক্ যে মানুষকে সত্যনিরূপণের মানদণ্ড হিসেবে দেখলেন মার্কসের চোখে সেই মানুষ শ্রেণী-আশ্রয়ী। রাষ্ট্রের আন্তর ভাব প্রজ্ঞা হ'লেও তার নিয়ন্তা হ'ল সুবিধাবাদী শ্রেণী-সম্রাট। হেগেলীয় দর্শনে তাঁর ব্রহ্মের ত্রিপদী-গতি। মার্কস সেই ত্রিপদী-গতিকে লক্ষ্য করলেন মানব সমাজের বিবর্তন প্রয়াসে। একটি সংস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত সংস্থাও সৃষ্টি হয়। উভয়ের বিরোধ এবং সংঘাতের মধ্য দিয়ে যে পরিণতি এক-তৃতীয় অবস্থার মধ্যে রূপায়িত হয় তা আবার পরবর্তী অবস্থা-ত্রয়ীর প্রথম পরিচ্ছেদ। মার্কস মানব ইতিহাসের এই দ্বন্দ্বন্যায়কে আবিষ্কার করলেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐতিহাসিক চিন্তার ভিত্তিতে। তাঁর লিখিত উদাহরণ উদ্ধৃত করি: উনবিংশ শতাব্দী মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করল। মানুষের আত্ম-স্বাতন্ত্র স্বীকৃত হ'ল। ব্যক্তিবাদ উনিশ শতকের মূলমন্ত্র। কাল তার আপন কুক্ষিতে ঐ যুগেই আর একটি বিরুদ্ধ মতবাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করল। তা হ'ল গোষ্ঠীবাদ। ব্যক্তিবাদ-গোষ্ঠীবাদে বিরোধ ঘটল। এই গোষ্ঠীবাদের ধারণার মধ্যে ব্যক্তিবাদ আপনাকে অনুস্যূত ক'রে দিল,—গোষ্ঠীবাদ পূর্ণতর হ'ল। এই বিরোধের পথেই মার্কসীয় দর্শনে অপূর্ণ ধারণা, অপূর্ণ জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মার্কস বললেন যে দ্বন্দ্ববাদ হ'ল গতির বিজ্ঞান—হোক না সে বাইরের জগতের ঘটনা প্রবাহের গতিশীলতা অথবা অন্তর্লোকের চিন্তাবহমানতা। মার্কসের মতে এই

দ্বন্দ্বন্যায়ের পথেই শ্রেণীহীন সমাজ বিবর্তন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণযোগ্য যে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ হেগেলীয় ভাবলোকে এবং বস্তুভুবনে যুগপৎ ক্রিয়াশীল কেন না হেগেলীয় দৃষ্টিতে বাস্তব এবং প্রজ্ঞা সমার্থক। হেগেলীয় বস্তুজগত এবং ভাবলোক উভয়েই কালাতীত। হেগেলীয় মতের এই গভীরতম সত্যটুকু হেগেল-শিষ্য মার্কস উপেক্ষা করলেন।* তাই ত' মার্কসীয় মত—কালবেষ্টিত যে বিশ্বভুবন সেখানেও দ্বন্দ্ববাদ ক্রিয়াশীল—বারবার খণ্ডিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বন্যায়ের পথে সমাজবাদের ক্রম-প্রসার যখন পরিণত হয়ে উঠবে তখনই শ্রেণীহীন সমাজ সত্য হবে মানুষের ইতিহাসে। শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থা অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক পরিণতি তার বিনাশে। মার্কসীয় রাষ্ট্রাদর্শ সত্য হয় রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে অতিক্রম ক'রে।

হেগেলীয় ভাববাদ আধুনিক নৈরাজ্যবাদকে অনুপ্রাণিত করল। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন রুশিয়ার নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক বাকুনিন্। বেলিন্সকি তার সহগামী হলেন। চিন্তানায়ক ক্রোপোতকিন্ অংশতঃ মার্কসীয় দর্শনের অনুগামী। নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মার্কস-পন্থীদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে মতদ্বৈধ না থাকলেও সেই সাধ্যকে সিদ্ধ করার পন্থা নিয়ে তাদের মধ্যে নিত্য বিরোধ। মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শ ফরাসীদেশে সিণ্ডিক্যালিজম্ নামক নব-আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করল। সমাজবিপ্লবকে এঁরা আবশ্যিক পদক্ষেপ বলে স্বীকার করলেন, ঐতিহাসিক রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতত্ত্বে এঁরা মার্কস পন্থীদের মতই বিশ্বাস করলেন। তবে এঁরা মার্কসীয় দর্শনের রাষ্ট্র-নৈতিক এবং অর্থনীতিক অতি-নির্দিষ্টতাকে অস্বীকার করলেন সম্পূর্ণ-রূপে। সিণ্ডিক্যালিজম্ গ্রেটব্রিটেনে আর এক নতুন ভূমিকায় আবির্ভূত হ'ল। এর নাম হ'ল গিল্ড সোশ্যালিজম্। অর্থনীতিতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে গিল্ড-পন্থীরা মূলতঃ মার্কস-পন্থী ; এঁরা মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করেছেন। মজুরী-প্রথার অবসান চেয়েছেন এঁরা। মার্কস-

* S. S. Barlingay লিখিত 'The Theory of Dialectic' দ্রষ্টব্য (Journal of the Philosophical Association, Vol, III Nos. 11-12)

পন্থীদের মত গিল্ড-পন্থীরাও রাষ্ট্রকে ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর কর্মপরিষদ এবং মুখপাত্র হিসেবে দেখেছেন। তবে আবহমানকাল রাষ্ট্র জবরদস্তি করবে এ তত্ত্বে মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করলেও গিল্ড-পন্থীরা এ তত্ত্বকে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা রাষ্ট্রকে শ্রমিকের এবং শ্রমিক স্বার্থের রক্ষক হিসেবে দেখেছেন। হবসন্ এঁদের মুখপাত্র হয়ে প্রচার করলেন যে রাষ্ট্র হ'ল জনগণমানসের অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার প্রতিরূপ। এখানে গিল্ডপন্থীরা হেগেলীয় দর্শনের অনুগামী।*

বহু তত্ত্বসমৃদ্ধ হেগেলীয় দর্শন নানান্ দিক থেকে নানান্ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে পুষ্ট করল। সমাজবাদী থেকে আরম্ভ করে ফ্যাসীবাদী পর্যন্ত সকলেই হেগেলীয় ভাবধারাকে গ্রহণ করল আপন আপন বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। হেগেলীয় ঐতিহাসিক জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব এবং তাঁর স্বাধীনতার অত্যদ্ভুত ধারণা রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত অধিনায়কতায় পর্যবসিত হ'ল। রাষ্ট্র সর্বশক্তির আধার। রাষ্ট্র স্বরাট এবং সম্রাট। এই রাষ্ট্র-ধারণা ফ্যাসীবাদী এবং নাজী রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের অনুপ্রাণিত করল। তাঁরা হেগেলীয় দর্শনের একদেশদর্শী ব্যাখ্যা করলেন আপন আপন ভৌগোলিক সীমানা বিস্তারের প্রয়োজনে। দুর্বল অশক্ত জাতির ওপর শক্তিমানের দুর্মদ লোভের জয়পতাকা উড়ল। হেগেলীয় দর্শনের অপব্যাখ্যা ঘটল এ যুগের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রনায়কদের হাতে। শাসনবিধি গঠনেও ফ্যাসী-বাদীরা হেগেলীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'ল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হেগেলের কাছে অগ্রাহ্য। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মতামত অপাংক্তেয়। রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন দেশের চিন্তাশীল অভিজাত সম্প্রদায়। এই তত্ত্বের অপব্যবহার ঘটালেন এ যুগের দানবীয় শক্তি-সাধকেরা। ফ্যাসীবাদীরা মার্কসীয় দর্শনের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনি মার্কসের দর্শন থেকে অখণ্ড সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র-ধারণাটুকু আহরণ করেছিলেন ; সে রাষ্ট্র-যন্ত্র এক দল বিশেষের করায়ত্ত রইল। ব্যক্তিবাদের প্রতি অনাস্থা এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রে অবিশ্বাস —এই দুটি মারণাস্ত্রও মুসোলিনি সংগ্রহ করেছিলেন মার্কসীয় দর্শন থেকে।

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডক্টর এন. বসু কৃত 'Political Philosophy after Hegel and Marx' গ্রন্থ পৃঃ ৫০-৫৪ দ্রষ্টব্য।

গণতন্ত্র হ'ল বুর্জোয়াদের সৃষ্টি। একদেশদর্শী ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রদর্শনের প্রেরণা জুগিয়েছিল মার্কসবাদ।

সোবিয়েত রুশিয়ায় যে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তার প্রাণকেন্দ্র মার্কসীয় জড়বাদ এবং তার উৎসমুখ হেগেলীয় দর্শন। শ্লাভ ভাষাভাষী মানুষদের ত্রাণকর্তা হিসেবে রুশিয়ার ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে রুশদেশের চিন্তানায়কেরা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ব'লে বিচার করেছেন। উনিশ শতকে এক অতিনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রয়োজনে রুশিয়ার এই সার্বভৌম আবির্ভাব ঘটবে—একথা বিশ্বাস করলেন রুশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রীয় দর্শনশাস্ত্রীরা। তাঁরা আরও বলেন যে এই সার্বভৌম রুশ রাষ্ট্র শুধু শ্লাভ-ভাষাভাষীদেরই মুক্তি ঘটাবে না, এই দেশ অন্যান্য দেশেরও অধিনায়কতা করবে। ইতিহাস-সম্মত মানব কর্মের রূপ চতুর্বিধ —ধর্মীয়, কৃষ্টিগত, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপ। এই চতুর্বিধ কর্মলোকে রুশিয়া প্রাগ্রসর হ'ল। তাই ত রুশীয় চিন্তানায়কেরা হেগেলের অনুসরণে রুশিয়ার সার্বভৌমতা দাবী করলেন। সোবিয়েত কম্যুনিজমের অধিষ্ঠান চারটি নীতির বনিয়াদে—সমাজবাদ, উৎপাদনশীলতা, বহির্নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্র সীমানা বিস্তার। এই সমাজবাদী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদর্শনের উদ্‌গাতা লেনিন এবং স্তালিন, উভয়েই মার্কসপন্থী। এঁদের হাতে মার্কসবাদের আংশিক রূপান্তর ঘটল দেশজ অবস্থার প্রয়োজনে। মার্কসের মতে সমাজবিপ্লব তখনই সেখানে সম্ভব হবে যখন পুঁজিবাদ কোন এক দেশে তার চরম পরিণতি লাভ করবে। এই পরিণত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে মানুষের কলকব্জার জ্ঞান উন্নততর হবে। ব্যবহারিক জীবনে তন্ত্র-সহায়তায় এদের জীবনমান সমুন্নত। এই ধরনের একটি রাষ্ট্রে সমাজবাদী বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনুন্নত দেশেও এই বিপ্লবের বিস্তার ঘটবে এবং এইভাবে সারা পৃথিবীতে সমাজবাদী বিপ্লব সংসাধিত হবে। বিংশ শতকে বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মার্কসীয় দর্শনের আংশিক রূপান্তর ঘটিয়ে লেনিন বললেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতনের জন্য যে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রয়োজন তার অনুষ্ঠান যন্ত্র-সভ্যতায় সর্বোন্নত রাষ্ট্রে হবে এমন কথা আবশ্যিক সত্য নয়। বরং অনুন্নত দেশে এই বিপ্লবের সম্ভাবনা সমধিক। মার্ক্সীয় দর্শনের আংশিক রূপ-বদল

হ'ল লেনিনের হাতে। ইতিহাস এই তত্ত্ব-সংশোধনে সহায়তা করল। জাতির প্রয়োজনে, যুগের প্রয়োজনে মার্কস কথিত তত্ত্বের আরো অনেক পরিবর্তন ঘটল। বিপ্লবোত্তর রুশীয় সমবায়ীকরণ নীতি জাতীয়করণের সমার্থক নয়। সমাজবাদ জাতীয়করণ নীতির পোষক। সমবায়ী কৃষি-কেন্দ্রগুলো রুশীয় সংবিধানে কথিত সমাজবাদী প্রতিষ্ঠান নয়। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক অশাস্ত্রীয় নীতি বিকৃতি ঘটেছে আধুনিক রুশিয়ার সমাজ-বাদী রাষ্ট্রে। সমাজবাদের মূলমন্ত্র অস্বীকৃত হয়েছে রুশীয় সংবিধানে। সংবিধানের দ্বাদশ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রম আদায় করবে এবং তাকে পারিশ্রমিক দেবে তার কাজ অনুসারে, তার প্রয়োজন অনুসারে নয়। এইভাবে রুশীয় সংবিধানে সমাজবাদ খণ্ডিত হয়েছে। সর্বহারাদের একনায়কত্ব কম্যুনিষ্ট দলের একনায়কত্বে পর্যবসিত হ'ল। মার্কসবাদের রূপান্তর ঘটল দলগত রাজনীতির প্রয়োজনে। রাষ্ট্রীয় দর্শনের মূল নীতির বলিদান করা হ'ল ব্যবহারের পাদমূলে। মার্কস কথিত সর্বহারাদের বিপ্লবের পথে পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশগুলিতেও সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটল না। বিগত বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেশীয় অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় অধোগতি এবং রুশীয় বাহিনী কর্তৃক এই সব অঞ্চল জবর দখলের সুযোগ নিয়ে স্তালিন 'পিপলস্ ডিমোক্রেসি'র প্রতিষ্ঠা ঘটালেন পূর্ব ইয়োরোপের এই অল্পোন্নত দেশগুলোতে। বুদ্ধিজীবী মুষ্টিমেয় কম্যুনিষ্ট এই বিপ্লবের অগ্রনায়ক। সোবিয়েত লাল বাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় এই তথাকথিত বিপ্লব সম্ভব হ'ল। দেশের মানুষের সঙ্গে নাড়ীর যোগ এই বিপ্লবকে প্রাণবন্ত করেনি। সর্বহারার একনায়কত্বের পরিবর্তে স্তালিন-পন্থী সুবিধাবাদীদের শাসনব্যবস্থা চালু হ'ল। তাই স্তালিনীয় পিপলস্ ডিমোক্রেসির প্রতিষ্ঠার কিছুকালের মধ্যেই যুগোশ্লাভিয়া মস্কোর নির্দেশের ক্রমান্বিত বিরোধিতা করল। প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো কম্যুনিষ্টদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দিলেন না, ক্ষমতা অর্পিত হ'ল পিপলস্ ফ্রণ্টের হস্তে। যে ফ্রণ্টে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। ওদিকে হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অতি গোচর। রুশীয় গণবাহিনী সেদিন হাঙ্গেরীর গণ-আন্দোলনকে

পশুবলে বিধ্বস্ত করেনি, বিধ্বস্ত করেছে ক্রেমলিন-মার্কা কম্যুনিজমকে। এর ফলে বিশ্বমানসে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তা সুদূরপ্রসারী।

মার্ক্সীয় শ্রেণী সংগ্রাম এবং হিংসাত্মক বিপ্লব যে কত ভয়াবহ তার নজীর আধুনিক কালের এবং অতীত কালের ইতিহাসে ইতস্ততঃ বহু বিক্ষিপ্ত। তাই হেগেলীয় শিষ্য বার্ণষ্টাইন মার্ক্সীয় দর্শনে প্রত্যয় রেখেও মার্ক্সীয় শ্রেণী সংগ্রাম এবং বিপ্লব পরিহারের জন্য বললেন। তিনি বিবর্তনের কথা বললেন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ; তাঁর মতে এই বিবর্তনের পথে সমাজবাদী আন্দোলনের পার্লামেণ্টারি রূপ উদ্বর্তিত হবে। এই পথে মার্কস-অভিপ্রেত নতুন সমাজ ব্যবস্থার অভ্যুদয় সম্ভব হবে। বার্ণষ্টাইন সম্পত্তিতে ব্যক্তি অধিকারতত্ত্বকে অস্বীকার করলেন, তিনি ধন-সাম্যে বিশ্বাস করেছেন। তবু তিনি মার্ক্সীয় দর্শনকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি, মার্ক্সীয় দর্শনের একদেশদর্শিতার জন্য। তিনি মার্কসবাদকে হেগেলীয় মতবাদের পশ্চাদ্‌পট থেকে নির্মুক্ত করতে চাইলেন। মার্ক্সীয় জড়বাদে হেগেলীয় দ্বন্দ্বনীতির প্রয়োগ-শুদ্ধি সম্পর্কে মতভেদের অন্ত ছিল না।* এই বাক্‌-বিতণ্ডা থেকে মার্কসবাদকে মুক্ত করতে চাইলেন বার্ণষ্টাইন। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য হ'ল। উদারনৈতিক বুর্জোয়া সমাজের দান বার্ণষ্টাইন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করলেন। বার্ণষ্টাইনের উদার মতবাদিতা ইয়োরোপে সমাজবাদী গণতন্ত্র এবং তার পরিণত রূপ পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সহায়তা করল। গণতান্ত্রিক-সমাজবাদী শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দল অস্তিত্ববান। বামপন্থী আর্ণল্ডরুজ্‌ এই বিরোধী পক্ষের অস্তিত্বের সমর্থনে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের উল্লেখ করলেন। বিরোধ না থাকলে প্রগতি সম্ভব নয়। একটা সম্পূর্ণ সমগ্রতার ধারণার মধ্যে বিরোধ বিধৃত। ইয়োরোপে সমাজবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ফ্যাবিয়ানদের উদ্যোগে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এবং ইংলণ্ডে এই নব্য সমাজবাদী আদর্শ নিয়ে সেদিন কত না পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। ভাঙ্গাগড়ার সে এক মাহেন্দ্র লগ্ন। সে যুগে এই উদার সমাজবাদী তন্ত্রের উত্তর সাধক সিডনি ওয়েব ঘোষণা করলেন যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে প্রবেশের সহজ গতিটা একেবারে অকল্পনীয় নয়।

* এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার জন্য Bertrand Russel-এর 'Problems of Philosophy' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এশিয়ার নবজাগরণ

এশিয়ার সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক অশান্তির কারণ হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ এই অশান্তির মূল কারণ হিসেবে বিদেশী প্রভুত্ব অথবা স্থানীয় সরকারের দুর্নীতিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। যদিও এই ধরনের ব্যাখ্যায় আংশিক সত্য অনুস্যূত। কিন্তু এরা সমস্যাটির গভীরে প্রবেশ করেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি বারবার বিজিত হয়েছে, বিজয়ীর লোভ বিজিতের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে, কুশাসনের বিশৃঙ্খলায় রাষ্ট্রগুলি হৃতসর্বস্ব হয়ে গেছে। স্বদেশী এবং বিদেশী শাসনের অত্যাচারে তাদের দুঃখের পাত্রটি বারংবার পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজ যদি এশিয়ায় গণ-অভ্যুত্থান হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সেই অভ্যুত্থান শাসকের অপরিমিত অত্যাচার ও অসদাচারের জন্যই ঘটেছে, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ ঘটবে। এর কারণ হ'ল অতীতে জন-সমাজ যা ছিল, আজ ঠিক তা আর নেই। তাঁদের মেজাজের বদল হয়েছে এবং এই মেজাজ বদলের পিছনে রয়েছে এক ধরনের বাস্তব সত্য। আমরা শুনেছি যে এশিয়ার নবজাগরণ এসেছে। কিন্তু এই নবজাগরণকে যদি শুধুমাত্র আলংকারিক অর্থে গ্রহণ না করি তা হ'লে আমাদের বুঝতে হবে যে এশিয়ার মানুষের মনে তার মানস-প্রবণতায়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষায়, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটল? কেমন করে কোন পথে এই পরিবর্তন সাধিত হ'ল?

এ কথা কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধেও একইভাবে প্রযোজ্য। কমিউনিস্টদের প্রচারের জন্যই এই আন্দোলন সফল হচ্ছে, একথা ভাবলে ভুল হবে। যাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানো হচ্ছে, তাদের মতিগতি, তাদের মনোভাব এই আন্দোলনের সাফল্যের কারণ। যখন কমিউনিস্ট প্রচার বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় না, তখন তারা সেই কথাই প্রচার করে যা তদ্দেশীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করতে চায়; যাদের মধ্যে প্রচার-

কার্য চালানো হচ্ছে, তারা মরিয়া হয়ে যা চায় সেটুকু দিলেই প্রচারকার্য সফল হয়। এশিয়ার সাম্প্রতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষণ করা সম্ভব হবে না যদি না আমরা তদ্দেশীয় ব্যষ্টি মানসের গতিপ্রকৃতির, তাদের মানসপ্রবণতার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর রাখি। চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার অনশনক্লিষ্ট ও অর্ধনগ্ন পর্ণকুটীরবাসী মানুষেরা কী চায় তার খবর আমাদের রাখতে হবে।

অর্থনীতিক তত্ত্বকথা আমাদের যে সমাধান দেয়, তা গ্রহণযোগ্য নয় ছবিতে দেখা চলন্ত জনতার মুখচ্ছবি যখন মনে পড়ে যায়, অগণিত ঊর্ধ্বমুখী মুখের শোভাযাত্রায় কত রকম মুখভঙ্গী তাদের, মুখের মুকুরে শত ভাবের প্রতিচ্ছায়া! কেউ মুখ বুজে নেই, মুখব্যাদান করে তারা কী যেন বলছে? তাদের মনের ভাব জানবার জন্য কৌতূহল হয়। তারা কী আশ্রয়ের জন্য, অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য চেঁচাচ্ছে? জীবনে যা কিছু শ্রেয় তার জন্যই কী তারা চীৎকার করছে? তারা কী স্বাধীনতা চাচ্ছে, তারা কী ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছে? না, তা নয়। তাদের উত্তাল কলরবের পিছনে রয়েছে তাদের অহংকার। এই অহংবোধটুকুকে তৃপ্ত করার জন্য এশিয়ার মানুষেরা তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে, আর্থনীতিক সুযোগ সুবিধা 'ত' তুচ্ছ কথা। ওরা চীৎকার করে ওদের বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, অর্থনৈতিক অসুবিধা বা দাবীদাওয়ার কথা ওরা বলছে না। আমরা ক্রমে দেখতে পাব যে গণজাগরণের প্রকাশ ঘটছে এই অহংবোধের সরব প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে। এই গণজাগরণের পর্যায়ক্রমটুকু বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সমস্যাটির কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করতে পারব।

এশিয়ার নবজাগরণের মুখ্য হেতু হল পশ্চিমের প্রভাব—এর অর্থ এই নয় যে প্রতীচ্যের উপনিবেশস্থাপনকারী রাষ্ট্রগুলির অত্যাচার ও শোষণের ফলেই এই জাগরণ সম্ভব হয়েছে। কেন না অত্যাচার ও শোষণের সঙ্গে এশীয় জনগণের বহুকালের পরিচয়, 'ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন, অথবা ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ শাসন যে তৎদ্দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। ইংরেজ অথবা ওলন্দাজ শাসনের ফলে যে উপকার তৎদ্দেশীয় জনগণ পেয়েছেন তা পূর্বেকার কোন শাসন-

ব্যবস্থায় তাঁরা পাননি, ভবিষ্যতে তা পাবার আশা খুব বেশী আছে ব'লেও মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি যে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যদি আরো শতগুণ বেশী কল্যাণ সাধন করতেন যদি তাঁরা গোড়া থেকেই জনহিতের মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশশাসন করতেন, তাহলেও তাঁদের এই ধরনের শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হ'ত। পশ্চিমী শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁদের প্রভাবে উপনিবেশগুলিতে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনই এশিয়ার সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক অশান্তির মূলে রয়েছে।

আমি যে পরিবর্তনের কথা ভাবছি, তার প্রকৃতি-স্বকৃতি স্বতন্ত্র। তা গোষ্ঠীগত কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরায়, তাকে দুর্বল করে। পশ্চিমী প্রভাব আসার আগে এশিয়ার সর্বত্রই জনগণ ছোট ছোট সুসমৃদ্ধ গোষ্ঠীতে যূথবদ্ধ ছিল। এই গোষ্ঠী কোথাও পিতৃ-প্রধান সুবৃহৎ পরিবার, গোষ্ঠী অথবা উপজাতির আকার নিয়েছিল, কোথাও বা সুসমৃদ্ধ গ্রামীন অথবা নাগরিক গোষ্ঠী-রূপে, আবার কোথাও বা ধর্মীয় সম্প্রদায় অথবা রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসেবে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যষ্টি সকল সময়ে অনুভব করেছে যে সে এক প্রবহমান আদি-অন্তহীন সমগ্রতার মধ্যে বিধৃত। সেই ব্যক্তি মানুষ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ বোধ করেনি, সে কখনো আপনাকে হারিয়ে ফেলেনি। অনন্ত মহাশূন্যে ভাসমান জীবন-বিন্দু হিসেবে সে কখনো নিজেকে ভাবতে পারেনি। পশ্চিমী প্রভাব এই সামগ্রিক অস্তিত্ববোধকে দুর্বল করতে চেয়েছে, ধ্বংস ক'রে দিতে চেয়েছে এই যূথবদ্ধতাকে। গতানুগতিক জীবনধারায় ভাঙ্গন ধরল ক্ষয়ে গল ধীরে ধীরে এই চিরায়তের অচলায়তন; সমষ্টিগত সম্প্রদায়গত অস্তিত্বের কাঠামো থেকে তাঁর গৌরবের জৌলুসটুকু মুছে নিল, তারা পশ্চিমী সভ্যতার চাপে ক্রমে ক্রমে অকেজো হয়ে পড়ল। নতুন নতুন ব্যবসাবাণিজ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত ক'রে পশ্চিমী সভ্যতা এটুকু সম্পন্ন করল। পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা দিল। প্রাচ্যের মানুষেরা যাতে সব রকমের আলস্য ত্যাগ ক'রে তাদের শিলীভূত ঐতিহ্য প্রিয়তাকে পরিহার ক'রে আত্মোন্নতির পথ খোঁজে, পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠী তা চাইল। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের

মুক্তি ঘটল না কিন্তু তারা ক্রমে নিঃসঙ্গ এবং যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। বাইরের প্রভাব তাদের উপর কাজ করতে লাগল। এতোদিন যে নাবালক মানুষটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের উষ্ণতা এবং নিরাপত্তায় আরামে দিন কাটাচ্ছিল, তাকে হঠাৎ এক নিরুত্তাপ জগতে অভিভাবকহীন রিক্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হল। এই গোষ্ঠী থেকে আকস্মিক বিচ্যুতির যে বেদনা, পরিত্যক্ত হওয়ার যে ব্যথা তাই এশিয়ার গণ-জাগরণের সূচনা করল। সমাজ বিবর্তন পথে এই গোষ্ঠীজীবনের ভেঙ্গে পড়া, এটা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেন না এক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষের নতুন অভ্যুদয় ঘটল ; সে কিছুটা পরিমাণে সুস্থ হয়ে ওঠে তখনই যখন সে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচুর সুযোগ পায়। ক্রমে সে আপনার দৈনন্দিন জীবনের সকল ভার বহনে এবং চাপ সহ্য করায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সে এমন একটি পারিপার্শ্বিক চায় যেখানে সে কাজ করতে পারে, কাজে সফলতা অর্জন করতে পারে, এবং এই কাজের ফলে আপনার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। আপন প্রতিভার বিকাশ সে এই কাজের পথেই ঘটাতে চায়। এইভাবে সে আত্মপ্রত্যয়টুকু ফিরে পায়, আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই আত্মবিশ্বাস ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তবেই মানুষের জীবনধারা অর্থহীন হয় না। মানুষ বাঁচার মধ্য দিয়ে আনন্দ খুঁজে পায়।

যেখানে এই আত্মবিশ্বাসের, এই নিজের প্রতি শ্রদ্ধার অসদ্ভাব ঘটে, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষের বিস্ফোরণধর্মী হওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেড়ে যায়। সে তখন কোন এক সার্বভৌম সত্যকে আশ্রয় করতে চায় অথবা কোন এক রাষ্ট্রনেতার চটকদার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপনার হারানো আত্মবিশ্বাসটুকুকে, আপন মূল্যবোধটুকুকে ফিরে পেতে চায়। কখন কখন সে রাষ্ট্রনেতার বদলে কোন একটি গোষ্ঠীর, দলের জাতির অথবা গণ-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চায় ঐ একই কারণে। সে এবং তার সমধর্মী মানুষের সমাজ-বিপ্লবে সহায়তা করে। এই বিপ্লব সমাজের ভিত্তিভূমিতে আঘাত করে, এর ফলে নানাবিধ জটিলতারও সৃষ্টি হয়। অবস্থার বিরল যোগাযোগ হয়ত বা মানুষের এই গোষ্ঠী আশ্রয়ী অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্বে রূপান্তর ঘটাবার সময় কোন

মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই ধরনের যোগাযোগ বড় একটা ঘটে না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ইউরোপে আমরা দেখেছি ব্যক্তি-মানুষ এইভাবে গির্জার সামগ্রিক প্রভাব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। প্রথমটা এই মুক্তি ঘটল আকস্মিকভাবে। দুর্বল এবং অবমানিত পাদ্রী সমাজ ইউরোপের মানুষের মন থেকে এবং হৃদয় থেকে নির্বাসিত হল, তার আর কোন কর্তৃত্ব রইল না। সেক্ষেত্রেও ব্যক্তি-মুক্তি সম্ভব হল এই বর্জনের ফলেই, মুক্তির জন্য সজ্ঞান প্রয়াস এই মুক্তিটুকুকে সম্ভব করে নি। কিন্তু আজকের দিনের এশিয়ার নব জাগরণ যে অবস্থায় ঘটছে, সেই অবস্থা ইউরোপে সেদিন ছিল না। মধ্যযুগ যখন অবসিত হল, তখনকার ইউরোপীয় মানুষেরা জেগে উঠে দেখল, তাদের সামনে রয়েছে সদ্য-আবিষ্কৃত নতুন নতুন মহাদেশের ইশারা, নতুন নতুন বাণিজ্যপথের আমন্ত্রণ আর নব নব সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা। কাগজের ব্যবহার-বিধি প্রবর্তনে ও ছাপাখানার আবিষ্কারে এবং মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভাবনে জ্ঞানের নতুন দিগন্তও তখন তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আকাশে বাতাসে আলোর বাণী তখন অনুরণিত হচ্ছে, ওদেশে তখন একটা আত্ম-প্রত্যয়ের ঢেউ লেগেছিল। ওদেশের মানুষ বিশ্বাস করল যে তারা আপন প্রতিভা ও শক্তি বলে এবং সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আনুকূল্যে যে কোন কর্ম সম্পন্ন করে তুলতে পারে। তাদের কর্মশক্তি স্বদেশে ও বিদেশে কোথাও বাধা পেয়ে ব্যর্থ হবে না।

অনুকূল অবস্থার যোগাযোগে পশ্চিমে মানুষের গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অস্তিত্বে যখন তার রূপান্তর ঘটল তখন তাদের প্রাণশক্তির এক দুর্বার সমারোহ আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এমনটি আর অন্য কোন দেশের সভ্যতায় দেখিনি। তবুও এই রূপান্তরটুকুকে একেবারে নিরুপদ্রব বলতে পারি না। সংস্কারসাধন ও প্রতিসংস্কারসাধন আন্দোলনের অনুষঙ্গী উপদ্রব এবং গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল মানুষের ভয় থেকে। এই ভয়ের মূল হল ব্যক্তি মানসে আপন দায়িত্ব পালনের শক্তি সম্বন্ধে সংশয়ের উদ্রেক।

এশিয়ার মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ-জীবনে যখন ভাঙন ধরল, তখন

অনুকূল অবস্থার যোগাযোগে এই ধরনের কোন অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কত শত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর এশিয়ার মানুষের এই জাগরণটুকু ঘটল। তার সামনে কোন অসামান্য সুযোগ-সুবিধার রঙ্গিন স্বপ্ন ছিল না, মহৎ আলোর সংকেতে উদ্বেলিতচিত্ত হয়ে ওঠার তার কোন অবকাশও ছিল না। তার চারপাশের জীবন যেন কর্দমপূর্ণ বদ্ধ জলাশয়, প্রাচুর্যের কোন ইঙ্গিত কোথাও নেই। শুধু অসংখ্য মানুষের মেলা সেখানে, তার যেন কোন মূল্য নেই। এক টুকরো রুটি, সামান্য একটু পুরস্কার, তা পাবার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত লোলুপদৃষ্টি মানুষেরা হাত বাড়ায়। সেখানে শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই। সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষেরা সেদেশে সম্মান পায়, মেহনতী মানুষ থেকে এরা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে। মুষ্টিমেয় গর্বান্ধ মানুষেরা পৃথিবীর কোন হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে আপনার মূল্য, এ সমাজের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাটুকু যাচাই করে নিতে পারে না। তারা শুধুমাত্র বাক্‌সর্বস্ব, অভিনয়নিপুণ পণ্ডিতম্মন্য মানুষে পরিণত হয়।

নব্য এশিয়ার চরমপন্থী মানুষেরা কিছুটা শিক্ষিত, এঁরা কায়িক পরিশ্রমকে ভয় করে। সমাজব্যবস্থায় এঁদের নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়, তাকে এঁরা ভয়ানক ঘৃণা করেন। প্রতিটি ছাত্র, করণের নিম্নতর শ্রেণীর প্রতিটি করণিক, চাকুরীজীবী প্রত্যেকটি পদাধিকারী, এরা সবাই নিজেদের কেউ কেটা ভাবেন। এই বাকপটু, অকেজো মানুষেরা এশিয়ার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেন। এঁদের জীবন রক্ষা ব্যর্থ, এঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, এঁদের আত্মমর্যাদাবোধটুকুও অবলুপ্ত। স্বীকৃতি ও মর্যাদালাভের মরীচিকার পিছনে এঁরা ছুটেছেন। অহং বোধ এবং বিশ্বাসের বিকল্প এঁদের লক্ষ্য।

কমিউনিস্ট রাশিয়া মুখ্যতঃ এই সব মেকী বুদ্ধিজীবীর কাছে তার আবেদন পাঠায়। কর্তৃত্বশালী বিদগ্ধ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এঁদের স্থান করে দেবার প্রলোভন দেখানো হয়। ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তনে এঁদের ভূমিকা থাকবে, এই কথা বলে রাশিয়ার প্রচার কার্য এঁদের বিভ্রান্ত করে, এঁদের ওপর একধরনের গুরুত্ব আরোপ করে। এদের তত্ত্বঘেঁষা স্বার্থবোধক প্রচারে এই নেতৃত্বলোভী মানুষেরা সহজেই প্রভাবিত হয়।

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে প্রচার কার্য চালানো হয় তার মধ্যে আসল আবেদন কিন্তু এর প্রকৃত ও স্বীকৃত সত্য এবং তথ্যগুলির মধ্যে নয়। এই প্রচারের ফলে জনসাধারণের মনে অস্পষ্ট ধারণা হয় যে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একযোগে এক অভূতপূর্ব সর্বপ্লাবী বিপ্লব ঘটাতে চলেছে। বিপ্লবের ফলে এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয় ঘটবে, যার ফলে বর্তমান জীবনের সব কিছুই নস্যাৎ হয়ে যাবে।

এশিয়ার এই গণজাগরণ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল এই যে এশিয়াবাসীরা কোন নতুন শক্তি অর্জন ক'রে এই গণজাগরণকে সম্ভব ক'রে তোলে নি। তাদের নৈতিক, মানসিক, অথবা আধিভৌতিক কোন শক্তিই তারা বাড়াতে পারে নি। এই ধরনের কোন শক্তিরই আকস্মিক বিস্তার অথবা ক্রমান্বিত প্রসার তারা ঘটাতে পারে নি। এই গণজাগরণটুকু সম্ভব হল পরিত্যক্ত হওয়ার বোধ থেকে : জীবন ও জগতের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে হবে এই অনুভূতি থেকেই এই গণ-জাগরণ জন্ম নিল। আত্ম-দৌর্বল্যের তীব্র অনুভূতি এই জাগরণের সহায়তা করল। নব জাগ্রত এশিয়ার মানুষের মনের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হ'লে দুর্বল মানুষের মনের কথা, তার সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতির কথাটুকু আমাদের বুঝতে হবে।

এ কথা প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে শক্তিই দুর্নীতির উৎস। কিন্তু এ কথাও অবিসংবাদিত সত্য যে দুর্বলতা মানুষকে নীতিহীন করে তোলে। শক্তি মুষ্টিমেয় শক্তিমান মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। দুর্বলতা অসংখ্য দুর্বল মানুষকে নীতি ভ্রষ্ট করে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, রূঢ়তা পরমত-সহিষ্ণুতা ও সংশয়—এরা হ'ল দুর্বলতার ফল। দুর্বলের প্রতিবাদ যে তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হয় তা নয়, দুর্বল মানুষ সব সময়ে আপনাকে অসহায় এবং নিজেকে প্রতিকূল পরিবেশের অনুপযুক্ত মনে করেন বলেই এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচুর্যের ভাগ দিয়ে ঐ দুর্বল মানুষগুলোকে জয় করা যাবে না। তারা আমাদের উদারতাকে অত্যাচার বলে গ্রহণ করবে। সেণ্ট ভিনসেণ্ট দ্য পল তাঁর শিষ্যদের এইজন্যই সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিলেন : 'তোমরা গরীব মানুষদের যে রুটি দিচ্ছ, তার জন্য তাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করতে

হবে।' কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকু কেবল সেখানেই সম্ভব হবে যেক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার মনে একই ভগবদ্ চেতনা বিরাজ করে। সেক্ষেত্রে উভয়েই ভগবানকে বিশ্বচরাচরের পিতারূপে গণ্য করে, উভয়েই ধর্মের ভাষাটুকু পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করে। এযুগে এই ধরনের আয়ত্তী-করণ হয়ত পরিপূর্ণরূপে সম্ভব নয়। আর ঐ দুর্বল মানুষগুলোর সঙ্গে আমরা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের অহংকার অথবা ঘৃণাটুকুও ভাগ করে নিতে পারি না। পার্থিব ঐশ্বর্যে আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী ঐশ্বর্যবান ; ইতিহাসের অভিজ্ঞতার বিচারে আমরা ওদের থেকে ভিন্ন ; তাই আমাদের উভয়ের সমীকরণ সম্ভব নয়। ওদের স্বনির্ভর হবার জন্য আমাদের সাহায্য করা দরকার। আমাদের কারিগরী জ্ঞান, সমাজ-বিদ্যা ও রাষ্ট্রনৈতিক চাতুর্য এগুলি ওদের হাতে তুলে দেবার কৌশলটুকু আমাদের শিখতে হবে। এর ফলে ওরা ওদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে, স্বনির্ভর হয়ে আপন মর্যাদা ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটাবে।

আমার এটা বদ্ধমূল ধারণা যে আমরা যদি এই দুর্বল মানুষগুলোকে স্ববশ হবার, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হবার কাজে সাহায্য করতে পারি তা হ'লে আমাদের বৈদেশিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কতকগুলি সমস্যার সমাধান হতে পারে, আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কতকগুলি নতুন জটিল প্রশ্নের মীমাংসাও হতে পারে।

ষষ্ঠ স্তবক : জীবনদর্শন

জীবনধর্ম : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
জীবনদর্শন : রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

জীবনধর্ম : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকী রেনেসাঁ বাংলা দেশে সার্থক হ'ল রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। একদিকে রামমোহনের নব ধর্মের প্রবর্তনা অন্যদিকে ডিরোজিওর প্রখর যুক্তিবাদিতা যখন সে যুগের নব্য হিন্দু সন্তানকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল, সেই লগ্নে হিন্দু জীবনবাদের যাঁরা পুনরুজ্জীবন ঘটালেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ভাবনা ছিল—এই জাতিকে আত্মপ্রবুদ্ধ করিয়া তাহার পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব সাধনার উপায় সন্ধান।"[১] আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষ সেদিন মুক্তির পথ সন্ধান করছিল। সামাজিক কুসংস্কারের বন্ধ অন্ধকার জাতি-মানসকে অন্ধ করে রেখেছিল। জাতি পঙ্গু হ'য়ে গিয়েছিল অর্থহীন বিধানবোধের বেড়াজালে। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র চাইলেন সুপ্রাচীন হিন্দু জীবনাদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তিনি সর্বমনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন হিন্দুর সনাতন ঐতিহ্যের উৎকর্ষে। বলিষ্ঠ বিশ্বাসের অলৌকিক দ্যুতি বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়। তাঁর মননিষ্ঠা হিন্দুধর্মকে নব্য যুক্তিবাদীর চোখে এক নতুন মর্যাদা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রচারী, রবীন্দ্রনাথ অনুচর। নবজাগরণের ভাবধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হলেন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দু-জীবনবাদ তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয়। হিন্দুর সংকীর্ণতা, তার আচারের শুষ্ক বালুরাশি কবির মানবিকতাকে গ্রাস করেনি। তাঁর সর্বমানবিক সহানুভূতি সর্বজনবিদিত, তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ বহুখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ সকলকে আহ্বান করেছেন তাঁর মহৎ প্রাণের বিরাট প্রাঙ্গণে। আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, পূর্ব পশ্চিম সবাই এসেছে সেখানে। জাতি ও ভাষার ব্যবধানকে কবি কোনদিনই স্বীকার করেন নি। কবির অন্তরের প্রীতি সর্বত্রগামী। তাঁর ব্যক্তিস্বার্থ, তাঁর গোষ্ঠীস্বার্থ কখনও তাঁর এই মানুষকে ভালবাসার পথে অন্তরায় হয়নি।

১। শ্রীমোহিত লাল মজুমদার প্রণীত বঙ্কিম-বরণ পৃঃ ১৪১

সেদিন ইংরেজ ছিল শাসক, আমরা শাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত বা কখন কখন ইংরাজী শাসনের পক্ষে ওকালতি[১] করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ওকালতি করেছেন ইংরেজ জাতির পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতি সুবিধাবাদীর কথা। যদিও সে সুবিধাটুকু হল সামাজিক সুবিধা। রবীন্দ্রনাথের ওকালতি হ'ল আদর্শগত। রবীন্দ্রনাথ বললেন, যে জাতির মধ্যে শেলী কীটসের মত কবি প্রতিভা জন্মে ছিল, এণ্ডরুজের মত মহৎ হৃদয় মানুষ আছেন সে জাতিকে তিনি চিরদিনই শ্রদ্ধা করবেন। যিনি জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করলেন সারা দেশের প্রতিনিধি হ'য়ে, যিনি মৃত্যুশয্যা থেকে কুমারী রাথবোনের অনৃত ভাষণের নিন্দা করলেন তিনিই আবার শাসক জাতিকে শ্রদ্ধা জানালেন অকুণ্ঠ ভাষায়। এ হ'ল আদর্শের কথা, কবির এ মানসিক পরিণতি কালোপযোগী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল তাঁর যুগে। রবীন্দ্রযুগ বঙ্কিমযুগ থেকে স্বতন্ত্র, যদিও কালের হিসাবে তাঁরা সমকালীন ; জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কনিষ্ঠের দেখা হয়েছে বারবার। অগ্রজ অনুজকে মাল্যদানও করেছেন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে[২], অভিনন্দন জানিয়েছেন পরম স্নেহে, তবু তাঁরা স্বতন্ত্রযুগের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর পুনরভ্যুত্থানের নায়ক রবীন্দ্রনাথ সেই অভ্যুত্থিত জাতির অধিনায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির বিক্ষিপ্ত শক্তি ও চিন্তাকে সংহত করলেন; রবীন্দ্রনাথ সেই সুসম্বদ্ধ চিন্তা ও সংহত শক্তিকে নবতর প্রকাশ পথে উৎসারিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত জাতির কর্ণে পাঞ্চজন্যের মঙ্গলনিনাদ ধ্বনিত করলেন, তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন নতুন ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথ সেই নবজাগরণের সম্ভাবনাকে সত্য করে তুললেন একটি বিরাট জীবনের সাধনা দিয়ে, একটি মহৎ মনের মননিষ্ঠায়। একথা আমরা স্মরণ রাখব যে প্রাক্ বিংশ শতাব্দী জীবন সাধনা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে রূপ নিল, তারই পরিণতি আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আর এক ভিন্ন পটভূমিকায়। জাতির মননসাধনার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন যুগের—এ বিচ্ছেদ তাঁদের ধ্যান ধারণায় ও জীবনচর্চায়। বঙ্কিমচন্দ্র

১। আনন্দমঠ, অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত 'Pramathanath Bose' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাঁর আপনকালের মানুষ, রবীন্দ্রনাথ হলেন যুগাগ্রগামী। তাইত বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আজ ইতিহাসের পাতায় আর রবীন্দ্রনাথে কথা সারা দেশের আকাশে বাতাসে। যত দিন যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজায় বাহুল্য ও আড়ম্বর বাড়ছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আগ্রহ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। একে শুধু হুজুগ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পিছনে রয়েছে ইতিহাসোত্তর আদর্শের মহনীয়তা এবং তার আংশিক ও ক্রমিক স্বীকৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রতিভাদ্যুতি বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গনের দশ দিক আলোকিত ক'রে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় সাহিত্যের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রনাথ তারও বাইরে স্বীকৃত হয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন বিশ্বজনার কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সে সৌভাগ্য হয়নি, হয়ত তার জন্য তাঁর প্রস্তুতিও ছিল না। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু এমন অনন্যতা দাবি করতে পারত না পশ্চিমের চোখে যার ফলে তাঁর স্বীকৃতি সহজ হ'তে পারত। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের মত উপন্যাসের অপ্রতুলতা ছিল না। ইংরাজী সাহিত্যেও তখন এই ধরনের সৃষ্টিও স্রষ্টার একেবারেই অসদ্ভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরাজী রচনায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করতেন না। তাঁর 'Rajmohan's wife' তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি, তাইত তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনায় হাত দলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, হিন্দু জীবনবাদে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর জীবনদর্শন ভারতীয় সাধনার ভাগবত আদর্শের উত্তরাধিকারটুকু গ্রহণ করেছিল পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। হিন্দু চিন্তার ধারা তাঁর দেশপ্রেমকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি হিন্দুর পুরাণ, শাস্ত্র, দর্শন, নূতন করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয় চিন্তার যুক্তি-পাথরে ঘষিয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।"[১] একথা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী মানবিকতার আদর্শ তাঁকে অভিভূত করেছিল; তিনি কঁত ও মিলের মনুষ্যত্বের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন সর্ব মনে প্রাণে; সে আদর্শ তাঁর হিন্দুবিশ্বাসের জারকরসে জারিত হ'য়ে হিন্দুধর্মকে নতুন মর্যাদা

১। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত বঙ্কিমবরণ: পৃ: ১৪৩

দিল। যুক্তিবাদের পাথরের বনিয়াদে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটল। তাঁর নায়কেরা ছায়াঘন রূপকথার রাজ্য ছেড়ে নেমে এল বুদ্ধির জগতে। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে তাদের দাম কষা হ'ল। হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ মানবিক গুণের চরম প্রকাশ; মানুষের আদর্শের পরম স্ফূর্তি সেখানে আমরা দেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন আদর্শ পুরুষ। আদর্শ মানুষের ধারণা যদি ইয়োরোপীয় প্রত্যক্ষবাদীদের চোখে সত্য হয়, গ্রাহ্য হয় তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা, তবে গীতার অধিনায়ক পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই বা কেন গ্রহণযোগ্য হবেন না আমাদের কাছে? গীতার ধর্মকে গ্রহণের বাধা কোথায়? সে ধর্ম ত মানবিক আদর্শকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে? এই ধর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম আস্থা ছিল। তাই তিনি বললেন: গীতোক্ত ধর্ম সমস্ত মানুষের ধর্ম। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করে তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে ভক্তি না করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে ইহা ধর্ম, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা); বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদী মন সংস্কারের ঊর্ধ্বে গীতোক্ত সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেছে, গীতার গুণ কীর্তিত হয়নি শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত বলে, তার মূল্য মহৎ তত্ত্বের প্রচারে। প্রাচীন হিন্দুধর্মের নব্য ভাষ্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে পশ্চিমী যুক্তিবাদ হিন্দু জীবনবাদকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাল। বঙ্কিম-মানসে ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদ উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হ'ল সনাতন ভারতীয় জীবনবাদ। রবীন্দ্র-মানসে প্রাচীনের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা তাঁর দেশকালের বেড়াভাঙা সব মানবীয় আদর্শের পটভূমিকা। একজনের চোখে যুক্তিবাদ হ'ল হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক বাহন, অন্যজনার কাছে যুক্তিবাদ আন্তর্জাতিক জীবনবাদের গ্রন্থকার। রবীন্দ্রনাথের চোখে গোষ্ঠীর সত্য-দর্শন মানুষের সত্য-দর্শনের মধ্যে বিধৃত। যে লোকোত্তর পুরুষ আপন অতিমানবীয় বীক্ষণশক্তির সহায়তায় সুন্দরের অনুপম মূর্তি প্রত্যক্ষ করলেন সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি জাতিবাদে বিশ্বাস করতে পারেন না। কবির সমগ্র পুরুষীয় অনুভব

তাঁর প্রাণরস আহরণ করেছে সারা পৃথিবীর মাটি থেকে। কবি তাইত তিনি বললেন ঃ

আমি পৃথিবীর কবি,
যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে,
সাড়া তার জাগিবে তখনি।

এ ত শুধু কবির কাব্য কথা নয়, এ তাঁর জীবন কথাও বটে। এ হ'ল বিশ্বকবির সমগ্র পুরুষীয় অনুভবের সত্যবাণী। রবীন্দ্রনাথের অভিসার হ'ল ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে। যতক্ষণ না কবি-মানস বৃহত্তরে পৌঁছায় অর্থাৎ হিরণ্ময় পুরুষের সন্নিধি লাভ করে, তার ক্লান্তিহীন অভিসার চলে যতিহীন পথে। সুদূরের পিয়াস হ'ল কবির বিশ্ববোধের কাব্যরূপ। আপনার জীবনের পত্রপুটে পৃথিবীর সব অভিজাত এবং অনভিজাত, নামগোত্রহীন মানুষের স্পর্শপূতঃ প্রসাদটুকু কবির কাছে পরম মুল্যের। তিনি মানুষের ধর্মে বিশ্বাস করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করলেন হিন্দু ধর্মে। রবীন্দ্রনাথের অভিসার ঘটেছে আত্মকেন্দ্র থেকে জীবন বলয়ের প্রত্যন্ত সীমায়,বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বহির্বিশ্ব থেকে আত্মকেন্দ্রের দিকে ফিরে এসেছে। মিলের শ্রেয়োবাদ, কঁতের প্রত্যক্ষবাদ বঙ্কিম মানসে যে নতুন শক্তির উন্মাদনা এনে দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে কাজে লাগিয়েছেন হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজীবনবাদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায়। কঁতের মানবিক আদর্শ যদি সত্য হয়, যদি সে জীবনাদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তবে সেই আদর্শের প্রমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সত্য হবে। হিন্দুধর্ম যদি সেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করে, যদি সে হিন্দুধর্মের আদর্শ হন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মধ্যে আমরা সমস্ত মানবিক গুণের মহত্তম প্রকাশ দেখেছি, তবে তাঁকে গ্রহণের বাধা কোথায়? এই পরম পুরুষ যে ধর্মের আদর্শ, সে ধর্ম গ্রহণে আমাদের যুক্তিবাদ ত কোথাও খণ্ডিত হয় না। মানুষে মানুষে যেটুকু প্রভেদ আছে, তার মুলে রয়েছে মানবিক গুণের বিভিন্ন প্রকাশ-পর্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিভেদে বিশ্বাস করেছেন, এই ভেদতত্ত্বই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের ধারণাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে সহায়তা করেছে। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ চরিত্র, তাঁর অনুসরণই কাম্য। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং

শরণং ব্রজ—এই মহৎ ভাষণের পুনরুক্তির প্রয়োজন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কল্পে। সে মানস কল্পান্তে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হ'ল দুর্যোগের। সে হ'ল ঝঞ্ঝার কাল। জাতীয় মনন-প্রকৃতির মধ্যে যে বিরাট শূন্যতা এসেছিল তাকে ভ'রে দেবার জন্য সে যুগের জাতি-মানসের সবটুকু শক্তি কেন্দ্রাভিমুখী হয়েছিল। তাই ত বঙ্কিমের যাত্রা হ'ল সর্ব-মানবিক আদর্শ থেকে হিন্দু জীবনাদর্শের তীর্থপথে ; পরের যুগ হ'ল সাম্যাবস্থা। সে যুগের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। তিনি আপন মনন ধর্মের অনন্যতায় সমস্ত সঙ্কীর্ণ জীবনাদর্শের গণ্ডিকে অতিক্রম করলেন অনায়াসে। তাইত তিনি সকল মানুষের কবি। হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মচ্যুত রোহিণীর যথোচিত শাস্তি বিধান করলেন আর মানুষ রবীন্দ্রনাথ বিধর্মী গোরাকে পরম দুঃখের মধ্য দিয়েও হিন্দুধর্মের সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উপরে ওঠার সুযোগ দিলেন ; কবির চোখে হিন্দু হওয়া ভালো, মানুষ হওয়া আরো ভালো। মানুষের ধর্ম শুধু হিন্দুর ধর্ম নয়, শুধু অহিন্দুরও নয়, সে যে সমগ্র মানব সমাজের ধর্ম। তাইত তার আবেদনও বৃহত্তর। কবি তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধে লিখলেন : বিদ্যাসাগর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙ্গালী বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন, যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই ত মানুষের চরম লক্ষ্য ও পরম কাম্য। সত্য সর্বব্যাপী, তার আধার সুবিস্তৃত। কোন একটি বিশেষ জীবন-বাদের নিঃসঙ্গতায় সত্য প্রতিষ্ঠা পায় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমন্বয়বাদী। বিভেদ এবং বিচ্ছেদ সুস্থ জীবন-যাত্রার অন্তরায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যুগ থেকে যুগান্তে, কল্প থেকে কল্পান্তে সভ্যতার যে বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি তা এক অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারার প্রকাশ। তাইত কবি সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ। এই আত্মীয়তার কথা, ঐক্যের কথা, তিনি তাঁর 'Religion of man' গ্রন্থে বললেন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে : "The truth that is infinite dwells in the ideal of unity which we find in the deeper relatedness" মানুষের অন্তরশায়ী ঐক্যবোধে সত্যের প্রতিষ্ঠা। এই সত্য অনন্ত, তার উপলব্ধি হ'ল মানুষের আত্মিক সাধনার

ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ এই পথের পথিক। তাঁর সাধনা সমন্বয়ধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের সাম্যবাদে বিশ্বাস ক'রেও মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগত বৈচিত্র্য ও অসাম্যকে স্বীকার করলেন পশ্চিমী প্রত্যক্ষবাদের অনুসরণে; রবীন্দ্রনাথ মানুষের গুণগত এবং জ্ঞানগত সমস্ত বৈষম্যকে জেনেও অস্বীকার করলেন, তাদের বিভেদকে বললেন তাদের আত্যন্তিক এবং মূলগত ঐক্যের কেন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দিকে আমাদের নিত্য অভিসার চলে; রবীন্দ্রনাথও পরমপুরুষকে ব্যক্তি চিত্তে প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। তবে তার অর্থ ও ব্যঞ্জনা ভিন্নধর্মী। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই, "Men must reveal in his own personality the Supreme Person by his disinterested activities. (Religion of man) রবীন্দ্রনাথও হিন্দুধর্মের সেই নিষ্কাম কর্মের আদর্শের কথা বললেন, চিত্তের গহনে সেই পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। তবে তাঁর যুক্তি হ'ল ভিন্ন ধর্মাশ্রয়ী কেন না তাঁর লক্ষ্য হ'ল আলাদা জগতের। কবির মনোবিহঙ্গ কোন ক্ষুদ্র গণ্ডির অন্তঃপুরে আশ্রয় নেয় নি। তাঁর জীবন-সাধনা হ'ল ভূমার, তাঁর ধর্ম হ'ল সর্বাশ্রয়ী। সে ধর্ম গতিশীল; নিত্য পরিবর্তমান যে মানুষ তার ধর্মও ত নিত্যসঞ্চারী। প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন: অন্তর্ধাতুর সৃজনী শক্তির ক্রমবিকাশে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে যে একটি অবিচ্ছেদ্য ক্রমচ্ছন্দ আছে তাহাকেই তিনি তাঁহার ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আমার ধর্ম আমার জীবনের মূলে। সেই জীবন এখনও চলছে কিন্তু মাঝ থেকে কোন এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে তাঁর উপরে টিকেট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতুহলী দর্শকের চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখা যায় একথা বিশ্বাস করা শক্ত।"[১] কোন এক যুগের ধর্মকে আমরা এইভাবে লেবেল মারা জাদুঘরের ধর্ম আখ্যা দিতে পারি। তা সে হিন্দু ধর্মই হোক, আর ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই হোক। বঙ্কিমচন্দ্র এই লেবেল আঁটা ধর্মে বিশ্বাস করেছেন। সে যুগে এই ধরনের বিশ্বাসের প্রয়োজন

১। রবিদীপিতা, পৃষ্ঠা ৫০-৫৪

ছিল। পরন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবন-প্রত্যয় দেশকালের সীমানাকে পরিপ্লাবিত ক'রে বিশ্বজনীন হয়েছে। ঐতিহাসিক বললেন, এ দুটোরই প্রয়োজন ছিল। আমরা সে প্রয়োজন স্বীকার করি। কালধর্মে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম তাঁকে হিন্দু ভারতবাসী করেছে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম তাঁকে করেছে বিশ্বনাগরিক। তাই বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি হয়েই রইলেন আর রবীন্দ্রনাথ হলেন এক অর্থে সারা পৃথিবীর জনগণের মন-অধিনায়ক।

জীবনদর্শন ঃ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

জীবন দর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনে গৃহীত দর্শন অর্থাৎ যে দর্শন মতকে আমরা সর্বপ্রযত্নে গ্রহণ করে থাকি, আমাদের চিন্তার এবং কর্মের জগতকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। এই জীবন দর্শন আমাদের স্বেচ্ছাবৃত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে; আমাদের চিন্তা জগতের দিশারী হ'ল আমাদের এই জীবন দর্শন। অবশ্য কান্টিয় নীতি দর্শনে যে Categorical imperative-এর কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেকে বলেছেন যে নৈতিক ঔচিত্যবোধের মধ্যে যে কর্ম-শাসনের নির্দেশ রয়েছে তার মধ্যে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের পক্ষে যা করণীয় বা করা উচিত বলে আমরা মনে করি সেটুকু সম্পাদন করার জন্য আমাদের শক্তি সামর্থ্য আছে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি এবং এও বিশ্বাস করি যে যাকে কর্তব্য বলে বুঝি তা আমাদের অবশ্য করণীয়। কান্টিয় নীতি দর্শনে কর্তব্য বোধের সঙ্গে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকলেও একথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে যাকে কর্তব্য বলে বুঝি, সেই বোঝার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কাজ করে। অতএব আমরা সহজেই বলতে পারি যে প্রত্যেক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানকর্মাশ্রিত মতই হল তার জীবন দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গী এবং দর্শন ভাবনায় এক ধরনের সার্বিক মানবতাবোধ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। ধর্ম, বর্ণ ভাষা ও ভূগোলের সব ব্যবধানকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে এরা দুজনে এক ধরনের মানবতাকে গ্রহণ করেছিলেন যা বিশ্বমানবের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এই সর্বগ্রাসী মানবতাবাদের ভিত্তিভূমিতে ছিল এক নিগূঢ় সর্বেশ্বরবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম সত্তার অস্তিত্বের প্রত্যয় এঁদের জীবন দর্শনকে চিহ্নিত করেছিল। এই সর্বব্যাপী ঐশী সত্তার অস্তিত্বের ধারণাটুকু ভারতীয় দর্শনের অধ্যাত্মবাদ থেকে উচ্চারিত

হয়েছিল। বেদবেদান্তের ভাবভাবনার ফল্গুধারা ভারতবাসীর চিন্তা ও ধারণাকে সিক্ত করে রেখেছে হাজার বছর ধরে ; তার ফলে ভারতবাসীর চিত্তে রসের অভাব কখনও হয়নি। সেই আর্দ্র চিত্ত-ভূমির মৃত্তিকাতে অজস্রবর্ণের ফুল ফুটেছে, তাদের গন্ধ মনোমুগ্ধকর। নানান ধরনের ফল ফলেছে, তাদের স্বাদ বহু বিচিত্র। বেদ উপনিষদের এই ঈশ্বর ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে একদিকে যেমন ভাবগত চেতনায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল তেমনি ধারা আবার এই ভাবগত ভক্তি উৎসারিত এক ধরনের মানবতাবাদকে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উপনিষদের সেই ঈশাবাস্য মন্ত্র গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে এক ধরনের ভাগবত চেতনার আলো দিয়েছে। তার ফলে তাঁদের মানবিকতার ধারণা এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিকে আশ্রয় করেছে। এর ফলে এক ধরনের সার্বিকতা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছে। কোন বিশেষ স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্টি আবিল এবং আচ্ছন্ন না হলে আমরা সহজেই এই দুই চিন্তা-নায়কের জীবন দর্শনের মূল সূত্রটিকে অনুধাবন করতে পারি।

আত্মকে অপররূপে প্রত্যক্ষ করাই হলো সুমহৎ জীবন দর্শনের লক্ষ্য। খ্রীষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলছেন: Who-so-ever will save his life shall lose it, and who-so-ever will lose his life for my sake shall find it. (New Testament) প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য সব সময়ে যে পালিয়ে বেড়ায় সে অচিরেই প্রাণ হারাবে এবং যে মানুষ ভাগবত সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করে তার মৃত্যু নেই। বাইবেলের এই মন্ত্রটি হ'ল গান্ধীজির প্রিয় মন্ত্র, তাঁর জীবনবেদের একটি মূল স্তম্ভ। এই ভাগবত প্রেরণায় আত্মদানই যে অমরত্বলাভের পথ সে তত্ত্বে গান্ধীজি বিশ্বাস করেছিলেন, সেই সঙ্গে এ তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেছেন যে যারা মানুষের সেবায় আত্মদান করে তারাও অমর হয়ে থাকে কেন না ভগবান সর্বাশ্রয়ী। যদি ভগবানই সর্বভূতে বিরাজ করেন তা হলে ভগবানকে ভালবাসাও যা জীবকে ভালবাসাও সেই একই কথা। বাইবেলের আর একটি কথাও গান্ধীজিকে মুগ্ধ করেছিল, Thou shalt love thy neighbour as thyself অর্থাৎ তুমি

তোমার প্রতিবেশীকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসবে। ভগবান যদি সর্বভূতে অধিষ্ঠান করেন তা হলে তো প্রতিবেশীকে পর ভাবা চলে না কেন না আমিও যে ভগবান আমার প্রতিবেশীও সেই একই ভগবান। তাই দেখি গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এক ধরনের সমদর্শন এসেছে যার সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম ঔপনিষদিক্ দর্শনে ও বৌদ্ধ দর্শন মতে। জৈন জীবন দর্শনেও এর সন্ধান আমরা পেয়েছি। গান্ধীজির জীবনবেদ উপনিষদের পুণ্যতোয়া স্রোত-ধারার দ্বারা একদিকে যেমন নিত্য বিধৌত হয়েছে অন্যদিকে আবার খ্রীষ্ট প্রমুখ মহান ধর্মের শাশ্বত ভাবনার দ্বারা তা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ভাবনায় ভাবিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র সাহিত্য সৃষ্টির কাননে যে মন্ত্রে লক্ষ ফুল ফুটিয়েছিলেন তা হ'ল সর্বেশ্বর মন্ত্র। তাঁর মানবতাবাদের আদর্শও এই সর্বেশ্বর-বাদের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন এক সর্বব্যাপী চৈতন্য সত্তায়, তিনি বিশ্বভুবনের নিয়ন্তা; মানুষের ভাবভাবনায়, তাঁর অজস্র সহস্রবিধ কর্মপ্রবাহের পশ্চাতে এই ভগবানের অদৃশ্য হস্ত। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র মাত্র। গান্ধীজি এই যন্ত্র-যন্ত্রী তত্ত্বে বিশ্বাস করেছেন। ভগবানে সর্ব কর্মের সমর্পণ, ভগবত চেতনায় আত্মচেতনাকে নিমজ্জিত করে দেওয়া এ তত্ত্ব হ'ল গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন তত্ত্ব। আপন কৌতুকময়ী অন্তর্যামীকে উদ্দেশ করে কবি বললেন :

'তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
অন্তর মাঝে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে ?

কবি এই অন্তর্যামীর কৌতুক লক্ষ্য করেছেন সারাটি জীবন ভরে। কবি যা কিছু বলতে চেয়েছেন তার মধ্যে যেন কবির অন্তর্যামী দেবতা আপন কথাটুকু বলে দিয়েছেন; কবি তার নিজের কথাটি বলতে পারেন নি; কবির গানের সুরে সবার অলক্ষ্যে তাঁর অন্তর্যামীর সুর এসে লেগেছে। কবি তাঁর অন্তরদেবতার দিব্যসুরে পরিস্নাত হয়ে উঠেছেন। তাঁর বচন, তাঁর মনন, তাঁর কর্মসাধনা এ সবই কবির নিয়ন্ত্রণের বাইরে; তাঁর অন্তর্ধামী জীবন দেবতা কবির সর্ব কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেন। শ্রীমৎ

ভাগবত গীতায় অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন শ্রীভগবান; তাঁর শিক্ষা হ'ল : ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

এই শিক্ষাই উপনিষদের শিক্ষা, ভারতীয় প্রজ্ঞার নিগূঢ় মর্ম কথা। এই সত্য একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের বহুতন্ত্রী বীণায় লক্ষমূর্চ্ছনায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছে তেমনি আবার তা গান্ধীজির একমুখী জীবন সাধনায় তাঁর জীবনতারার একতারাতে বজ্রগম্ভীর স্বরে নিনাদিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির জীবন দর্শন এই মহতী সত্যের আলোকে ভাস্বর হয়ে আছে। গান্ধীজি বলেছিলেন : 'We are not. He alone is. I have intense longing to lose myself in the Eternal and become merely a lump of clay in the Potter's divine hands অর্থাৎ গান্ধীজি একদিকে বাইবেল এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের এতদ্ সম্পর্কীয় সত্যের পুনরাবৃত্তি করলেন মাত্র। 'মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব' রবীন্দ্রনাথ এই ছত্রাংশে যে সত্যের ইঙ্গিত করলেন, সেই সত্যটুকুই গান্ধীজি গ্রহণ করেছিলেন। সেই সত্য উপনিষদের সত্য, সে সত্য New Testament-এর সত্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির জীবনদর্শনে এক সর্বব্যাপী ভগবদ্‌তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি এঁদের উভয়ের চিন্তা ও ভাবনায় ভগবানের সচ্চিদানন্দরূপটুকু অতিমাত্রায় অভিব্যক্ত। জীবনের অস্তিত্বকে সত্যরূপে স্বীকার করা তাকে দুইবাহু মেলে গ্রহণ করার জন্য উভয়েই অতিমাত্রায় আগ্রহী। জীবন সত্যের মধ্যে আনন্দের অমৃত উৎসটিকে সন্ধান করার জন্য উভয়ের আগ্রহের অন্ত ছিল না। গান্ধীজি বললেন সত্য 'সৎ' থেকে জাত। তাই তিনি সত্যাশ্রয়ী। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতই বলেছিলেন, সত্যের জন্যই সবকিছু ত্যাগ করতে পারি, সত্যকে পরিত্যাগ করে তিনি কিছুই চান নি। এই সত্যাশ্রয়ী জীবন-সাধক যে সত্যাগ্রহের মন্ত্র ঘরে ঘরে প্রচার করলেন তা শুনেছি রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট ঠাকুরদার মুখে। গান্ধীজির সত্যাশ্রয়ী আদর্শের প্রতীক হলেন রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্র। সর্বত্যাগী ঠাকুরদা বাউলের আনন্দঘন রসমূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের নাটকে বার বার আবির্ভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা সকলকে ভালবেসেছেন, ভালোবাসা বিলিয়েছেন পথে পথে, আর সেই ভালোবাসার

কর্ষিতক্ষেত্রেই আধুনিক দর্শনের মানবিকতাবাদ অঙ্কুরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই ভালবাসা তত্ত্ব উপনিষদের' ঈশাবাস্য মন্ত্রের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবই ভগবানের চিন্ময় সত্তার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শুধু মানুষ কেন মনুষ্যেতর সকল প্রাণীকে, সকল জীবকে, সর্ববিধ বস্তুকে আত্মজ্ঞানে ভালবাসার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি এঁদের উভয়ের মানবতাবাদ ভাগবত চেতনার আলোয় আলোকিত।

সত্যাশ্রয়ী গান্ধীজি সত্যকে আশ্রয় করেছেন অনন্যশরণে। রমাঁ রলাঁর মত তিনি একাগ্র সাধনায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সত্য সাধনা হ'ল শিল্পীর সত্য সাধনা, গান্ধীজির সত্যসাধনা হ'ল কর্মযোগীর সত্যসাধনা। গান্ধীজি নিরলসভাবে সত্যের অনুসরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যকে সৃষ্টি করেছেন ; কবির সত্য হ'ল শিল্প-সত্য। কবির শিল্পসঙ্গী জীবন তাই সহজে সত্যকে আশ্রয় করেছিল। তাঁর কাছে শিল্প-সত্যই তো জীবনসত্য। তিনি মনীষি ভোজদেবের মত বিষয়টিকে বিচার ক'রে ভোজদেবের চেয়ে আর একটু অগ্রসর হয়ে বললেন যে শিল্পসত্য হ'ল জীবনসত্য অর্থাৎ ঘটনার চেয়ে মহত্তর মূল্যের। ভোজদেব শিল্প ও জীবনের স্বাঙ্গীকরণ ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চোখে শিল্পের মূল্য জীবনের মূল্যকে অতিক্রম ক'রে গেছে। কবির সেই বহু-উচ্চারিত কথা 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'।

রবীন্দ্রনাথের এই সত্যসৃষ্টির তত্ত্বটি এমন একটি মহদাশয় মনন-ধর্মকে আশ্রয় করেছে যেখানে ব্যবহারিক সত্য-মিথ্যার ভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। যাঁর মননে মিথ্যার স্থান নেই তিনিই বলতে পারেন যে আমি যা কিছু সৃষ্টি করি তা সত্য হয়ে ওঠে ; কবিগুরুর শিল্প-সত্যের এই ধারণার মধ্যে যে সুগভীর জীবন প্রত্যয় লুকিয়ে আছে তা গান্ধীজির জীবন দর্শনেও লক্ষ্যণীয়। গান্ধীজি বললেন : 'I often describe my religion as religion of Truth. Of late instead of saying God is truth, I have been saying Truth is God, in order more fully to define my religion. We are sparks of Truth. The sum-total of sparks is indescribable, as yet—unknown Truth, which is God ! (My confession : On life)

সত্যকে ধর্মরূপে গ্রহণ করা এবং ধর্মকে সত্যের আসনে বসানোর প্রয়াসটুকু যে কত দুরূহ তা সহজে বোধগম্য হবার নয়। এ অতীব নিগূঢ় তত্ত্ব। সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করা এবং আপামর জনসাধারণকে সেই ভগবানের প্রতিভূরূপে অবলোকন করা, তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করা, এ হ'ল এক দুশ্চর জীবন তপস্যা। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির মত সর্বভূতে ভগবৎ দর্শন করেছেন তাঁরাই যীশুখ্রীষ্টের বাণী উদ্ধার করে বলতে পারেন যে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মত করে ভালোবাস ; মানুষকে আত্মবৎ ভাবার শক্তি কজনেরই বা আছে ? গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথ এঁরা উভয়েই এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে বুদ্ধ খ্রীষ্ট, মহাবীর এবং মহম্মদের অনুরূপ ভাব-ভাবনাকে আশ্রয় করেছেন। গান্ধীজি বললেন: The bearing of this religion on social life is, or has to be seen, in one's daily social contact. To be true to such religion one has to lose oneself in continuous and continuing service of our life. Realization of truth is impossible without a complete merging of oneself in an identification with this limitless ocean of life. Hence for me there is no escape from social service, there is no happiness on earth beyond or apart from it. Social service must have been taken to include every department of life. In this scheme there is nothing low, nothing high. For all is one though we seem to be many. অতএব দেখা যাচ্ছে যে গান্ধীজির সকল মানুষে সমদর্শন, অচ্ছুৎবাদ, হরিজন উন্নয়ন পরিকল্পনা—এ সবেরই মূলে ছিল, ভাগবত দর্শন। যে মানুষ সকল মানুষে ঈশ্বর দর্শন করে তার চোখে উচ্চ-নীচ ভেদ চলে যায়। আর যাঁর ভাগ্যে সে দর্শন ঘটে নি তাঁর চোখে এই উচ্চ-নীচ ভেদটা পর্বত প্রমাণ হয়ে থাকে। তাই আমাদের চোখে গান্ধীজির সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা 'এহ বাহ্য'। জনকল্যাণ, লোকশিক্ষা ও অন্যান্য যে সব লোকহিতকর কাজে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি উভয়েই আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার উৎস-ভূমি হ'ল সর্বব্যাপী ভাগবত চেতনা।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি এঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রেম এবং অহিংসা মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে অপর্ণা চরিত্রে আমরা এই রক্তস্রোতের ও হিংসা স্রোতের বিরুদ্ধে মানুষের যে আত্যন্তিক বিরাগ আছে তা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্যায়ে বার বার আমাদের বলেছেন যে তিনি আমাদের লোক হয়েই বেঁচে থাকতে চান। 'তোমাদের লোক', এই পরিচয়টুকুই তাঁর পরিচয়। তিনি একটুকুকেই তাঁর শেষ পরিচয় বলতে দ্বিধা করেননি। এই যে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার সাধনা, এই সাধনাই তাঁর জীবন সাধনা। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে যে পরিচিত জনতার সরনীতে তিনি আগন্তুক মাত্র। তার সঙ্গে বৃহৎ মানব সমাজের কোন যোগই নেই। তিনি নিজেকে জনগণের প্রচণ্ড কৌতূক বলে ধিক্‌কৃত করেছেন। এই 'তোমাদের লোক' হতে চেয়ে তিনি বললেন যে তাঁর সৃষ্টি বহু বিচিত্র হলেও তা সর্বত্রগামী হয়ে উঠতে পারে নি। আপনার কাব্য-কলাকে সর্বত্রগামী করে তোলার জন্য কবির মনে নিরন্তর প্রয়াস চলেছিল। সবার সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনা তা একদিকে যেমন বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে সঞ্জীবিত করে তোলে, অন্য দিকে আবার তা সর্বজীবে প্রেম ও দয়াকে উৎসারিত করে। এই অহিংসা অসদর্থক (negative) নয়, এই অহিংসার মন্ত্রই সর্ব মানবে এবং সর্ব জীবে প্রেম ভালবাসাকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। গান্ধীজির মানবপ্রেম সম্প্রসারিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমে। আমরা যুগে যুগে বুদ্ধ, চৈতন্য ও বিশ্বের অন্যান্য প্রধান মানব প্রেমীদের জীবন সাধনায় অনুরূপ প্রেমতত্ত্ব লক্ষ্য করেছি। এই মানব প্রেম যখন সর্বজীবে দয়া রূপ পরিগ্রহ করে তখন তা মহত্তর মর্যাদার দাবী রাখে। কবি শুধু যে মানুষকে ভালোবেসেছেন তা নয়, তাঁর ভালবাসা মনুষ্যেতর প্রাণীতেও ব্যাপ্ত হয়েছিল; গান্ধীজিও কবির মত মনুষ্যেতর প্রাণীরও সেবা করেছেন। হিংসার স্থান তার জীবনদর্শনে ছিল না তাই তিনি নিরামিষ আহার করতেন। আমিষ আহার গ্রহণ করলেই তো হিংসার আশ্রয় নিতে হয়। প্রাণী জগতকে হিংসা করার তো কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন যে ময়ূর তাকে ভয় করে নি, এটি তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় গৌরব এবং সবচেয়ে

বড় জয়। এই যে প্রাণী জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা এ সেই সর্বব্যাপী ভাগবত দর্শনে বিশ্বাসের ফলশ্রুতি।

এই মৌল জীবন-দর্শন থেকে রবীন্দ্রনাথ বড় একটা বিচ্যুত হন নি। ক্ষেত্র বিশেষে গান্ধীজির বিচ্যুতি লক্ষ্যণীয়। গান্ধীজির রাজনৈতিক চেতনার যে সর্বগ্রাসী ব্যবহারিক দিকটি রয়েছে তারই প্রভাবে হয়ত গান্ধীজিকে মাঝে মাঝে এই মৌল বিশ্বাসভূমি থেকে সরে আসতে হয়েছে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জনক হিসেবে গান্ধীজিকে শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে হিংসা ও দ্বেষের কথা বলতে হয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের তিনি ঘৃণা করতেন কিনা সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। তাঁর সব আন্দোলনই ছিল অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী। এই প্রসঙ্গে আমরা চৌরি চৌরার সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি। সত্যাগ্রহী যখন হিংসার পথ নিল তখন গান্ধীজি সমগ্র আন্দোলনটিকে প্রত্যাহার করে নিলেন। অতএব আমরা বলতে পারি যে ব্যবহারিক প্রয়োজনে গান্ধীজিও সময়ে সময়ে আপন গৃহীত তত্ত্বের বিকারকে স্বীকার করে নিলেও তাঁর মৌল জীবন-দর্শনে সে বিকার স্থায়ী হতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা বোধ হয় এই মৌল জীবনদর্শনের ব্যতিক্রমের ছবি একবারও দেখিনি। তাই তিনি সে যুগের যুগধর্মকে গ্রহণ করে পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে কোন বিষোদগার করেন নি। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী কবি অন্যায়ের প্রতিবাদে বার বার মুখর হয়ে উঠেছেন। মিস্ রাথবোনের মিথ্যাভাষণের সমুচিত প্রত্যুত্তর তিনি দিয়েছেন। তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার প্রতিবাদে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেছিলেন। বর্বর শাসকের অপশাসনের প্রতিবাদ করলেও তিনি ইংরেজ জাতিকে কখনও ঘৃণা করতে পারেন নি। সে কথা তিনি আমাদের বলেছেন। তিনি বললেন, শেলী, কীট্সের মতো কবি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন সে জাতির প্রতি তাঁর বিদ্বেষের মনোভাব থাকতে পারে না। কবির এই উক্তি কবির মৌল জীবন দর্শনের সঙ্গে সুসম্পৃক্ত। যাঁরা সর্বজীবকে এবং সর্বমানবকে 'আত্মবৎ' মনে করেছেন সাময়িক প্রয়োজনে কখন কখন সেই তত্ত্বের বিকার ঘটলেও সে বিকারটুকু চিরস্থায়ী হয়নি। জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে

গান্ধীজিকে হয়ত কখন বা আপনার মৌল জীবনদর্শন থেকে কিছুটা সরে আসতে হয়েছে কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি ঘটতে পারে নি। যথার্থ প্রকৃতিপ্রেমী ব'লেই তিনি ঘোরতর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন নি, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি, এঁদের উভয়েরই সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত গভীর ছিল। ছলনা ও অভিনয় করা এঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ। কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রের হস্তে পট্টভি সীতারামাইয়ার যখন পরাজয় ঘটল তখন সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী। সেই পরিবেশে গান্ধীজি অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। এই সত্য ভাষণের ফলে গান্ধীজির বহু বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। তবুও এই সত্যাশ্রয়ী পদাতিক আপন পদযাত্রায় বিমুখ হলেন না। তিনি সত্যকে প্রকাশ করলেন অবিচল নিষ্ঠায়। লোকে তাঁকে ভুল বুঝল, কিন্তু সত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি নিশ্চয়ই গান্ধীজিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এবার কবির কথা বলি। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে শান্তিনিকেতনে যাঁরা এসে উপস্থিত হলেন কবিকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কবির বিরূপ সমালোচক। এঁদের মধ্যে অনেকেই কবির অযথা নিন্দা করেছেন ইতিপূর্বে, বিরূপ সমালোচনাও করেছেন অসূয়ার বশবর্তী হয়ে। পায়রা কবির নিন্দায় যে সব সনাতনী সমালোচক সনাতন সাহিত্য ধর্মের দোহাই দিয়ে কবির প্রতি অযথা কটূক্তি করেছিলেন তাঁরাই সেদিন ছিলেন অভিনন্দন কর্তাদের পুরোভাগে। অনেক চেষ্টা করেও কবি এই মিথ্যাচারকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি তাঁদের দেওয়া অভিনন্দন, প্রত্যাখ্যান করলেন। সত্যকে কোন কিছুর জন্যই যে ত্যাগ করা চলে না এই সত্যটিকে গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে বার বার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গান্ধীজির ভাগবত দর্শনের সঙ্গে তাঁর মানবতাবাদ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; এই সত্য কবির জীবন দর্শনেও লভ্য। গান্ধীজির মতে ভগবান প্রেমময়, অহিংসা তত্ত্বের সদর্থক (positive) দিকটি হ'ল সর্বমানবে প্রেম। মানুষ মাত্রকেই ভালোবাস, এই মন্ত্রের মূলে আছে সর্ব মানবের

সঙ্গে একাত্মতাবোধ। গান্ধীজি বললেন, অহিংসার অর্থ হ'ল পরম করুণা। তাঁর মতে দয়া করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। বাক্যে চিন্তায় এবং কর্মে আমরা যেন কাউকে হিংসা না করি। ভেদজ্ঞান না থাকলে হিংসা আসে না, তাই ভেদ জ্ঞানের উপর উঠতে হবে। আর একবার এই ভেদজ্ঞান রহিত হলে সর্ব জীবে সর্ব মানবে এই সমদর্শনটুকু ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই সমদর্শন রবীন্দ্রদর্শনেরও মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষের সঙ্গে একাত্মতাটুকু অনুভব করেই ক্ষান্ত হন নি, মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গেও তিনি তাঁর অভিন্নতাটুকু উপলব্ধি করে গর্ব বোধ করেছিলেন, তার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। কবির কথা :

ময়ূর করেনি মোরে ভয়
সেই গর্ব সেই মোর জয়।

মহাকবি মিলটনের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের কথা উদ্ধার করেই একথা বলেছিলেন যে মিলটন ইডেন উদ্যানে আদিম মানব দম্পতির সঙ্গে যে সব পশুপক্ষী বাস করত তাদের মধ্যে কোন ঐকান্তিক যোগ ছিল না। মিলটন কোন নিবিড় অধ্যাত্ম সাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেন নি যেমনটি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। অধ্যাত্ম চেতনায় চেতনাবান না হয়ে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মত একাত্মবাদে বিশ্বাস করা বোধহয় শক্ত।

এই একাত্মতা তত্ত্বে বিশ্বাস করার ফলে গান্ধীজির ব্যবহারিক জীবনে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সকলের প্রতি সমদর্শন একান্তভাবে লক্ষণীয়। তিনি জীবে প্রেমে বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী এঁরা উভয়েই বিশ্বসংসারের অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাস করেছেন। জীব জগতে তথা সমগ্র প্রকৃতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখা, এইভাবে বিশ্বসংসারের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করা, এই তত্ত্বের মূল রয়েছে উপনিষদের 'ঈশাবাস্ত' মন্ত্রের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করলেন তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে। তিনি বললেন মানুষ ও বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্গত নানান অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বজুড়ে মানবলোকে হৃদয়াবেগের ঢেউ উঠেছে এবং পড়ছে। এই যে ঢেউখেলা এর মধ্য দিয়েই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে যোগটুকু স্থাপিত হয়। তবে একথা অন-

স্বীকার্য যে সর্বজীবের সঙ্গে এই আত্মিক যোগটুকু অনুভব করা সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। যাঁরা জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই অনন্য সাধারণ ব্যক্তি বলে এই যোগটুকু উপলব্ধি করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ এই যোগটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: বিশ্বের এই মিলনটি সম্পূর্ণ অনুভব করার এবং ভোগ করার ক্ষমতা সকলের সমান নয়, কারণ যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি। এই কল্পনা শক্তিতেই মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে। যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়। যা আমাদের মনের জিনিষ নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে। এই লীলা তো মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ।[১]

এই বিশ্বমানব প্রেম তত্ত্বটির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্প ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। গান্ধীজি যেমন তলস্তয়ের মত সাহিত্য ও শিল্পের সামাজিক মূল্যে বিশ্বাস করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই অর্থে এই ধরনের মূল্যকে স্বীকার করেন নি। তাঁর ধারণায় সাহিত্য হ'ল, 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' মানুষদের মিলন ক্ষেত্র। সাহিত্যের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্য, অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্যে। শাক-সব্‌জির ক্ষেতের সঙ্গে মানুষের যোগ ফসল ফলানোর যোগ। ফুলের বাগানের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ পৃথক জাতের, সব্‌জি ক্ষেতের শেষ উদ্দেশ্য ক্ষেতের বাইরে, সে হচ্ছে ভোজ্য সংগ্রহ। ফুলের বাগানের যে উদ্দেশ্য তাকে এক হিসেবে সাহিত্য বলা চলে। অর্থাৎ মন তার সঙ্গে মিলতে চায়—সেখানে গিয়ে বসি, সেখানে বেড়াই, সেখানের সঙ্গে যোগে মন খুশী হয়।[২]

১। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২। ঐ " "

আনন্দের যোগে সকল মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে কবি আপন সার্থকতাটুকু খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। সেই অন্বীক্ষাটুকু কবি কণ্ঠে অপূর্ব সুষমায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ঃ

'যে আমি রয়েছে তোমার আমায়
সে আমি আমারই আমি।
সে আমি সকল যুগে
সে আমি সকল খানে
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি,
বেজে ওঠে মোর গানে।'

কাব্য কথায় কবি যে মহাসত্যের অবতারণা করবেন তারই অনুরণন শুনি তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। এই এক আমি আছি লক্ষ লক্ষ আমি আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি আছি সেই মহা আমি আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আছিকেও অতিক্রম করে আছেন। সেইজন্যই অগণ্য আমি আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছে, সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আমাকে এবং আমার মধ্যে যে লোক সর্বলোককে জানে সে লোক গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সে জানে না, যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে অন্যকে সে আপন বলে জানে না।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্ধৃতিতে আমরা যে তত্ত্বের সন্ধান পাই তা হ'ল, 'সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে' মন্ত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আমরা রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজির জীবনে লক্ষ্য করেছি। এক অর্বাচীন কিশোর কবি যাকে নিয়ে বিদ্বদ্জনের ঠাট্টা তামাসার অন্ত ছিল না এবং এক অখ্যাত আইনজীবী যাকে নিয়ে আলাপ আলোচনার কোন অবকাশই ছিল না, তাঁরা কেমন করে কর্ম মাহাত্ম্যের কোন বন্ধুর পথে বিশ্বমানবের মর্যাদা পেলেন তা নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য।

১। 'সাধনা' গ্রন্থের 'আমার জগৎ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যদি আমরা এই সত্যটিকে যথাযথ অনুধাবন করি তাহলে বুঝতে পারব, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি উভয়েই সর্বভূতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেই বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন। এই যোগ সাধনের ফলেই একজনের লেখনী মুখে অমর কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, অন্য জনের কর্মযোগে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতির রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব হয়েছে।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ-দর্শন দর্শন-শাস্ত্রীদের অনুধাবনযোগ্য। আমরা দেখেছি গান্ধীজি মাঝে মাঝে অনশন করতেন আত্মশুদ্ধির জন্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়া কোন কারণে দূষিত হলে গান্ধীজি আত্মগ্লানি অনুভব করতেন, এই আত্মগ্লানি দূরীকরণের জন্য তিনি অনশনের পথ গ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি দিল্লীতে যে একুশ দিনব্যাপী অনশন করেছিলেন তা স্মরণীয়। জারবেদা জেলে থাকাকালে হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দু এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার সরকারী প্রয়াসের প্রতিবাদে তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, রাজন্যবর্গের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর রাজকোট অনশনের কথা আমরা জানি; অপরের অন্যায়ের নিরাকরণ করার জন্য গান্ধীজি যে অনশনের দ্বারা আত্মনিপীড়ন করতেন তার মূলে রয়েছে গান্ধীজির সর্বমানুষের ক্ষেত্রে এই একাত্ম বোধটুকু। এই একাত্মতার ধারণা থেকেই গান্ধীজির সমগ্র জীবন দর্শনও সমাজ দর্শন উদ্ভূত হয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ালেন, অহিংস আন্দোলন শুরু করলেন এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য, তখন তাঁর মুখে কথা শুনেছি তাঁর মূলে ছিল সর্বমানবের সঙ্গে এই একাত্মতা-বোধের তত্ত্বটুকু। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই:

'I suggest that we are thieves in a way. If I have anything that I do not need for my own immediate use and keep it, I thieve it from somebody else. It is a fundamental law of nature without exception that nature produce enough for our wants from day to day; and if only everybody took enough for itself and nothing more, there would be no pauperism in the world, there would

be no men dying of stravation': জগত সংসার থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে, অনাহারে মৃত্যু নিবারণে যে সহজ পথটি গান্ধীজি আবিষ্কার করেছিলেন সে পথটি হ'ল নীতিবোধের পথ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়কে তিনি চৌর্যবৃত্তি বলেছেন। অপরকে বঞ্চিত করে ভবিষ্যতের অভাবের তাড়নার আশঙ্কায় মানুষ যে সঞ্চয় করে তা নৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান হীনতার পরিচয় দেয়। গান্ধীজি এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিটাকেও আমাদের অপরকে আত্মার আত্মীয়রূপে গ্রহণ না করার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখেছেন। যদি আমরা বুভুক্ষু নিরন্ন মানুষদের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতাম তবে নিশ্চয় তাদের অনাহারে রেখে আমরা ভবিষ্যৎ অভাবের আশঙ্কায় সঞ্চয় করতাম না। আমাদের এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিটাও, গান্ধীজির মতে আমাদের সত্য থেকে বিচ্যুতির অন্যতম লক্ষণ। যিনি সত্যাগ্রহী তিনি সঞ্চয় করেন না। গান্ধীজি বললেন: 'A seeker after truth, a follower of the Law of love, cannot hold anything for tomorrow. God never stores for tomorrow. If we repose faith in his providence we rest ensured that he will give us everyday our daily bread.'

শ্রীমদভাগবদ্ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজি উপরোক্ত মন্তব্য করলেন। গান্ধীজির মতে যিনি মানব প্রেমিক তিনি কখনই সম্পত্তির সঞ্চয় সম্বন্ধে আগ্রহী হবেন না। কেন না সঞ্চয় করা মানেই অপরকে বঞ্চনা করা। সঞ্চয় স্পৃহা ও চৌর্য স্পৃহায় গান্ধীজির চোখে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তাই বোধ হয় পরমকারুণিক ভগবান বুদ্ধ সর্বত্যাগী হয়েছিলেন; গান্ধীজিও তাই বোধহয় ত্যাগের মন্ত্রটি বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন! ত্যাগের মধ্য দিয়েই সর্বস্ব ত্যাগের পথেই মানুষ তার জীবনে পরমার্থটুকু লাভ করে, এই মহাসত্যটুকু রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন। অজস্র লেখায় কবিতায় গানে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটুকু প্রকাশ করলেন:

'আমার যে সব দিতে হবে
সে তো আমি জানি
আমার যত বিত্ত প্রভু
আমার যত বাণী

আমার চোখে চেয়ে দেখা
আমার কানে শোনা
আমার হাতের নিপুণ সেবা,
আমার আনাগোনা।'

জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির দান অপরিমেয়। শিক্ষার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই দুটি মানুষের জীবন দর্শন নিরন্তর কাজ করেছে ; কর্মাশ্রয়ী শিক্ষার নীতিতে এঁরা দুজনেই বিশ্বাস করেছেন। এঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মনের আনন্দ ও আত্মার মুক্তি। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই আনন্দে অবগাহন স্নান করুক, এই মুক্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এই আশাই পোষণ করেছিলেন বর্তমান যুগের ঐ দুই যুগন্ধর মহাপুরুষ। যেখানেই স্বাধীনতাকে খর্ব এবং খণ্ডিত হতে দেখেছেন সেখানেই গান্ধীজি এগিয়ে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও পিছিয়ে থাকেন নি। নারীর খর্বিত স্বাধীনতা কবিকে পীড়া দিয়েছিল। তিনি বিধাতাকে প্রশ্ন করেছিলেন :

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা ?'

'স্বে মহিম্নি'—স্ব মহিমায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি উভয়েই। সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, এটি চেয়েছিলেন গান্ধীজি। এই সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সত্যাশ্রয়কে পরম মূল্য দিয়েছেন। স্বামীজি কথিত অভীমন্ত্র, উপনিষদ কথিত মাভৈ মন্ত্র, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয় দর্শনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ; তাইত গান্ধীজির সত্যাগ্রহী অহিংস। সত্যাগ্রহী যিনি তিনি কাউকে ভয় করেন না, আর ভয় না করলে হিংসা করারও কোন অবকাশ থাকে না। হিংসার উৎপত্তি হয় ভয় থেকে। কবি যে স্বপ্ন দেখলেন সেই স্বর্গের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন :

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত—"

কবি এই অভয় স্বর্গের আদর্শে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে উদ্বোধিত

করে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই যে স্বর্গের কল্পনা করলেন এ স্বর্গ হ'ল সেই স্বর্গ,

"—যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছুসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
হেথা শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতোপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

এই স্বর্গের কল্পনা করলেন গান্ধীজিও। কল্পনা নেত্রে দেখা স্বর্গে দরিদ্রতম ভারতবাসীও এটুকু অনুভব করবে যে এদেশ তারই, উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। বিভিন্ন ধর্মের এবং মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এবং শান্তি বজায় থাকবে, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হবে, মদ্যপান সবাই বর্জন করবে, নারী-পুরুষে সমান অধিকার থাকবে সেই নতুন ভারতবর্ষে, গান্ধীজি সেই ভারতবর্ষকে কল্পনা নেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন: 'An India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class or low class of people, an india in which all communities shall live in harmony. ...... There can be no room in such India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men. This is the India of my dream.'

কর্মযোগী মহাত্মা গান্ধী এবং ক্রান্তদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ, এঁরা উভয়েই কবি এবং মনীষী। এঁদের উভয়ের চিন্তা কল্পনা এবং কর্মধারাকে আশ্রয় ক'রে যে জীবনদর্শনের আমরা সন্ধান পাই তা হ'ল উপনিষদের জীবনদর্শন; 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন। সে মন্ত্র হ'ল ত্যাগের মন্ত্র। সেই ত্যাগই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে জাত, সেই ত্যাগের ধারণাই রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজিকে একধরনের নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য দিয়েছে। তাইতো লেখক হিসেবে এঁরা উভয়েই সার্থক হয়েছেন।

সপ্তম স্তবক : আধুনিক মার্কিন দর্শন

এরিক হফার : মানুষের প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতত্ব

আরুইন এড্ম্যান : (ক) জগত কথা ও কবি

(খ) বিষয়বস্তু, দৃষ্টি ও দৃশ্যশিল্প

এরিক হফার: মানুষের প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতত্ব

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম যুগে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অন্তরালে কতিপয় সরল বৈজ্ঞানিক সূত্রের আবিষ্কার করেছিলেন; এতে তাঁদের বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা ছিল না। গ্যালিলিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে প্রকৃতি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এমন সব পন্থায় যা একান্তভাবেই সরল, সহজ এবং সাধারণ, এটাই হ'ল প্রকৃতির রীতি এবং গতি। কেপলার এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে প্রকৃতি সরলতায় আস্থাবান এবং নিউটন খুব আবেগের সঙ্গে লিখেছেন যে, "প্রকৃতি সরল ক্রিয়াকর্মে আনন্দ পায় এবং খুব জমকালো ক্রিয়াকর্মের অনুকরণে তার প্রবৃত্তি নেই।"

ঐ একই সময়ে যারা মানবপ্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন তাঁরা কিন্তু এর সরলতায় কথা বললেন না, বললেন এর অবিশ্বাস্য জটিলতার কথা। মানব প্রকৃতির অনিশ্চয়তা, অসমতা, অসংগতি ও ভবিতব্যতার অভাবের কথা মনটেন বারবার বললেন। তাঁর মতে আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশই প্রতি মুহূর্তে তাদের আপন আপন খেলা খেলছে, "আমাদের নিজেদের অন্তরের আভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ অপরের সঙ্গে আমাদের যে প্রভেদ রয়েছে তার থেকে কিছু অংশে কম নয়।" বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি এতদুভয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্যাসকেল বস্তুর সরলতার সঙ্গে মনুষ্য প্রকৃতির জটিলতার তুলনা করেছেন; তিনি মানুষের মধ্যে বহু পরস্পর-বিরোধিতার সমাবেশ দেখেছেন, দেবদূত এবং পশু, দানব এবং প্রতিভা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং আবর্জনা, বিশ্বের গৌরব এবং কুৎসা, এসবের সমন্বয়ে হ'ল মানুষ। আমাদের মধ্যে যেটুকু সমন্বয় রয়েছে তা উদ্ভট, তা পরিবর্তনশীল এবং তা বহুবিধ। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ এতখানি উন্মত্ত যে উন্মত্ত না হওয়াটাও একধরনের উন্মত্ততা। তাই যখন প্লেতো এবং অ্যারিস্তত্‌ল রাজনীতি বিষয়ে লিখতে গিয়ে এমনভাবে লিখলেন যে মনে হ'ল

তাঁরা পাগলাগারদের পাগলদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করছেন তখন তাঁর মতে তাঁরা ঠিক কথাই বলেছেন।

প্রকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করার সময় আমাদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেই তত্ত্ব প্রকৃতির ঘটনাগুলির সঙ্গে সুসমঞ্জস হয় এবং তা যেন সরল ও ঋজু হয়। যেক্ষেত্রে নানান ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় যে ব্যাখ্যা যতই সরল হয় ততই সঠিক হয়। বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ে একজন আধুনিক লেখক বলেছেন যে জটিল ব্যাখ্যা করার অর্থ হ'ল আমার বাড়ীর পশ্চিমে যে নিকট প্রতিবেশীটি থাকে তার বাড়ী পৌঁছুবার জন্য যদি আমি পুব দিক থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী ঘুরে সেই প্রতিবেশীটির বাড়ী যাই তাহলে যেমনটি হয় এই জটিল ব্যাখ্যা তার অনুরূপ হবে। মনুষ্য জগতে সরল ও ঋজু পদ্ধতির উপযোগিতা মোটেই স্বতঃসিদ্ধ নয়। অতি সহজতম লক্ষে পৌঁছুবার জন্য আমরা প্রায়ই খুব ভুলপথে এবং ঘুরপথে চলি। অভাবিত পথে সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ ঘটে। মানুষ যে উদ্ভট প্রাণী এটা ভুললে মানুষের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ভোলা হবে। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করি তখন তার সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা এবং অনুমানই করি না কেন তা অযৌক্তিক এবং অবৈধ হয় না।

(২)

মানুষের নির্মাণকার্য যে সম্পূর্ণ হয় না এটাই মানুষের সবচেয়ে অদ্ভুত গুণ; বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়াদি নেই বলে মানুষ হ'ল এক অর্থে অর্ধপ্রাণী। কারিগরি বিদ্যার সহায়তায় সে আপনার ত্রুটিগুলি পূর্ণ করে এবং এই অর্থে সে স্রষ্টা, অর্ধ-ঈশ্বর। একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়াদি মানুষের না থাকার ফলে মানুষ তার পরিবেশকে এবং পৃথিবীকে তার নিজের মতো করে পুনরায় সৃষ্টি করে নেয়। নিজেকে সম্পূর্ণ করার অন্তহীন প্রচেষ্টায়, আপনার দৈহিক অক্ষমতা পূরণের প্রয়াসের মধ্যে মানুষ আপনার সৃজনীশক্তির উৎসটুকু আবিষ্কার করে; এরা তার অপ্রাকৃত হবারও মুলে। নিজেকে

সম্পূর্ণ করার এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির ধরাবাঁধা পথে যাওয়া এবং প্রকৃতির বশ্যতা পরিহার করে।

মনুষ্য-স্বভাবের অপ্রাকৃত চরিত্রটুকু হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের অগ্রগতির ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে মনে হয়। প্রকৃতির লৌহবিধির আওতার বাইরে চলে আসবার প্রয়াসের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই প্রয়াসটুকু সজ্ঞান চেষ্টা নয়, আপনার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে এর সূত্রপাত হয় নি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মূলে আছে একটা অসহায় ভাব; এই অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলেই মানুষের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই মানুষরূপী অর্ধপ্রাণীটি ক্রমেই নিজের অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠল। জীবনের বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্টতর প্রকাশ-রূপকে সে পূজা করল, তাদের বিশেষ ধরনের ইন্দ্রিয়াদিকে পূজা করল, তাদের কুশলতা এবং সামর্থকে পূজো করল। সম্ভবতঃ যে প্রথমে পশু হনন করেছিল, যে তাদের মাংস খেয়েছিল এবং তাদের চর্ম পরিধান করেছিল, সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা এবং নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্য যে প্রথমে এই কাজ করেছিল তা নয়; বোধ হয় তাদের শক্তি, গতি, সামর্থ আহরণ করে নিয়ে তাদের মত হয়ে ওঠবার জন্যেই এটা করেছিল। নগ্ন, নিরস্ত্র এবং অরক্ষিত মানুষ উদাসীন জননী বসুন্ধরাকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধরিত্রীর অনুগ্রহপুষ্ট অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চেয়েছিল; কিন্তু যখন সে আবিষ্কার করল যে প্রকৃতির অনুগৃহীত এই সব সন্তানদের মতো তার ইন্দ্রিয়াদি এবং সহজাত শক্তি অতটা উঁচু ধরনের না হলেও এদের প্রতিকল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা তার আছে তখন মানুষ প্রকৃতির পূজো করা ছেড়ে প্রকৃতিকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার নেশায়, জয় করবার নেশায় মেতে উঠল। মানুষ আপনাকে পূর্ণ করে তুলে নিজের পরিবেশটিকেও ধীরে ধীরে গড়ে তোলে এবং মানুষের সৃষ্ট এই জগৎ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। জীবনের অন্যান্য রূপের অভিব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি না করে মানুষ আপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র এবং বংশ-পরম্পরা দাবি করল এবং সৃষ্টির অংশ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখে নিজেকে পৃথক বলে ভাবতে শিখিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চেষ্টার স্বকীয়তা অথবা তার কৃতির গৌরব পরিমাপ করতে হলে আমাদের দেখতে হবে যে মানবিক জগতের কাজকর্মের সঙ্গে অমানবিক জগতের প্রভেদটুকু এর দ্বারা কতটুকু উজ্জীবিত হচ্ছে। এটা অতি পরিষ্কার কথা যে স্বাধীনতার জন্য অভীপ্সা মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া কর্মের মধ্যে প্রধানতম। বলপ্রয়োগ থেকে মুক্তি, মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি এসবই হ'ল সেই সব পারিপার্শ্বিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি যারা বৃহত্তর প্রকৃতি থেকে মনুষ্য প্রকৃতির ব্যবধানটুকু কমিয়ে দেয় এবং মানুষের উপরে জড় প্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তা ও পূর্বনির্দিষ্ট কর্ম প্রবণতাটুকু চাপিয়ে দেয়। এই একই নিরিখের বিচারে একথা বলা যায় যে মানুষের অদ্বিতীয়তার পরিপন্থী হল মানুষের সার্বভৌম শক্তি। এই ধরনের সার্বভৌমশক্তির অন্তরে যে দুর্নীতির প্রবণতা রয়েছে তার মুলে হ'ল এই সত্যটুকু যে শক্তি মানুষকে বস্তুতে পরিণত করে এবং মানুষ যে প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত সেই প্রকৃতির মধ্যেই আবার তাকে টেনে নিয়ে যায়। কেন না শক্তির ধর্মই হ'ল যে যা পরিবর্তনশীল তাকে অপরিবর্তনীয় করে তোলা এবং আপন আপন আদেশকে প্রকৃতির আদেশের অমনীয়তা এবং অপরিবর্তনশীলতাটুকু দান করা। অতএব মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও সার্বভৌম শক্তির ক্রমেই অবনতি ঘটে। যে সব উদারনৈতিক স্বৈরাচারী শাসকেরা নিজেদের মেষপালকের মতো মনে করেন তাঁরাই অপরের কাছ থেকে মেষেদের যোগ্য বাধ্যতাটুকু দাবি করেন। সার্বভৌম শক্তির অন্তরে খুব যে অমানুষিকতা আছে তা নয় তবে মনুষ্য-বিরোধিতাটুকু তার মধ্যে রয়ে গেছে।

(৩)

মনুষ্য জগৎকে সুসংগত, সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্ধারিত সামগ্রিক সত্তারূপে গ্রহণ করতে হলে মানুষের নিজস্ব স্বভাবটুকুকে হয় উপেক্ষা করতে হবে নয় তাকে সমানভাবে দমন করতে হবে এবং মনুষ্য প্রকৃতিকে বৃহত্তর প্রকৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাত্ত্বিকেরা অমানবিক শক্তির হাতে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতাটুকু তুলে দিয়ে এটুকু

সম্পন্ন করে : এরা হ'ল বিশ্ববিধাতা, ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু, অর্থনীতিক অথবা নৈসর্গিক রাসায়নিক শক্তিসমূহ। শক্তিমান কাজের মানুষেরা লৌহশৃঙ্খলা এবং অন্ধবিশ্বাসের প্রবর্তন ক'রে মানুষের স্বাধীনতাটুকু হরণ করতে চেয়েছে ; যে ব্যক্তি-মানুষ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে কোন কিছু বলা যেত না তার সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রটুকু লুপ্ত করে দিয়ে, তার বিচার এবং স্বাধীন ইচ্ছাকে বলপ্রয়োগ এবং অশ্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়ে তারা ব্যক্তিসত্তার বিনাশ ঘটাল। মানুষের স্বকীয়তাটুকু নষ্ট করে দিয়ে ইতিহাসের জনকেরা নির্ভুলভাবে ভবিষ্যতটুকু বলে দিতে পারতেন এবং ইতিহাসবেত্তারা অতীত সম্বন্ধে একটি বাঁধাধরা ছক দিতে পারতেন। নির্ধারণবাদীদের মধ্যে এক ধরণের দুষ্টবুদ্ধি রয়ে গেছে ; তারা সবাই মনে করে যে মানুষ বড়ই উপদ্রব করে এবং সেই একই সঙ্গে তারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে মনুষ্য প্রকৃতির মত উৎকৃষ্ট বস্তু আর নেই।

যে সমাজে স্বাধীনতার অপ্রতুলতা নেই সেখানেও মানুষকে অতি সংক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে ; ক্ষমতাসীন মানুষদের কাজকর্ম বিচারের সময় আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে তারা সজ্ঞানে অথবা অচেতনভাবে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করে দেবার জন্য চেষ্টা করছে তা সে মানুষ ভোটদাতাই হোক, শ্রমিকই হোক মালিকই হোক অথবা চিন্তাজীবীই হোক। তারা যে উপায়ই প্রয়োগ করুন না কেন তাঁদের উদ্দেশ্য হোল মানুষকে ক্রিয়াশীল একটি যন্ত্রে পরিণত করা ; অ্যারিস্ততলের সংজ্ঞায় এদের ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

অন্যপক্ষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পুষ্ট করে তোলার জন্য সব পন্থাই সার্বভৌম শক্তির পরিপন্থী। লক্ষণ দেখে যা বোঝা যাচ্ছে তা হল যে এই বিনষ্টি ব্যক্তিমানুষের শক্তি বৃদ্ধি ক'রে অথবা শক্তিমানদের বিরুদ্ধে তাকে উস্কে দিয়ে এটি করা যাবে না ; কিন্তু শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ করে একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে খাড়া করে দিয়ে এটি সম্ভব করা যাবে। যে ক্ষেত্রে শক্তি সার্বভৌমরূপ পরিগ্রহ করেছে সেক্ষেত্রে পরাজিত ব্যক্তিমানুষ কোন আশ্রয়ই পায় না তা সে যতই কৌশলী এবং শক্তিমান হোক না কেন।

এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রচলিত সব রকমের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে মুক্ত সমাজই হোল সবচেয়ে অস্বাভাবিক। বের্গসঁ-এর ভাষায় এই ধরণের সমাজে আমরা যে ধরণের প্রচেষ্টা দেখি তা হল প্রকৃতির ধর্মের পরিপন্থী। কারিগরী বিদ্যার আধুনিকীকরণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চললেও সার্বিকতাবাদ মানুষকে আদিম প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। রুশোর দিন থেকে আরম্ভ ক'রে আমরা যে "প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও" আন্দোলনটি প্রত্যক্ষ করেছি তা অসংশয়িত ভাবে স্বৈরতন্ত্র এবং পশুশক্তির পূজায় পর্যবসিত হয়েছে; এই ধরণের আন্দোলনকে অনেকে উদারনৈতিক এবং মহান বলে মনে করেছেন। মানুষের চরিত্রের জটিলতা এবং অনিশ্চিত পরিণতির কথা ভেবে মনে হয় যে মনুষ্য চরিত্রের সম্যক জ্ঞানলাভ করলেও বোধ হয়, তাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সমাজযন্ত্র বোধ হয় ভালো-ভাবেই চলবে যদি আমরা একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন করি (একনায়কতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করে না) অথবা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে যখন সরকার ব্যক্তির কাজে কোন ভাবে হস্তক্ষেপ করে না; সার্বভৌম একনায়কতন্ত্র অথবা নামমাত্র সরকার, এরা উভয়েই মানুষের স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে।

আমরা জড় বস্তুর উপরেই হোক আর মানুষের উপরই হোক যে শক্তির প্রয়োগ করি তাকে সহজেই সরলীকৃত করে ফেলা যায়। এই শক্তি চায় সহজ সমস্যা, সহজ সমাধান ও সহজ সংজ্ঞা। জটিলতার মধ্যেই দুর্বলতা বাস করে; আপসের পথ হল জটিল।

জড় বস্তুর জগতে যেমন বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ বিদ্যাবিদেরা সরলী-করণের উপরে ঝোঁক দিয়েছেন তেমনি মনুষ্যসমাজের ব্যাপারে যারা এই সরলীকরণটুকু এনেছেন তাঁরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করেছেন। এরিক হফার, হিটলার ও স্তালিনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যে অর্থে পদার্থতত্ত্ববিদ ও রসায়নশাস্ত্রবিদ হলেন জড় পদার্থের বিজ্ঞানী, কতকটা সেই অর্থে হিটলার ও স্তালিন হলেন মনুষ্যপ্রকৃতির বিজ্ঞানী। হফারের মতে তাঁদের ভ্রষ্ট নীতি এবং দুষ্কর্মের পিছনে বিজ্ঞানীর সরলীকরণ প্রবণতাটুকু যেমন ছিল তেমনি ছিল নিজের দলীয় তত্ত্ব ও

নিছক দুষ্কার্যপ্রিয়তা। তাঁদের বিরুদ্ধ মতবাদীদের সম্বন্ধে মারাত্মক অসহিষ্ণুতার ভিতরেও একটা বৈজ্ঞানিক চেতনার সন্ধান পাই; যে সার্বভৌমশক্তির বিরুদ্ধতা করে সে হল প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যতিক্রমের অনুরূপ; উভয়কেই বিচার বিশ্লেষণ করে কোন রকমে তাদের লোপ পাইয়ে দিতে হবে।

এটা একটা নিছক গোঁজামিলের ব্যাপার নয়। যখন আমরা দেখি যে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশক্তিমান কর্তারা পাভ্‌লফের* কুকুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে খুব আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন তখন বুঝি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামাজিক তাৎপর্য অনেক; জার্মানীর এবং কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে যে সব বন্দী শিবির খোলা হয়েছিল সেগুলো মানুষকে অমানুষ করে তোলার কারখানাবিশেষ, সেখানে মানুষদের জন্তু হিসাবে গণ্য করা হত; যেভাবে বিজ্ঞানীরা ইঁদুর এবং কুকুর নিয়ে গবেষণা করে এরা সেখানে মানুষ নিয়ে সেইভাবে গবেষণা করতেন। সার্বভৌমশক্তি কোন সমাজের প্রতিষ্ঠা করে না, তা পশুশালার পত্তন করে; হয়তো D' Argeonson-এর ভাষায় একে "সুখী মানুষের পশুশালাও" বলা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আমরা যে চরম দুঃসাহসিক কাজটুকু প্রত্যক্ষ করেছি তা হোল মানুষকে খুব ছোট করে ভাবার দুঃসাহসিকতা। এ একটা অত্যন্ত ভয়াবহ্‌ অবস্থার সূচনা করেছিল। এ অবস্থা ছিল অভাবিতপূর্ব এবং তাঁরাও অতর্কিতভাবে পৃথিবীটাকে আক্রমণ করেছিল এবং অভিভূতও করে ফেলেছিল। শক্তির আস্বাদন তখনই পূর্ণ হয় যখন আমরা প্রকৃতিকে আয়ত্ত না ক'রে মানুষকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করি। অবশ্য যে মানুষ পাহাড় পর্বত সরিয়ে দিতে পারে এবং নদীর গতিপথ-নিয়ন্ত্রিত করতে পারে সে মানুষের শক্তিমত্তাবোধ আর যে মানুষ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদের প্রাণবন্ত যন্ত্রে পরিণত করতে পারে তার মদমত্ততার বোধ একই রকম কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অতএব এটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রকৃতির উপর মানুষের চমকপ্রদ আধিপত্যের পরেই বোধ

* পাভ্‌লফ (১৮৪৯—১৯৩৬)—রুশ শারীর বৃত্তবিৎ ও চিকিৎসক।

হয় মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা চেষ্টা হয়েছিল। প্রকৃতিকে জয় করে যে শক্তি অর্জিত হয়েছিল সেই শক্তি মানুষকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধবার কাজে ব্যবহৃত হল। নিওলিথিক যুগের শেষ থেকে প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতার সমষ্টিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে এই প্রভেদটি প্রথম চোখে পড়ে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে নিকটপ্রাচ্যে নিওলিথিক যুগের শেষে একধরণের শিল্পবিপ্লব লক্ষ্য করা গিয়েছিল; তার পরবর্তীযুগে যে সভ্যতার যুগ প্রবর্তিত হল তা যাদুবিদ্যা এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিমানুষকে বশ করতে চাইল।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং শিল্পবিপ্লব প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে পরবর্তী বৃহৎ পদক্ষেপ; প্রকৃতিকে বশ করে মানুষ যে প্রভূত শক্তি অর্জন করল তার অনুগামীরূপে দেখা দিল মানুষ বশ করার উন্মাদ প্রয়াস; তারা চাইল মানুষকে প্রকৃতির জড় বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে দিতে। যেক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বশ করার দুরূহ প্রচেষ্টায় আমরা প্রকৃতিকে ক্রীতদাস করে ফেলতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে পরিপূর্ণ বশীকরণের এটা হল একটা ছল মাত্র। সুতরাং যদিও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় বিংশ শতাব্দীতে আমাদের বহু চমকপ্রদ কীর্তিস্তম্ভ রচিত হয়েছে তবুও যখন আমরা পিছু ফিরে তাকাব তখন মনে হবে যে বিংশ শতাব্দী হল মানুষকে বশ করার, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের যুগ। জাতীয়তা, সমাজতন্ত্রবাদ, কমিউনিজম, ফ্যাসিবাদ, জঙ্গীবাদ, সমিতি গঠন, প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সব মতবাদ ও প্রচেষ্টার একই উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্যটুকু হল নানাভাবে তদ্বির তদারক করে মানুষের স্ববশচিন্তাটুকু হরণ করা। এক্ষেত্রেও আবহাওয়া বলপ্রয়োগ এবং যাদুশক্তির প্রয়োগে ভারাক্রান্ত।

৫

প্রাচীন ইহুদিদের এটা একটা খুব বড় কৃতিত্বের কথা যে তাঁরাই প্রথমে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনেছিলেন। সব প্রাচীন সভ্যতার মধ্যেই এইরকম একটা ধারণা দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক

ঘটনার সঙ্গে মানুষের জীবন একই সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের গোটা বনিয়াদ মনুষ্য প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির একাত্মতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহুদিরাই প্রথম মনুষ্য জগৎ ও মনুষ্যেতর জগতের মধ্যে কোন আত্মিক যোগকে অস্বীকার করলেন। তাঁদের সময় থেকে সূর্য, তারকা, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে এমন কোন রহস্যময় শক্তিই আরোপ করা হল না যে শক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। সব কিছুই একই ভগবানের সৃষ্টি; তিনি প্রকৃতি এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন আপনার প্রতিরূপ ক'রে। মানুষ হয়েছিল দ্বিতীয় স্রষ্টা। ইহুদিদের কাল থেকে বিশ্বজগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ বেশী প্রাধান্য পেল, কেন না সেখানেই পৃথিবীর অর্থপূর্ণ নাটকটি অভিনীত হচ্ছে।

প্রথমে এই প্রাচীন ইহুদিরা প্রমাণ করলেন যে মানুষদের পক্ষে যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বটি গ্রাহ্য নয়। যদিও প্রাণীজগতের সর্বত্র এই যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বটি স্বীকৃত তবুও তা মনুষ্য সমাজে গ্রাহ্য নয়। তাঁরা এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বললেন যা দুর্বলতাকে সর্বপ্রকার শক্তি সম্ভাবনায় রূপান্তরিত ক'রে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। একধরণের গোঁড়ামি, দূরাশ্রিত আশা এবং সীমাহীন ভক্তি এগুলিকে তাঁরা বেছে বেছেই আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলির দৌলতে দুর্বল শুধুমাত্র যে বেঁচে থাকে তা নয়, সবলকে তাঁরা সময়ে সময়ে হতবুদ্ধিও করে দেয়।

সর্বোপরি মনুষ্যপ্রকৃতির অপ্রাকৃতত্ব দুর্বল মানুষের মধ্যে যে পরিমাণে লক্ষ্যণীয় ঠিক সেই পরিমাণে সবলের মধ্যে লক্ষ্যণীয় নয়। শক্তিমান মানুষেরা সাধারণতঃ সহজ, সরল, ঋজু এবং বোধগম্য হয়; এককথায় তারা প্রকৃতি-অনুসারী; এমন কথা বলার পক্ষে যুক্তি রয়েছে যে দুর্বল মানুষেরাই সর্বপ্রথমে প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। সবল মানুষদের দ্বারা বন থেকে বিতাড়িত হয়ে তারাই প্রথমে সোজা হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করেছিল; তাদের ক্ষুব্ধ আবেগ প্রথম বাক্যে রূপ নিতে চেষ্টা করেছিল; তারাই প্রথম লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছিল তা যন্ত্র এবং অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। তাদের যে শক্তি নেই সেই শক্তির বিকল্পের আবিষ্কার করার জন্য

এই দুর্বল মানুষদের প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ঘটল; এর দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে যে প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্বর্তনে এদের ভূমিকা ছিল প্রধান।

মানুষকে আমরা তার মানবিকরূপে প্রত্যক্ষ করি যখন সে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে না। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রয়েছে সেই বাধার সম্মুখীন হলে যে আবেগ সঞ্জাত হয় তার ফলেই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হয়; সোজা সহজ পথে পা ফেলে এগিয়ে গেলে মানুষের কোন সাফল্য অর্জিত হবে না। মানুষের অগ্নিগর্ভবাণী এবং বিস্ফোরক বিকল্পগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতেই উদ্ভূত হয় এবং তার অন্তহীন যাত্রা, তার আত্মার গগনচুম্বী প্রসার তাও সম্ভব হয়।

এই গ্রহে মানুষের অবস্থা ছিল, (জাতিচ্যুত ও বহিরঙ্গ হওয়ার ফলে) ডাঙ্গায় তোলা কই মাছের মতো। তার অবস্থা তাকে নতুন নতুন পথে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রেরণা দিয়েছিল, তাই এটা মোটেই অসঙ্গত নয় যে অজানার সঙ্গে লড়াইয়ের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই অনুপযুক্ত বহিরঙ্গ মানুষের দল। অসম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে মানুষের মধ্যে পেছিয়ে না গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা প্রবণতা দেখা যায়। অধিকন্তু মনুষ্যচরিত্রের স্বকীয়তার সঙ্গে সংগতি রেখে এই অযোগ্য মানুষেরাই তাদের পারিপার্শ্বিকে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আপনাদের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলে। অতএব সংস্কার, আবিষ্কার, মেরামত করা এবং ঝাঁপিয়ে পড়া এসবের জন্যেই একটা প্রবণতা তাদের আছে। তাই নতুন নতুন মহাদেশে অভিযাত্রীদলের পুরোভাগে এই তথাকথিত অযোগ্য লোকেদের আমরা দেখেছি। তারাই অর্থনৈতিক রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন পথ এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

এটা মনুষ্যসমাজের পক্ষে খুব গর্বের কথা যে তাদের মধ্যে যারা পরিত্যক্ত তারা পথিপার্শ্বে পড়ে থাকে না; নতুন সমাজ-ব্যবস্থার তারাই হল ভিত্তিপ্রস্তর; যারা বর্তমানের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারল না তারা ভবিষ্যৎ দেশ রচনায় অংশীদার হয়ে ওঠে। ডি এইচ্ লরেন্স-এর মতো পণ্ডিতেরা যাঁরা মনে করেন যে এই দুর্বল মানুষদের সংস্পর্শে সভ্যতার অবনতি ঘটে তাঁরা ঠিক সত্যটি ধরতে পারেন নি। সমাজের এই দুর্বল

অংশের ভূমিকাই মনুষ্যসমাজকে তার বৈশিষ্ট্যটুকু দিয়েছে। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে এই দুর্বল মানুষদের আধিপত্য নৈসর্গিক পন্থার বিকল্পপন্থা সূচিত করেছে। মানুষের স্বাভাবিক এবং সহজাত প্রবৃত্তির কোন বিকার এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে না; এদের আনুকূল্যে নতুন সৃষ্টিসম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে।

দুর্বল মানুষেরা মহাত্মা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, দুঃসাহস এবং আত্মত্যাগ-জাত মহৎ কর্ম সাধারণতঃ খুব সন্দেহজনক অনুপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়। দুর্বল মানুষেরা দুষ্টামির চেয়েও দুর্বলতাকে ঘৃণা করে। তারা যে দুর্বলতাকে ঘৃণা করে তার প্রমাণ হল তারা নিজেদেরই ঘৃণা করে। দুর্বল মানুষ-দের যে সাগ্রহ পলায়নটুকু আমরা দেখেছি তা হল নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার প্রয়াস। তার এই প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, আত্ম-প্রবণতা এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থ লুকিয়ে আছে; তবুও এসবের মধ্য দিয়েও সে বড় একটা কিছু করতে পারে। তাই আমরা দেখি যে যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যর্থ হল তারা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করে। তারা বড় বড় পরিকল্পনা নেয়, অনন্যসাধারণ একাগ্রতা, দুর্দম শক্তি এবং কর্ম সম্পাদনে এমন এক বিশেষ ধরণের নৈপুণ্য তাদের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই যা হয়তো অনেক শ্রেষ্ঠতর মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। এটা খুব অদ্ভুত শোনায় যে সম্ভাব্যের হাতে যারা পরাজিত হয়, তারাই অসম্ভবের সাধনা করে; কিন্তু দুর্বলের মানসিকতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে দুঃসাহসের পথই হোল সহজ পথ। দুর্বল মানুষেরা বিফল মনোরথ হবার বেদনাটুকু এড়ানোর জন্য বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেন না যা সহজ এবং সম্ভাব্য তা করতে না পারলে লোকে আমাদের দোষ দেয়; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে না পারলে সেই বিফলতার দায়িত্ব কাজের গুরুত্বের উপর আরোপিত হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুনকে আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে দুর্বল এবং অশক্ত প্রকৃতির মানুষেরা একধরণের দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে থাকেন। যাঁরা জীবনে সফল হয়েছেন তাঁরা আমূল সামাজিক সংস্কার চান না, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পে সম্পূর্ণ অভিনবত্বকে বরণ করেন না, বন-বাদাড় কেটে বসতি স্থাপন করতে যান না অথবা সাহিত্য, শিল্প এবং

সংগীতে নতুন প্রকাশ ধারাও প্রবর্তন করেন। যাঁরা ভাল কাজকর্ম করছেন তাঁরা স্বস্থান থেকে আরও ভাল কাজ করার চেষ্টা করেন কেন না তাঁরা যেটুকু জানেন সেটুকু আরও ভালভাবে করার চেষ্টা করেন। যে পরিস্থিতি ভারসাম্য হারিয়েছে তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টাই হল নতুনকে সাগ্রহে বরণ করা; এর দ্বারা নিজের অক্ষমতা ঢাকা পড়ে। অগ্রদূত এবং অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করার অর্থই হল এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যেখানে অসামর্থ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ-যোগ্য এবং অপরিত্যজ্য; অভিজ্ঞতা এবং কোনো কিছু করার জ্ঞান এবং নৈপুণ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নতুনকে বশ করা যায় না; অতএব যা অভিনব তা কুৎসিত এবং তাকে কিম্ভূতকিমাকারও বলা চলে।

সন্দেহজনক প্ররোচনা এবং মহৎ কর্ম সম্পাদনের মধ্যে যে অসংগতি তা দেখিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা মানবদেবতাকে নিন্দা করছি; পরন্তু আমরা তার প্রশংসা করছি। যেহেতু মানুষের সৃষ্টিশক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অতি সাধারণ এবং তুচ্ছ প্রবণতাকে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি দান করা। রাসায়নিকের ধাতুর পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণাটুকু প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা বলে মনে হয়, কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতির বাস্তবতার সঙ্গে তা মেলে। মানুষের অন্তরাত্মায় ভালো এবং মন্দের ভারসাম্যটুকু রক্ষিত হয়: উচ্চ ও নীচ, মহৎ ও হাস্যকর, সুন্দর ও কুৎসিত, গুরুত্ব-পূর্ণ এবং তুচ্ছ সবার মধ্যেই এ ভারসাম্যটুকু বজায় থাকে। সাফল্যের উৎকর্ষ এবং কর্মের উদ্দেশ্য এ দুই-এর মধ্যে নিকট সম্বন্ধের কল্পনা করলে আমরা মনুষ্য চরিত্রের স্বকীয়তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকব। মানুষ হিসেবে আমাদের মহত্ব হল সেখানেই যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব অভিযোগ, আনন্দ বেদনা ও দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং ক্ষুধা এসব কিছু নিয়ে যে কাজটুকু আমরা করতে পারব তা যথাযথ সম্পন্ন করি। কীটস্ লিখেছিলেন যে আমরা যখন কোন ব্যাপারে সামান্য বিব্রত বোধ করি তখন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই বোধটুকু এমনভাবে গুরুতর আকার ধারণ করে যে তা সোফোক্লিসের নাটকের উপজীব্য হয়ে পড়ে। সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সাধারণের অভিজ্ঞতায় সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে আছে। সব ঘটনাই নতুন নতুন ভাব ভাবনা এবং অন্তর্দৃষ্টি থেকে সমান দূরে;

তার সীমাহীন মানবতা বোধের স্ফুরণ আমরা দেখি মানুষের তুচ্ছ এবং অতি সাধারণকেও অসাধারণ করে দেখাবার শক্তির মধ্যে।

৬

যে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মত তা হল মানুষের স্বকীয়তার গভীরে যে সব গুণগুলি রয়েছে তারাই মানুষের সৃষ্টিশক্তির উজ্জীবন ঘটায়। আমরা আগেই দেখেছি যে মানুষের অসম্পূর্ণতা, সে যে অসম্পূর্ণ প্রাণী এই বোধটুকু তাকে তার অনন্যসাধারণ জীবনচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এই অসম্পূর্ণতাটুকু আমরা দেখি মানুষের বিশেষ ধরণের ইন্দ্রিয় শক্তির অভাবের মধ্যে এবং এই ইন্দ্রিয়গত অভাবটুকু পরিপূরণ করার চেষ্টার অভাবের মধ্যে ; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অসম্পূর্ণতা এবং ধীরে ধীরে বড় হয়ে পরিণত হওয়ার অক্ষমতাটুকুও এই অসম্পূর্ণতার মধ্যে পড়ে। এই যে ক্রটিগুলির কথা বললাম এরা সকলেই মানুষের বিশেষ ধরণের সৃষ্টিশক্তিকে উৎসারিত করে দেবার ব্যাপারে বড় বড় ভূমিকা নিয়েছে। মানুষের বিশেষ ধরণের ইন্দ্রিয় না থাকার ফলে মানুষ অস্ত্র এবং হাতিয়ার খুঁজতে লাগল, সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় স্বয়ংক্রিয় না হতে পেরে মানুষের ব্যবহারে দ্বিধা দেখা দিল। জীবজন্তুদের মধ্যে অনুভূতির পরেই ঘটে কাজের সূত্রপাত। রাসায়নিক দ্রুততা এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে যান্ত্রিক ভাবে কর্মও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় ঠিক পথের সন্ধানটুকু করা যায় না ভুল এবং বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে না গিয়ে। এই বিরতির মধ্য দিয়েই আমরা পাই রূপকলা, ভাব-ভাবনা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, বিরক্তি, অভিলাস এবং সৃষ্টিকর্মের প্রারম্ভিক সূত্রগুলি। সবশেষে পরিণত বয়সে যৌবনোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি যদি রক্ষা করা যায় তাহলে বোধ হয়, মানুষের শক্তির প্রকাশ ঘটে লীলার মাধ্যমে ; অন্তর্দৃষ্টি এবং আলোকিত সন্ধানের পক্ষে তা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা এটুকু প্রত্যাশা করতে পারি যে স্ববশ ব্যক্তির মধ্যে এই অসম্পূর্ণতাটুকু যেন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। ব্যক্তিমানুষ যখন স্বনির্ভর হয় তখন তার মত অসম্পূর্ণ জীব বড় একটা দেখা যায় না ; তার অসম্পূর্ণতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ এবং নিত্যস্থায়ী। অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং যূথবদ্ধ

যে ব্যক্তিমানুষ তার অনন্য-সাধারণতাটুকু বহুলাংশে অস্পষ্ট। অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হল পূর্ণ হয়ে ওঠা এবং ভারসাম্যটুকু আপনা-আপনি রক্ষিত হওয়া। দৃঢ় সম্বদ্ধ সমষ্টিজীবন এক ধরণের জীবনায়নের জনক যা আমাদের অমানবিক প্রকৃতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাই যূথভ্রষ্ট মানুষের আবির্ভাব মানুষের স্বকীয়তা অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথাপি একথা বলা যায় যে এই পদক্ষেপটি কোনও ধীরমন্থর সামাজিক অগ্রগতির পরিণতি নয়, বরং বিপর্যয় এবং প্রলয়ংকর অবস্থার ফলস্বরূপ। প্রথম যে ব্যক্তি মানুষটি হল জাতিচ্যুত শরণার্থী, সে নিঃসঙ্গ এবং একক। এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে মানুষ সাগ্রহে চায় নি, একে তারা দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল : সে যূথভ্রষ্ট হয়েছিল। ইতিহাসের সৃষ্টির স্বর্ণযুগগুলির পূর্বেই সর্বত্র সমাজজীবন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যক্তিমানবের ধ্বংসস্তূপ থেকেই সৃষ্টিকর্মের সূচনা। যা কিছু নতুন তারই মূলে ছিল এই পলাতক আশ্রয়প্রার্থী। তারাই প্রথম স্বাধীন মানুষ, তারাই প্রথম নগর এবং সভ্যতার পত্তন করেছিল ; তারাই দুঃসাহসিক আবিষ্কারের সম্মান পেল ; ইজরায়েল, গ্রীস, রোম এবং আমেরিকার বীজ হল তারাই।

যূথবদ্ধ জীবন থেকে ব্যক্তিমানুষকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তার বেদনা থেকে সে কখনই মুক্তি পায় না। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব সর্বদাই অসম্পূর্ণ এবং ভারসাম্যহীন। তার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা এবং আবেগচালিত প্রয়াসের মূলে রয়েছে ঐ পূর্ণতা এবং ভারসাম্যটুকু ফিরে পাবার জন্য অন্ধ আকুতি। ঐ ব্যক্তিমানুষ যখন নিজেকে ফিরে পেতে চায়, নিজের মূল্যটুকু সপ্রমাণ করতে চায়, তখনই সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায় মহৎ কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয়। ব্যক্তিমানুষ যখন নিজেকে ফিরে পায় না অথবা নিজের অস্তিত্বটুকুর মূল্য যাচাই করতে পারে না আপন চেষ্টায়, তখন তার মধ্যে অপরিসীম ব্যর্থতা বাসা বাঁধে, অশান্তির সূত্রপাত হয় ; তার মধ্যে এই ব্যর্থতা কালক্রমে আমাদের অস্তিত্বের ভিতকেও কাঁপিয়ে দেয়। ব্যক্তিমানুষের জীবনের ভারটুকু বহন না করার প্রবণতা থেকেই এইসব অশান্তির সূত্রপাত ; এই অশান্তির পরিণতি ঘটে সমষ্টিতান্ত্রিক সংস্থায় যারা সার্বভৌম শক্তিতে বিশ্বাস করে।

এটা একটা অদ্ভুত দৃশ্য : মানুষ যখন তার স্বকীয়তার বোঝা বহনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে তখন বোঝাটুকু এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে নিয়ে শেষে তাকে ফেলে দেয়। কেন না যখন সে পিছনে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় তখন নিজেকে এক বিরাট জনতার মধ্যে দেখে ; এ জনতা পতাকা উড়ায়ে, বাদ্য বাজায়ে এবং অপরিসীম আনুগত্য এবং নিশ্চয়তার দিকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যায় ; তারা পিছিয়ে যাচ্ছে বহুদিনের একটি প্রাচীন পর্বতমালার নুড়ি হবার জন্য, একটি সামগ্রিক কাঠামোর অখ্যাত একটি অংশরূপে গণ্য হবার জন্য।

তত্রাচ মনুষ্যপ্রকৃতির একটি অদ্ভুত গুণ হ'ল এই যে এই সাগ্রহ পশ্চাদপসরণ মূলতঃ আর কিছুই নয়, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য শুধু এক পা পেছিয়ে যাওয়া। আধুনিক পশ্চিম জগতে ক্রমাগত লড়াই চলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্যবিরোধী প্রবণতার মধ্যে। রেনেসাঁর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রিফরমেশন-এর যে স্থান, এন্‌লাইটেনমেন্ট-এর যুগের সঙ্গে জ্যাকবিনিজম্-এর যে সম্পর্ক ঠিক সেই সম্পর্ক রয়েছে উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর উৎকট স্বাদেশিকতা এবং সমাজতান্ত্রিক সংঘক্রিয়াবাদের (collectivism)। আজ পর্যন্ত পশ্চিমের মানুষের উদ্ভাবনক্ষমতাই তাকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী আন্দোলন যে আবেগকে উৎসারিত করে দিয়েছে সে তাকে নিজের সৃষ্টিমূলক কাজে লাগিয়েছে ; আত্মোন্নতির জন্য তাকে ব্যবহার করেছে। তাই আমরা গত চারশো বছরের ইতিহাসে বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি কিভাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী আন্দোলনের পরবর্তী যুগে ব্যক্তিমানুষেরা সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে ; সাহিত্যে এবং শিল্পে তারা কিভাবে দুঃসাহসী সৃষ্টির জোয়ার এনে দিয়েছে। সমকালীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিরোধী আন্দোলনে আমরা যে অভূতপূর্ব রূঢ়তা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমাদের ভাবিত করে তুলেছে ; ব্যক্তি-মানুষ এর পরে কি আবার শীর্ষস্থান অধিকার করবে ? অনেকেই একথা ভেবেছেন যে, এই ভীতিপ্রদ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সমকালীন গণআন্দোলন কি পশ্চিম দেশের ব্যক্তিমানুষকে চিরতরে গোষ্ঠীর আধিপত্য স্বীকার করাবে ?

৭

মানুষের স্বভাবকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বোঝার চেষ্টা করলে মানুষের জগতে কথার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পুরোপুরি বোঝা যায় না। কথার শব্দমূল্য অথবা চিত্রমূল্য আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার গতিবেগ বৃদ্ধি করে অথবা তাকে মন্থর করে দেয় সেই জটিল প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা দুরূহ, কেন না সাধারণতঃ এই প্রসঙ্গে কথাগুলো অর্থহীন হয়ে থাকে।

এটা খুবই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার মত যে প্রকৃতির ক্ষেত্রে ম্যাজিকের ব্যবহার—কথা দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস—এ সবই একটি মৌল বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল ; এ বিশ্বাস হ'ল প্রকৃতি মনুষ্য-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন নয় ; এটি আরও ধরে নেয় যে মানুষের জগতে যে সব পদ্ধতি কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে তা মনুষ্যেতর জগতেও প্রয়োগ করলে কার্যকরী হবে। মানুষের প্রকৃতি বৃহত্তর প্রকৃতির অংশমাত্র—এই বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের প্রতিচ্ছবি হ'ল উপরোক্ত প্রত্যয়টুকু। এই প্রত্যয়টুকু ঐ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় থেকে বেশী অযৌক্তিক নয়।

আমরা জানি যে কথা দিয়ে পাহাড় টলানো যায় না কিন্তু তা দিয়ে জনগণকে চালানো যায় ; অন্য কিছুর চেয়েও কেবলমাত্র কথার জন্য মানুষেরা যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কথা চিন্তাকে রূপ দেয়, আবেগকে উদ্বেলিত করে এবং কর্মের সূত্রপাত করে ; কথাই মানুষকে হত্যা করে এবং তাকে পুনরুজ্জীবিত করে ; তার অধঃপতনের জন্য কথাই দায়ী এবং কথাই তার ব্যাধি নিরাময় করে। আমরা যাদের কথার মানুষ বলি সেই সব পুরোহিত ভাববাদী ও বুদ্ধিজীবীরা জঙ্গীনেতা, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও ব্যবসাদারদের চেয়েও ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সংকটকালে যখন মানুষের পুরোনো জীবনের প্রথাগুলো ভেঙে পড়ছে এবং মানুষ অজ্ঞাত অভিনবের সঙ্গে লড়াই করছে তখন কথার এবং ম্যাজিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপনা তাদের কার্যকরী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ; গদ্যময় বাস্তবের জন্য

মানুষ অজানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যকে পাবার জন্য তার আত্মার প্রসার ঘটাতে হবে। 'তার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপকে সুস্থ এবং সুদৃঢ় করার জন্য রূপকথার পরীদের গল্প, ইন্দ্রজালের ছোঁয়ার প্রয়োজন হয়। বাস্তবের অনুসরণ ও জ্ঞানের বিকিরণ এ-দুটোর কোনোটাই গোড়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপজীব্য হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রেও রাসায়নিক ভবিষ্যদ্বক্তা এবং ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা প্রমুখ ঐন্দ্রজালিকেরাই হলেন পথিকৃত। প্রথম যুগের রসায়নশাস্ত্রবিদেরা দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না; তাঁরা পরশপাথর এবং অমৃতের সন্ধান করেছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বেত্তা এবং আবিষ্কারকেরা পুরাণের কথা এবং পরীর গল্প থেকে প্রেরণা পেতেন। কলাম্বাস শুধুমাত্র সোনা এবং সোনায় মোড়া সাম্রাজ্যের সন্ধান করেন নি; তিনি স্বর্গোদ্যানের সন্ধান করেছিলেন। যখন তিনি অরিনকো নদীর দেখা পেলেন তখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে ইডেন উদ্যানের চারিটি নদীর অন্যতম গিহন নদীর দেখা তিনি পেয়েছেন। তিনি সোন দেশে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন যে তিনি যেসব নিদর্শন এবং প্রমাণ এতদস্থলে প্রত্যক্ষ করেছেন তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই অঞ্চলেই স্বর্গরাজ্যের দেখা পাওয়া যাবে। গাণিতিক সমীক্ষাও তাঁর এই সিদ্ধান্তকে নাকি সমর্থন করেছিল।'

কথা এবং ইন্দ্রজালের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আকার নিতে পারে ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সে সম্বন্ধে একটা সচেতনতা না থাকলে আমরা হয়তো ইতিহাসের মর্মার্থটুকু উদ্ঘাটন করতে পারব না। আমরা যে শতাব্দীতে বাস করি সেই শতকে মানুষ বৈজ্ঞানিক চেতনা ও উৎকৃষ্ট বাস্তববোধের দ্বারা প্রভাবিত। জাত্যাভিমানী ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজম এবং উৎকট স্বাদেশিকতার ইন্দ্রজালও এই যুগকে প্রভাবিত করেছে। লক্ষ লক্ষ চাষীকে শহুরে শিল্পশ্রমিকে দ্রুত রূপান্তরীকরণের অর্থ হ'ল নিওলিথিক যুগ থেকে বিংশ-শতাব্দীর তোরণদ্বারে প্রবেশ আসন্ন; জাতীয়, গোষ্ঠিগত অথবা সামাজিক স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে হৃদয়দ্রাবী রূপকথা এবং মরীচিকার অবতারণা না করলে বোধহয় এই নূতন যুগে উত্তরণ সম্ভব হয় না।

বর্তমানকালে একটা বিশ্বাস ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে যে মানবজাতি একটা যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। পারমাণবিক সর্বাত্মক ধ্বংসের ভয় থেকে এই বিশ্বাস আংশিকভাবে জন্ম নিয়েছে; এবং অংশত জন্ম নিয়েছে আমাদের এই ভয় থেকে যে যদি কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘদিন স্থায়ী যুদ্ধ বাধে তাহলে যে সমষ্টিতন্ত্রকে আমরা ঘৃণা করি সেই সমষ্টি-তন্ত্রের আদর্শেই আমাদের সমাজ গঠিত হবে; যে আশায় বুক বেঁধে আমরা এদের সঙ্গে লড়াই করব প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই আশাকেই হনন করে ফেলবো। আরও একটা দুর্লক্ষণ হল এই যে, জাতির মধ্যে যে মানুষেরা দুর্বল, যারা এতোদিন পথ প্রদর্শকরূপে এবং ভবিষ্যতের নিয়ন্তা-রূপে কাজ করেছে তাদের আমরা হয়তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো। বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় যে নতুন বিপ্লব ঘটে গেল, যা প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্ষমতাকে প্রভূতভাবে বাড়িয়ে দিল তাও সাধারণ মানুষের মূল্য অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলে এবং পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের ফলে হয়তো শীঘ্রই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সারা দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারবে এবং জনগণের সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধবিগ্রহেরও নিষ্পত্তি করে দেবে; অদ্ভুতভাবে জটিল এবং কল্পনাতীত ব্যয়সাধ্য পরীক্ষাগারে বর্তমানে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; আদর্শ মানবেরা এইসব পরীক্ষাগারে কাজ করেন। মানুষের শক্তি বিস্তারের এই নতুন দিগন্তে অকেজো এবং পরিত্যক্ত মানুষদের কোন স্থান নেই। দুর্বলকে আজ আর ইতিহাসের গতির নিয়ন্তা এবং আন্দোলনের প্রেরণা দাতারূপে দেখা হচ্ছে না; আবর্জনার মতই তাকে পরিত্যাগ করার সম্ভাবনাটকুই প্রকট হয়ে উঠছে। যখন দুর্বল মানুষকে ইতিহাসের নিয়ন্তারূপে আমরা দেখব না তখন ইতিহাস এবং প্রাণীবিদ্যায় (Zoology) বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকবে না বলে অনেকে ভয় পাচ্ছেন; সে ভয় খুব অমূলক নয়।

বর্তমান সংকটের ফলে আমাদের মধ্যে যে শান্তি এবং নৈরাশ্য এসেছে তার পরিণতি হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টির স্বচ্ছতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যে সব শক্তি দুর্বল মানুষদের বৃহত্তর অন্ধকারের জগতে নিক্ষেপ করছে, আমরা যখন সেই সব শক্তির পরিমাপ

করছি তখন পৃথিবীর সর্বত্রই এমন সব ঘটনা ঘটছে যা দেখে আমরা স্তব্ধ হয়ে থামছি, বিস্মিত হচ্ছি এবং আশায় বুক বাঁধছি। ঠিক এই মুহূর্তেই আমরা অনুন্নত দেশগুলির সর্বত্র দেখছি জ্ঞানে, পার্থিব সম্পদে এবং পারদর্শিতায় নূতন মানুষেরা যুগযুগসঞ্চিত নিষ্ক্রিয়তা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে সদর্পে প্রবেশ করেই এক অবিস্মরণীয় নাটকের অভিনয় করছে। এ নাটকটির উপজীব্য হল সবচেয়ে পশ্চাদবর্তী মানুষের সর্বাগ্রগামী হওয়ার অভিনয়। এই অভিনয়ের গুরুত্ব অনেক; যদি আমরা এর মর্মার্থটুকু সম্যক অবগত হই তাহলে এর স্থূলতা উগ্রতা, পাশবিকতা, শত্রুতা এবং অভিনেতাদের অত্যুৎসাহ আমাদের পীড়া দেবে না। আমরা অবশ্য এটুকু আশা করব যে এটাই তাদের শেষ অভিনয় হবে না।

যদি আমরা মনুষ্যচরিত্রের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হই তাহলে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে যা ঘটছে তার মর্মোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে। একটি অনুন্নত দেশকে আধুনিকীকরণের যে কাজ তা হল ধীর স্থির কাজের লোকের দায়িত্ব; সেটুকু করতে গিয়ে একটা পাগলাগারদের মানুষদের মত অভিনয় করার দরকার কি? উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বৈষম্য মানুষের কাজকর্মে দেখা যায় তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এক্ষেত্রে পাই। রূপকথা, অদ্ভুত ইন্দ্রজাল এবং বশীকরণ প্রভৃতির সহায়তায়, দুর্বল মানুষদের শক্তির উজ্জীবন ঘটানোর দরকার হয়; বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে তারা আপন আপন পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা পায়। যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অথবা আপন স্বার্থের দোহাই দিয়ে অনুন্নত দেশগুলির অশিক্ষিত এবং সমৃদ্ধিহীন জনগণকে পুরোপুরি কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। তাদের শেখাতে এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেও সম্মত করা শক্ত হয়ে পড়ে। কেননা শিক্ষাকে তারা তাঁদের অসম্পূর্ণতার প্রমাণ হিসাবে দেখে, এবং ধীর অগ্রগতিকে তারা বর্তমানের পঙ্ককুণ্ডের উপরে আপন ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাত পা ছোঁড়ার সামিল বলে মনে করে। তারা গতানুগতিক ধীর পদক্ষেপ চায় না; অধঃপতিত বর্তমান থেকে গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে একটা অতি বিস্ময়কর লম্ফপ্রদান তারা কামনা করে। তাদের

এই ভ্রান্ত ধারণাটুকুর প্রয়োজন হয় যে যখন তাদের ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে অন্য মানুষদের অতীতের কীর্তিকে ধরার চেষ্টা করছে মাত্র তখন তারা বোঝাতে চায় যে তারা পৃথিবীতে সকলের অগ্রগামী এবং মনুষ্যসমাজকে তারা পথ দেখাচ্ছে। দেশের শিল্প গড়ে তোলার ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু তাদের চোখে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যের বেদীতে একটি মহৎ কর্মসম্পাদনরূপে প্রতিভাত হওয়া চাই। শক্তি-ব্যঞ্জক কথা, স্ব-ধর্মীদের সঙ্গে নিত্যযোগ এবং উদ্ধত তাচ্ছিল্যের যেমন এর জন্য প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন কারিগরী শিক্ষার, প্রচুর কলকব্জা এবং সন্তোষজনক খাদ্য ব্যবস্থা এবং আশ্রয়স্থলের। ইতিহাসের সমুন্নত চূড়োয় অনুন্নত মানুষেরা উঠতে চায়; তারা সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মনুষ্য-সমাজের অগ্রচারী বলে ভাবতে চায়, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্যের তারা ধারক ও বাহক হতে চায়; তারা নিজেদের মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নির্বাচিত যন্ত্র বলে মনে করে। তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে এই যে নিষ্ক্রমণ এটাকে বিজয়ীর অভিযান বলে গণ্য করতে চায়।

(ক)

আরুইন এডম্যানঃ জগত, কথা ও কবি

শিল্পী শিল্পসৃষ্টির জন্য কোন না কোন উপাদান নিয়ে কাজ করেন। তার উপাদান হয় পাথর, না হয় রং আর না হয় কথা। কথা বলার যে শৈলী, যে আঙ্গিকে কবি কথা বলেন তা শিল্পতত্ত্বের এক অতি রহস্যময় সমস্যা। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্রসম্মত ব্যঞ্জনাটুকু থেকে ভাষাকে যদি পৃথক করে দেখা হয় তা হলে বলতে হয় যে ভাষা একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং শূণ্য, অন্যদিকে আবার তার সারবত্তাও অনস্বীকার্য। ভাষা হল সঙ্গীতের মত স্পন্দমান, তার মতই পলায়নতৎপর। কবির কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে যদি তুলনা করা হয় তা হলে বোঝা যায় যে চিত্রীর শিল্পমাধ্যম কত বৃহৎ, কত দীর্ঘস্থায়ী। সমস্ত সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে 'বর্ণ সঙ্কর শিল্প' বলা যেতে পারে। এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাব্যের আবেদন তার সুর, তার বিশেষ স্বরগ্রাম, তার নিজস্ব ধ্বনি-বিন্যাসকে আশ্রয় ক'রে ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। কাব্যকে আমরা ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসেবে ভাবতে পারি; শুধু এই বাহনটি ছন্দৈশ্বর্যে মণ্ডিত; অন্যান্য ভাবের বাহনের থেকে এইটুকুই তফাৎ। সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্রকৃতি হল তা ভাবের বাহন হলেও অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী; তা সহজেই শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করে।

কাব্যের এই দ্বিবিধ কার্যকারিতা লক্ষণীয়। একদিকে কাব্য ধ্বনি-সুষমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, অন্যদিকে আবার তা ভাববিনিময়ের বাহন। সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা; একদিকে

যেমন তাতে সুর আছে, অন্যদিকে আবার তার তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপও আছে। সেইজন্যই সাহিত্যের দুটি রূপ পরস্পরকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুঁয়ে চলে গেছে। তারা হল গদ্য ও পদ্য। আদর্শগতভাবে গদ্য হবে এক ধরণের বীজগণিত, এক বিশেষ ধরণের সঙ্কেত-বার্তা। যে ভাবটুকু বহন করা দরকার তার বাহন হওয়া ছাড়া গদ্যের অন্য কোন কাজ নেই। গদ্য সেই কাজটুকু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় করবে। যা বলতে চাইছি গদ্য শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, সেইটুকুকেই এমনভাবে প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ না থাকে। বৈজ্ঞানিক সংগঠনেই গদ্যের রূপের পূর্ণতম প্রকাশ। সে হিসাবে শিল্প-পদবাচ্য হওয়ার কোন অধিকার গদ্যের নেই।

কিন্তু শব্দের দুটি দিক আছে, এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই গদ্যকে শিল্প-বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য অনেকের মতে গদ্য খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয়। খুঁতখুঁতে তর্কবিদ্যাবিশারদ যতই শব্দকে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার চেষ্টা করুন না কেন, শব্দের মধ্যে আবেগের ব্যঞ্জনা থেকেই যায়; ভাষায় ছন্দ নিত্য-অনুস্যূত; বীজগণিতের সূত্রতেও এই ছন্দের সন্ধান মেলে। যে ভাষায় দার্শনিক শিল্পধর্ম-মূলক দর্শন-আলোচনা করেন তার মধ্যেও সেই ভাষার সহজ ছন্দটুকু, ধ্বনি-সুষমাটুকু আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। দার্শনিক দেকার্তের দর্শন আলোচনায় ফরাসী ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য সহজভাবেই ফুটে উঠেছে। বের্গসঁর দর্শনও এই ধ্বনি-ঐশ্বর্যের জন্যই সুখপাঠ্য।

কথা কেবলমাত্র শুষ্ক শব্দ নয়। তার অঙ্গে আবেগের স্পর্শটুকু লেগে থাকে। যে পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষা আমরা শিখি, তাদের কথা, তাদের স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, বাল্যকালের কত মধুর স্মৃতি ঐ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, যে সব পরিবেশে ঐ ভাষা ব্যবহার করেছি, তার স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত হয়ে থাকে ঐ ভাষার সঙ্গে। ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সূত্র হিসেবে গণ্য হয় না; অবশ্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধরনের সাঙ্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ভাষা সুস্পষ্ট অর্থবহ। এমন কথা নেই বললেই চলে যার প্রতি-

অর্থ নেই। 'নিজের ঘর', 'মৃত্যু' প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর না হয় বিকর্ষণ করে। যে সব কথার সুস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বলা হয় তার সঙ্গে একাধিক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে যাওয়ার ফলেই শব্দের নিজস্ব অর্থটুকু হারিয়ে গেছে।

শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিকা থাকার ফলে গদ্যসাহিত্যকে 'সঙ্কর শিল্প' বা Hybrid art বলা যেতে পারে। শব্দ কখন কখন তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রতীকরূপে কখন বা গীতময় ধ্বনিরূপে আবার কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিন্যাসগত যে ধ্বনি-সাম্য, তার অন্তরে সঙ্গীতের যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তাকে যথাযথ-ভাবে গদ্য ব্যবহার করে না, কাব্য সেটুকুকে ব্যবহার করে। অবশ্য কখন কখন ছন্দোময় বর্ণবহুল গদ্যের ঢঙে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তার মধ্যে শব্দের উপযুক্ত প্রসাদগুণ এসে যুক্ত হয়। ক্লাটন ব্রুক বললেন যে গদ্যের বিশেষ গুণ হল সুবিচার, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে গদ্যের ঢঙটুকু নির্মিত হয়ে থাকে। গদ্যের বিস্তারটুকু নির্ণীত হয় ভাষার দুটি ক্রিয়ার কথা মনে রেখে, একদিকে ভাষা ভাবের বাহন, অন্যদিকে তা বস্তুর প্রতিচ্ছবি। গদ্য কী না করে? গদ্যে গল্প বলা যায়। দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়; বিষয়গত জটিলতার সরলীকরণ ক'রে গদ্য স্থান এবং ব্যক্তির বর্ণনা করে, গদ্যের মাধ্যমে আবার কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে তাকে আপনার মতে নিয়ে আসা, এ সবই হল গদ্যের কাজ। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য ব্যক্ত করে। গদ্য শুধুমাত্র শব্দের অর্থটুকু সম্বল ক'রে কাজ করে না। শব্দের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও গদ্যের কাজে লাগে। গদ্য কাব্য থেকে সঙ্গীতের সুরটুকু কর্জ করে। এতে বিভিন্ন ধরনের ভাবের বাহন বলেই গদ্য শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাত্র নয়। কল্পনায় যে সমন্বয় সাধন সম্ভব গদ্য সেই সমন্বয়টুকু সৃষ্টি করে। গদ্য সেই কল্পলোকের উৎস। তাই উপন্যাস গদ্যকে আশ্রয় করে আছে।

কাব্য এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের বাহন ভাষা পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়; কাব্যের ভাষাকে কবি, তাঁর শ্রোতা অথবা পাঠক কেউ-ই ভুলে থাকতে পারেন না। সান্তায়ানা যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন

মূলতঃ কথার স্বর্ণকার, কথার সোনা দিয়ে তিনি কাব্যের অলঙ্কার গড়েন। শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে, কবি তাঁর পাঠককে সেই শব্দের আমন্ত্রণটুকু পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা ইতালীয়, তাঁরা সত্যসত্যই ভাগ্যবান। এই ভাষায় স্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি যে কথা বললেই এক ঝুড়ি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে হয়, এ ভাষায় কবিতা না লিখে উপায় থাকে না, অবশ্য এটি যদি তার মাতৃভাষা হয়। সুইনবার্ণের মত কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব্দলালিত্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে এমন সব চরণ লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণে শুধু রয়েছে পদলালিত্য, শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য।

আমরা এমন একটি কাব্যকলার কল্পনা করতে পারি যে কাব্যকলায় শুধুমাত্র স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগতি সৃষ্টি করবে। সে ধ্বনি-সংগতি প্রাচ্যদেশের ঝাড়লণ্ঠনের মত বর্ণবহুল ও ঝলমলে হবে। এমন কবি এবং কাব্যপাঠকে রয়েছেন যাঁরা শব্দের বর্ণটুকুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং প্রত্যক্ষ করি। ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে 'cellor door' কথাটি বড়ই মিষ্টি, এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনে শুনিনি ;-এমন অনেক ইংরেজ কবি আছেন যাঁরা বুঝতে পারবেন যে ঐ বিদেশী ভদ্রলোকটি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।

শব্দের কারুকার্য সম্পন্ন করাটাই কিন্তু কবির কবিকৃতির সবটুকু নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির কুশলী সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই কুশলী সমন্বয় সাধনকর্মের মাধ্যমে যে আবেদনের সৃষ্টি করা যায় তা কাব্যের ইন্দ্রিয়জ আবেদনেরও সবটুকু নয়। আর এক দিক থেকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বর-গ্রামের (Tones) মতই ভাষারও বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে। কিন্তু সেইটুকু সাদৃশ্য ছাড়াও গভীরতর সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে না ঠিক তেমনি কতকগুলি শব্দাংশকে একত্র যোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের ভাষার মধ্যে যতি

আছে, ছন্দ আছে; ভাষার এই ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট ছোট খণ্ডাংশগুলি কবি তাঁর কাব্যসৃষ্টির কাজে লাগান।

কবিতার ছন্দই হ'ল তার বিশেষ শক্তি। মানুষের কান এতো সহজে, এমন অনায়াসে কেমন ক'রে ছন্দের আহ্বানে সাড়া দেয় তার রহস্য বোধ হয় মানুষের জৈব অন্তরে লুকিয়ে আছে। ফুসফুসের আকুঞ্চন প্রসারণে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যেও বোধ হয় এই রহস্যের লীলা। সঙ্গীতে ছন্দের লীলা অতি প্রত্যক্ষ; কাব্যে ছন্দ এক কল্পনা-রঙীন পরিবেশ সৃষ্টি করে, এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আস্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্যলোকে পরস্পরের প্রতিবেশী হয়। কবির বক্তব্য পাঠক শোনেন। কবিতা হ'ল কবির স্বপ্ন, কবি-মানসের অনুভব মাত্র। কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কবি তাঁর কাব্যে সঙ্গীতের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন, হঠাৎ-পাওয়া নানান শব্দালঙ্কার কবি এই কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন, কাব্য আপন স্বরূপে ঝলমল করে ওঠে।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যের দীর্ঘায়িত আলুথালু গতিচ্ছন্দ, পোপের কাব্যের দৃঢ়-পিনদ্ধ চরণ, সুইনবার্ণের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিল্টনের অমিত্রচ্ছন্দের সামগ্রিক গতি স্ব স্ব কাব্যের আবেদনটুকু নির্ণয় করে। কাব্যের মৌল গতিচ্ছন্দ কবির দেখা স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রটুকু সযত্নে চয়িত শব্দের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে। কিন্তু কবির স্বপ্ন বলতে আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কবির সৃষ্টি এবং রসিকের রসানুভবের অনেকখানিই নিহিত রয়েছে। কবিতা শুধুমাত্র পদ্যাংশের সমষ্টিমাত্র নয়, তার ছন্দ, তার মিল, তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের স্বরূপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা হ'ল সামগ্রিক সৃষ্টি, একটি সম্পূর্ণ দেহসৌষ্ঠব; কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের গভীরে; কাব্যের সত্তা হ'ল স্বপ্নের সত্তা যাকে কবি পুঁথির পাতায় অমরঙ্করে রেখে যান।

আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, যে প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতি থেকে হাজার হাজার ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তাঁর আনন্দ-উদ্বেলতা এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির কাব্যরূপটুকুর

সৃষ্টি করে। আমরা যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হ'লে কবি-প্রতিভা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষেরা কাজ করছেন তাঁদের কৃতি-রহস্যেরও অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হতো। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন যে কাব্য হ'ল শান্ত মনে জীবনের অতীত আবেগময় মুহূর্তগুলিকে স্মরণপথে আনয়ন করা। তাঁর উক্তিতে কাব্যের ছন্দ-মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক আবেদন রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে। কবি-মনের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখা ছবির সঙ্গে আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও ভাব-ভাবনাকে সমন্বিত ক'রে যে দিবাস্বপ্ন দেখেন তার নামই কবিতা। একটি চতুর্দশপদী কবিতাকে সাধারণভাবে গদ্যে হয়ত অনুবাদ করা যায়, তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও না হয় ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে পারিপার্শ্বিকের চাপে আমাদের আনন্দের ভোজে পংক্তিভোজন করার প্রবৃত্তিতে ভাঁটা পড়ে। যদিও এই আনন্দের আস্বাদনে আমাদের জন্মগত অধিকার। কাব্যে যে অনুভূতির কথা বলা হয়, তার যে অনুরণন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবটুকু বিস্তার জুড়ে, তা কিন্তু কাব্যের জীবন নয়। তাই কবিতার ভাব, তদ্‌বর্ণিত অনুভূতির কথা ভাষান্তরে বললে তার মধ্যে মূল কবিতার রসটুকু মেলে না। পাঠকের চেতনায় যখন কবির স্বপ্নের প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে, যখন কবির সামগ্রিক দৃষ্টিটুকু পাঠক আপন অন্তর্দৃষ্টির বলে আপনার করে নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু অব্যাহত থাকে; আনন্দের মন্দিরে কাব্যের জীবন্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির দেখা জগতের টুকরো ছবি, তার অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, তার আনন্দানুভূতির ভূমা-রূপ আপনার সত্তায় সমন্বিত হয়ে যায়।

কবির কাব্যে যে অনাদ্যন্ত প্লেতোনিক সমর্গতাটুকু পাই তাকেই আমরা 'কবির স্বপ্ন' আখ্যা দিয়েছি। কবি এই স্বপ্নটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্ন-সঞ্চারে সহায়তা করে, কবিতার জাদু আছে, কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করার।

কবিতার জাদু হল কবির ভাষার মনোহারিত্ব। তার সম্মোহনশক্তি

পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে দুর্বারভাবে। আমরা কোন কবিকথিত মানসিক পরিবেশরচনায় বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনের গতিচ্ছন্দে কবিচিত্তের বহমানতা এসে ঢেউ তোলে। আমরা কবির সঙ্গীতে মুগ্ধ হই। তাই কাব্যের অন্তবর্তী বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা কবিতার স্বরূপটুকুকে কিছুতেই ধরতে পারি না। কবির জৈবিক স্বপ্নে আমরা মুহূর্তের জন্য অংশভাগী হয়ে পড়ি; এই স্বপ্নই ত কাব্য। কাব্যের হৃৎস্পন্দন আমাদের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায়। যাঁরা কবি তাঁরা জানেন যে মনের গহনে কাব্যের সূত্রপাত হয় অর্থহীন সুরের ঝংকারের মত। ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবিতার কথা আমরা জানি যার সূত্রপাত কবি-মনে হয়েছিল এক অস্পষ্ট সুরের ইঙ্গিত থেকে; সে সুরে কথা তখনো সংযোজিত হয়নি; কবি-কল্পনার অস্পষ্টতা ক্রমে কেটে গিয়ে সে সুর আকার পেল, কথা পেল, অর্থ পেল। কাব্যরসিক জানেন যে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, যে ছন্দের প্রবাহ নিত্যবহমান তার জন্যই তিনি কাব্য ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের কাব্যে পাওয়া অতি নিকৃষ্ট ছন্দই হোক অথবা মিল্টনের কাব্যে পাওয়া সূক্ষ্ম উচ্চাবচতা-সমাকীর্ণ অমিত্রচ্ছন্দই হোক, যে কোন ধরনের ছন্দকে আশ্রয় করে কাব্যকে থাকতে হবেই। ছন্দই হ'ল সুরের প্রাণ। সুর নইলে কবিতার হৃৎ-স্পন্দন থেমে যায়। কবিতার ভাষায় যতই চাতুর্য থাক, ছন্দের সম্মোহনটুকু না থাকলে কবিতা পাঠকের হৃদয়ে সুরের অনুরণনটুকু জাগায় না; সেই মুহূর্তের জন্য কবির স্বপ্ন পাঠকের প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে না।

ছন্দের গতি এবং যতি, এরা কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত করতে পারে না। কথা যদি শুধু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-সুরটুকু মাত্র হতো তা হ'লে তা পুরোপুরি শব্দ ও শব্দ-সমন্বয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। কোন একটি বিশেষ শব্দকে কেন্দ্র ক'রে যে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, যে ভিন্নধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্মনির সৃষ্টি সম্ভব, তাদের কোনটিকেই আমরা কাব্যে খুঁজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙ্গীত সঙ্গীতের চেয়ে খাঁটি হলেও, তা সূক্ষ্ম হবে। কাব্যে আমরা কথার

ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্দ নয়; আমরা তা ব্যবহার করি মনের ভাব প্রকাশের জন্য। কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা করা যায় না। যদি কবি কথার এই প্রকাশ-ক্ষমতাটুকুকে পুরোপুরি কাজে না লাগান তা হলে তিনি তাঁর কাব্যকণার অন্যতম মুখ্য উৎসের অপচয় করবেন বলেই আমাদের ধারণা।

কথার একটি তন্ত্রশাস্ত্র-সম্মত উৎস থাকে আর থাকে অ-তন্ত্র-সম্মত মৌল উপাদান। এই দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকলা অংশতঃ নির্ভরশীল। কবি কথার রসাশ্রয়ে বেশি মাত্রায় আগ্রহী। বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল দেয় না। কবির কাজ হ'ল সর্বোপরি কথার শক্তিটুকুকে নিয়ে; কথার সত্যাসত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণোজ্জ্বল করে পরিবেশন করেন, তা সে সংবেদনই হোক, তার নিজের দলের বিশেষ ভাব-ভাবনাই হোক; তাকে প্রাণবান ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে কবি আপন কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি ধারা অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি আপনার কল্পনার রঙে ঐশ্বর্যবান করে কাব্যে পরিবেশন করেন কখন কখন। বাইরের যে অতিপ্রত্যক্ষ জগৎ কবিচিত্তের দ্বারে বার বার আঘাত হেনে কবির ইন্দ্রিয়চেতনাকে জাগ্রত করে, তাঁর আবেগকে উদ্দাম করে দেয়, তাঁর মনের ভাব-সমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রাকৃত জগৎকে কবি আপন কাব্যে রমণীয় মর্যাদা দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করতে চান। কাব্যে কথিত রূপকল্প কবির আবেগ ও চিন্তাকে কাব্য-পাঠকের চিত্তে সাকার করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বহির্বিষয়ক সাংকেতিক বার্তা বিনিময়ে ইংলণ্ডের পরিবর্তে × চিহ্ন ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সেক্সপীয়র ইংলণ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রবিদের সংজ্ঞা নয়। সেক্সপীয়র বললেন: 'এ দেশ শক্তি-ঐশ্বর্যে পরম গম্ভীর। মঙ্গলের পীঠস্থান, স্বর্গীয় উদ্যান ইডেনের অন্যতম রূপ; একে দ্বিতীয় স্বর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'ইংলণ্ড' এই শব্দটি নানান ভাব, স্মৃতি ও কল্পনার উদ্দীপক, শৈশবের কত স্মৃতি, ইংরাজ জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না রাজনীতিজ্ঞ পাঠকের কল্পনায় ভীড় করে আছে। কবিতার কথাগুলি

অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র নয়, তা হ'ল আবেগের উদ্দীপক। তারা শুধু বস্তু বা বিষয়ের কথা বলে না, তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা। কবি তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, তাঁর ছন্দের গতিতে, তাঁর কাব্যের অনবদ্য শব্দসুষমায় পাঠকের স্তিমিত কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলেন।

কবি এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেন তাঁর বিশিষ্ট শৈলীতে কাব্যের কথাগুলিকে সাজিয়ে; তার ফলে পাঠক শিশুসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে নতুন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতা পুরানো গতানুগতিকতাকে অস্বীকার ক'রে বিচিত্রতর ইন্দ্রিয় সংবেদনকে আশ্রয় ক'রে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তাঁর কাব্যে অভিজ্ঞতায় পাওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি সমেত এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। ব্যস্তবাগীশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে যে বর্ণ, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ একেবারে রোজনামচার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাকেই কবি এক এক ক'রে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্য-কলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই রূপার্ট ব্রুকের 'Great Love' কবিতায়। আমরা যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার সময়ে যেসব উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলো কাটাই, কবি তারই স্মারকবাণী আমাদের শুনিয়েছেন :

These I have loved :
White plates and cups, clean-gleaming,
Ringed with blue lines ; and feathery, fairy dust ;
West roofs, beneath the lamp-light ; the strong crust
Of friendly bread ; and many-tasting food,
Rainbows ; and the blue bitter smoke of wood ;
And radiant raindrops crouching in cool flowers ;
And flowers themselves, that sway through sunny hours,
Dreaming of moths that drink them under the moon ;
Then, the cool kindness of sheets, that soon
Smooth away trouble ; and the rough male kiss
Of blankets ; grainy wood ; live hair that is

Shining and free; blue-massing clouds; the keen
Unpassioned beauty of a great machine;
The benison of hot water; furs to touch;
The good smell of old clothes; and other such—
The comfortable smell of friendly fingers,
Hair's fragrance, and the musty reek that lingers
About dead leaves and last years ferns......Dear names
And thousand other throng to me! Royal flames;
Sweet water's dimpling laugh from tap or spring;
Holes in the ground; and voices that do sing;
Voices in laughter, too, and body's pain
Soon turned to peace, and the deep-panting train;
Firm sands; the little dulling edge of foam
That browns and dwindles as the wave goes home;
And washes stones, gay for an hour, the cold
Graveness of iron; moist black earthen mould;
Sleep; and high places; foot-prints in the dew,
And oaks; and brown horse-chestnuts, glossy new;
And new peeled sticks, and shining peels on grass;
All these have been my loves.'

কবি তাঁর কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলেন সে অভিজ্ঞতায় শিশুর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সজীবতা। কাব্যের এই গুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ ক'রে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে অতি প্রত্যক্ষ। হোমারের কাব্যে এই ধরনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়, কীটস এবং মিল্টনের কাব্যেও এই গুণের অসদ্ভাব নেই। মিল্টনের কাব্যে মহত্তর মহিমায় জটিলতা এই গুণটিকে ক্ষুণ্ণ করে নি। বস্তুর বর্ণোজ্জ্বল রূপটিকে কবি তাঁর সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োজনের মাধ্যমে আমাদের দেখান। কবি বস্তুটিকে বর্ণনা করেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তাটুকুর নির্দেশ দিয়ে, সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, প্রত্যূষকে বলেন যে তার না কী গোলাপের মত আঙুল। পশমের স্পর্শ, পুরোনো কাপড়ের গন্ধ, বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন আঙুলের ছোঁয়া, গোলাপের ঘ্রাণ, কাঁটার

ফুল ফুটিয়ে দেওয়া—এই সব শব্দ ব্যবহার ক'রে আপনার ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার কথা কবি পাঠককে মনে করিয়ে দেন।

আমাদের জগতের প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটুও সাধারণতঃ হয়ে থাকে তা কবি আমাদের ভুলিয়ে দেন; অনেকের মতে এইটুকুই হ'ল কবির কাজ। আমাদের আদিম সংবেদনের রূপটিকে পুনরুদ্ধার করাই হ'ল কবিকৃতি। শিশু বাঁধাধরা ছকে চলতে এবং বাঁধাধরা বুলি বলতে শেখার আগে তার চোখ বা কান যে বিশুদ্ধ রূপ দেখে ও শব্দ শোনে, সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো এবং শোনানই হ'ল কবিকুলের মুখ্য কর্তব্য। শিশু যখন ট্রেনগাড়ী দেখে তখন তার কানে কানে ইঞ্জিনের অদ্ভুত শব্দটাই বড় ক'রে বাজে। তাই শিশু ট্রেনকে 'ছু ছু' নাম দিয়েছে। তেমনিধারা কবিও এই পরিচিত পারিপার্শ্বিককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় অভিহিত করেন কারণ কবির জটিলতাবর্জিত ইন্দ্রিয়-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্যভাবে ধরা দেয়।

এই ইন্দ্রিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য বলে কবি বিশেষ গৌরব দেন; তাই কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা একাধারে সরল ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের কাছে তার আবেদন সর্বাগ্রগণ্য। যে কাব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সাড়া জাগায় না তা আমাদের আবেগকেও উদ্বেল করে তুলতে পারে না। যে সব কথায় সহজেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তাদের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিত্যদিন ধরে হয়েছে যে কবি আর সহজে তাদের দিয়ে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন না তাই কবিকে নতুন বিষয়ের কথা, নূতন অনুষঙ্গের কথা চিন্তা করতে হয়। ঝলমলে কোন অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন। চমক ভাঙ্গে আমাদের, আমরা মনোযোগ দিই। ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবি পাত্রীকে বলছেন:

'The modest water saw its God and blushed.'

এই বিস্ময়কর অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশি সজাগ হয়ে দেখি কেমন করে জল মদে পরিণত হ'ল।

উপমা এবং রূপকের ওপরে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হয়ত অনেক সহজ করে, সরল করে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কবির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যেসব বস্তুর নিত্য যোগ তা থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত ক'রে নিয়ে উপমা এবং রূপকের সাহায্যে নতুন নতুন

অনুষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত ক'রে দিলে আমাদের পক্ষে যে কাব্য থেকে যে তথ্যটুকু লাভ করা সহজ হয়, তা সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। রূপকের সাহায্যে শুধুমাত্র কাব্যের বিষয়বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের মর্যাদাটুকু আনে না, কাব্যের বিষয়বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাকে আমাদের আবেগ, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের ঐতিহ্য এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে। অন্যভাবেও বলা যায় যে আমাদের কোন কোন আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে হঠাৎ অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত ক'রে তোলা হয়।

'My love is like a red, red rose.'

অথবা

'Du bist wie eine Blume.'

অথবা আবার বলি রুপার্ট ব্রুকের একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতার কথা। 'The Dead' কবিতায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা যাঁরা জীবনকে ভালবেসেছিলেন, যাঁরা সুন্দরকে ভালবেসেছিলেন। কবি বলছেন নিত্য-সুন্দর ফুলের কথা, বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদের এবং দয়িতের গণ্ডদেশের কথা যা একদিন অধুনা-মৃতদের পরম প্রিয় ছিল। তারপরে কবি যেন মন্তব্য না করেই বলেছেন:

'There are waters blown by changing winds to laughter,
And lit by the rich skies all day and after.
Frost with a gesture stays the waves that dance.
And wandering loveliness; he leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace under the night.'

দিনের বেলা আমরা যেসব নৃত্যচপল ঊর্মিমালা প্রত্যক্ষ করেছি তারা হঠাৎ এসে প্রাণের জগৎটার প্রতিনিধিত্ব করে এবং মৃত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রাত্রের শান্ত পরিবেশে দেখা স্তব্ধগতি জলরাশি।

এই উপমা এবং রূপকের ব্যবহার করেন কবি গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতার প্রতিবাদ হিসেবে। আকাশের চাঁদ আর অর্থহীন শুভ্র চক্রাকার বস্তুমাত্র নয়, চাঁদ হ'ল রাত্রির রাণী। সূর্য হ'ল আপনার রথে

চংক্রমণশীল যৌবন-লাঞ্ছিত দেবতা। সুন্দরকে বলা হয়েছে যে সে হ'ল পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রোজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা

'The soul of Adonais like a star

Beacons from the abode where the eternal are.'

এ সত্য অনস্বীকার্য যে সকল ভাষাই রূপকাশ্রয়ী। অভিজ্ঞতায় যেটুকু পাওয়া যায়, নানানভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যঞ্জনাময় করাই হ'ল আলোচনার উদ্দেশ্য। যে সব কথা শোনামাত্র ইন্দ্রিয় তার অর্থ গ্রহণ করে সেই ধরনের কথা ব্যবহারের ফলে, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আবেগের নিগূঢ় যোগসাধনের ফলে অথবা আমাদের আবেগজীবনের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গূঢ় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ঘটলে আমরা কবির কাব্যকে অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি, অর্থের উপলব্ধি সহজ হয়। এই কারণেই জোর ক'রে বলা যায় না—কোন একটি কবিতার সঠিক অর্থ কী। তার অনুবাদও সম্ভব নয়। পেয়ারা আস্বাদন ক'রে তার স্বাদটুকুর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া বা পিচ ফলের স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় করা কবিতার অনুবাদ করার মতই দুরূহ কর্ম। যে সঙ্গীতের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে শব্দায়ন করেছেন কাব্যের ভাবটুকুকে প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন ভাবকে তীব্র করার জন্য, সে সবই অনুবাদ কর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হ'ল শব্দে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা অথবা বলতে পারি প্রাণই শব্দের রূপে কাব্যে আবির্ভূত হয়। পার্থিব জগতটা কবির ভুবনে পরিণত হয়, সেই ভুবনটিই তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বোদ্ধা পাঠক যখন কাব্য পাঠ করেন তখন কবির চারপাশের পার্থিব জগতটাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন করেন তাঁর সঙ্গীতময় এবং চিত্রময় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে।

শিল্পীর মতই কবি রঙ ও রূপের পূজারী। আমরা একটি কবিতা সংগ্রহ বা চয়ন করতে পারি যার বিষয়বস্তু গোলাপ ফুল। কিন্তু কবির মানসিকতায় শিশুসুলভ সতেজ ভাবটুকু থাকলেও কবি আর শিশু নন। তাঁর অনুভূতির শূন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা শিশুর অভিজ্ঞতায়

একেবারেই অলভ্য। তাঁর কবি কৃতির কৌশলই হ'ল তাঁর খেয়ালখুশি, তাঁর আবেগকে প্রাণবন্ত করা, তাদের সত্য ক'রে তোলা; এইটুকু না হলে কবি পাঠকের কাছে তাদের যথাযথরূপে হাজির করতে পারেন না। কবি যে-পন্থায় তাঁর সংবেদনকে উজ্জ্বলতর ক'রে তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধা করেন। কবিতাকে অনেক সময় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ গীতি-কবিতারই বিষয়বস্তু হ'ল কবির একান্ত ব্যক্তিগত আবেগময় জীবন। কবিরা বারবার মানুষের জন্ম এবং যৌবনকে ঘিরে কাব্য রচনা করেছেন। কারণ কবিরাও মানুষ এবং মানুষের আবেগের প্রতি তাঁদের অশ্রান্ত আকর্ষণ। কবিরা যখন এইসব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাঁদের সৃষ্টিতে প্রাণস্পন্দনটুকু প্রত্যক্ষ হয়, তাঁদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর কারণ তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু সাধারণ-বোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তাঁদের প্রকাশটুকু অনন্যসাধারণ বলে। কাব্যে কবি মানুষের যেন একটি অবিসংবাদিতরূপে গ্রাহ্য মানস অবস্থার কথা বলেন মৃত্যুহীন ভাষায়:

Oh, never say that I was false of heart.
When absence seemed my flame to qualify.
As easy might I from myself depart
As from my soul which in the breast doth lie.

হাজার হাজার নরনারী তাঁদের প্রেমাস্পদের জন্য অস্পষ্টভাবে এক ধরনের সুতীব্র আবেগ অনুভব করেন বটে কিন্তু তাঁরা সকলেই সেক্ষপীয়রের সেই সনেটটিতে নিজেদের অনুভূতিকে খুঁজে পান; কবি সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্যসাধারণ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। কবি-কথিত প্রেমের সজীবতা এবং প্রচ্ছন্ন বাস্তবতা তাঁদের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।

আবেগের ভুবনে কাব্য হ'ল সর্বোত্তম প্রবক্তা; অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এমন সুন্দর ক'রে প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে বা তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে যা একান্তই উপেক্ষনীয় তা-ই কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। জলের রাসায়নিক তত্ত্বে কবির কোন আকর্ষণ নেই, তিনি দেখেন জলের ওপরে রোদের ঝিকিমিকি,

আলোর শুভ্র আভা। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে কবির যে নিত্যযোগ এবং তদ্‌জাত যে আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় তা একমাত্র কবিরই অনুশীলনের বস্তু। বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক তেমনি যে কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি মৃত। আবেগের উদ্রেক নানান ভাবে ঘটতে পারে। ব্লেক্ তাঁর দুর্জ্ঞেয়বাদের দ্বারা, ডোন তাঁর যৌন আবেদনের দ্বারা, দান্তে তাঁর ভগবদ্ প্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তাঁর প্লেতোনিক ভাববাদের সহায়তায় আমাদের আবেগের প্রস্রবনকে বারবার মুক্ত করে দিয়েছেন। কবির মনে যে চিত্রকল্প এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয় তা হ'ল কাব্য-সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা ; প্রবল ভাবে বাঁচার জন্যই এই চিত্রকল্প ও সঙ্গীতের সমারোহটুকু সম্ভব হয়, কবি এই প্রাচুর্যটুকু মনে মনে উপলব্ধি করেন, তাঁর আবেগ-অনুভূতির অতলতাটুকু তিনি প্রকাশ করতে চান এবং অনেক সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপরের সঙ্গে এটুকু একত্রে উপভোগ করতে চান। What is Art গ্রন্থে ঋষি তলস্তয় নিষ্ঠাকে নন্দনতত্ত্বের গুণ হিসেবে খুব উঁচে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তলস্তয় নৈতিক নিষ্ঠাকে বুঝেছিলেন। নন্দনতত্ত্বের ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ বলে গণ্য করা যায়। কবিতার মধ্যে কবি আপনার উৎসাহ আবেগ বহুলপরিমাণে অনুস্যূত ক'রে দেন এবং কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে এমন কৌশল থাকে যা পাঠকের মনে কবির উৎসাহ আবেগকে সঞ্চার ক'রে দিতে পারে। বস্তু, ব্যক্তি অথবা ভাব কবির অনুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে, কবি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়তে পারেন যে কোন একটি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। মানুষের মনে ভাবের অস্তিত্বও তার পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ; কবির আঙ্গিকের প্রসাদগুণে এই ভাবেরও হাত গজাতে পারে, একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয় ডাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে। কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যছন্দে স্পন্দমান ক'রে তুলতে পারে। কবি ভগ্‌হান লিখেছেন:

"I saw Eternity the other night
Like a great ring of pure and endless light."

ইংলণ্ডে একশ্রেণীর কবি রয়েছেন যাঁদের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর তরুণীর মত মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। লুক্রেটিয়স থেকে আর্লিংটন রবিন্সন পর্যন্ত কবিকুল এই শ্রেণীভুক্ত।

এমন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা বিরোধ আছে; চিন্তাবিদের বিশ্লেষণ-মুখীনতা ও কবির ইন্দ্রিয়জ আবেগপ্রবণতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা প্লেতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কী ভাবে ভাব আবেগতপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পারে। যে কোন ভাবকে কোন রূপক অথবা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়, কেবলমাত্র সূত্রাকারেই তা প্রকাশ-যোগ্য নয়। 'ফ্রিডাস' গ্রন্থে প্লেতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার সৃষ্টি করেছেন, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমার মাধ্যমে তাকে রূপ দিয়েছেন, বলেছেন যে আত্মার রথ ছুটে চলেছে স্বর্গকে বারবার প্রদক্ষিণ ক'রে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের আবেগময় পরিণতি দেখিয়েও দেখানো যায় যে ধর্মকে ঘৃণা ক'রেও স্বর্ণবর্ণোজ্জ্বল স্বাধীনতা এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তুকেন্দ্রিক ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কবি-কল্পনা নানা ভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে—ছোট, বড়, মহৎ অথবা ক্ষুদ্র যে কোন উদ্দীপকই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। যদি কবির কল্পনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে থাকে তাহলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্যকে মহাকাব্যের উপজীব্য করে তুলতে পারবেন; সেই কাব্যে একদিকে যেমন বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং মহিমা থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেই কাব্যে সঙ্গীত এবং আবেগময় রূপকল্পেরও অসদ্ভাব হবে না। কবির স্বভাবজ কাব্য শক্তির ধর্ম হ'ল ছন্দোময় চিত্র-ধর্মী উদ্ভাবনী ক্রিয়া এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিমুক্ত অনুসন্ধানী মনের সন্ধান সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই দুটো ভিন্নধর্মী ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমরা প্রবল আবেগমুখর The Divine Comedy অথবা On the nature of things অথবা Paradise Lost-এর মত মহা-কাব্যের সন্ধান পাই। আমাদের যুগেও হয়তো এমন কাব্য রচিত হবে।

এমন কবি হয়তো আবির্ভূত হবেন যাঁর লেখায় বস্তু জগতের সবটুকু জটিলতা এবং অদৃষ্টের লীলা কল্পনা-মুখর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করবে, এবং পাঠকের বুদ্ধি ও কল্পনাকে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে। স্বধর্মে কোন বিষয়েই ও আপনাকে একান্তভাবে কাব্যের উপজীব্য বলে দাবী করতে পারে না। যা আছে তা হ'ল কবি প্রতিভা। এই প্রতিভা কখন একটি গোপাল-কোরককে নিয়ে কাব্য রচনা করে আবার কখন তা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপন কাব্যের উপজীব্য মনে করে। কবির কল্পনাগত অভিজ্ঞতার উপর এটা একান্তভাবে নির্ভরশীল।

গদ্যের শিল্পরীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে যায়। অবশ্য গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে বিবেচিত হতে পারে। গদ্যের যে প্রান্তিক রূপ, সেই রূপে আমরা দেখি ভাব ভাষাকে আশ্রয় ক'রে আপনাকে প্রকাশ করছে এবং কী প্রকাশ করেছে গদ্যে সেটাই বড় কথা, কীভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা নয়। গদ্য তার এই প্রান্তিকরূপে আপনার শিল্প প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে, সে শুধুমাত্র প্রকাশের বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গদ্যকে এইরূপে আমরা সঙ্কেত চিহ্নের, সাঙ্কেতিক বার্তার অথবা কম কথার ব্যবহার করার সূত্র হিসাবে, তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি।

গদ্যের যে সীমান্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইখানে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে তফাৎ করা দুষ্কর। গদ্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত উপাদান ও বিশুদ্ধ সংগীত উপাদানের আবিষ্কার করা যে কোন লেখক অথবা পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য। সংবেদনগত রীতি-নৈপুণ্যে গদ্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে যে ধরনের সৌন্দর্যসৃষ্টি করে তা কাব্যের মত মনোহারী না হলেও, তা যে রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য। গদ্যের ছন্দ হ'ল বিমুক্ত ছন্দ, কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি সূক্ষ্মতর। আপন স্বরূপে গদ্যকে শিথিল কাব্যরূপ বলা যেতে পারে। প্যাটারের মত লেখকের লেখা আমরা পড়ি তার সুন্দর শব্দবিন্যাসের জন্য, ডি. কুইন্সের রচনা পড়ি তাঁর চিত্রকল্প এবং গদ্যছন্দের উৎকর্ষের জন্য, রাস্কিন পড়ি তাঁর স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জ্বল

বর্ণনার জন্য। অনেকের মতে এইসব লেখা গদ্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলতা নেই।

গদ্য বহুবিধ এবং এর অত্যদ্ভুত নমনীয়তা নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে। গদ্য এমন এক শিল্পের বাহন যে শিল্পে রীতিটুকু মুখ্য নয়। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা লেখকের ভাব অথবা মানসিক অবস্থার রূপটুকু খুঁজি ; সেইরূপে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে চাই। কবিতার মত অতোখানি সংবেদনশীল প্রকাশ না চাইলেও আমরা গদ্যসাহিত্যে লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে পাই। সেই অপরূপ প্রকাশভঙ্গী বক্তব্যের অধিক অর্থ বহন করে।

নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শের নিদর্শন হিসাবে উপন্যাস বিশেষ সাগ্রহ মনোযোগের দাবী রাখে। কিন্তু সৃষ্টি-কর্মের নিদর্শন হিসেবে সমগ্র কল্পনা প্রক্রিয়ার প্রকৃতির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। প্রাথমিক বিষয়জ্ঞান থেকে আরম্ভ ক'রে সকল অভিজ্ঞতাই হ'ল কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস-মাত্র। আমরা বস্তুকে দেখি না ; আমাদের প্রকৃতি এবং স্বভাবে আগত নিরন্তর উদ্দীপন থেকে আমরা বস্তুর রূপটুকুকে গড়ে নিই। রূপকার্থে বলছি না, যথার্থ ই টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, বাড়িঘর, শাকসবজি, রাজরাজড়া, এরা সবাই আমাদের কল্পনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে আমরা যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তা দিয়ে আমাদের চারপাশের স্থায়ী বস্তুজগৎটার নির্মাণ সম্ভব হয়। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বিদ্যমান তা স্থপতির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয় ; অন্যলোক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, আমাদের নিকটতম বান্ধব অথবা আমাদের পরিচিত ব্যক্তিরও আমরা যে রূপ কল্পনা করি, তাদের সঙ্গে নিত্য আলাপ-আলোচনা, ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তকে সমন্বিত ক'রে যে কল্পিত জগৎটুকু সৃষ্টি করি তা হ'ল আমাদের কল্পনার স্থাপত্য-শক্তির নিদর্শন।

আমাদের সমস্ত জ্ঞানই হ'ল কল্পিত ছবি, একে অলিখিত কল্পনাও বলা চলে। ঔপন্যাসিক ইচ্ছা ক'রেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদ্‌পটে স্থান দেন, ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও অভিমতকে চারিত্রসত্তা দান করেন। ভগবানের চেয়েও

অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত ভিত্তির উপর উপন্যাসকার আপন উপন্যাসের জগতটুকু সৃষ্টি করেন। আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পষ্টতর ও অবিসংবাদিত সত্তা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন টম জোনস্, ডেভিড কপারফিল্ড অথবা আনা কারেনিনা। এইসব চরিত্র শুধু যে বেঁচে আছে তাই নয়, এরা এদের নিজের জগতে বেঁচে আছে। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আনা কারেনিনা যে সমাজে তাঁর অনুরূপ ঐশ্বর্যবান অথচ তাৎপর্যহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনের পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাশুভের ধারণা চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে। তলস্তয় একটি নতুন সভ্য সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজব্যবস্থার কথাচিত্র অঙ্কন করেন নি। কাল্পনিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হ'ল এই যে আমরা উপন্যাসবর্ণিত পাত্র-পাত্রীর ঐশ্বর্যের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে। আমরা তাদের জয়লাভে বা বিপর্যয়ে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করি একেবারেই সত্যিকারের কোন মুল্য না দিয়ে। আমরা যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এদের সঙ্গে বিচরণ করি, এঁদের সঙ্গে যে ভালবাসার আস্বাদন করি তা পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনাপেক্ষা বিস্তৃততর, বিচিত্রতর এই জীবনে অনুপ্রবেশ লাভ ক'রে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের জীবনধারাকে আরও সুন্দরভাবে, আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও ভালভাবে শিখি। ঔপন্যাসিকেরা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি শিক্ষা দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন, এঁদের কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাঁদের জীবনযাত্রার উপর তাঁদের বিষাদবিধুর চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যাসকার হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্তা। অনেক পাত্রপাত্রী নিয়ে যদি একটা গল্প লিখতে হয় তাহলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা দরকার। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁর সবচেয়ে কম দার্শনিকচেতনা আছে বলে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের ঘটনা-পারম্পর্যের পরিকল্পনায়,

পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি তাঁর আপন জগত সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে রূপ দেন, যখন আমাদের সমকালীন উপন্যাসকার হার্ডি, আনাতোল ফ্রাঁস অথবা টমাস ম্যানকে আমরা দার্শনিক বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সমকালীন দর্শনশাস্ত্রীদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর অর্থে দার্শনিক। তাঁরা তাঁদের চিত্রিত চরিত্রের মধ্য দিয়ে, আপন আপন ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তাঁরা তাঁদের জীবন মূল্যায়ন-টুকুর যাথার্থ্য সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্বের পটভূমিকায় নির্ণাত করেন। তাঁরা শুধুমাত্র মূল্যায়নই করেন না, তাঁরা নতুন এক জগতের সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক দর্শনচিন্তায় আমরা এমন একটি জগতের আবিষ্কার করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগত উপন্যাসকারের সৃষ্ট জগত থেকে পূর্ণতর এবং ব্যাপকতর। কারণ উপন্যাসিকের মন অনন্তে সংলগ্ন এবং তাঁর সৃষ্টি ও কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে প্রবেশ করেছে।

(খ)

বিষয়বস্তু, দৃষ্টি ও দৃশ্যশিল্প

পৃথিবী সম্পর্কে শুধু আলোচনাই করা চলে না, চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখতে হয়। কথা বলার জন্য শুধু যে আমাদের জিহ্বা আছে তাই নয়, শোনার জন্য যে কান আছে তাই নয়, দেখার জন্য চোখও রয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের কান দিয়ে আমরা শুধু আনন্দের জন্য সঙ্গীত শ্রবণ করি না, অর্থহীন শব্দও শুনি যা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। আবার আমরা প্রতীকী শব্দও শুনি। সে শব্দ তর্ক-শাস্ত্রসম্মত অর্থের ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। চোখের পক্ষেও বস্তুগুলি অর্থহীন সঙ্কেত বলে মনে হতে পারে, কোন একটি পুস্তকের পাতায় দেখা অর্থহীন অক্ষরসমষ্টির মত। অথবা কোন একটি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিশেষ ভাষায় লেখা দুর্বোধ্য আলোচনার মতও মনে হতে পারে পার্থিব বস্তুগুলিকে ৮ মানুষের ব্যবহারগত বুদ্ধির মূল্যায়ন বস্তুগুলিকে প্রতীক-শৃঙ্খল বলে মনে হয়। Vision and Design গ্রন্থে Roger Fry বলেছেন যে দিনমানে আমরা বস্তুজগতকে যেভাবে দেখি তাকে কোন ক্রমেই 'নন্দনতাত্ত্বিক দর্শন' আখ্যা দেওয়া যায় না। আমাদের কাজের জন্য যেটুকু দেখা দরকার, কেবলমাত্র আমরা সেইটুকু দেখি। শিল্পতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুতে কতটুকু রঙ, রেখা, রূপ ও গুরুত্ব রয়েছে, তা আমরা একেবারেই দেখি না।

রঙ এবং রূপের দ্বারা প্রায় সকলেই আকৃষ্ট হয়। মনস্তাত্ত্বিকেরা আমাদের বলেন যে আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়জ উদ্দীপনার উত্তর দিই পেশীজাত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এই প্রতিক্রিয়াটুকু অত্যন্ত দুর্বল। হয় কোন পেশীতে সামান্য আকুঞ্চন জাগে অথবা কোন স্নায়ুতন্ত্রীতে সামান্য উত্তেজনা লক্ষিত হয়। চিত্রী অথবা ভাস্কর তাঁদের ইচ্ছাশক্তি চালনা ক'রে আপন আপন সংবেদনকে

ক্যানভাসে অথবা মর্মর ফলকে রূপদান করেন। দৃশ্যশিল্পের গুণাগুণ বিচার করার সময়ে শিল্পের দৃশ্যগত মূল্যটুকু বিচার করা হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান যে শিল্পটি তার দ্বারাই শিল্পকর্মের বিচার হয়।

দৃশ্যশিল্পের মধ্যে দর্শনগত গুণাবলী ছাড়াও যে শিল্পের অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, সে কথা আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব। আমরা এই প্রসঙ্গে যে চোখের কথাই ভাবি না কেন তা নিশ্চয়ই কোন না কোন মানুষের চোখই হবে এবং আমাদের চোখের সামনে যে কোন বস্তুই থাকুক না কেন তা গদ্য অথবা কবিতার কথার মত আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবে। ঐ যে রঙ, ঐ যে রূপ দেখছি, ওগুলো নিশ্চয়ই কোন বস্তুর রঙ ও রূপ, ক্যানভাসের ওপর আঁকা ঐ যে 'পিরামিড' দেখা যাচ্ছে ওটা নিশ্চয়ই কোন পবিত্র যূথবন্ধ পরিবার, ঐ যে উপবৃত্ত দেখছি, ওটি একটি মুখের ছবি, ঐ যে ছড়িয়ে পড়া লাল রঙ, ওকে আচ্ছাদন বস্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে অথবা সূর্যাস্তের উজ্জ্বল আভা হিসাবেও ওকে মনে করা যেতে পারে। কোন একটি ছবির বিষয়বস্তুকে মানুষের আবেগ-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। যে চোখ বিষয়-বস্তু অবলোকন করছে তা হ'ল মানুষেরই চোখ এবং মানুষের চোখ শুধুমাত্র দর্শনবিষয়ক মাধ্যমেই নয়, এবং চোখের শুধুমাত্র নন্দনতাত্ত্বিক আবহটুকুই আছে তাও নয়। চোখের এই বিকল্প ক্রিয়া এতই প্রবল যে অনেকের চোখেই চিত্র হ'ল নিখুঁত দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এঁরা কখনই ছবি দেখার শৈলীতে অভ্যস্ত হন নি এবং কখনো চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে সেই ধরনের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নি, যার ফলে চোখ শুধুমাত্র উপস্থিত বিষয়-টুকুকেই দেখে এবং সেই দর্শন থেকে আনন্দ পায়। ছবির আনন্দ তার রঙ এবং রেখা থেকে আহরণ করতে হবে, ভাস্কর্যকর্মের আনন্দটুকু পেতে হবে শিল্পকৃতির আকার ও আয়তন থেকে; স্থাপত্য কর্ম দেখে আমরা আনন্দ পাব তার উপরিভাগের শিল্পকৃতি এবং গুরুত্বের পরিমিতিবোধে। স্থাপত্যকর্মের বেলায় প্রয়োজনবোধ তার নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদনের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে যায়। বাড়ি, ঘরদোর দেখলেই তাকে প্রয়োজনের বিগ্রহ-মূর্তি বলে মনে হয়। একে কল্পনার সামগ্রী বলে বিবেচনা করতে দ্বিধা হয়।

ছবিকে ছবি হিসেবে দেখে তা থেকে আনন্দ পেতে হলে চোখের

সারল্য এবং তাৎক্ষণিক আবেদনে তার সাড়া দেবার শক্তিটুকু আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। অনেকের কাছেই আঁকা ছবি হ'ল রঙিন ফটোগ্রাফি মাত্র, এচিং হ'ল আর এক ধরনের ফটোগ্রাফি যার মধ্যে রেখাগুলি সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট রূপ নেয়। কিন্তু যাঁরা চিত্ররসিক মুখ্যতঃ তাঁরা শিল্পের এই প্রতিনিধিত্ব কর্মে বিশেষ আগ্রহশীল নন। তাঁদের আগ্রহ হ'ল দর্শনে এবং এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। চিত্রকর্মে প্রধানতঃ রঙ ও রেখা এবং তাদের বিস্তারই মুখ্য। এক অর্থে কথায় চিত্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা, যেমন বৃথা বাক্‌রচিত সঙ্গীতকে তর্কশাস্ত্রসম্মত সূত্রাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা। রেখার ভাষা, বিভিন্ন রঙের সমন্বিত রূপের আবেদনই হ'ল চিত্রের বৈশিষ্ট্য। কথার মাধ্যমে ছবির ভাষাকে ব্যক্ত করা যায় না। ছবি থেকে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা মিষ্টিকের ঈশ্বর-দর্শনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। একের প্রতিক্রিয়া অপরকে বোঝানো যায় না। চিত্র কর্ম আমাদের যে ধরনের আনন্দ দেয় তা হয়ত অন্যভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—তার বেশি কিছু নয়। De witt Parker এই প্রসঙ্গে তাঁর 'Principles of Aesthetics' গ্রন্থে বললেন :

'It is most sufficient that the picture moves us through the vicarious presence on a canvas of a moving object, it must stir us in a more immediate fashion through the direct appeal of sense. For example, a picture which presents us with a semblance of the sea will hold us through the power which the sea has over us; but it will not hold us so fast as a picture of the same subject which in addition grips us through its greens and blues and wavy lines. The one sways only through the imagination, the other through our success as well.'

অর্থাৎ চলমান কোন বস্তুর ছবি বলে মনে হলেই যথেষ্ট হল না, ইন্দ্রিয় পথে আরো সক্রিয়ভাবে আমাদের মধ্যে উত্তেজনাটুকু জাগাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সমুদ্রের ছবি দেখে মনের মধ্যে সমুদ্রের সেই অনন্ত শক্তিটুকুর প্রভাব অনুভব করা দরকার। কিন্তু

ছবির মধ্যে সেই শক্তিটুকু থাকে না যেটুকু মৌলিক বস্তুর মধ্যে থাকে। সমুদ্রের নীল, সবুজ রঙ আর তার সর্পিল উর্মিরেখার জাদু আমাদের মনকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। ছবি শুধু কল্পনার মাধ্যমে আমাদের প্রভাবিত করে। ছবির বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়পথে সংবেদন জাগায়।

বিভিন্ন রঙ ও বিভিন্ন স্বরগ্রামের মতই স্পন্দনমাত্র ; ইথারের ভিন্ন-ধর্মী স্পন্দনের ফলেই বিভিন্ন রঙের জন্ম। বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ধরনের গুণ আছে এবং আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর তার কার্যকারিতাও ভিন্ন। বিশেষ ধরনের স্পর্শ, শব্দ ও ঘ্রাণ আমরা পেয়ে থাকি। এগুলি অদ্বিতীয় এবং এদের রূপান্তর সহজসাধ্য নয়। অনুষঙ্গজাত বিভেদের কথা বাদ দিলেও রঙের বিভিন্নতার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা আনন্দ এবং বেদনাবোধ করে থাকি। শব্দের মত রঙের মধ্যেও বৈষম্য থাকে। লাল এবং বেগুনী রঙের মত তীব্র উজ্জ্বল রঙও আছে, আবার বিভিন্ন স্তরের মোলায়েম নীলচে রঙেরও অসদ্ভাব নেই। বিশেষ বিশেষ রঙ থেকে নির্বিশেষ রঙ্গন শিল্পর উদ্ভব করা হয়েছিল কিছুদিন আগে ; নির্বিশেষ স্বরশিল্প—যাকে আমরা সঙ্গীত বলি তা এই রঙ্গনশিল্পের সমতুল্য। কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁদের ওপর রঙের বর্ণালীর সামান্য ভেদাভেদের ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাঁরা বর্ণের সূক্ষ্মতর ভেদ সম্বন্ধেও অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল। একখানি সুন্দর ছবির কাছে তার আকর্ষণ বহুল পরিমাণে দ্রষ্টার বর্ণ-সংবেদন-শীলতার ওপর নির্ভরশীল। শিল্পী যে পরিমাণে দ্রষ্টার প্রাথমিক বর্ণ-সংবেদনশীলতাটুকুকে কাজে লাগাতে পারবেন সেই অনুপাতে ছবির আবেদনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে।

আমাদের সহজ অনুভূতিতে চোখে দেখে রঙ সম্বন্ধে যা মনে হয় তার সবটুকু সত্য নয়। রঙের সঙ্গে প্রীতিপ্রদ এবং অপ্রীতিকর বহু স্মৃতি এবং সংবেদন বিজড়িত থাকে। রক্তের সঙ্গে লাল রঙের, আকাশের সঙ্গে নীল রঙের, সূর্যালোক অথবা গ্রীষ্মকালের সঙ্গে হলুদ রঙের, কালো রঙের সঙ্গে শোকের, ধূসর রঙের সঙ্গে বিষাদের যোগটুকু সর্বজনবিদিত। অজ্ঞাতপথে আমাদের সংবেদনের সঙ্গে স্মৃতির একটি নিগূঢ় যোগ রয়েছে। তাই জন্যই কোন একটি ছবির রঙে আমাদের

মনে অপ্রত্যাশিত রকমের তীব্র প্রতিক্রিয়া কখন কখন দেখা দেয়। রঙের যে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে চোখে দেখা রঙটুকু এবং স্মৃতিপথে টেনে আনা সেই রঙের অতীত স্মৃতি—এদের উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অনেকেই রঙ দেখে খুশি হন, যেমন সমুদ্রের, আকাশের, বালির রঙে, অনাদি-বলয়-বিলম্বিত মহাদৃশ্যের রঙের সমারোহে, বহুরূপীর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আমাদের উল্লাসের অন্ত থাকে না। আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি, মনে হয় যেন অনন্ত সুরসমুদ্রে ডুবে গেছি। রঙ্গীন স্ফটিকাধারে যে বর্ণ বৈচিত্র্য, দীপাধারে যে বর্ণসমারোহের প্রতিফলন, হীরাজহরতে যে বর্ণালীর লীলা তার মধ্যে দর্শক ডুবে যান। ছবির মধ্যে অবশ্য আমরা কোন একটি রঙকে অসংলগ্ন, একক হিসাবে পাই না, ছবির সমন্বিত রূপের মধ্যে তা একটা বিন্দুমাত্র, চতুর্দিকে তার রেখার বেষ্টন, এই রঙ রূপকে নির্দিষ্ট করে দেয়। ভিনিসিয়ান চিত্রে রঙের বাহারই হ'ল চরম শিল্পমূল্য (উদাহরণ হিসাবে টিশিয়ান এবং টিনটেরেটোর উল্লেখ করছি), তবু সে রঙ কোন একটি বস্তুর রঙ। চিত্রের যে কাঠামো তার স্পন্দনটুকুকে আশ্রয় করেই রঙের মাধুর্য। সূর্যাস্তের ছবিতে রঙ দিয়ে দিয়ে রঙীন নক্সা তৈরী করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য নয়; অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে সমৃদ্ধতর বর্ণবহুল স্বপ্ন আমরা দেখি তাকে ছবির মধ্যে বিধৃত করে দিই এবং তা বহুল পরিমাণে বাস্তবের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করে।

শিল্পীর রঙ ইন্দ্রিয়গোচর সমন্বয়টুকু শিল্পে আমদানি করে এবং এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতি মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছবির বিষয়বস্তুতে একধরনের আলো আর রঙ জুড়ে স্তিমিত সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়। চক্ষুগ্রাহ্য পরিবেশের তারা অঙ্গ ও উপাদান। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে রঙ হ'ল চিত্রের বহিরাবরণ, ছবির বিষয়বস্তু রেখার মাধ্যমে ফুটে ওঠে, রূপ পায়, এগুলি হ'ল চিত্রের উপজীব্য। দর্শনকৃতিকে রঙের ঔজ্জ্বল্যে ঐশ্বর্যবান করে তোলা হয়, দর্শনের তীক্ষ্ণতা, শক্তি ও গভীরতার প্রসার সাধিত হয়। চোখ যখন দেখে, তখন সেই দেখার ভিতর দিয়ে ছবির মধ্যে সংহতিসাধন করে।

এই সংহতিটুকু আসে রূপ এবং আকারের মাধ্যমে, বিভিন্ন রেখার সমন্বয় এই রূপ ও আকারের আকর।

রঙের মত রেখারও বিশেষ আবেদন আছে। আমরা বলি যে সুন্দর জিনিষ দেখা অনেক সহজ। ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংগতি, বক্র-রেখার সাবলীলতা, সরল সুনির্দিষ্টতা এরা সবাই এক হ'য়ে আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দকে উৎসাহিত করে। বিশেষ বিশেষ রকমের রেখা, ভগ্ন ও বক্ররেখা, সরল এবং তরঙ্গায়িত রেখা, বৃত্ত এবং উপবৃত্ত এরা সবাই সঙ্গীতের উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রামের মত, উজ্জ্বল এবং টিমটিমে রঙে সজ্জা মুল্যে আমাদের স্নায়ুগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অভাবিত সমন্বয়সাধন করে। সঙ্গীতের তালের মত ছবির রেখাগুলিও এক ধরনের সঙ্গীত বললেই হয়। রেখাচিত্রে রঙের বালাই নেই। ফ্লোরেণ্টাইন প্রমুখ চিত্র-শিল্পের অঙ্কন রীতিতে রঙের ব্যবহার গৌণ—যাঁদের কাছে চক্ষুগত ইন্দ্রিয়াবেদন অতিমাত্রায় সত্য, তাঁরা ছবির রেখা দেখে রেখার সঙ্গে সঙ্গে রেখাকে অনুসরণ করেন এবং ছন্দোময় সংযোগে যে নির্বিশেষ বস্তুটার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাস করেন। অন্য সব নন্দনতাত্ত্বিক কৌশলের কথা বাদ দিলেও গোথিক শিল্পের সমুন্নত ঋজুতা, রেনেসাঁস শিল্প-রীতির প্রলম্বিত সমতা, গ্রীক পুষ্পাধারের নৃত্যপরা রেখা-শ্রেণী অথবা প্রাচীন অঙ্কন-শিল্পের অনমনীয়তা—এসবই হ'ল রসের আকর।

একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে চিত্রের রেখার মধ্য দিয়ে আমরা গতির সংবেদন, স্পর্শের সংবেদনটুকু পেয়ে থাকি। 'সহমর্মিতাবোধ' এই কথাটির সাহায্যে অনেক নন্দনতত্ত্ববিদ্ চিত্রকর্মে এবং ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে দ্রষ্টা যে আনন্দ লাভ করেন সেই আনন্দটুকুর উৎসের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সহমর্মিতাবোধকে Empathy বা Einfühlung বলা হয়েছে পশ্চিমী নন্দনতত্ত্বে। এর দ্বারা আমাদের শরীরের একটি বিশেষ প্রবণতাকে বোঝানো হয়েছে। মনুষ্যদেহ আপন উত্তেজনা ও গতি-শীলতার মাধ্যমে বাইরের জগতে দেখা বিষয়টির সম্যক অভিজ্ঞতাটুকু পেতে চায়। কল্পনায় আমরা ছবিটির প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে সঙ্গে চলি, ছবির মধ্যে যদিও কোথাও তালভঙ্গ হয়ে থাকে তা হলে আমাদের চলার মধ্যেও তালভঙ্গ হয়, অনুভূতির মধ্যে যে ছেদ পড়ে, এ তালভঙ্গ তারই ফল।

প্রবহমান তরঙ্গায়িত রেখা আমাদের উত্তেজনার প্রশমন করে এবং আমাদের অনুভূতি ও অর্ধ-উপলব্ধ নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আনন্দরসের সন্ধান করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবন্ত বিগ্রহরূপে নিজেদের কল্পনা করি, তেমনি ধারা ছবির অথবা মর্মর ফলকের জীবন্ত রেখাগুলির মধ্যেও আমরা সাময়িকভাবে আমাদের অস্তিত্বটুকুকে কল্পনা করি। ভাস্কর্যকর্মে উপরোক্ত 'সহমর্মিতা-বোধের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে। 'ডিস্‌কাস্‌ নিক্ষেপকারীর' মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা তার গতি এবং স্থিতি এতুটোকেই আপন করে নিই। আমাদের পেশীতে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয, পেশী দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে ওঠে, যখন আমরা মাইকেলেঞ্জেলোর গড়া কোন পেশীবহুল মূর্তির যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করি। একসময়ে ওয়াল্টার পেটার বলেছিলেন যে সব সার্থক শিল্পই আপন আপন বিশিষ্ট উপাদান এবং আঙ্গিকরীতিকে পুরোপুরি কাজে লাগায। ছবি দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তার উৎস হ'ল চক্ষুরীন্দ্রিয এবং চোখের দরবারেই ছবির আবেদন এসে পৌঁছায়। সমকালীন সমালোচকেরা বিশেষ করে ছবির প্রাথমিক এবং দৃশ্যগুণের উল্লেখ করেছেন। এঁদের অন্যতম এ্যালকর্ট বার্ণস্‌ তাঁর 'The Art in Painting' গ্রন্থে এই ধরনের কথা বলেছেন। ভাস্কর্য শিল্প-সম্বন্ধেও এঁদের মন্তব্য খাটে। তর্কশাস্ত্রের রীতি মেনে বলা যায় যে সঙ্গীতের মত চিত্রও নির্বস্তু শিল্প বলে পরিগণিত হতে পারে। ছবিতে রেখা. রঙ ও আকার প্রমুখ উপাদান দ্রষ্টার আনন্দের স্বরূপ। এরাই বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টি ছবির আত্যন্তিক মূল্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। শিল্প বিচারের এই প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিতে ম্যাডোনা অথবা একদল সন্ন্যাসীর প্রতিকৃতির, এক ঝুড়ি ফল অথবা বাড়ি ঘরদোরের ছবি যা-ই আঁকা হোক, সবার মূল্যই সমান। ছবির শিল্প-মূল্য অথবা মনুষ্য-সম্বন্ধ সম্পর্কিত ভাবমূল্যের কোন ইতরবিশেষ হয় না। শিল্প-সমালোচকের চোখে কোন চিত্রের অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক ছক অথবা ছবিতে ব্যবহৃত রঙের মানচিত্রটুকু অত্যন্ত মূল্যবান বলেই মনে হবে। ছবিতে কোন বিষয়কে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করেই একথা বলা চলে। সমকালীন চিত্রসমালোচনায় একদল

প্রান্তিক মতবাদী রয়েছেন যাঁদের মতে ভবিষ্যতে শিল্পে কোন বিষয়কে বা বস্তুকে চিত্রিত করার প্রয়াস থাকে না, শুধুমাত্র যা উপস্থাপিত করা হবে চোখের সামনে সেইটুকুই দেখা হবে; মনোযোগ এবং কল্পনাকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য কোন বিষয়কে শিল্পে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হবে না। দর্শকের দৃষ্টি এবং চিত্রীর মনোযোগ যা দর্শনীয় তার প্রতিই থাকা উচিত, একথা বলাই বাহুল্য। অন্যথায় চিত্রকলা দৃশ্যকাব্যের দৃপ্তরূপে পর্যবসিত হবে মাত্র। বাইরের বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নেই, ভিতরে যে দিবাস্বপ্ন বোনা হচ্ছে তার দিকেই লক্ষ্য। যারা পড়তে শেখেনি তারাও ছবি দেখে আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু চিত্রকলা শুধুমাত্র নির্বস্তু রঙের ও রূপের আধারমাত্র হবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শুধুমাত্র এই ধরনের আধারে শিল্পকে যে পর্যবসিত করা যাবে না, এর পিছনে নন্দনতাত্ত্বিক যুক্তি রয়েছে। আমাদের আগ্রহ ও স্বার্থ-জড়িত পরিচিত বস্তুই নন্দনতাত্ত্বিক আধাররূপে পরিগণিত হয়। ছবির কোন গুণের ব্যত্যয় হয় না যদি ছবির মধ্যে একটা আকর্ষণীয় মুখচ্ছবি আঁকা থাকে অথবা এমন একটি নিসর্গলোকের দৃশ্য আঁকা হয়ে থাকে যার মধ্যে দর্শক শান্তি, স্বাধীনতা অথবা আনন্দের সন্ধান পান। চিত্রী এবং দর্শকের এই সত্যটুকু সদাসর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে চিত্রের বিষয়বস্তুকে চিত্রমূল্য অর্জন করতে হবে। সাধারণভাবে যা মানুষের কাছে মূল্যবান তাকে রঙে ও রেখায় দর্শকের চোখে মনোরম করে তুলতে হবে। সাধারণ দর্শক যখন অভিযোগ করেন যে তিনি চিত্রে আঁকা 'সূর্যাস্ত' বা 'মানুষের মুখ' সত্যি কখনো দেখেন নি, তখন তিনি অনৃতভাষণ করছেন না। কিন্তু তিনি যে সত্যের কথা বলছেন তার দ্বারা তিনি চিত্রের শিল্পগুণের অপযশ করছেন না। ফটোগ্রাফিতে বিষয়কে যেমন হুবহু নকল করার চেষ্টা হয় শিল্পী নিশ্চয়ই সেই ধরনের চেষ্টা করেন না। তিনি আপনার শিল্প-মাধ্যমে বাইরের পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশকে চিত্রিত করতে চাননি, তিনি চেয়েছেন প্রাকৃতিক জগতের অথবা মনুষ্যলোকের একটি ভাবচিত্র আঁকতে যা একাধারে চিত্তাকর্ষক হবে, সমগ্র কল্পনাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াকে প্রকট করবে। যে রঙের বাহার প্রকৃতিতে দেখি না, তা নন্দনতাত্ত্বিক সমর্থন পেতে পারে। রেখার সমন্বয়ে এমন

ভূচিত্র আঁকা যায় যা হয়ত সত্যই কোথাও নেই ; কিন্তু সে ভূচিত্র নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবতায় ন্যূন হবে না যদিও সাধারণভাবে তাকে সত্য বলা চলবে না। ছবিতে আনুপাতিক পরিণতি আনতে গিয়ে অনেক সময় প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করতে হয়।

চিত্রকর প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন না, যেমন তর্কশাস্ত্রবিদ বাস্তবের প্রতিলিপি রচনা করেন না। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবতা। শিল্পী যখন তাঁর শিল্পসৃষ্টির ইন্দ্রিয়জ স্বচ্ছতা এবং দর্শনগত আনন্দটুকুকে ক্যানভাস অথবা পাথরের বুকে শাশ্বত ক'রে রাখেন সেই মাহেন্দ্রলগ্নে আমরা নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তবটুকুর দেখা পাই। এই বাস্তবতাটুকুর সৃষ্টি হয় শিল্পীর রেখায় ও রঙে। শিল্পী যে রঙ ও রেখার সমন্বয় ঘটান তার যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই ছবির গভীরতায় ও স্বচ্ছতায়, তার সৌন্দর্যরসে। তাই কোন মানুষের হুবহু নকল করা ছবিতে তার মুখসৌন্দর্যের সত্যটুকু প্রকাশিত না হতেও পারে। তার মুখমণ্ডলে স্থানে স্থানে হয়ত এমন সব রঙ শিল্পী আবিষ্কার করলেন, যে রঙটুকু হয়ত প্রকৃতি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। চোয়ালের পাশে হয়তো এমন একটা রেখা রয়েছে যার কোন ফটোগ্রাফিতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অল্প। তা সত্ত্বেও তাঁর ছবিটা বন্ধুদের কাছে খুবই স্পষ্ট এবং অর্থবহ বলে মনে হবে। যাঁরা তাঁকে দেখেন নি তাঁদের কাছেও ছবিটি অস্পষ্ট, অর্থবহ বলে মনে হবে না। প্রকৃতি থেকে যেটুকু পার্থক্য দেখা যাবে, যেটুকু বিকার পরিলক্ষিত হবে তা শিল্পীর শিল্প-আঙ্গিকের অংশ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই আঙ্গিকের সাহায্যে শিল্পী ছবিকে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি করে গড়েন না, নন্দনতাত্ত্বিক অর্থে বাস্তব ও সুন্দর ক'রে রচনা করেন।

ছবির উপজীব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তুগতের প্রতিকৃতি নয় ; ছবিতে এমন এক ধরনের সত্তা প্রতিষ্ঠা পায় যা কেবল শিল্পগতেই সুলভ। সেই চিত্রে যে জগত, যে সুসংহত বিশ্বের সৃষ্টি হয় তার মূলে আছে কবি-কল্পনার আলো, যে আলোয় অবগাহন ক'রে শিল্পের বিষয়বস্তু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সেই জগতের কারণ উপাদান হ'ল সুসংহত সঙ্গতি, রঙের, রেখার ও আকারের সমন্বয় ; চিত্রী এই সঙ্গতি, এই সমন্বয়টুকুকে ফুটিয়ে

তোলার সাধনা করেছেন। রঙের রেখায় ঐ ছোট্ট জগতটি বস্তুজগতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আকর্ষণীয় নয়; এ জগত স্বচ্ছ, সুসংহত ও আলোকোজ্জ্বল, এতে বর্ণ-বৈচিত্র্য আছে, রেখা-সুষমা আছে, আর আছে শিল্পীর খেয়ালী মনের স্পর্শ; যে কোন ভিনিসীয় ছবিতে অথবা Giorgione-এর আঁকা ছবিতে এমন এক ধরণের কল্পনার আলো এসে পড়েছে, যে আলোয় ছবির বিষয়বস্তু এক অনির্বচনীয় ঐক্যসূত্রে গ্রন্থিত হযে গেছে। ফ্লোরেণ্টাইন শিল্পে এবং অন্যান্য সমকালীন শিল্পেও ছবির কাঠামোকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ছবি থেকে পৃথক করে দেখা যায়; এই কাঠামোটাকে ছবির শিল্প-সত্তার মেরুদণ্ড বললে অত্যুক্তি হয় না। ছবি দেখে যে আনন্দ আমরা পাই তা হ'ল শিল্পজাত আনন্দ, যা দেখেছি সেই দৃষ্ট উপাদানগুলির সমন্বয় মাত্র।

একথা বললে ভুল হবে না যে চিত্রণ-শিল্প হ'ল একধরনের কাব্য, অথবা চিত্রণ-শিল্পেরও ছন্দ আছে। কিন্তু দৃশ্য-শিল্পের যে ছন্দ তা ছন্দোময় কথা থেকে স্বতন্ত্র। ছবিতে যে ছন্দটুকু পাই, যে কাব্যটুকু সন্ধান করি তা সাহিত্যের বিষয়বস্তু নয়। Wattaeu-এর গ্রাম্য পারিষদবর্গের উপস্থিতিতে ছবি রঙচঙে চিত্রময় কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা সত্য নয়। ছবির রেখায় ও রঙে ঐ পারিষদেরা জীবন পেয়েছে, আপন আপন স্বাতন্ত্রে ফুটে উঠেছে। ছবির যে কাব্য তা হ'ল রেখা ও রঙ; এদের নিজস্ব কল্পনার অনুরণন সমগ্র শিল্পকর্মটুকু জুড়ে থাকে। দ্রষ্টার মধ্যে ছবি স্বপ্ন জাগায়, দ্রষ্টাকে সম্মোহিত করে তার আপন ভাষ্য, আপন ছন্দের সহাযতায। সে ভাষা, সে ছন্দ হ'ল চিত্রের, কাব্যের নয়। ঐ তরল নীল রঙ, ঐ ছায়াটুকু, ঐ সতেজ ঋজু রেখার বাঁধনছেড়া নির্দেশ, ঐ আয়তনের অতিনির্দিষ্টতা, এইসব উপাদানের মধ্যেই মুহূর্তের জন্য দর্শকের চোখ ডুব দেয়, কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়। রেমব্রাণ্টের, এল গ্রেকোর, ফ্লোরেন্টিনীয় ব্রোন্‌জিনোর শিল্পকর্মের ছন্দ আমাদের মনে দিবাস্বপ্নের সঞ্চার করে। সেই দিবাস্বপ্নের ভাষাও হ'ল চিত্রের ভাষা, সেই চিত্ররূপের অনুধ্যানটুকুও দৃশ্যমান বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

চিত্র সম্বন্ধে যা বলা যায় তা ভাস্কর্যকর্ম সম্পর্কেও একই অর্থে

প্রযোজ্য। কিন্তু ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক অঙ্গ রয়েছে যেগুলি বিবেচনা করলে একে চিত্র থেকে পৃথক ক'রে বিবেচনা করতে হয়। সে পার্থক্যটুকু কেবলমাত্র শৈলীগত নয়। ভাস্কর্যশিল্পের বিষয়বস্তু হ'ল মানুষের দেহ; নিজেদের দেহ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক এবং আমরা আমাদের দেহসৌষ্ঠবকে অত্যন্ত রমণীয় মনে করি এটাও সত্যি কথা। ভাস্কর্যকর্মের আবেদন তাই দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়জ রমণীয়তার আবেদন এবং পরিচিত প্রিয় পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে সচরাচর লভ্য নৈতিক মনোভাব, তর্কশাস্ত্রসম্মত অভিপ্রায় এবং কল্পনাশ্রয়ী অনুষঙ্গ—এদের দ্রষ্টব্য ক'রে তোলার শিল্পপ্রয়াস। ভাস্করকৃত মূর্তি আমরা আগ্রহের সঙ্গে অবলোকন করি। তার ফলে ঐ মূর্তির উদ্যত পেশীমালার উত্তেজনাটুকু, আবার তার উত্তেজনা প্রশমনোত্তর শান্ত ভাবটুকু সহমর্মিতা-বোধের মাধ্যমে আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আমাদের মনে স্পর্শ পাবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমাদের স্পর্শানুভূতি উদগ্র হয়ে ওঠে। এই ভাস্কর্যকর্ম আমাদের আকষণ করে আপনার বীরত্বব্যঞ্জক মর্যাদাটুকুর গুণে, অথবা নৈতিক ঐশ্বর্যে অথবা যৌবনকালের শক্তি-সৌন্দর্যের উন্মাদনায়। গ্রীকবীর, গ্রীক ব্যায়ামবীর অথবা গ্রীক দেবতাদের মতই এই আকর্ষণ অনিবার্য। ভাস্কর্যকর্মে মানুষের মন, তার ইচ্ছা, তার অভিলাষ, এরা সবাই দেহান্বিত হয়; মর্মর পাথরে তৈরী মূর্তিটি শুধুমাত্র মর্মর মূর্তিই নয়, এটি হ'ল পাথরে গাঁথা বিশেষ কোন মনুষ্য-আদর্শের ভাস্করকৃত রূপ।

এই কারণে এবং অন্যান্য কারণেও ভাস্কর্যশিল্প তার বিষয়বস্তুর জন্য এক বিশেষ ধরনের মর্যাদার দাবী করে। ভাস্কর্যশিল্প এখন এমন যুগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যখন মানুষের জীবন শ্রী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ এথেন্সের রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় জীবন-যাত্রার ভাবগাম্ভীর্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও মানুষের দৈহিক সুষমা এবং এই দেহসৌন্দর্যকে কেন্দ্র ক'রে যাবতীয় রূপ-কল্পনাই হ'ল ভাস্কর্যকর্মের উপজীব্য, তবু তার এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো চিত্রশিল্পে অলভ্য। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ দিক থেকে প্রশ্নটি বিচার করা যেতে পারে। যে কোন দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন,

ভাস্করকৃত মনুষ্যমূর্তি আকর্ষণীয় শিল্পসৃষ্টি। ভাস্কর্যকর্মে সচরাচর রঙের ব্যবহার হয় না। শিল্প-উপাদানের স্তূপ এবং উপাদানে রচিত রেখার ব্যঞ্জনার উপরই ভাস্কর্যকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে। উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যকর্ম আমাদের মধ্যে স্পর্শের প্রবৃত্তিটুকু জাগায়। ভাস্কর্যকর্মের (তা সে মর্মরের ওপরই হোক অথবা ব্রোঞ্জের ওপরেই হোক, আর তা মসৃণই হোক বা রুক্ষমই হোক) প্রসাদগুণটুকুর নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেক। নগ্ন মনুষ্যদেহ হ'ল ভাস্করের শিল্পের বিষয়বস্তু। তাই আমাদের সভ্যসমাজে একে অসংলগ্ন নিন্দিত শিল্প বলেও এক ধরনের অভিমত রয়ে গেছে। যেখানে ভাস্কর্যশিল্প কোন বিশেষ নিদর্শন নিয়ে কাজ করছে, সেখানে ভাস্করের কানে বাজছে রেনেসাঁস যুগের সামান্য ধারণার অনুরণন, আর যখন ভাস্কর জাতিগত সামান্যের প্রতিনিধিকে শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন তখন তাঁর শিল্পে গ্রীক শিল্পের বিষয়-কেন্দ্রিক ব্যঞ্জনাটুকু ফুটে ওঠে। ভাস্কর্যশিল্প সুন্দর হলেও, এ একটি মৃত সভ্যতার হিমশীতল স্মারকস্তম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নতুন এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক ভাস্কর্য-শিল্পের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরসাস্বাদনের অন্তরশায়ী মৌল-তত্ত্বগুলির রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পাই স্থাপত্য-শিল্পে। স্থাপত্য-কর্মের যেসব বিজয়স্তম্ভ যুগে যুগে রচিত হয়েছে, স্থপতির নির্বাধ সৃষ্টিপ্রেরণায় যে স্থাপত্যশিল্প রচিত হ'ল তার মধ্যে চিত্রশিল্পের রঙ ও রেখার অন্বয়, ভাস্কর্যকর্মের অলংকরণ ও চিরায়ত করার প্রয়াস এবং কাব্যের কল্পনাপ্রবণ ব্যঞ্জনা সমন্বিত হয়েছে। গোথিক উপাসনাগৃহে, গ্রীক মন্দিরে, আধুনিক যুগের মহাবিদ্যালয়গৃহের গম্বুজশীর্ষে অথবা সেতুবন্ধে আমরা সঙ্গীত ব্যতীত সকল চারুকলার সুষমাটুকু এনে যুক্ত করি। এইসব বৃহৎ শিল্পকর্মে এক ধরনের স্থানিক বাস্তবতা ও তার আকর্ষণ রয়েছে যা অন্য শিল্পে একান্ত দুর্লভ। স্থাপত্যশিল্পী কখনো বিস্মৃত হন না যে তাঁর পরিকল্পনাজাত গৃহের রূপ এবং ব্যবহার-যোগ্যতা, এ দুটোই থাকা উচিত। অন্য শিল্পীদের এই বিবেচনাটুকু নেই। গৃহ শুধুমাত্র অলংকরণের আধার নয়, গৃহে ব্যক্তির এবং সমাজের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই প্রয়োজনই এর রূপটুকু নির্ধারণ করেছে।

স্থাপত্যশিল্প তাই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের মধ্যেকার সীমান্তভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে সে এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমাদের পরিবেশের অংশরূপে তার মধ্যে নিত্যদিন স্থাপত্য-শিল্প বিরাজ করছে বলেই আমরা ভুলে যাই যে এটি একটি বিশেষ ধরনের চারুকলা। মোলেয়ারের নাটকের কুশীলব Mr. Jourdain যেমন ভুলে গিয়েছিলেন যে সারাজীবন তিনি শিল্পের অন্যতম রূপ গদ্যশিল্পকে ব্যবহার করেছেন দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজনে। আমরা সুন্দর কুৎসিত নানা ধরনের ঘরবাড়ির দ্বারা চতুর্দিকেই পরিবেষ্টিত। আমরা তাদের মধ্যে বাস করি। আমরা তাদের স্বীকার করে নিয়েছি। যদি কোন শিল্প পুরো-পুরি আমাদের নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে তা হ'ল এই স্থাপত্যশিল্প। জাদুঘরে ছবিকে লুকিয়ে রাখা চলে। কবিতা না পড়লে, গান না শুনলে চলতে পারে কিন্তু ঘরবাড়ি, বিশেষ করে স্মারক ভবন-গুলি চোখে পড়বেই। আমরা দৈনন্দিন কাজে কর্মে বেরোলেই তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন মন্তব্য করেছিলেন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদেরা আপনার ভুলের চিহ্নমাত্র রাখে না আর স্থপতিরা তাদের ভ্রান্তিগুলি অনেক আয়াসে রচনা করেন।

আর এক অর্থেও স্থাপত্যশিল্প নিয়ন্ত্রিত। এটি ব্যয়বহুল শিল্প। স্থপতির কল্পনাজাত পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য। কবি গায়ক এবং চিত্রী এঁরা সকলেই অনেক কম উপাদান নিয়ে, অনেক কম পরিশ্রমে আপন আপন শিল্প সৃষ্টি করেন।

আমরা স্থাপত্যশিল্পকে দ্ব্যর্থবোধক বলেছি বলেই এমন কথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে স্থাপত্যশিল্পে সৌন্দর্যের ন্যূনতা ঘটে। পরন্তু দ্ব্যর্থবোধক হওয়ার ফলেই সৌন্দর্য কখন কখন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। কোন একটি ভবনের ব্যবহারিক উপযোগিতাটুকু ও তার যথাযথ আবেদন আমাদের কল্পনার দ্বারে পৌঁছে দেয়, এই সত্যটুকু স্থাপত্যসুষমার একটি বিশেষ দিককে উদ্‌ঘাটিত করে। কোন একটি ভবনের আকার, আয়তন অথবা রঙটুকুর জন্যই তার আবেদন সত্য হয়ে ওঠে না, মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এটি কতখানি উপযোগী তাও কিন্তু আমাদের এই প্রসঙ্গে ভাবতে হয়। কনস্তান্তিনোপলের মসজিদ,

ন্যুইয়র্কের রেলস্টেশনভবন অথবা লয়রের গ্রাম্যভবনের সৌন্দর্য বিচার করার সময় এ কথা মনে হয় যে এদের সুষমা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, আমরা যখন এগুলোকে আশ্রয় ক'রে যে জীবনধারা নিত্য-বহমান তার কথা চিন্তা করি।

কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে বাড়িটি সম্বন্ধে সর্বাগ্রগণ্য প্রাথমিক বিবেচ্য হ'ল এই যে এটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যে কোন দৃষ্টি-কোণ থেকেই দেখ না কেন, ছবির মত এটি আগ্রহের উদ্রেক করে এবং ছবির মতই রঙে ও রূপে এটিও সার্থক হয়ে উঠে। স্থাপত্য-কর্মে নেপের সার্থকথা অনস্বীকার্য। অবশ্য একে রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় গীর্জার নিদর্শন ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। যে কোন ভবনের সৃষ্টি-পরিকল্পনার মধ্যে এটি নিশ্চয়ই থাকবে তবে সে ঐক্যটুকু বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনোযোগকে নিত্য আকর্ষণ করবে। স্থাপত্য শিল্পের কোথাও অনাবশ্যক জটিলতা থাকবে না; গ্রীক উপাসনাগৃহে গোথিক প্রথায় নির্মিত ভবনের অভ্যন্তরভাগে আমরা যেমন নানাবিধ অলংকরণের মাধ্যমে গৃহের বিস্তার ঘটতে দেখি, সেই পথে স্থপতি তার নির্মিত ভবনের বিস্তার সাধন করলে সেই জটিলতাটুকু গ্রহণযোগ্য। স্থাপত্যকর্মের সৌন্দর্য নন্দনতাত্ত্বিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুটিকে উদগ্র করে তোলে। অলংকরণ ও গঠনের মধ্যে নিত্যদিন এই সৌন্দর্য ও মনোযোগের দোলা। যদিও একথা সত্য যে স্থাপত্যশিল্পে গঠননৈপুণ্যটুকুই মুখ্য কেন্দ্রিক রেখা ও আয়তনের গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য ভবন-গৃহটিকে গুরুত্ব দান করে। বিশেষ ধরনের উৎকর্ষ-সন্ধানী মনোযোগ হয়ত ভবনগৃহের অলংকরণকার্যের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে, এবং এই অলঙ্কারই ভবন-পরিকল্পনাকে ঔজ্জ্বল্য, বৈচিত্র্য ও মর্যাদা দান করে। Chartres-এ অবস্থিত গীর্জার তোরণদ্বারের ভাস্কর্যকর্মে অথবা রঙীন কাঁচের ওপর করা সূক্ষ্ম কারুকার্যে দর্শক-চিত্ত মুগ্ধ হয়। কিন্তু এইসব ভাস্কর্য মূলতঃ গীর্জার সম্মুখভাগের সামগ্রিক স্থাপত্য-পরিকল্পনার অঙ্গ-মাত্র। স্থপতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলা যায় যে গোলাপ-বাতায়নের রঙীন কাঁচের পাল্লার ওপর যে বর্ণ-বৈচিত্র, রঙের যে লীলা তা শুধুমাত্র ভবনের অভ্যন্তর ভাগের গভীরতাকে নির্দেশ করছে; গভীরতর ব্যাপ্তিতে তাকে প্রসারিত করছে। অলংকরণের প্রতি স্থপতির মমত্ববোধকে

আমরা সুন্দর ঝঙ্কারময় শব্দের প্রতি কবির মমত্ববোধের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। স্থাপত্যের সামগ্রিক আবেদনকে তীব্রতর করার জন্যই স্থপতি তার ব্যবহার করেন। আবেদনটুকুকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে অলংকরণের ব্যবহার তিনি কখনই করেন না।

যে ভবনে অলঙ্করণ করা হয়, সেই অলঙ্কারটুকু ভবনের গঠনশৈলীর দ্বারা বহুল-পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ ভবনের গঠনশৈলীও তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্দিষ্ট। যে কোন ভবনের রূপমাধুর্যের অংশবিশেষ নির্ভর করে ভবনটি কী পরিমাণে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনটুকু সাধন করছে তার ওপর। যে উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার পূর্ণতা-সাধনই তার রূপবিকাশের পক্ষে প্রশস্ত পথ। ইয়োরোপীয় স্থাপত্যের মহৎ নিদর্শনগুলি দৃশ্যগত উপাদানের মাধ্যমে আপন আপন ব্যবহারিক উপযোগিতাটুকুকে প্রকাশ করেছে। স্থপতির উদ্দেশ্য মূর্তি পেয়েছে এইসব স্থাপত্যের মাধ্যমে। গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় মান্তুয়ার Palazzo del Te ভবনটি একটি প্রমোদ প্রাসাদ, তামিয়েনের গীর্জাটি সুন্দর এবং পরিষ্কারভাবে পরিকল্পিত হলেও তা একটি উপাসনাগৃহ।

কোন ভবন নিশ্চয়ই শুধুমাত্র তার ব্যবহারিক প্রযোগকৌশলটুকুকে প্রকাশ ব্যাপারে প্রাধান্য দেবে না। যদি তা অবিমিশ্র স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই তার উপাদানের ধর্মকে প্রকাশ করবে। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে যে, স্থপতি যে পাথর এবং কাঠের বদলে ইস্পাত এবং লোহাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ ও সচেতন। যখন ইস্পাতের কাঠামোয় গ্রীক গীর্জার আদর্শে ব্যাঙ্কের ভবনটি নির্মিত হত অথবা পাথরের তৈরী রেনেসাঁস যুগের প্রাসাদের অনুকরণে একটি নির্মাণকার্য সাধিত হত সে কালকে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি। যে গৃহের স্থাপত্য-কৌশলে চক্ষু এবং কল্পনা উভয়েই প্রতারিত হয় সে ভবনের নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন বিরক্তিই উৎপাদন করে।

ব্যাপকার্থে সুন্দর, গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় নিখুঁত যে স্থাপত্যশিল্প তা উন্নততর কল্পনাশক্তির দ্যোতক। ফরাসীদের অসংখ্য প্রমোদভবন,

প্রাসাদ ও গীর্জাকে ফরাসীরা আপনাদের সভ্যতার, ঐতিহাসিক শিল্প-ঐতিহ্যের নিদর্শন বলে যে উল্লেখ করেন, এটা খুবই সঙ্গত। আমরা স্বীকার করি, এগুলি যথার্থই ঐতিহাসিক কীর্তিস্তম্ভ। অন্য কোন কাজের চেয়ে গৃহনির্মাণ কর্মেই সামাজিক কল্পনা আপনাকে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করে। কোন একটি জাতির স্থাপত্যকৌশল, স্থাপত্যকর্মে ব্যবহৃত অলঙ্করণ, এ সবই জাতির রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করে। সঙ্গীত, পদ্য অথবা গদ্য রীতি—এদের কোনটিই স্থাপত্যের মত এতোখানি জাতীয় চরিত্রকে প্রকাশ করে না। সঙ্গীত-প্রমুখ শিল্পকলায় অযৌক্তিক, অবাস্তব অথবা অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা চলতে পারে। স্থাপত্যশিল্পে তারা নিষিদ্ধ। গীর্জা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, রঙ্গালয়, প্রেক্ষাগৃহ, জেলখানা এ সবই হ'ল সমাজ-জীবনের কেন্দ্র; সমাজ-জীবনের চিত্র এদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। উজ্জ্বল সূর্য-করোজ্জ্বল পর্বতোপরি গ্রীক দেবালয়, চতুর্দিকে বাসভবন পরিবৃত সু-উচ্চ গোথিক উপাসনাগৃহ, রেনেসাঁস যুগের প্রাসাদ এবং আধুনিক কালের গগনচুম্বী অট্টালিকা, এরা সবাই ইস্পাত, কাঁচ আর ঋজু সরলরেখার সমন্বয়। অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য শিল্পের এই নিদর্শনগুলি সভ্যতার মর্মকথাটুকুকে অধিকতর স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করে। আমাদের জীবন-সত্তার প্রস্ফুটন ঘটে এইসব ভবনকে আশ্রয় ক'রে; এদের অলঙ্কার, এদের গঠনগত ঐক্য, কল্পনাগত উপযোগিতার মাধ্যমে আমাদের জীবন-ধারার মান নির্ণীত হয়, আমাদের জীবন ধারা হয় নিয়ন্ত্রিত।

গ্রন্থপঞ্জী

অভিনবগুপ্ত : ধ্বন্যালোকলোচন।

অরবিন্দ, শ্রী : (The) Foundations of Indian Culture, Thoughts & Glimpses, The Future of Poetry, Hindu Drama, The Human Cycle, Kalidasa, Last Poems, Letters of Sri Aurobindo on Savitri, Life, Literarure and Yoga, The National Value of Art, Our Ideal, Two Letters of Criticism, Vyasa and Valmiki.

আইজেনবর্গ, এ : Aesthetic Function of Language.

আইয়ুব, এ, স : The Aesthetic Philosophy of Tagore.

আনন্দবর্ধন : ধ্বন্যালোক।

আরনেষ্ট কাসিরের : An Essay on Man.

আরিস্ততল : Poetics.

আরুইন এডম্যান : Art and the Man.

ইউজেন ও নীল : Emperor Jones.

ইয়েটস : The Rose in the Heart.

ইণ্ডিয়ান পেন্টিং : Times of India Annual.

উইডগেরি (A. W. Widgery) : Contemporary Thought of Great Britain.

উইলিয়াম কেলি রাইট : A History of Modern Philosophy.

এলিয়ট, টি, এস্ : Principles of Literary Criticism.

এ্যারিস্টটল অন্ দি আর্ট অব পোয়েট্রি : অনুবাদক : ইনগ্রাম বাইওয়াটার।

ওকাকুরা : Ideals of the East.

অগডিন ও রিচার্ডস্ : The Meaning of Meaning.

ক্ষেমেন্দ্র : ঔচিত্যবিচারচর্চা।

কডওয়েল ক্রিষ্টোফার : Illusion and Reality.

কনটেমপোরারি ইন্দিয়ান ফিলজফি : Edited by S. Radhakrishnan & Muirhead.

কবিকর্ণপুর : অলংকার কৌস্তুভ।

কবির হুমায়ুন : Poetry, Monod and Society.

কলিংউড, আর জি : The Principles of Art.

কাজিন, এম ভি : Lectures on the True, the Beautiful and the Good.

কাজিনস্ জে এইচ : Tagore on Tagore.

কান্ট, ইমানুয়েল : Critique of Judgement.

কালিদাস : শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, উত্তররামচরিত।

কার উইলডন : Philosophy of Croce.

কুন্তক : বক্রোক্তিজীবিত।

কুমারস্বামী আনন্দ কেন্টিশ : Arts and Crafts of India and Ceylon, Citralaksana, History of Indian & Indonesian Art, Introduction to Indian Art, The Indian Craftsman, Rajput Painting, The Indian origin of the Buddha Image, The Dance of Siva, Some ancient elements in Indian decorative Art.

কেয়ার্ড, এডওয়ার্ড : Hegel, Indealism and the Theory of Knowledge.

কেয়ার্ড, হেগেল (Blackwood Philosophical Series)

Coates, Adrian : (A) Sceptical examination of Contemporary British Philosophy.

কারজিবিস্কি এ্যালফ্রেড : Science and Society.

ক্যারু টমাস : To a Lady that desired I would love her.

ক্যারিট : What is Beauty, Theory of Beauty.

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত।

ক্রোচে বেনেদেত্তো : Aesthetic, My Philosophy, The Essence of Aesthetics, What is living and what is dead in the philosophy of Hegel.

গডউইন : Political Justice.
গীতিচর্চা : দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।
গুপ্ত অতুলচন্দ্র : কাব্যজিজ্ঞাসা।
গুপ্ত নলিনীকান্ত : Tagore, a great poet, a great man.
গুপ্ত মনোরঞ্জন : রবীন্দ্রচিত্রকলা।
গ্যয়টে : Faust.
Gates : Psychology for Students of Education.
গ্রাউসে রেনি : The Civilisation of the East.
ঘোষ এস্ কে : Sri Aurobindo on Indian Aesthetics.
ঘোষ মনোমোহন : প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা।
ঘোষ শান্তিদেব : রবীন্দ্রসঙ্গীত।
চক্রবর্তী অজিত : কাব্যপরিক্রমা।
চক্রবর্তী আর এন সম্পাদিত : Early Works of Abanindranath Tagore.
চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র : আনন্দমঠ।
চট্টোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র : তত্ত্বজিজ্ঞাসা।
চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার : Master Artist and Innovator.
চণ্ডীদাস : শ্রীরাধার পূর্বরাগ।
চৌধুরী প্রবাসজীবন : Tagore on Literature and Aesthetics, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন।
চৌধুরী বিশ্বপতি : কাব্যে রবীন্দ্রনাথ।
চৌধুরাণী ইন্দিরাদেবী : The Music of Rabindranath Tagore.
জগন্নাথ : রসগঙ্গাধর।
জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান
সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল
আর্ট (সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা)।
জার্নাল অব ঈসথেটিকস
এণ্ড আর্ট ক্রিটিসিজিম্
১৯৪৮-৫০
জেমস, উইলিয়ম : Talks to Teachers on Psychology.

জীফ পল : Semantic Analysis.
জীমার : The Arts of Indian Asia.
জেণ্টিলে : The Theory of Mind as Pure Act.
জেলার : Outlines of Greek Philosophy.
জর্জ সাণ্টায়ন : The Realms of Spirit : Book fourth of realms of being.
ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, ভারত শিল্পে মূর্তি, ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, ঘরোয়া।
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : অচলায়তন, অরূপরতন, আকাশ-প্রদীপ, আত্মশক্তি, আধুনিক সাহিত্য, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ইতিহাস, উৎসর্গ, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি, ধর্ম, Modernty in Literature, Religion of Man, যাত্রী, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, শান্তিনিকেতন, শিক্ষা, শ্যামলী, পঞ্চভূত, Personality, Religion of an Artist, ঋতু উৎসব, কালমৃগয়া, কালের যাত্রা, কল্পনা, কালান্তর, চিরকুমার সভা, চৈতালি, চিত্রাঙ্গদা, চিত্রলিপি, চিত্রবিচিত্র, ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, জন্মদিনে, ডাকঘর, তপতী, তাসের দেশ, খাপছাড়া, পরিশেষ, পরিচয়, পথে ও পথের প্রান্তে, পুনশ্চ, প্রান্তিক, প্রভাতসঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বলাকা, বনবাণী, বিদায় অভিশাপ, বিবিধ প্রসঙ্গ, বীথিকা, বিশ্বপরিচয়, শেষ লেখা।
ডোনাল্ডসন্ আই : Essays in Criticism.
ডিউই : Philosophy of Civilisation, Democracy and Education.
বুদ্ধঘোষ : অথশালিনি।
বেল, ক্লাইভ : Art.
বের্গসঁ : Creative Evolution.
বাক : Fugue.
ব্যাবিট, আরভিং : The New Laokoon.
ব্ল্যাক ম্যাক্স : Language and Philosophy.
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল : পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান : শতবার্ষিকী গ্রন্থ।
ব্রাডলি : Appearance & Reality.

ব্রুক রুপার্ট : Great Love, The Dead.
বিনিয়ন : The Flight of Dragon.
বিদ্যাধর : একাবলী।
বিশী প্রমথনাথ : রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ ; রবীন্দ্রনাট্য-প্রবাহ; রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প।
বুঁলো মার্গারেট : Psychical distance as a factor in Art and an Aesthetic Principle.
বুচার : Poetry & Fine Arts.
বিশ্বনাথ : সাহিত্যদর্পণ।
বোপদেব : মুক্তাফল।
বার্নার্ড বোসাংকে : History of Aesthetic ; Priciple of Individuality & Value.
ব্রেশ্‌ট বের্টোল্ড : Three Penny Opera : The Life of Galileo, Man is Man ; Mother Courage ; Baal ; Dream in the Night ; The Rise and Fall of Mahoganny City ; The Exception and the Rule ; The Measures taken ; The seven deadly sins ; Caucasian chalk circle ; The good woman of Setzuan ; Puntilla and her man Malti.
ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ : কাব্য কৌতুক ; সাহিত্য মীমাংসা।
ভরত : নাট্যশাস্ত্র।
শ্রীমধুসূদন সরস্বতী : ভগবদ্ভক্তিরসায়ন।
মম্মটভট্ট : কাব্যপ্রকাশ।
মহিমভট্ট : ব্যক্তিবিবেক।
মারসেল গ্যাব্রিয়াল : The Metaphysical Journal.
মজুমদার মোহিতলাল : বঙ্কিমবরণ
মান্না গুণময় : রবীন্দ্রনাথ।
P. Mombe : A brief course in the history of Education.
মিল্টন : Paradise Lost.
মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ : Tagore's Music.

মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী।

মুখোপাধ্যায় ডঃ রমারঞ্জন : Literary Criticism in Ancient India ; রসসমীক্ষা।

Mukhopadhyay K. K. : New Education & its Aspects.

মুরে জি. আর. জি. : Aristotle.

ম্যাকটেগার্ট : Studies in Hegelian Cosmology.

মৈত্র সুশীল কুমার : Studies in Philosophy & Religion.

রঁমা রোঁলা : John Christopher ; People's Theatre ; Beethoven the Creator ; Life of Tolstoy ; Life & Gospel of Vivekananda.

রোঁলা এবং টেগোর : Ed, Alex Aronson & Krishna Kripalani.

রোঁলা : Alex Aronson.

রাজা কে. কে. : Indian Theories of Meaning.

রাধাকৃষ্ণন সর্বপল্লী : Philosophy of Rabindranath Tagore.

রায় নীহাররঞ্জন : রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, বাঙালীর ইতিহাস ; An Artist in Life.

রায় সুকুমার : আবোল তাবোল।

রায় বিনয়গোপাল : The Philosophy of Rabindranath Tagore.

Russel Bertrand : Problems of Philosophy ; Sceptical Essays.

রীড হার্বার্ট : The Meaning of Art.

E. G. Tangerman : ডিজাইন এণ্ড ফিগার কার্ভিং।

F. A. Taylor : ডিজাইন এণ্ড এক্সপ্রেশান ইন্ দি ভিজুয়াল আর্টস।

Louis Wolchonok : ডিজাইন্ ফর আর্টিস্ট্স্ এণ্ড ক্রাফটসমেন।

Luce A. : Berkeley's Inmaterialism.

তৈত্তিরীয় উপনিষদ।

Thilly, Frank : A History of Philosophy.

দত্ত ধীরেন্দ্রমোহন : Contemporary Indian Philosophy.

দান্তে : Epistle, Divine Comedy.

দাশগুপ্ত শশীভূষণ : শিল্পলিপি।

দাশগুপ্ত সুধীরকুমার : কাব্যালোক।

দাশগুপ্ত সুরেন্দ্রনাথ : কাব্যবিচার ; রবিদীপিতা; Fundamentals of Indian Art.

দে বিষ্ণু : Rabindranath Tagore—Our Modern Painter.

ধনঞ্জয় : দশরূপক।

ধাওয়া : History of Symbolism.

নক্স, এ : The Aesthetic theories of Kant, Hegel & Schopenhauer.

নরবানে ভি. এম্ : The Ethics of Rabindranath Tagore.

নন্দী সুধীরকুমার : Aesthetics of Romain Rolland, An Enquiry into the Nature & Function of Art, On Aesthetic & Ethical Values ; Studies in Modern India Aesthetics ; রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ, ললিতকলা ও জনমানস ; রূপান্তরের দুর্গমপথে।

নাহম মিল্টন. সি : Structure and the Judgment of Art.

নিবেদিতা সিষ্টার : Art Reviews in Modern Review, ১৯০৭ এবং ১৯১০।

নিয়োগী পৃথ্বীশ : Centenary Folio of Tagore's Paintings.

De Witt Parker : Principles of Aesthetics.

নীৎসে : The Birth or Tragedy.

পন্টি, মেরিলিন : The Phenomenology of Perception.

পুনেকর শংকর মোকাসি : The later phase in the development of W. B. Yeats.

প্লেতো : Republic ; Ion ; Phaedrus ; Complete Works of Plato, Five Dialogues.

প্লুতার্ক : How a Youngman ought to study Poetry.

Heinrich Wolfflin : প্রিন্সিপল্‌স্ অব আর্ট হিষ্ট্রি।

ফলকেনবর্গ রিচার্ড : History of Modern Philosophy.

ফাইফ্ ডব্লু হ্যামিল্টন্ : Aristotle's Art of Poetry.

Amadee Ozanfant : ফাউণ্ডেশনস্ অব মডার্ন আর্ট।

Field, G. : The Philosophy of Plato.

ফ্রাই রোজার : Vision and Design.
ফ্রোবেল : Education of Man.
Thomas Fuller : Holy State & Profane State.
Roger Fry : Vision and Design.
বউমগার্টেন : Aestetica.
বওয়ার, এস্ : An Introduction to Tagore's Mysticism.
বওয়ার অটো : Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie.
বওয়িক : On the Laws of Japanese Painting.
বসু. এস্. এন্ : The Art of Pirandello.
বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ।
বন্দ্যোপাধ্যায় কনক : রবি পরিক্রমা।
বন্দ্যোপাধ্যায় হিরণ্ময় : রবীন্দ্রদর্শন, রবীন্দ্রশিল্পতত্ত্ব।
বসু অরবিন্দ : The Intergation of Spritual Experience.
বসু, এ : Dr. Brojendra Nath Seal as a literary Critic.
বসু ধীরেন্দ্রমোহন : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
বার্নস, এ্যালকট : The Art in Painting.
বিবেকানন্দ, স্বামী : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।
বিষ্ণুপুরাণ :
হার্বার্ট স্পেন্সর : Data of Ethics.
সিজউইক : Methods of Ethics.
রাস্ক : The Philosophical Bases of Education.
হাক্সলে, আলডুস : Ends and Means.
রেমণ্ড : Modern Education : its aims & methods.
Ross. W. Aristotle : a complete exposition of his works and thought.
Hume : Enquiries concerning the human understanding and concerning the principles of morals.
Nietzche, Friedrich : (The) Philosophy of Nietzche.

Leibnitz, G. W. (The) Monodology and other Writings, Trans. by Robert Latta.

Hegel : an annotated selection. ed. by. Wanda Orynske Kant, Immanuel : Obeservations on the feeling of the beautiful and sublime. Trans. by John J. Goldthwait.

Rene Descartes : Descartes' Philosophical writings. selected and translated by N. K. Smith.

Beck Lewis White : A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason.

The Philosophy of Spinoza : ed. by, Joseph Ratner.

Henri Bergson : Creatique Evolution. (trans. by Arthur Mitchell.)

Henri Bergson : A New Philosophy (ed. by. Edouard le Roy).

Aristotle : (The) Nicomachean Ethics of Aristotle, edited by J. M. Mitchell.

Edward Caird : (The) Evolution of Theology in the Greek Philosophers.

Daveport Russell, W. : (The) Dignity of Man

Peterson, Forrest, H : (A) Philosophy of Man and Society.

Roth Robert, J : John Dewey and Self-realisation.

মতিলাল দাশ : বেদের কথা।

Chatterjee and Dutta : An Introduction to Indian Philosophy.

Jadunath Sinha : Outlines of Indian Philosophy.

William James : The will to believe.

Huxley. J : Evolutionary Ethics.

Ginsberg : Moral Progress.

Bradley : Ethical Studies.

Sidgwick : Method of Ethics.

James Seth : Ethical Principles.

J. E. Erdmann : History of Philosophy.

G. F. Stout : Analytic Psychology.

Dr. S. Radhakrishnan : Indian Philosophy.

Dr. S. Dasgupta : Joga as Philosophy and Religion.

Dr. S. Dasgupta : History of Indian Philosophy.

Max Müller : Six systems of Indian Philosophy.

নির্ঘণ্ট

ব. বি./দর্শন-জিজ্ঞাসা/৬৩-৩১